নিবেদন

অবশেষে 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ'এর তৃতীয় এবং শেষ খণ্ড প্রকাশিত হল।

আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব স্বর্গীয় আশুতোষ মিত্রের জন্মশতবর্ষে (জন্মদিন : ৬ বৈশাখ, ১২৭৫) এই খণ্ড প্রকাশিত হওয়ায়, সকলের আগে যিনি আমার ধর্ম-স্বর্গ ও পরম তপস্যা তাঁর আশীষ ভিক্ষা করছি। তিনি এখানে যেমন আমায় সব সময় রক্ষা করতেন পরলোক থেকেও তিনি তাই করুন এই আমার একমাত্র প্রার্থনা—"শতং ভবাস্যুতয়ে"।

এ-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৯৪৮ সালে যখন প্রকাশিত হয়, তখন থেকেই আমার একমাত্র ভাবনা, পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় সংস্করণ আমি জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারব কিনা। এই দুর্মূল্যের বাজার, তার উপর দুটি যুদ্ধের অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, টাকার মূল্য হ্রাস— সব মিলিয়ে বর্তমান সমাজে তথা মানবের মানসিকতায় এমন এক দোলা এসেছে, তার পরেও যে বই বেরবে এবং সে-বই সুধীসমাজে আদৃত হবে, আমি দেখে যাব—এ আশা আমার পক্ষে করা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণেই যে, মানুষ আশাবাদী। আমার এই আশা, আমার গত ত্রিশ বছরের কামনা বাসনা ধ্যান-ধারণা চিন্তা-চেতনার আজ সমাপ্তি ঘটল। হুগলী জেলার ইতিহাসের তিনটি খণ্ডই আমি আমার দেশবাসীর হাতে দিয়ে যেতে পারলাম এই আমার একমাত্র আনন্দ। আমার দেশ ও আমার জেলার কথা লিখতে গিয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথের "আমার দেশের পথের ধূলা—খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি" এই কথাটি হৃদয়ে উপলব্ধি করে অপার আনন্দ পেয়েছি তাই কবিকে আমার প্রণাম।

জন্মগ্রহণের পর থেকেই দেশের প্রতি ঋণ সুরু হয়। জন্মেই পৃথিবীর আলো বাতাস, মানুষের অমৃত-সঙ্গ, পুরনো ঐতিহ্যের সুমধুর স্মৃতি তথা চেতনা—সবই আমৃত্যু পেয়ে আসছি। দেশ আমার জননী; এই জননী জন্মভূমির প্রতি ঋণের কি শেষ আছে? নেই, এ ঋণের শেষ নেই! তবু কিছু ঋণ শোধ করার সামান্য ব্যর্থ চেষ্টা।

আজ নতুন বছরের প্রথম দিনে, বৈশাখীর প্রদীপ্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে আমি এই ভেবে আনন্দিত যে, ঠাকুরের ইচ্ছায় আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি। আমার সীমিত বিদ্যা-বুদ্ধিতে যতোটুকু সম্ভব ষোলআনা দিয়ে ততোটুকু আমি করেছি।

এই কর্মের পিছনে বাংলাদেশের ইতিহাস-রসিক মানুষের দান বড়ো কম নয়। বিশেষ করে সাধারণ গ্রামের অখ্যাত মানুষের দান। এ'রা নানাভাবে আমায় সাহায্য করেছেন, আমার অনেক ভুল শুধরে দিয়েছেন, আমার গ্রন্থ সম্পর্কে সততই খোঁজখবর নিয়েছেন। বলা যায়, এ'রাই আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন। এ'দের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এই বইয়ের আগের দুটি খণ্ড প্রকাশিত হবার পর সুধীসমাজ এবং সমালোচক

আশাতীতভাবে এই নগণ্য লেখককে প্রশংসা করেছেন। নানান পত্র-পত্রিকায় মুক্তকণ্ঠে এর জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছেন অনেকেই। এ'দের শ্রদ্ধা জানাই।

এই গ্রন্থের প্রথম দুটি খণ্ডের কিছু আলোচনা কয়েকজনের মতের সঙ্গে মিল খায়নি। আমি তো সাধ্যমত তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে চেষ্টা করেছি। তবুও কিছু কিছু মন্তব্য নাকি কয়েকজনের মনোবেদনার কারণ হয়েছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথের কথা এখানে একটু বলি ঃ

তাঁর গুরুদেব দাশরথি দেব সম্বধে ৯২৬ পৃষ্ঠায় প্রথম আট লাইনে যা বলা হয়েছে, তাঁর শিষ্যবর্গের মতে বক্তব্যটি যথার্থ হয় নি। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মনোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতটি উল্লেখ করছি—"দাশরথি দেব যোগেশ্বর ১৪ বৎসর বয়সে ব্যাকরণ শেষ করিয়া ১৭ বৎসর বয়সে ভাষাবিচ্ছেদ ও ন্যায় পাঠ করেন। পরে স্মৃতিশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া "স্মৃতিভূষণ" উপাধিতে ভূষিত হন। পূজাপাঠ, অধ্যাপনা ও সাধনা এই ছিল তাঁহার জীবন। স্বগৃহে ছাত্র রাখিয়া তাহাদের ব্যয় বহন করিয়া বিদ্যাদান ছিল তাঁহার রীতি। ইঁহার বাগ্মীতা ও কবিত্বশক্তি ছিল অপূর্ব। শ্রীমদ ওঙ্কারনাথ 'মন্নাথ' ও 'মিলন গাথা' নামক গ্রন্থদ্বয়ে এই আদর্শ পুরুষের জীবনকথা বর্ণনা করিয়াছেন।"

দেবানন্দপুরে পাকা রাস্তা নির্মাণ (পৃষ্ঠা ৭৫৩) সম্বন্ধে শ্রীঅনিলকুমার দত্ত লিখেছেন যে, তাঁর পিতা রায়বাহাদুর অতুলচন্দ্র দত্তের "প্রচেষ্টায় ও অর্থানুকুল্যে রাস্তা হয়।" কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, সর্বসাধারণের দেয় চাঁদায় উক্ত রাস্তাটি নির্মিত হয়। আর হুগলী জেলার মহিলা কলেজ সম্বন্ধে ৩৯৭ পৃষ্ঠায় রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র মুখার্জির চেষ্টায় উহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি ছয় মাসের মধ্যে টাকা সংগ্রহ করেন বলে যা লেখা হয়েছে, শ্রীভূপতি মজুমদার এই সম্পর্কে বলেন যে এ কথা ঠিক নয়। অর্থসংগ্রহে অনেকেই সহযোগিতা করেন, এবং অর্থদানকারীদের নামের তালিকা কলেজে আছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলী জেলার অবদান ও হুগলী জেলার লেখকগণের বিস্তারিত গ্রন্থতালিকা অর্থাভাবে এই গ্রন্থে সংযোজিত করতে পারলাম না। সেজন্য আমি দুঃখিত। আটশো আলোকচিত্রের মধ্যে তিনটি খণ্ডে মাত্র সাড়ে-চারশো ব্লক দেওয়া সম্ভব হলো। হুগলী জেলার সহস্রাধিক গ্রন্থাগার যদি এই গ্রন্থ তাঁদের গ্রন্থাগারে রক্ষা করে আমায় সহায়তা করতেন তাহলে বোধহয় অর্থকৃচ্ছতার হাত থেকে আমি রেহাই পেতাম। যা হোক ভবিষ্যতে পৃথক পুস্তকে উহা প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল। বহু আয়াস স্বীকার করে শ্রীমতী রমা দেবী উল্লেখপঞ্জী করে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আর আমার কন্যা কল্যাণীয়া শুক্লা পুরাণো বই থেকে অনেক তথ্য নকল করে দিয়ে আমায় সহায়তা করেছে। এ'দের দু'জনকে আমি আশীর্বাদ করছি।

মিত্রাণী
২ কালী লেন ॥ কলিকাতা ২৬

আমার পরলোকগতা কন্যা

শিখার উদ্দেশে

॥ প্রতিলিপি ॥

[২য় খণ্ড]

[৩য় খণ্ড]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার প্রসারকল্পে সরকারী সাহায্যে এই গ্রন্থের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল।

বিষয় সূচী

তৃতীয় খণ্ড

রায়ের মন্দির ১০৫১; ক্ষীরোদগোপাল মিত্র ১০৫১; কুমারকৃষ্ণ মিত্র ১০৫১; গরুটি ১০৫১; গরুটির প্রাসাদ ১০৫২; ফরাসীদের নাট্যশালা ১০৫৩; গৌরহাটি যক্ষ্মা হাসপাতাল ১০৫৩; অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি ১০৫৩; ফিরিঙ্গি কালী ১০৫৫; হাঙ্গরের উৎপাত ১০৫৬; কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ১০৫৬; চাঁপদানী ১০৫৭; বঙ্গের প্রাচীন চটকল ১০৫৭; চাঁপদানী মিউনিসিপ্যালিটি ১০৫৮।

চারুশীলা বসু বালিকা বিদ্যালয় ১২১১; সারদাচরণ মিউজিয়াম ১২১১; অপরূপা মাতৃসদন ১২১২।

॥ চিত্রসূচী ॥

১২৭ আমোদর নদ-গড়মান্দারণ, মধুসূদন গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

১২৮ রঘুনাথ দাস গোস্বামী, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

প্লেট ১২৯—প্লেট ১৩৬ ... ... ১৪৪৪—১৪৫৩

১২৯ রাজা রাজচন্দ্র রায়ের সনন্দ, নিস্তারিণী কালী—সেওড়াফুলি।

১৩০ ঘোষবংশের বিগ্রহ রাধাগোবিন্দজীউ—দশঘরা, বরদা সোম প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়।

১৩১ রাজরাজেশ্বরী—কোন্নগর, ভদ্রেশ্বরের মন্দির—ভদ্রেশ্বর।

১৩২ শিবমন্দির—চাঁদবাটি, দ্বারিকাচণ্ডীর ভগ্ন মন্দির—দ্বারহাট্টা।

১৩৩ মদনমোহনজীউর মন্দির—শ্রীরামপুর, রাজরাজেশ্বরের মন্দির——দ্বারহাট্টা।

১৩৪ যোগেশচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

১৩৫ প্রাচীন মন্দিরের ইষ্টকে ভাস্কর্যশিল্প, অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায়, মনোমোহন সিংহ রায়।

১৩৬ জগন্নাথদেবের মন্দির—মাহেশ, রাধাবল্লভের মন্দির—বল্লভপুর।

প্লেট ১৩৭—প্লেট ১৪৬ .. .. ১৪৫৮—১৪৬৯

১৩৭ অরবিন্দ ঘোষ

১৩৮ রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের থামে চিত্রাবলী, নন্দদুলালের মন্দিরের পোড়ামাটির চিত্রাবলী

১৩৯ ভাণ্ডারহাটি হইতে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বর মূর্তি

১৪০ রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের খিলানের চিত্র, দ্বারিকাচণ্ডী মন্দিরের ইঁটের ভাস্কর্যশিল্প।

১৪১ রাঘবেশ্বর—বৈদ্যবাটী, চামুণ্ডা—ভাস্তাড়া, পার্বতী—সেওড়াফুলি, বিষ্ণু—মহানাদ, বিষ্ণু—দীঘা, বিষ্ণু—পুনাজগড, পার্শ্বনাথ—পাণ্ডুয়া।

১৪২ বিশাল গৌরীপট্ট—মহানাদ, বুদ্ধদেব—রামপুরহাট, মন্দিরের থাম, বিষ্ণুমূর্তি—মাদড়া, বিষ্ণুমূর্তির নিম্নাংশ—দ্বারবাসিনী, প্রাচীন মূর্তির নিম্নাংশ—জেজুর, বুদ্ধদেব—বারাকপুর, বিষ্ণুমূর্তির নিম্নাংশ—হুগলী।

১৪৩ মহাবীর—কাঁকড়াকুলি, শোভাযাত্রা—কাঁকড়াকুলি, মহাবীর—সিঙ্গুর, মহাবীর—হরিপাল।

১৪৪ নৃত্যরত ভৈরব—মাদড়া, বড়মাকালী—বৈঁচী, বিষ্ণুমূর্তি—পাণ্ডুয়া বিষ্ণুমূর্তি—কানপুর।

১৪৫ রেজা খাঁ প্রদত্ত তায়দাত—রিষড়া।

১৪৬ বিশালাক্ষীমাতা—আনুড়।

চন্দননগর মহকুমা

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর চন্দননগর মহকুমা গঠিত হয়। চন্দননগর ফরাসী অধিকৃত স্থান ছিল এবং আয়তনে ছোট হইলেও ইহা ঐতিহ্যে মুখর। সমগ্র বঙ্গদেশ যখন বৃটিশ-শাসিত ভারতের একটি প্রদেশরূপে ইংরাজ রাজত্বের অধীন, তখন এই ক্ষুদ্র অঞ্চল ফরাসী-শাসনের অধীনে এক স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। রাজনীতিক ও শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিতে বাঙলার এই শহরটি তখন বাঙালীর কাছে বিদেশ বলিয়া গণ্য হইলেও প্রাকৃতিক বিন্যাসে বাঙলার এই অবিচ্ছেদ্য অংশ শিল্পে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে বাঙলার সহিতই অন্তর-সংযোগে যুক্ত ছিল।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে ইংরাজ শাসনের অবসান হইলে বাঙলার এই বিশিষ্ট ফরাসী শহরটির উপর বৈদেশিক শাসনের অবস্থান বাঙালীর অন্তরকে আন্দোলিত করে বলিয়া চন্দননগরের মুক্তি আন্দোলন বহ্নিমান হইবার আগেই ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা মে ফরাসী সরকার চন্দননগরকে ভারত সরকারের নিকট হস্তান্তরিত করেন। ইহার পূর্বে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে চন্দননগরে গণভোট গ্রহণ করা হয়। এই গণভোটে চন্দননগরের শতকরা ৯৯ জন অধিবাসী এই শহরকে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির জন্য ভোট দেন।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন ভারতসরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের অধীনে 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটর' দ্বারা চন্দননগর শাসিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণানুযায়ী শ্রীসুনীলবরণ রায় চন্দননগরের শাসন পরিচালক ও পুলিশের মহাপরিদর্শক এবং শ্রীবিমলচন্দ্র সেন পুলিশ অধিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুনের পূর্বে ফরাসী ইউনিয়নের যে সব নাগরিক ও ফরাসী প্রজা চন্দননগরের অধিবাসী ছিলেন তাঁহারা ভারতীয় নাগরিক হন।

মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য জন্মদিবস ২রা অক্টোবর ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ফরাসী চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ভারত সরকার চন্দননগরের শাসনভার পশ্চিমবঙ্গের উপর অর্পণ করেন। শাসনপরিচালক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীনির্মলকান্তি রায় চৌধুরীর হাতে চন্দননগরের যাবতীয় শাসনভার অর্পণ করেন। তিনি সেই দিন প্রাক্তন শ্রীরামপুর মহকুমার **হরিপাল, তারকেশ্বর, সিঙ্গুর** ও **ভদ্রেশ্বর** এই চারটি থানাসহ চন্দননগরকে লইয়া হুগলী জেলার অধীনে নূতন **"চন্দননগর মহকুমা"** গঠন করিয়া দেন। বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমস্ত আইন সেই দিন থেকে চন্দননগরে প্রযোজ্য হয়। পূর্বে যে সব আইন বলবৎ ছিল তাহা সমস্তই চন্দননগরে এখন রদ হইয়া গিয়াছে। শ্রীহরিহর শেঠ ও দেবেন্দ্রনাথ দাস যথাক্রমে চন্দননগর শাসন পরিষদ ও পৌরসভার প্রথম ও দ্বিতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন।

মুক্তিসাধনায় চন্দননগর পুস্তকে শ্রীহরিহর শেঠ মুক্তিলাভের জন্য চন্দননগরবাসিগণ যে সকল বাধাবিপত্তির মধ্যে থাকিয়াও সংগ্রাম করেন তাহা লিখিত আছে। ফরাসী চন্দন-নগরের প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককালের বিস্তারিত বিবরণও তিনি এই গ্রন্থে প্রকাশের জন্য দিয়াছেন।

॥ চন্দননগর ॥

ফরাসী চন্দননগরের বিশিষ্টতা ফুটিয়াছিল এখানকার শিল্প ও বাণিজ্যে,—কিন্তু ফরাসীদের সহিতই ইহার পরিচয়। ইংরাজী ১৪৯৫ অব্দে কবি বিপ্রদাস রচিত মনসা-মঙ্গলে ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতিতে বা প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত পাণ্ডব-দিগ্বিজয়-প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগলিক গ্রন্থে, ইহার অন্তর্গত কোন কোন স্থানের উল্লেখ দৃষ্টে ইহার প্রাচীনতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইলেও, কতিপয় পল্লী একত্র করিয়া চন্দননগর নামের উৎপত্তি হইয়াছিল সম্ভবতঃ ফরাসীদের উপনিবেশ স্থাপনের পর।

"খলসানি মহাগ্রামো যত্র রাজা চ ধীবর"—দিগ্বিজয় প্রকাশ

গঙ্গা-বক্ষ হইতে ধনুরাকৃতি ধূর্জ্জটি--ললাটে চন্দ্রকলার ন্যায় সহরের আকৃতি থাকায় চন্দ্র হইতে চন্দ্রনগর এবং তাহা হইতে চন্দননগর, অথবা চন্দন কাষ্ঠের ব্যবসা বা প্রচুরতা হইতে চন্দননগর নামের উৎপত্তি হয়। শেষোক্ত কারণ হওয়াও বিচিত্র নহে; কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এখানে চন্দন কাষ্ঠের কাজ ছিল, সে প্রমাণ পাওয়া যায়। (১) চন্দননগর নামের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বরে এখানকার কর্তৃপক্ষ মার্টিন, দেলান্দ এবং পেল্‌এ স্বাক্ষরিত তদানীন্তন প্যারিস্থ ডিরেক্টরকে লিখিত এক পত্রে।

ফরাসী কোম্পানীর প্রথম অধিনায়ক মঁসিয়ে দেলান্দ মোগল বাদসার নিকট হইতে ৪০,০০০৲ মুদ্রা বিনিময়ে ১৬৮৮ খৃীষ্টাব্দে চন্দননগরে কুঠি স্থাপন ও তথাকার মালিকত্ব লাভের অনুমতি প্রাপ্তির অনেককাল পূর্বে পেলিসি নামক এক ব্যক্তি ১৬৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে সহরের উত্তর প্রান্তে বোড় কিষণপুর নামক পল্লীতে প্রথম এক খণ্ড প্রায় ১০ আরপাঁ পরিমিত জমি ৪০১৲ টাকা মূল্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।*

দেলান্দ এখানে কুঠি স্থাপনের পর এই নূতন উপনিবেশে কোম্পানীর কার্য-পরিসর দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময় কোম্পানী বলিতে ডিরেক্টর ১ জন, ৫ জন সভ্য লইয়া এক কাউন্সিল, ব্যবসাদার ও দোকানদার ১৫ জন, নতের ২ জন, পাদরি ২ জন, ডাক্তার ২ জন ও সূত্রধর ১ জন মাত্র ছিল; এবং পদাতিক ১০৩ জন, তন্মধ্যে ২০ জন ভারতীয়—ও ৩টি কামান ছিল। (২) চন্দননগরের সুপ্রসিদ্ধ আরলাঁ দুর্গ ১৬৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ইহা সহরের মধ্যস্থলেই ছিল এবং হুগলীর ওলন্দাজ দুর্গ ও কলিকাতার পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অপেক্ষাও অধিকতর মজবুত ও জমকাল ছিল। (৩) কিন্তু উহার প্রসিদ্ধি ইহাতে নহে। যে বৃটিশ জাতি একদা জগতের অদ্বিতীয় জাতি বলিয়া খ্যাত ছিল, ১৭৫৭ খৃীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ এই দুর্গপাদমূলেই তাঁহাদের ভাগ্য পরীক্ষিত হইয়াছিল। ফরাসী গভর্ণর দুপ্লে যে নীতি ধরিয়া এই চন্দননগরে বসিয়া এক দিন ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন সেই নীতি গ্রহণ করিয়াই বহুদিন তাঁহারা ভারতের অধীশ্বর হইয়া পৃথিবীর সর্বপ্রধান জাতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। ভাগ্যদেবীর গতি ভিন্নরূপ হইলে আজ ভারতেতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত।

*ফ্রান্সের জমির এক প্রকার মাপ। এক আরপাঁ প্রায় তিন বিঘার সমান।
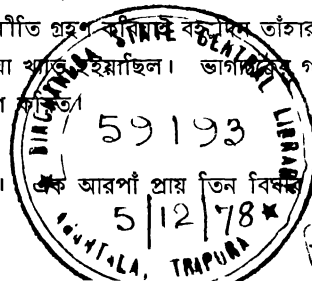
ফরাসীদের প্রথম অভ্যুদয়ের পর ফ্রান্সের মূল কোম্পানীর অমনোযোগিতা ও এখানকার অর্থাভাবে কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হইতে থাকে তৎপরে কিঞ্চিদধিক প্রায় সিকি শতাব্দী গত হইলে ইংরাজি ১৭৩১ অব্দে দুপ্লের ডাইরেক্টররূপে এখানে আগমনের সহিত শিল্পে, বাণিজ্যে, সম্পদে, সম্ভ্রমে দশ বৎসরের মধ্যে যেন যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে এ স্থান নবীন শ্রী ধারণ করিয়া ভাগীরথী-তীরবর্তী অপর সকল পাশ্চাত্য জাতি সকলের ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠে। এই সময় এখানকার সহিত সুরাট জেডো, বসোরা, তিব্বত, পারস্য এমন কি সুদূর চীন পর্যন্ত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এক কথায় তখন সমস্ত বাংলার উপর এখানকার বাণিজ্য-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন এই উন্নতিশীল উপনিবেশটিকে বেশ সুরক্ষিত দেখিয়া এবং এখানে ব্যবসাদি কার্যের সুবিধা বিবেচনায় অন্যান্য স্থান হইতে বহু লোক এখানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। তখন কলিকাতার শোভা-সম্পদ-বাণিজ্য সর্ব বিষয়ই এ স্থানের তুলনায় হীন ছিল। এই সময় এখানে সুন্দর রাজবর্ত্ম বেষ্টিত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ইষ্টক-নির্মিত অট্টালিকা ও অধিবাসীর সংখ্যা এক লক্ষ ছিল। (৪)

দুপ্লের সময় এবং তাহার অব্যবহিত পর পর্যন্ত এ স্থানের উন্নতি হইয়াছিল। তৎপরে পূর্বোক্ত ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধের পর ইহা বৃটিশদের হস্তগত হয় এবং সেই সঙ্গে ফরাসী জাতির ভারতে প্রতিষ্ঠালাভের আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই চিরতরে বিলুপ্ত হয়। ক্লাইভের আদেশে দুর্গের তলদেশ পর্যন্ত তুলিয়া ফেলা হয় এবং সহরের প্রায় সমস্ত অট্টালিকা ধ্বংস করিয়া সহরের পূর্ব শ্রী লুপ্ত করা হয়। ইংরাজী ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা ইংরাজদের অধিকারে থাকে। তৎপরে ইংলণ্ডের ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ সাতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রত্যার্পিত হয়। এইরূপ আরও কয়েকবার ইংরাজ হস্তে পুনঃ ফরাসীদিগের হস্তে যাওয়ার পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইহা শেষবার ফরাসীদিগের হস্তে আসে। এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা ফরাসীদিগের হাতেই ছিল। ভাগীরথীতীরে যে সকল পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহারা সকলেই ভারত ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন।

॥ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ॥

পূর্বকালে এখানে অহিফেন, বস্ত্র, নীল, রেশম, চাউল, দড়ি, চিনি প্রভৃতির কাজ খুব বেশী ছিল। এখানকার সূক্ষ্ম বস্ত্র তখন ইউরোপে পর্যন্ত রপ্তানি হইত। চন্দননগরের গৌরবময় যুগে যে সকল শ্রীসম্পন্ন লোকের উদ্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রধান। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তৎকালে সম্ভ্রমে ও সম্পদে এ প্রদেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন বলা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গারাম যশোহরের কোন স্থান হইতে তাঁহার বিধবা মাতার সহিত এখানে মাতুলালয়ে আগমন করেন। তিনি নিজ চেষ্টায় ফরাসী কোম্পানীর অধীনে সামান্য চাকরীতে প্রবেশ করিয়া শেষে প্রধান সহায় রূপে কোম্পানির বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন; এবং কোম্পানির মাল খরিদ-বিক্রয় দ্বারা প্রভূত সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজ সম্মানেও তিনি সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং দুইটি সুবর্ণ পদক পাইয়াছিলেন। কথিত আছে, ১৭৫৬

খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর বৎসর চন্দননগর অবরোধের পর ইংরাজ সেনা কেবল তাঁহার আবাস লুণ্ঠন করিয়াই প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ও নগদ টাকা লইয়া যায়। এই সময় ক্লাইভের গোলায় তাঁহার বিশাল বাসভবন চূর্ণ হইয়া যায়। ইহার পর হইতে চৌধুরী-বংশ একেবারে হতশ্রী হইয়া যায়। এখন তাঁহাদের সবই গিয়াছে; আছে কেবল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "চৌধুরী ঘাট" **"নন্দদুলালের মন্দির"** প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ মাত্র। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্জ করিবার জন্য সর্বদা তাঁহার নিকট আসিতেন এবং কবি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় চাকুরীর উমেদারীর জন্য আসিতেন।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পাঁচ পুত্র ছিল। তাহাদের নাম জগন্নাথপ্রসাদ, শিবনাথ, কৃষ্ণপ্রসাদ, বলরাম ও আত্মারাম। কৃষ্ণপ্রসাদ ইন্দ্রনারায়ণের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চন্দননগরের পতনের পর তাঁহাদের অবস্থা অতিশয় হীন হইয়া পড়ে তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দেও কৃষ্ণপ্রসাদ জীবিত ছিলেন। তিনি প্যারিসে ফরাসী মন্ত্রীর নিকট নিজের দুর্দশার কথা ও তাঁহার পিতা ও তিনি স্বয়ং ফরাসী কোম্পানীর কি উপকার করিয়াছেন সেই কথা জানাইয়া আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করেন। কিন্তু ফরাসী কোম্পানী তাহার কোন অনুকূল উত্তর দেন নাই।

কৃষ্ণপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম কাশীনাথ। তিনি পর্যন্ত ইন্দ্রনারায়ণের বংশ সমাজে পতিত ছিল। নেড়োরমনের চট্টোপাধ্যায় বংশীয় দেওয়ান রামপ্রসাদ কাশীনাথ চৌধুরীকে উদ্ধারের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া দ্বাদশ মন্দির নির্মাণ করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে কাশীনাথকে সমাজে পুনস্থাপিত করেন। কাশীনাথ নামক একটি শিব এখনও আছে।

উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব হইতে খলিসানীর বসু ও গোন্দলপাড়ার হালদার মহাশয়েরাই এখানকার মধ্যে ধনী জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বসু মহাশয়-দিগের পূর্বপুরুষ করুণাময় বসু ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তাম্রলিপ্ত হইতে আসিয়া প্রথমে বেলকুলি, পরে বেলকুলির নবাবের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইয়া তাঁহার প্রদত্ত জমিতে খলিসানী গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই বংশ প্রাচীনতায় ও ধর্মকর্মের জন্য এখানে বিশেষ খ্যাত। দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, পথ ঘাট প্রস্তুত প্রভৃতি কার্যের জন্য ইঁহাদের পূর্বপুরুষগণ সাধারণের যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে বসু-বংশ অনেকটা হীনপ্রভ হইয়া যাইলেও যথারীতি দোল, দুর্গোৎসব ও পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী, নন্দনন্দন, বিষ্ণু গোপাল প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে। হালদার মহাশয়ের আদি পরিচয় কিছুই জানিতে পারা যায় না।

এখানকার গ্রাম্য দেবতা **শ্রীশ্রীবড়াইচণ্ডী ও শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী** অতি প্রাচীন ও জাগ্রত। এখানকার অন্যান্য প্রাচীন বর্ধিষ্ণু বংশের মধ্যে বারাসাতর শ্রীমানী ও দে, বাগবাজারের সরকার, নেড়োরমনের চট্টোপাধ্যায় ও ঘোষ, পালপাড়ার পাল, বেড়োর পালিত, পাল, বসু ও কুণ্ডু প্রভৃতি এবং দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়, দেবী সরকার, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মোল্লা হাজি, কাশীনাথ কুণ্ডু, রামকানাই সরকার, নবকৃষ্ণ দে দুর্গাচরণ রক্ষিত, শম্ভুচন্দ্র শেঠ, অদ্বৈতচরণ মণ্ডল প্রভৃতি ব্যক্তিদের নাম শুনা যায়।

পূর্বকালে কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা, কথক, যাত্রাওয়ালা এখানে যত ছিল এত আর কোথাও ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ রাসু, নৃসিংহ, আণ্টুনি ফিরিঙ্গী, গোরক্ষনাথ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, নীলমণি পাটুনী, বলরাম কপালী প্রভৃতি কবিওয়ালা; চিন্তে মালা, নবীন গুঁই প্রভৃতি পাঁচালীওয়ালা; রঘুনাথ শিরোমণি, উদ্ধব চূড়ামণি, তমাল অধিকারী প্রভৃতি কথক এবং মদন মাষ্টার, বৌ মাষ্টার, মহেশ চক্রবর্তী, ব্রজ অধিকারী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাগণ, এই স্থানেই বাস করিতেন। এই সহরে এতাবৎ যতগুলি শিল্পী, চিত্রকর, গায়ক, লেখক ও গ্রন্থকারের উদ্ভব হইয়াছে, অন্যত্র তাহা কুত্রাপি দেখা যায় না। বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম পুস্তকত্রয়ের অন্যতম **"কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ"** নামক গ্রন্থ চন্দননগরের পাদরি গেরাাঁ দ্বারা শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হইয়া এই স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরী হইতে রোমান অক্ষরে এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। লেখক মনো-এল্-দা আস্সুম্পসাম্ ঢাকা জেলায় তাঁহার ধর্মপ্রচার ক্ষেত্রে ভাওয়াল ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের উপভাষা ইহাতে প্রয়োগ করিয়ছেন। ইহাই সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা পুস্তক। এই লেখকই পর্তুগীজ ভাষায় সর্বপ্রথম বাঙ্লা ব্যাকরণ (১৭৩৪ খৃঃ) এবং বাঙ্লা কোষ প্রণয়ন করেন। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ'-এর ভাষার নমুনাঃ

"পিতা আমারদিগের, পরমস্বর্গে আছ; তোমার সিদ্ধি নামেরে সেবা হোক্:"

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ম্যাডাম গ্র্যান্ড, বর্মার রাজকুমার মাইন্গুন্, ম্যাডাম ওয়াটস্, জাল প্রতাপচাঁদ, জন বৃষ্টো, মহারাজ নন্দকুমার, বৈকুণ্ঠ মুন্সি, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও দর্পনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এখানে বাস করিয়াছেন। বিশপ কুরি, বিশপ হিবার, গ্রাঁপ্রে., স্ট্রাভোরিনাস, হ্যামিল্টন, উইলিয়াম হজ, এলবার্ট মেটো রিপা প্রভৃতি পর্যটকগণও এ স্থানে আসিয়াছিলেন।

॥ ম্যাডাম্ গ্রাণ্ড ॥

ইতিহাসপ্রসিদ্ধা রূপলাবণ্যময়ী ম্যাডাম গ্রাণ্ড যাঁহার রূপবহ্নিতে এক সময় বাঙ্গলা ও ফ্রান্সের বহু লোক দগ্ধ হইয়াছিল, যাঁহার কথা কবি তাঁহার ছন্দে "Queen of the Ganges, Queen of the Siene" বলিয়া গাহিয়াছেন, যাঁহার একটু একটু মধুর হাসির পরিবর্তে মহামান্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস তাঁহার সমস্ত পদমর্যাদা তৎপদে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন—তিনি ফ্রান্সে যাইয়া প্রিন্সেস দে টালিরন্ড নামে পরিচিত হইবার পূর্বে চন্দননগরে বাস করিতেন।

পুরাতন চন্দননগরের গৌরবময় স্মৃতিচিহ্ন এখন অতি অল্পই আছে। যাহা আছে তন্মধ্যে কোম্পানীর সময়ের গোরস্থান, সুবৃহৎ জলাশয় 'লালদীঘি' ১৭২০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত কনভেণ্ট সংলগ্ন গির্জা, শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দির, শ্রীশ্রীদশভুজা দেবীর মন্দির, তায়ৎখানা বাগানের ডাচ নির্মিত ভজনাগারের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানকার ফরাসী জাতীয় উৎসব ফ্যাস্তা, যাদুঘোষের রথ ও বারোয়ারীর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজাও বহু দিনের। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দিনটি স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই ফ্যাস্তার উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। ফরাসীগণ চলিয়া যাইবার পর এই উৎসবটি এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সমস্ত সহরটি বহু পল্লীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে গোন্দলপাড়া, বারাসাত, দিনেমারডাঙ্গা, হাটখোলা, হাজিনগর, মানকুণ্ডু, দিগলসপটী, বড়বাজার, বাগবাজার, লালাবাগান, উড়েপাড়া, হালদারপাড়া, ভাকুন্ডা, খলসানি, কলুপুকুর, নাড়ুয়া, বোড়, সরিষাপাড়া, গোস্বামীঘাট, কাবারিপাড়া, বক্সীর বেড়, চাঁপাতলা, বোড়াই চন্ডীতলা, হরিদ্রাডাঙ্গা, সুরের পুকুর, কাঁটা-পুকুর প্রভৃতিই প্রধান। অন্যান্য স্থানের পল্লী সকলের নাম যেমন দেব-দেবী, ব্যক্তি, জাতি, বৃক্ষ, জলাশয় বা ঘটনাবিশেষের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এখানেও সেইরূপে অনেকগুলি পল্লীর নাম হইয়াছে, গোন্দলপাড়া, খলিসানী ও বোড় নামক স্থানগুলি অতি পুরাতন। গোন্দলপাড়া নবাব খানজা খাঁর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, দিনেমাররা উহা ছাড়িয়া দিবার পর ফরাসীরা ইজারা লয়। নবাব খানজা খাঁর বিষয় ৬৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

দিনেমারডাঙ্গা নাম—দিনেমারদের শ্রীরামপুর যাইবার পূর্বে প্রথম ঐ স্থানে বসবাস ও কুঠীস্থাপনা হইতে। মানকুণ্ড,—রাজা মানসিংহের উড়িষ্যা যাত্রাকালে এই স্থানে আগমন হইতে। মানসিংহের স্মৃতি-বিজড়িত একটি পুষ্করিণীর সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি শুনা যায়। দিগলেস্‌পটী দুপ্লেক্সের নাম হইতে। লালবাগান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর শুভ্র লাল-মোহনের নাম হইতে। (৫) পালপাড়া, গোস্বামীঘাট, বক্সীর বেড় কুণ্ডুঘাট প্রভৃতি পাল, গোস্বামী, কাবারি, বক্সী প্রভৃতি হইতে নামের উৎপত্তি। বেহারা বা উড়েপাড়া নামটি ইন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরীর উড়িষ্যা হইতে আনীত পাল্কীর বেহারাদের বাসস্থান হইতে।

সেইরূপ রথের সড়ক নামোৎপত্তি ইন্দ্রনারায়ণের রথ হইতে হইয়াছে। পঞ্চাননতলা, ষষ্ঠীতলা, **বোড়াইচন্ডীতলা**, কালীতলা, বিশালক্ষ্মীতলা, সনাতনতলা প্রভৃতি স্থানগুলি ঐ সকল নামীয় দেবদেবীর নাম হইতে। চাঁপাতলা, বাদামতলা, শাউলিবটতলা, খেজুরতলা, প্রভৃতি গাছের নাম হইতে। সুরের পুকুর, বেণেপুকুর, পদ্মপুকুর, কলশপুকুর, বিদ্যালঙ্কার পুকুর ও মুন্সীপুকুর প্রভৃতি স্থানগুলি এবং ঐ পার্ক, মেরি, পুলিস আফিস বড় বড় হোটেল প্রভৃতি গাছের নাম হইতে। সুরের পুকুর, বেণেপুকুর, পদ্মপুকুর, কলুপুকুর, বিদ্যালঙ্কার ছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঠিক তাহার অব্যবহিত পূর্বে চন্দননগরের অবস্থা ধ্বংস-প্রায় হইয়াছিল, এ কথাও এক জন লেখিকা বলিয়াছেন।(৬)

বোড়াই চন্ডীমাতা চন্দননগরের অন্যতমা প্রাচীনা দেবী বলিয়া কথিত আছে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর দেবীর যাবতীয় অলঙ্কার অপহৃত হয়। পরে চন্ডীমাতার পুনরভিষেক হয়। এই সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় [৩রা ও ২৯শে অক্টোবর ১৯৫৭] প্রকাশিত দুইটি সংবাদ উল্লেখ্যঃ

বোড়াই চন্ডীমাতার অলঙ্কার অপহৃত

চন্দননগর, ২রা অক্টোবর ১৯৫৭—গতকল্য রাত্রে **বোড়াই চন্ডীমাতার** মন্দির হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার অপহৃত হইয়াছে। দুষ্কৃতকারী মন্দিরের ফটকের তালা ভাঙিয়া প্রবেশ করে।

জনগণের বিশ্বাস প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে সিংহলে আটক পিতাকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহল যাত্রাকালে তাঁহার মাতার নির্দেশানুযায়ী ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বিগ্রহের মস্তকটি মন্দির হইতে ২০০ গজ দূরে পাওয়া যায়। উহা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া যথারীতি শুচীকরণের পরে অর্চিত হইতেছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। ৩-১০-৫৭

বোড়াই চণ্ডীমাতার পুনরভিষেক—শারদীয়া পূজার মহাষ্টমী রাত্রে মন্দিরের তালা ভাঙিয়া বোড়াই চণ্ডীমাতার মস্তক অপহরণের পর গতকল্য বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা দেবীমূর্তির আবশ্যক অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হোম যজ্ঞ প্রভৃতি হয় এবং প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগমে ও কোলাহলে মন্দির প্রাঙ্গণ উৎসব মুখরিত হইয়া উঠে। দেবীর যে সমস্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার এবং বস্ত্রাদি অপহৃত হইয়াছিল তাহা পুনরায় সংগ্রহ করা হইয়াছে। ২৯-১০-৫৭

এখানে কয়েকটি বেশ প্রশস্ত এবং সোজা বড় রাস্তা আছে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড এই সহরের ভিতর দিয়া গিয়াছে। সমস্ত সহরটিতে পাকা পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ মাইল এবং কাঁচা পথ মোট ১০ মাইল। ১৭৫১ -৫২ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে দেখা যায়, তখন পাকা পথ প্রায় ১০ মাইল এবং কাঁচা পথ প্রায় ১½ মাইল মাত্র ছিল। (৭)

এখানকার বিশেষত্বের কথা বলিতে হইলে পুষ্করিণীর আধিক্যের কথা উল্লেখ করিতেই হয়। পূর্বোক্ত মানচিত্র হইতে গণনায় মোট প্রায় ১ হাজার ৪ শত ৫০ জলাশয় পাওয়া যায়। বোধ হয়, এত অধিকসংখ্যক পুষ্করিণী এ প্রদেশে এই পরিমাণ স্থানের মধ্যে অন্যত্র নাই। দেবমন্দির ও ভাগীরথীতীরে ঘাটের সংখ্যাও অধিক। ছোট বড় মন্দিরের সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ১শতের কম নহে এবং বাঁধাঘাটের সংখ্যা মোট ২৯টি। গৃহাদির সংখ্যা যে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা দেখা যায়, কিন্তু পুষ্করিণীর সংখ্যা আর বৃদ্ধি পাইতেছে না, বরং কিছু কমিয়াই থাকিবে।

কতিপয় ব্যবসার জন্য চন্দননগরের এখনও খ্যাতি আছে। সে সম্বন্ধে পরে বলা হইবে। দেশী মদ, গুলীর আড্ডা, তুরংও কতকটা বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। পূর্বে এ স্থান যাত্রা, কবি পাঁচালীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ১৪ই জুলাইয়ের জাতীয় উৎসব ফ্যাস্তা স্বর্গীয় যাদবেন্দু ঘোষ প্রতিষ্ঠিত "যাদু ঘোষের রথ", রাজেন্দ্রনাথ গোস্বামী (গাংগুলী) প্রতিষ্ঠিত খুন্তির মহোৎসব নামক মেলা এবং সর্বোপরি শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার ধুম এখানকার বিখ্যাত বাৎসরিক উৎসবরূপে উল্লিখিত হইতে পারে। যাদু ঘোষের উপর জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ হওয়ায় এই রথ প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া একটা কিংবদন্তী আছে। এখানে যেরূপ বৃহদায়তনের সুন্দর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গঠিত হইয়া মহাসমারোহে ৩ দিন পূজা হইয়া বিসর্জন হইয়া থাকে, তাহা কুত্রাপি দেখা যায় না। উপস্থিত এরূপ ঠাকুর বহু পুরাতন। চাউল-ব্যবসায়ীদের দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠিত হইলেও, প্রথম প্রতিষ্ঠিতা কে এবং কোন্ সময় হইতে এই পূজা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ঠিক জানা যায় না। শুনা যায়, কাপড়েপটীর ঠাকুরের প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীধর বন্দোপাধ্যায়। ইনি একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রায় শত বৎসর পূর্বে তিনি চাঁদা সংগ্রহ করিয়া প্রথম এই পূজা আরম্ভ করেন। পূর্বে সহরের উত্তরাংশে গোন্দলপাড়া ও ডাঁশপুকুর নামক স্থানে আর দুইখানি বড় বড় ঠাকুর হইত। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত ইতিহাস ২৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া

এখানে আর উল্লেখ করা হইল না। এখানে কার্তিক ও সরস্বতী পূজায়ও যথেষ্ট ধূম আছে।

॥ রাজরাজেশ্বরী পূজা ॥

জগদ্ধাত্রী পূজার ন্যায় চন্দননগর গড়বাটীতে **রাজারাজেশ্বরী পূজা** বহুদিন হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই পূজা সম্বন্ধে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ্যঃ

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও উত্তর চন্দননগর গড়বাটীতে রাজরাজেশ্বরী পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। সর্বজনীন ভিত্তিতে রাজরাজেশ্বরী মাতার পূজা এতদঞ্চলে একমাত্র এখানে হইয়া থাকে এবং এই উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে প্রচুর জনসমাগম হয়। পূজা শুক্রবার সপ্তমী তিথিতে আরম্ভ হইয়া সোমবার দশমী পর্যন্ত চলিবে।

চড়ক, পাটভাঙ্গা, স্নানযাত্রা, দ্বাদশ গোপাল, ঝাঁপান প্রভৃতিতেও পূর্বে বেশ লোক সমাগম হইত, এখন পর পর কমিয়াই যাইতেছে। ভাল আম্রের জন্যও চন্দননগরের একটু প্রসিদ্ধি আছে। সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বনাথ চাটুয্যে' নামক আম্রের উৎপত্তি এই স্থানেই এবং 'হিমসাগর' নামক অত্যুৎকৃষ্ট আমের আদিস্থান গরুটির বাগান বলিয়া শুনা যায়।

চন্দননগরের অবস্থা সম্বন্ধে যত দূর বুঝিতে পারা যায়, বর্তমানে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যান্য পার্শ্ববর্তী স্থান-সমূহের তুলনায় অনেক বেশী হইলেও ইহার উন্নতি যুগের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। সহরের সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা অনেক অংশেই এক্ষণে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু অন্য দিকে কতকগুলি স্থান ক্রমশঃ লোকশূন্য হইয়া জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইতেছে। শত বৎসর পূর্বে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, যখন বিশপ হিবার এই স্থান দর্শন করেন, তখন ইহাকে জনবিরল, কর্মবিরল, নিস্তব্ধ, নিভৃত স্থান বলিয়া গিয়াছেন। (৮) বৃটিশ সংঘর্ষে উহার পতনের পর হইতেই ক্রমে এই দশা প্রাপ্ত হয়। উহার অদূর ভবিষ্যৎ হইতেই চন্দননগর পুনরায় ধীরে ধীরে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে থাকে। উহার প্রাচীনকালের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইতে এখনও অনেকটা বাকী থাকিলেও, বহুদিন হইতেই নগর ভাগীরথী তীরবর্তী অন্যান্য নগর-সমূহের তুলনায় শোভা, সৌন্দর্য ও সুবিধায় উন্নত।

প্রজাতন্ত্র চন্দননগরে প্রজার অধিকার, রাজ্যপরিচালনা-পদ্ধতি, বিচার শাসন প্রভৃতি পূর্বে অন্যান্য লোকের কৌতূহল উদ্দীপিত করিত। এখানে যাতায়াতের জন্য রেল, নৌকা ও স্থলযানাদিই প্রধান। কিছু দিন হইতে ষ্টীমারের ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার নিকট যাতায়াতের সুবিধা, বাৎসরিক রাজস্ব পাইয়া থাকেন। খোদ ফরাসী গবর্ণমেণ্টও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে পূর্বে বাৎসরিক কিছু খাজনা দিতেন। এই খাজনা কিসের জন্য দিতেন, তাহা ঠিক মত জানিতে পারা যায় না। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এক সময় চন্দননগরের সমস্ত জমি ইজারা লইবার কালে গবর্ণমেণ্টের সহিত যেসব সর্ত নির্ধারিত হয়, তন্মধ্যে একটি সর্ত ছিল, মোগল সম্রাটকে যে রাজস্ব দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা ইজারাদারদের দেওয়ানী প্রাপ্তির সহিত পুরাতন স্বত্বে স্বত্ববান্ হইয়া, তাঁহারা এই রাজস্ব প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন, কি না, বলিতে পারি না। যে ৬০ বিঘার কথা উল্লিখিত হইল, উহাই সম্ভবতঃ সেই ৬০ বিঘা,—যাহা জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো, বাসের স্বল্প

ব্যয় সাধারণতঃ সকল দ্রব্যই পাওয়া ও অন্যান্য বিবিধ সুবিধা হেতু এখানে সময় সময় বহু লোক আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। শত বৎসর পূর্বেও এখানে বাসের খরচ ও দ্রব্যাদির মূল্য খুবই কম ছিল। তখন এক জন বিশিষ্ট ক্রিয়াবান্ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মাসিক সংসার-খরচ দেড় শত টাকায় সুনির্বাহ হইত। একজন সাহেবের মদ ছাড়া থাকিবার ও খাইবার খরচ মাসে ৩৫৲ টাকাতেই হইত জানা যায়। (৯)

ফরাসীদের চন্দননগরের প্রকৃত রাজসত্ব সম্বন্ধে শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ২ হাজার ৩ শত ৭৭ একারের মধ্যে প্রায় ৬০ বিঘা মাত্র জমী ফরাসীদের কতকটা নিজস্ব বলিতে পারা যায়। অবশিষ্টের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাৎসরিক রাজস্ব পাইয়া থাকেন। ঔরংগজেবের নিকট হইতে কুঠীস্থাপনের জন্য ফরাসীরা প্রথম জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার ভিতরেই ফরাসীরা তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, বাকী তালুকদারী জমি ছিল। সে সময় বোড় বিশনপুর, চক • সিরাবাদ, সাকনোড়া এই কয়টি মহল লইয়া সেই তালুকদারী। কেহ কেহ বলেন, ফরাসীদেব ঠিক নিজস্ব বলিতে মাত্র ৭ বিঘা। (১০) যাহা হউক, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত লেখালেখি করিয়া সমস্ত সহরটির শাসনাধিকার পূর্বে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের হস্তেই ন্যস্ত ছিল।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের অবসান হইলে চন্দননগরেব অধিবাসিগণ এই অঞ্চল বিদেশীর শাসনাধীন থাকিবে তাহা না চাওয়ায় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর ফরাসী সরকার চন্দননগরকে মুক্তনগরী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্থানীয় ব্যক্তিগণের উপর শাসন ও পৌরব্যবস্থার ভার অর্পণ করেন। অতঃপর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা মে তাহারা চন্দননগরকে ভারত সরকারের নিকট কার্যত হস্তান্তরিত করেন। এই সনদে ফবাসী পক্ষে মঁসিয়ে তাইয়ার ও ভারতের পক্ষে চন্দননগরের নবনিযুক্ত এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষর করেন। যে সনদখানিতে উভয়ে স্বাক্ষর করেন তাহা এই ঃ

STATEMENT OF SERVICE TRANSFER

In accordance with the agreement concluded during the conference held in Calcutta on 18th April 1950, ratified later on by the Government of India and the Council of French Ministers on April 28, 1950.

To-day, May 2, 1950 the Administrator G. H. Traileur, Delegate of the Commissioner of the Republic for French India, Chandernagore has transferred his power to Mr. B. K. Banerjee Administrator appointed by the Government of India to replace him.

The inventory of furniture has been taken charge of without remarks.

It has been given to B. K. Banerjee the remaining records and the keys ot the Treasury Cash-room.

(Sd) G. H. Tailleur
Administrator-delegate retiring

(Sd) B. K. Banerjee
Administrator in-coming

এখানে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের মোট আয় প্রায় সওয়া ৫ লক্ষ টাকা। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৭ শত ৪৮, উহার পূর্ব বৎসর ছিল ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯৫ টাকা। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ৩২ হাজার ১ শত ৫৪ টাকা রাজস্ব পাওয়া যাইত জানা যায়। (১১) ১৭৩২।৩৩ খৃষ্টাব্দে সমস্ত চন্দননগর ইজারা দিয়া বৎসরে প্রায় ১২ হাজার টাকা আয় হইত। এখানে কার্যক্ষম ব্যক্তির বৎসরে ৮ আনা হেড ট্যাক্স ভিন্ন আয়কর, বাড়ীর কর প্রভৃতি অন্য কোন কর দিতে হয় না। এমন কি, পার্শ্ববর্তী বৃটিশ মিউনিসিপ্যাল নগর সমূহে আলো, জল, পথ প্রভৃতির ট্যাক্স আছে, এখানে ঐ সকল সুবিধা থাকিতেও কোন ট্যাক্স নাই। তাহা সত্ত্বেও এখানে মিউনিসিপ্যালিটির আয় কম নহে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল আয় ৯৪ হাজার ৬ শত ৪৮ টাকা, পূর্ব বৎসর ছিল ৮২ হাজার ৯ শত ৬২ টাকা। এই আয়ের মধ্যে বাজার, খেয়াঘাট, কসাইখানা, জমীর জমা, বাড়ীর ভাড়া, আমদানী মালের উপর খাজনা প্রভৃতিই প্রায় ৬৫—৭০ হাজার টাকা। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৬৮ হাজার ১ শত ৭ ফ্রাংক মিউনিসিপ্যালিটিব আয় ছিল। (১২)

॥ সরকারের আয়ের প্রধান অংশ ॥

সরকারী আযের প্রধান অংশ আবগারী বিভাগ হইতে পাওয়া যাইত। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে যে বিষয়ে যে আয় হইযাছিল, তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইতেছে।

বিভিন্ন রাজস্ব	২৩৯০৬,
আবগাবী ও অন্যান্য	৪৩৯৮৫৫,
রেজেষ্ট্রারী ফি	৪১৭,
জল কলের ট্যাক্স	১১০৫৭,
ইংরাজ গভর্মেণ্টের নিকট আফিং ও লবণেব দরুণ পাওয়া	২৮৪০৮,
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন	১১৩৯২,
মিউনিসিপ্যালিটীর দেয়	৭৬৫৭,
অন্যান্য	৬৯,
	৫২২৭৬১,

চন্দননগরের সমস্ত আয় পূর্বে যদি এই স্থানে ব্যয় হইত, তাহা হইলে এখানকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সৌন্দর্য আরও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না। ১৯২১, ২২ ও ২৩ খৃষ্টাব্দে **২ লক্ষ** ৯ হাজার ৭ শত ৫৯, ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫ শত ৭৭, ও ২ লক্ষ ১ শত ৩৫, টাকা যথাক্রমে এখানে মোট ব্যয় হইয়াছে। এখানকার অবশিষ্ট আয়ের টাকা ফরাসী ভারতের অন্যান্য নগরীতে ব্যয় করা হইত। পূর্বেও চন্দননগরের আয় হইতে অন্য উপনিবেশে ব্যয় হইত। ৪৬ বৎসর পূর্বে এখানকার আয় ছিল ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪ শত ৫ ফ্রাংক, ব্যয় ১৪ হাজার ১১ ফ্রাংক।

ভারতের অন্য তিনটি ফরাসী অধিকৃত উপনিবেশের ন্যায় চন্দননগর পণ্ডীচেরীর অধীন। সমগ্র ফরাসী ভারতের গভর্ণর এক জন মাত্র। তিনি প্রধান নগরী পণ্ডীচেরিতে থাকিতেন,

কখনও কখনও উপনিবেশ সকল পরিদর্শনার্থ গমন করিতেন। গভর্ণরের অধীনে প্রত্যেক উপনিবেশে এক একজন এডমিনিষ্ট্রেটর ছিল। এখানে আদালত ও হাকিম থাকিলেও সেসন মোকদ্দমার জন্য পন্ডীচেরী হইতে স্বতন্ত্র বিচারক আসিতেন। আপিলের জন্য পণ্ডিচেরীতে উচ্চ আদালত ছিল। কালেক্টরি, শিক্ষাবিভাগ, পূর্তবিভাগ প্রভৃতি সমস্তই পণ্ডিচেরীর উক্ত বিভাগের অধীন। সমস্ত বিষয় পরিদর্শনের জন্য প্রতি বৎসর ফ্রান্স হইতে এখানে এক জন ইন্‌স্পেক্টর আসিতেন। কলিকাতায় যে ফরাসী কংসুল থাকিতেন, চন্দননগরের শাসন বিষয়ে তাঁহার সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না।

সহরের শান্তিরক্ষার সহায়তাকল্পে গবর্ণমেণ্ট এখানে পূর্বে এক দল সিপাহী রাখিতেন, এখন কতকগুলি পুলিসের কনেষ্টবল ভিন্ন আর কিছু থাকে না। ইহাদের সংখ্যাও অধিক নহে। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বেও এখানে কতকগুলি সিপাহী থাকিতে দেখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পণ্ডিচেরী বা ঐ দিকের থাকে। ১৭৪৩—৪৫ খৃষ্টাব্দে এখানে দুই দল পদাতিক সৈন্য ছিল জানা যায় (১৩) সন্ধির সর্তানুসারে ১৫টির অধিক সৈন্য রাখিবার চন্দননগরে উপায় ছিল না।

এখানকার আইন স্বতন্ত্র নহে, সমস্ত উপনিবেশের জন্য আইন একই এবং উহা প্রধানতঃ ফ্রান্সেরই মিনিষ্টার অব দি এ্যান্‌তিরিয়ার দ্বারা প্রণয়ন করা হইত। ফ্রান্সের দেপুতে ও সেনেতার সভায় ফরাসী ভারতের নাগরিক ও প্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত এক জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিত। দেপ্‌তে ও সেনেতার সভায় কোন ভারতবাসী স্থান না পাইলেও, চন্দননগরের নাগরকদেরও সেই পদে নির্বাচিত হইবার অধিকার ছিল।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট এখানে মিউনিসিপ্যালিটির সৃষ্টি হয়। প্রথম মেয়র হন চার্লস ডুমেন। এখন চন্দননগরে কর্পোরেশন হইয়াছে।

বৃটিশ ভারতের রেজেষ্টারের ন্যয় এখানে 'নতের' বলিয়া একটি পদ আছে। ইহার দ্বারা উইল খরিদ-বিক্রয়, দেনা-পাওনা প্রভৃতি সকল প্রকার লেখাপড়া হইয়া থাকে।

এখানে পূর্বে মোট ৮টি থানা ছিল। এক জন পুলিশ কমিশনার ও তদধীনে ১ জন কোতোয়াল এখানকার প্রধান পুলিস কর্মচারী। সকল বিভাগেই কর্মচারীদের মধ্যে সাহেবের পরিবর্তে পণ্ডিচেরীর লোকই অধিক দেখা যাইত। এখানকার সাধারণ অধিবাসিগণ পণ্ডিচেরীর লোকদের এতাধিক প্রভুত্ব আদৌ পছন্দ করিতেন না।

এখানে বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ খুব কমই হইত। প্রাণদণ্ডের জন্য গিলোটিন নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। উহার দ্বারা শিরচ্ছেদন করা হয়। পূর্বে প্রাণদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত অপরাধীকে রি-ইউনিয়নে লইয়া যাওয়া হইত। গিলোটিন যন্ত্র ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই শেষবার এখানে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এখানে সেখ আবদুল পাঁজারি ও হীরু বাগ্‌দী নামক দুই ব্যক্তির ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী প্রথম প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। পূর্ব যে তুরুঙের কথা উল্লেখ হইয়াছে, জেলখানার বা কোন মাতাল বা ধৃত অপরাধীকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য উহা ব্যবহৃত হয়। উহা কাষ্ঠ-নির্মিত এক প্রকার যন্ত্রবিশেষ, উহার মধ্যে ছিদ্র আছে, তাহাতে অপরাধী পদদ্বয় ঢুকাইয়া দেওয়া হয়।

॥ শিক্ষাব্যবস্থা ॥

যত দূর জানিতে পারা যায়, এক শত বৎসর পূর্বে এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রধানতঃ স্থানীয় গুরুমহাশয়দের পাঠশালাতেই নিবদ্ধ ছিল এবং সেরূপ পাঠশালার অভাবও ছিল না। তৎপরে ক্রমে য়ুরোপীয় পাদ্রী মিশনারীরা এখানে শিক্ষাবিস্তার মানসে চেষ্টা করেন ও দুই একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ও তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়েও প্রথম একমাত্র বাঙলাই শিক্ষার বিষয় ছিল। পরে ক্রমে ফরাসী ভাষা শিক্ষা প্রবর্তিত হয়।

বর্তমান কনভেন্টের দক্ষিণে—যে স্থানে এক্ষণে স্বর্গীয় ছক্কনলাল সিংহ রায় মহাশয়ের বাটী আছে, শুনা যায় ঐ স্থানে বাঙালীর ছেলেদের জন্য মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট বিদ্যালয় ছিল। লালদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে যে বিদ্যালয়ের কথা জানা যায়, উহা সম্ভবতঃ এক শত বৎসর পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। ঐ স্থানে অবৈতনিক ভাবে বাঙলা ও ফরাসী পড়ান হইত। পিরু সাহেব নামক ঐ বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষকের নাম পাওয়া যায়। প্রাক্তন দুপ্লে কলেজ—যাহার প্রথম নাম ছিল সেন্ট মেরিস ইনষ্টিটিউশন, উহাও মিশনারীদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যূন এক শত বৎসর পূর্বে ফাদার বার্থের দ্বারা স্থাপিত হয়। প্রথম বর্তমান রু জেনারেল মারত্যাঁ যাহার পূর্বে রুদে বড়বাজার নাম ছিল, ঐ রাস্তার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ বলেন, লালদীঘির কোণের বিদ্যালয়টিই ঐ স্থানে উঠিয়া আসিয়াছিল। দুপ্লে কলেজ নামক বিদ্যালয় এক্ষণে গবর্ণমেন্টের অধীন। ইহাতে একটি ফরাসী বিভাগ আছে, তাহা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। প্রথমাবস্থায় বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য লটারী করা হইয়াছিল। ইহার উন্নতি-প্রসঙ্গে ফাদার বার্থে ও ফাদার আলফন্সোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় লোকের মধ্যে নন্দদুলাল বসু ইহার উন্নতিকল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে চন্দননগরের এই প্রাচীন বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় [২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩] যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ

চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের শতবার্ষিকী উৎসব

ভদ্রেশ্বর, ২৪শে ফেব্রুয়ারী—চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের তিনদিনব্যাপী শতবার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে শেষ হইয়াছে। তিনদিনব্যাপী বহু মনীষীর আগমনে চন্দন-নগর ধন্য হয় এবং তাঁহাদের বাণী গ্রহণ করিয়া সার্থক রূপ দিবার জন্য সকলে সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

১৮৬২ সালে ফরাসী শাসনাধীনকালে চন্দননগরে যখন এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইহার নাম ছিল 'সেণ্ট মেরীস্ ইনষ্টিটিউশন' আর ডাক নাম ছিল ফরাসী স্কুল। সেদিনের ছোট স্কুলটি দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া চলে। ফাদার বার্থে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। একটির পর একটি শ্রেণী বৃদ্ধি পাইয়া যখন এফ্ এ ক্লাশ খোলা হয় তখন ইহার নাম হয় দ্যুপ্লেজ কলেজ। চন্দননগরের প্রাক্তন ফরাসী শাসক খ্যাতনামা দ্যুপ্লের নামেই এই নামকরণ হয় পরে কলেজ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা দ্যুপ্লে স্কুল নামেই

চলিয়া আসিতে থাকে। সম্ভবত ১৯০১ সাল হইতে এই স্কুলের নামকরণ দ্যুপ্লের নামে হয়। ১৯৪৮ সালের ১৭ই মে ফরাসী শাসন মুক্তির অব্যবহিত পূর্বেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্র বিপ্লবী কানাইলালের নামে এই বিদ্যালয়ের নাম রাখা হয় কানাইলাল বিদ্যামন্দির। প্রথম দিনে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ব্রজকান্ত গুহ। ডঃ গুহ বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে আবক্ষ কানাইলালের মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন ও মাল্যদান করেন। পরে নবনির্মিত বিজ্ঞান ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়।

বর্তমান আদালতের পশ্চাতে একটি বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের কথা মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহার সম্বন্ধে প্রাচীন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই।

এখানে পাশ্চাত্য ধরণের শিক্ষাপ্রবর্তন প্রসঙ্গে ফাদার ফ্রিচ্, ফাদার বার্থে ফাদার এলফন্সো ও ব্রাদার হানোবিয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুনা যায়, ফাদার ফ্রিচ্ এখানে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম উদ্যোগী। অন্যান্য কোন কোন স্থানের ন্যায় এখানেও মিশনারীরাই পাশ্চাত্য ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। প্রায় শত বৎসর পূর্বে স্বগীয় ভূদেব বাবু এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দুপ্লে কলেজের পর 'বঙ্গবিদ্যালয়' এখানকার প্রধান বিদ্যালয়। ১২৮৮ সালের ২০শে বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বারাসত তে-মাথায় কানাইলাল খাঁ মহাশয়ের একটি ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ৩টি মাত্র বালক লইয়া উহা স্থাপিত হয়। বারাসত নিবাসী স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় প্রথম গিরিশচন্দ্র শ্রীমানী মহাশয়ের আস্তাবলে একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। সাধারণের সহানুভূতি অভাবে তিনি নিজে উহা পরিচালনে সমর্থ না হওয়ায়, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে স্থানীয় বালকদের শিক্ষাবিষয়ে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করেন। রাখাল বাবু গোন্দলপাড়ানিবাসী কালিদাস বসু, শ্রীশচন্দ্র বসু, রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তেলেনীপাড়া নিবাসী অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় এই প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্গীয় দীননাথ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বর্তমান বিদ্যালয়ভবন নির্মাণকল্পে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ রক্ষিত ও কানাইলাল খাঁ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম ইহা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, এক্ষণে এখানে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্য পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রসংখ্যা অন্যূন ২৫০। একটি বে-সরকারী কমিটির দ্বারা উহা চালিত হইয়া থাকে। গবর্ণমেন্ট ও মিউনিসিপ্যালিটি এই বিদ্যালয়ে সামান্য সাহায্য করিয়া থাকেন।

কানাইলাল দত্তের স্মৃতি রক্ষার্থে বর্তমানে "ডুপ্লে স্কুলের" নাম পরিবর্তন করিয়া কানাইলাল বিদ্যামন্দির নাম রাখা হইয়াছে। ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ব্রজকান্ত গুহ বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে কানাইলাল দত্তের আবক্ষ মর্মরমূর্তির উন্মোচন করেন। কানাইলাল এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আর একটি স্মৃতিফলক নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

চন্দননগরের স্বেচ্ছা সৈনিক

মনোরঞ্জন দাস

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল তারিখে
স্বদেশের জন্য বিজার্ত (BIZERTE) নগরে যিনি
প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারই
স্মৃতিরক্ষার্থে এই প্রস্তাব ফলক সংস্থাপিত হইল

প্রসিদ্ধ বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেশদ্রোহী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে জেলের মধ্যে হত্যা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (১৪) চন্দননগরের ষ্ট্যাণ্ডে তাঁহার একটি আবক্ষ মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে

শহীদ
কানাইলাল দত্ত

জন্ম—১৫ই ভাদ্র ১২৯৫ (জন্মাষ্টমী) মৃত্যু—২৫শে কার্তিক ১৩১৫

ভারতের মুক্তি যজ্ঞে
হে বিপ্লবী শহীদ কানাই,
যে কীর্তি রাখিয়া গেছ
প্রাণবীর্যে আত্মাহুতি দিয়া
সে পুণ্য অমর স্মৃতি
জন্মক্ষেত্রে যাক উদ্ভাসিয়া
অনন্তকালের বুকে
হে যাজ্ঞিক তব মৃত্যু নাই।

॥ শহীদ নির্মলজীবন ঘোষ ॥

কানাইলালের মতো আর একজন শহীদ হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী বীর নির্মলজীবন ঘোষ। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ সাহেবকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার জন্য ২৬ অক্টোবর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ফাঁসি হয়। পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত ধামাসিন গ্রামে মাতুলালয়ে পালিত বংশে তাঁহার জন্ম হয়। খগেন্দ্রনিধন পালিতের কন্যা রত্নপ্রসবিনী প্রভাসরঞ্জিনীর পঞ্চম পুত্র শহীদ নির্মলজীবন ঘোষ। তাঁহার পিতা যামিনীজীবন ঘোষ মেদিনীপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই ঘোষপরিবারের অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। শহীদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিনয়জীবন ঘোষ হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুস্তকে এই সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে তাহা উল্লেখ্য ঃ

My mother Shrimati Pravas Ranjini Ghosh came from the Palit family of village Dhamasin in the district of Hooghly. I was born there. In the same village of Dhamasin was also born my fifth younger brother, Nirmal Jiban Ghosh who was hanged on the 26th

October 1934 in the Midnapur Central Jail in connection with the Burge Murder Conspiracy Case. (Murder of British Magistrates)

দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় দ্বারা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার নিজ নামে এবং "নিত্যগোপাল শেঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়" নামে আর দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। উভয় বিদ্যালয়ই অবৈতনিক এবং গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। শেষোক্তটি শ্রীযুত হরিহর শেঠের দ্বারা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃদেবের নামে প্রতিষ্ঠিত।

এখানে বেসরকারী ছোট ছোট পাঠশালা অনেক আছে, তন্মধ্যে শ্রীযুত আশুতোষ নিয়োগী মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে দুইটি পাঠশালা আছে, তাহাই উল্লেখযোগ্য। আশু বাবুর পাঠশালাটি অবৈতনিক, বালকদিগের সহিত ছোট মেয়েরাও এখানে শিক্ষা পাইয়া থাকে।

মেয়ে এবং ছোট ছেলেদের জন্য এখানে কনভেণ্ট একটি শিক্ষালয় আছে, তাহা রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত নানদের দ্বারা পরিচালিত। ইহার সহিত ছাত্র-ছাত্রীদের থাকিবার আবাস সংযুক্ত আছে। এখানে সকল জাতির ছেলেমেয়েদের প্রবেশাধিকার থাকিলেও সাধারণতঃ সাহেবদের ছেলেমেয়েরাই শিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। দশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালকদিগকে এই বিদ্যালয়ে লওয়া হয় না। মেয়েরা অনেক বড় বয়স পর্যন্ত এখানে থাকে। বাঙ্গালার মধ্যে এই শ্রেণীর শিক্ষালয় যে কয়টি আছে, তাহার মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ। মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার মত শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এখানে আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি যে বাটীতে আছে, তাহা এলফ্রেড কুর্জন নামক চন্দননগরবাসী এক জন প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার দান করিয়াছিলেন।

কেবলমাত্র বালিকাদের জন্য পূর্বে এখানে সরকারী একটি অবৈতনিক এবং 'কাশীশ্বরী পাঠশালা' নামে আর একটি বেসরকারী পাঠশালা ছিল। প্রথমটি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি 'চন্দননগর শিক্ষাসমিতি' নামে একটি কমিটির দ্বারা পরিচালিত হইত। শেষোক্তটি গোন্দলপাড়া নিবাসী ম্যাণ্ডালের এড্‌ভোকেট যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই সহস্র টাকা অর্থসাহায্যে উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় ভদ্রলোকের চেষ্টায় ১৩১৮ সালের ২৫শে শ্রাবণ স্থাপিত হয়। ইহার বর্তমান বাটীটি অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত জমিতে, প্রধানতঃ কমলকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হইয়াছে। স্থানীয় বালিকাদের জন্য এইটিই প্রধান বিদ্যালয়। সম্পাদক বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় ইহার যথেষ্ট উন্নতি হয়।

এই দুইটি ভিন্ন পালপাড়া ও বিবিরহাট নামক স্থানে আর দুইটি মেয়েদের অবৈতনিক ছোট পাঠশালা ছিল। প্রথমটি পালপাড়া সুহৃদ্ সমিতি এবং দ্বিতীয়টি সন্তানসঙ্ঘ দ্বারা চালিত হইত। .এই উভয় পাঠশালাই দুইটি মহীয়সী রমণীর যত্নে ও পরিশ্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই রমণীদ্বয় হইতেছেন আশুতোষ দত্ত মহাশয়ের পত্নী এবং স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পত্নী। পালপাড়ার পাঠশালাটি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে প্রথম কৃষ্ণকিশোর দত্ত মহাশয়ের দ্বারা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি সাধারণ পাঠশালারূপেই সৃষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয়টি শরৎবাবুর পত্নীর দ্বারাই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'অঘোরচন্দ্র শেঠ প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয়' নামে এখানে আর একটি অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয় এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার পরিচালনভার গবর্ণমেণ্টের উপরেই ন্যস্ত আছে। বালিকা এবং অপেক্ষাকৃত বড় মেয়ে, এমন কি, বয়স্থা রমণীগণও ইহাতে বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা পাইতে পারেন, সে জন্য ছাত্রী আবাস-সংবলিত একটি নারীশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। উহার জন্য সহরের মধ্যস্থলে মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে কিছু কম ৪ বিঘা জমি খরিদ করিয়া উপযুক্ত আবাসাদি নির্মিত হইয়াছে। এই সমস্ত ভিন্ন প্রবর্তক-সংঘের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি বিদ্যাপীঠ আছে। এখানে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই থাকিবার ও শিক্ষালাভ করিবার ব্যবস্থা আছে।

এখানে পূর্বে যে যে বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল, সেই সেই স্থানেই কিছু ফরাসী শিক্ষার ব্যবস্থাও নির্দিষ্ট ছিল। ফরাসী আইন, চিকিৎসা বা উচ্চশিক্ষার জন্য এখান হইতে পণ্ডীচেরীতে যাইতে হইত। কিন্তু ঐ সকল শিক্ষার দ্বারা অর্থোপার্জনের বিশেষ সুবিধা না থাকায় কেবল আইন পরীক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ পণ্ডিচেরী যাইতেন।

বৈদ্য-বেদ বিদ্যালয় নামে ১৩২৮ সালে কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের দ্বারা এখানে একটি প্রাচ্য প্রতীচ্য সমন্বয়ে আয়ুর্বেদ শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানে ছাত্র-দিগের থাকিবার এবং আয়ুর্বেদের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কতিপয় ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতি ভদ্রলোক বিনা পারিশ্রমিকে এখানে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

১২৫০ সালে চন্দননগরে একটি **সংগীত-বিদ্যালয়** ছিল। উহা বসন্তলাল মিত্রেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম শিক্ষক ছিলেন রাজ রাম বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২০ সালে উহা উঠিয়া যাওয়াতে চন্দননগরের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। উহার বিষয় পরে বিবৃত হইয় ছে।

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এখানে চতুষ্পাঠী পূর্বকাল হইতেই আছে। শুনা যায়, ইন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত লালবাগানে, যে স্থানে এক্ষণে ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের উদ্যান আছে ঐ স্থানে একটি টোল ছিল। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে নন্দদুলালের মন্দিরে ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য নামক এক পণ্ডিত একটি টোল স্থাপন করিয়াছিল। হাটখোলার ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও পঞ্চাননতলার শিরোমণির টোল প্রসিদ্ধ ছিল। নাড়ুয়া অঞ্চলে 'ভবদেব শিরোমণি টোল' নামে একটি টোল ছিল। অনেক দিন পূর্বে শেষোক্ত পল্লীতে শ্যামাচরণ গোস্বামী ও তৎপূর্বে তাঁহার পিতার টোল প্রসিদ্ধ ছিল। এই গোস্বামী মহাশয়েরা পিতা-পুত্র উভয়েই বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন। সহরের মধ্যে গোস্বামীঘাট নামক স্থানেই শিক্ষিত ও শাস্ত্রজ্ঞ লোকের বাস সর্বাপেক্ষা বরাবরই অধিক। শতাধিক বৎসর পূর্বে গোন্দলপাড়া পল্লীতে ন্যায়শাস্ত্রের যথেষ্ট অনুশীলন হইত। জানা যায়, তৎকালে এখানে দশটি ন্যায়ের বিদ্যালয় ছিল। (১৫)

এক্ষনে এখানে দুই পাঁচটি ছাত্রকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, এমন ভট্টাচার্যের অভাব না থাকিলেও অধুনা একমাত্র কালিদাস-চতুষ্পাঠীই উল্লেখযোগ্য। ইহা কালীচরণ দাস মহাশয়ের দ্বারা ১৮৩২ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। দাশ মহাশয় এই কার্যে ৩০।৩২ সহস্র টাকা দান

করিয়াছেন। তিনি এক জন বিশিষ্ট ধনী নহেন, অল্পশিক্ষিত ব্যবসাদার কিন্তু ইদানিং শিক্ষার জন্য তাঁহার পূর্বে আর কেহ এখানে একালীন এতাদৃশ দান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ নাই। সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র রায় ও ভূতেশ্বর শ্রীমানী মহাশয়েরা পূর্বে এই চতুষ্পাঠীর ট্রাষ্টি ছিলেন।

॥ গ্রন্থাগার ॥

পুস্তকাগার বলিতে **'চন্দননগর পুস্তকাগারই'** সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যদুনাথ পালিত মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত পালিত মহাশয়, মহেন্দ্রনাথ নন্দী, মতিলাল শেঠ প্রভৃতি কতিপয় মহোদয়ের চেষ্টায় এখানে একটি সখের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহাতে 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়-সমিতির অভিনয় স্পৃহা শেষ হইলে উহার ষ্টেজ ও সরঞ্জামাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ত্রিগুণাচরণ পালিত, মহেন্দ্রনাথ নন্দী, হরিমোহন সুর প্রভৃতি মহাশয়গণের উদ্যোগে এই পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। ইঁহার দীর্ঘজীবনীর বিবিধ অবস্থার ইতিহাস বিবৃত করিবার স্থান নাই। ইহার শৈশবাবস্থা হইতে আজ পর্যন্ত সকল সময়েই সহরের শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হস্তে ইহার পরিচালনের ভার ন্যস্ত থাকিলেও, মধ্যে অবস্থা বিশেষ খারাপ হইয়া যায়। তৎপরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইহার নবগঠিত কার্যনির্বাহক সভার হস্তে আসার পর হইতে ইহা পুনরুন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া, উক্ত বৎসর ডিসেম্বর মাসে ইহার ৫০ বৎসর বয়সের সহিত ক্রমে এখন চন্দননগরের মধ্যে পুস্তকাগার একটি গৌরবের বস্তু হইয়াছে। ইহার হিতৈষী ও বন্ধুগণের মধ্যে আমি এখানে এক জনের নাম করিব,—যিনি সুদীর্ঘকাল ইহার সুখ-দুঃখের সহিত বিজড়িত থাকিয়া, ইহার সর্বাপেক্ষা দুঃখের দিনে ইহাকে বুকে করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গীয় প্রমথনাথ মিত্র। তাঁহার বড় সাধের পুস্তকাগারের জন্য তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহার কতটা ভগবান দিয়াছেন, দুরদৃষ্টক্রমে তিনি তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পুস্তকাগার এখানে ওখানে কতিপয় ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিয়া, এক্ষণে সহরের মধ্যস্থলে, **'নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির ও চন্দননগর পুস্তকাগার'** নামে ইহার আপন বাড়ী হইয়াছে। অর্থভাণ্ডারের অবস্থাও অসচ্ছল নহে এবং পুস্তকের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার সহিত যে পাঠাগার আছে, তাহাও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। লোক-শিক্ষা, বালক এবং যুবকদিগের মধ্যে পাঠস্পৃহা ও মৌখিক রচনার উৎকর্ষ-লাভের জন্যও কর্তৃপক্ষগণ যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন ও করিতেছেন। এক্ষণে মফঃস্বলের বে-সরকারী পুস্তকাগারসমূহের মধ্যে ইহা একটি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এমন কি, ইহার সমকক্ষ পুস্তকাগার এখন এ প্রদেশে আছে কি না সন্দেহ।

এখানে অন্য উল্লেখযোগ্য পুস্তকাগারের মধ্যে 'দশভূজা সাহিত্য-মন্দিরের' নাম করা যায়। ইহা ১৩২৯ সালে ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত সাতকড়ি সুর প্রভৃতি কতিপয় স্থানীয় ভদ্রলোকের উদ্যোগে মানকুণ্ডু নামক পল্লীকে শ্রীশ্রী দশভূজা দেবীর মন্দির সান্নিধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

চন্দননগর পুস্তকাগারের পূর্বে অন্য কোন সাধারণ পুস্তকাগার এখানে ছিল বলিয়া জানা যায় না। শুনা যায়, বড়বাজার নামক পল্লীতে এক সাহেবের একটি পুস্তকাগার ছিল। উহা সাধারণের জন্য কি পারিবারিক, তাহা বলা যায় না। পরে উহা খরিদ করিয়াই তদ্দ্বারা ও যদুনাথ পালিত মহাশয়ের সংগৃহীত গ্রন্থ-সমূহের দ্বারা চন্দননগর পুস্তকাগার আরম্ভ হয়। উহা সম্ভবতঃ দেড়শত টাকায় ক্রীত হইয়াছিল। গোন্দলপাড়া সম্মেলন ও পাঠাগারের এই স্থানের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠাতা যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার পিতা অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে 'অম্বিকাস্মৃতি মন্দির' নির্মাণ করিয়া দেন।

এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে এখানে যে সকল লাইব্রেরীর উদ্ভব ও লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে গোন্দলপাড়ার 'বান্ধব লাইব্রেরী, কাঁটাপুকুরের 'ন্যাসন্যাল লাইব্রেরী' সার্ডালর 'সরস্বতী লাইব্রেরী, এবং 'বীণাপাণি লাইব্রেরীর' নাম করা যাইতে পারে। বান্ধব লাইব্রেরী গোন্দলপাড়া সম্মেলনে রূপান্তরিত হয়।

দীর্ঘকালস্থায়ী পাঠাগার বা শিক্ষাবিষয়ক অন্য সমিতি এখানে একটিও ছিল না এবং এখনও নাই। আনুমানিক শত বৎসর পূর্বে বড়বাগান পল্লীতে মতিলাল শেঠ মহাশয়ের বাড়ীতে সম্ভবতঃ 'চন্দননগর লিটারেরি সোসাইটি' নামে একটি সমিতি ছিল বলিয়া জানা যায়। রায় প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ বাহাদুর, সিদ্ধেশ্বর বসু ও ডাক্তার নিত্যানন্দ নন্দী যথাক্রমে উহার সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। উহা তিন বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উহার এক উৎসব সভায় আগমন করিয়াছিলেন। এই সময়েই বাদামতলা নামক পল্লীতে আর একটি শিক্ষানুশীলনের জন্য সমিতি ছিল, তাহার নাম জানিতে পারা যায় না। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে 'সাহিত্য-সভা' নামক একটি সাহিত্য বিষয়ের সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। উহা উঠিয়া যাইবার অনেক পরে আরও দুইটি সভা ঐ নামে গঠিত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত সভার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। শেষবার যে সাহিত্য সভার সৃষ্টি হইযাছিল, স্বগীয় প্রাণধন ভড় মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। 'লিটারেরি সোসাইটি' নামে সহরের উত্তরাংশে আর একটি শিক্ষা বিষয়ক সমিতির কথা শুনা যায়। ইহার সম্পাদক ছিলেন সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী। 'গোন্দলপাড়া হিতসাধিনী সভা' নামে একটি সভা ছিল। উহাতে সাহিত্যবিষয় আলোচনা হইত শুনা যায়, 'প্রজাবন্ধু' নামক সংবাদপত্র প্রকাশে এই সভার বিশেষ উদ্যোগ ছিল এবং স্বর্গীয় ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র বসু উহার অন্যতম পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন।

'গোন্দলপাড়া রিডিং ক্লাব' নামে আর একটি সমিতি ছিল, শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন 'বান্ধব-সম্মিলনী' নামে গোন্দলপাড়ায় আর একটি সমিতি ছিল। উহা প্রধানতঃ শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায়, স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ডিবেটিং ক্লাব, সারস্বত সম্মিলন, পালপাড়া সান্ধ্যসমিতি ও কতিপয় ক্লাব প্রভৃতি ছিল।

এক্ষণে চন্দননগর পুস্তকাগার সংশ্লিষ্ট পাঠাগার বা 'দশভূজা সাহিত-মন্দির' ভিন্ন চন্দননগর শিক্ষা সমিতি, সন্তান-সম্প্রদায় ও পালপাড়া সুহৃদ্ সমিতি নামে তিনটি সমিতি

আছে। প্রথমটি ১৩১৮ সালে বালকবালিকাদের প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। 'কাশীশ্বরী পাঠশালা' নামক বালিকা বিদ্যালয়টি এই সমিতির দ্বারা চালিত হইতেছে। কর্মজীবনকে আদর্শ করিয়া, দেশ সেবার উদ্দেশ্য লইয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে অরুণ-চন্দ্র দত্তের দ্বারা সন্তান সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার দ্বারা একটি মেয়েদের পাঠশালা পরিচালিত হইতেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি ইহার লক্ষ্য। পালপাড়া সুহৃদ সমিতি ১৩২৮ সালে হরিহর শেঠের উদ্যোগে এবং কালীপ্রসন্ন বসু, মাণিকলাল বড়াল, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও প্রিয়নাথ দত্তের সহায়তায় স্থাপিত হয়। শিক্ষার উন্নতি ও সহায়তা ভিন্ন দুঃস্থ ব্যক্তির সাহায্য প্রভৃতির এই সমিতির কার্যান্তর্ভুক্ত। এই সমিতির চেষ্টায় ও ব্যয়ে এক্ষণে একটি ছেলেদের ও একটি মেয়েদের পাঠশালা পরিচালিত হইতেছে এবং পালপাড়া 'বালক-সম্মিলন' নামক বালক ও কিশোরদের একটি সান্ধ্য পাঠাগার পরিচালনার সহায়তা হইতেছে। 'গোন্দল-পাড়া-সম্মেলন' নামে আর একটি সমিতি কয়েকটি যুবক দ্বারা কয়েক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা 'প্রথম স্রোতের ফুল' নামে একখানি হস্তলিখিত মাসিক নিজেদের মধ্যেই প্রকাশ করিতেন। এক্ষণে একটি পাঠাগার ও নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চন্দননগরের মধ্যে ইহাই একমাত্র নৈশ বিদ্যালয়। গোন্দলপাড়ায় 'শিশুসাহিত্য সংসদ' বারাসতে 'সাহিত্য সংসদ' ও সাউলিতে 'বালক সঙ্ঘ' নামে আর তিনটি ছেলেদের সমিতি আছে। শিশু-সাহিত্য সংসদ হইতে 'অরুণ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হইত।

॥ শ্রীশচন্দ্র বসু ॥

গোন্দলপাড়ার বসু বংশ সম্ভূত শ্রীশচন্দ্র বসু প্রথম জীবনে একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন পরে ইনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। প্রজাবন্ধু নামক সংবাদপত্রের একজন সহায় এবং Amateur Workshop নামক পত্রের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। 'লীলা' (১২৯৫) নামক একখানি প্রবন্ধ-পুস্তক ও 'প্রতাপ' নামক এক-খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। 'সংসার' নামে আর একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তিন মাসিক পত্রেও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। স্বর্গীয় রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুরের ইনি গৃহচিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসা বিষয়ে দু-একখানি পুস্তকও রচনা করেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তাহা প্রকাশিত হয় নাই। দরিদ্রের দুঃখে ইঁহার হৃদয় সর্বদা দ্রবীভূত হইত। তাঁহার সম্বন্ধে ৫৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

চন্দননগরের "অঞ্জলি-সমিতি" শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষের পরিচালনায় প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবত সুন্দরভাবে চলিতেছে। এই প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর বিতর্ক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করিয়া এই অঞ্চলে বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছে।

গোন্দলপাড়ার "ফ্রেন্ডস ক্লাবও" একটি প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। কয়েক বৎসর যাবত ইহারা নিখিল বঙ্গ বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শরীর চর্চা, ব্রতচারী, ও সাংস্কৃতিক যাবতীয় কার্যেও ইহারা অগ্রণী। ইহাদের একটি থিয়েটার ক্লাবও আছে এবং প্রতি বৎসর দুর্গাপুজার সময় ইহারা অভিনয় করিয়া থাকেন। শ্রীপ্রভাত বসুর সম্পাদনায় "সংহতি" বলিয়া একখানি পাক্ষিক পত্রও ইহারা কিছুকাল প্রকাশ করেন।

॥ বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ॥

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু জাপানে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী পরলোকগমন করেন। তাঁহার চিতাভস্ম জাপানে সংরক্ষিত হইয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন জাপানে যান, তখন তিনি রাসবিহারীর কন্যা শ্রীমতী ভারতী বসুর (ইঁহার জাপানী নাম তেতেকু) নিকট রাসবিহারীর অস্থিভস্ম ভারতে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীমতী ভারতী ডাঃ রায়কে বলেন যে, তিনি তাঁহার অভিভাবকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পরে এই বিষয়ে তাঁহাকে জানাইবেন।

রাসবিহারীর চিতাভস্ম তাঁহারা ভারতে পাঠাইবেন বলিয়াছেন—এই সংবাদ সকলেই অবগত আছেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু জাপান হইতে ভস্ম প্রেরণের যাবতীয় খরচা ও ভারতবর্ষে উহা সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ভারত সরকার হইতে করিবেন বলিয়াছেন। এখন ভস্ম কোথায় সংরক্ষিত হইবে, তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে শ্রীভূপতি মজুমদারকে সভাপতি করিয়া কলিকাতায় "রাসবিহারী স্মারক সমিতি" এবং **পালাড়ায়** "রাসবিহারী স্মৃতিরক্ষা সমিতি" গঠিত হইয়াছে।

রাসবিহারী বসুর পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সুবলদহ গ্রামে হইলেও তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত, ভদ্রেশ্বর থানার অধীন, বিঘাটি-খলিসানি ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে পালাড়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। রাসবিহারীর শৈশবে মাতৃবিয়োগ হয়, তখন তাঁহার পিতা বিনোদবিহারী বসু ও মেসোমহাশয় বামাচরণ ঘোষ চন্দননগরে ফটকগোড়ায় পাশাপাশি বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বসবাস করেন। কারণ বামাচরণবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ রাসবিহারীর মাসীমার তাহা হইলে তাঁহাকে দেখাশুনা করিবার সুবিধা হইবে। শিশু রাসবিহারী ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সুশীলাবালা সরকারকে তাঁহাদের মাসীমাই লালন-পালন করেন।

চন্দননগরের প্রবীণ জননায়ক শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় ও প্রবর্তক সঙ্ঘের শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের সহিত আমাব এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। তাঁহারা উভয়েই রাসবিহারী যে হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে আমার সহিত একমত।

বর্ধমানের শ্রীদাশরথি তা এবং সুবলদহ গ্রামের শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বর্ধমান জেলার আরও কয়েকজন ভদ্রলোক রাসবিহারীর জন্মস্থান সুবলদহ গ্রাম বলিয়া তথায় চিতাভস্ম সংরক্ষণের দাবী জানাইতেছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের সহিত একমত নহি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি হুগলী জেলার পালাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার চিতাভস্ম চন্দননগর, কলিকাতা, বারাণসী ও দিল্লীতে সংরক্ষণ করা উচিত বলিয়া আমি মনে করি। চন্দননগরের দাবী সর্বাগ্রে—এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ এই স্থানে তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল এবং এই স্থানই তাঁহার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। কলিকাতায় মহাজাতি সদনে কিম্বা স্ট্রাণ্ড রোড ও বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোডের (ক্যানিং স্ট্রীটের পরিবর্তিত নাম) সংযোগস্থলে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া তথায় ভস্ম রক্ষিত হইলে ভাল হয়। এইরূপ জনবহুল স্থানে মন্দির নির্মিত হইলে উহা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

তারপর বারাণসী ও দিল্লী রাসবিহারীর উত্তর-ভারতের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর যে বোমা ফেলা হয়, তাহা ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ও যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং রাসবিহারী ছিলেন উহার নায়ক। বারাণসী হইতে তিনি পুলিশের চক্ষে ধূলা দিয়া পাঞ্জাবীর বেশে পলায়ন করেন। বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্তি সংরক্ষণ করাই কর্তব্য বলিয়া আমার বিশ্বাস। যে স্থানে লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হন, সেই স্থানে যদি কোন স্মৃতি রাসবিহারীর থাকে, তাহা হইলে ভাল হইবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে উহা প্রেরণা দিবে।

সুবলদহে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান, এই স্থানের দাবী আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু রাসবিহারীর ন্যায় মহাবিপ্লবীর স্মৃতি যাহাতে শহরের মধ্যে হয়, সেই বিষয়ে রাসবিহারী স্মারক স্মৃতি সমিতি ও সরকারের দেখা কর্তব্য। ভদ্রেশ্বরের নিকট বিঘাটি ডাকঘরের নাম **"রাসবিহারী"** ডাকঘর করিবার জন্য আমি আবেদন করিতেছি। ইহা পরিবর্তন করিলে ভাল হয়। **পালাড়ায়** রাসবিহারীর একটি মর্মর মূর্তি স্থাপিত হইবে স্থির হইয়াছে। ভদ্রেশ্বরের মধ্যে পালাড়া গ্রামের বিষয় বিবৃত আছে।

আমি আশা করি, রাসবিহারীর চিতাভস্ম সংক্রান্ত সমস্ত দাবীর সামঞ্জস্য করিয়া রাসবিহারীর চিতাভস্ম সংরক্ষণের এমন ব্যবস্থা হইবে যাহাতে কাহারও মন ক্ষুণ্ণ না হয়।

রাসবিহারী বসুর আদি নিবাস সুবলদহ গ্রামে হইলেও তিনি পালাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেব চন্দননগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় এই স্থানেই তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা হয়। তাঁহার জীবনী শ্রীসুধীরকুমার মিত্র রচিত "মহাবিপ্লবী-রাসবিহারী" নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে।

যোগেন্দ্রনাথ সেন

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সর্বপ্রথম যে বাঙ্গালী জীবনদান করেন, তিনি হইতেছেন চন্দননগরের যোগেন্দ্রনাথ সেন। এই বাঙ্গালী বীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং বি. এস-সি পাস করিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য বিলাত যান। সেই সময় বিলাতে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্রগণ যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য বিশেষভাবে ব্যগ্র হন। যোগেন্দ্র সেন, পরেশলাল রায়, ইন্দ্রলাল রায়, ডবলু. সি. ব্যানার্জীর পৌত্র কে. ব্যানার্জি প্রভৃতি বাঙ্গালী ভীরু এই বদনাম ঘুচাইবার জন্য প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেন। যদিও ভারতীয় ছাত্রগণ তখন সেনাবাহিনীতে যোগদান করিলেও বৃটিশ অফিসারের সমান মর্যাদা লাভ করিতেন না তবুও তাহারা যোগদান করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

যুদ্ধের নেশায় পাগল হইয়া বিজ্ঞানের ছাত্র যোগেন্দ্রনাথ "ওয়েষ্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট"-এ যোগ দেন এবং ফ্রান্সের রণাঙ্গনে প্রথম বাঙ্গালী হিসাবে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। সামরিক মর্যাদায় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। যোগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁহার কোম্পানীর অধ্যক্ষ লিখিয়াছিলেন ঃ

He was one of the best in the Company and died like a soldier, doing his duty and doing it well.

জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী

বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এখানে অনেক আছেন এবং পূর্বেও ছিলেন। প্রত্যেকের বিষয় এই স্থলে না বলিলেও একজনের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। তিনি হইতেছেন রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত মহীশূরের ভূতপূর্ব দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি কাব্যনন্দ ও মহীশূর দরবার হইতে প্রাপ্ত রাজ-মন্ত্র-প্রবীণ উপাধি-ভূষিত হইয়াছিলেন এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ফেলো ছিলেন। তিনি যে কোন পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতেই অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন ও বৃত্তি পাইয়া-ছিলেন। গণিত, সংস্কৃত ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা, তাঁহার রচিত বহু গবেষণাপূর্ণ অন্যান্য গ্রন্থাদির কথা, কতিপয় কলেজ অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করিয়া মহীশূর রাজার অর্থসচিব ও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যুক্তপ্রদেশের কণ্ট্রোলার জেনারেলের পদ প্রাপ্তি পর্যন্ত তাঁহার সমস্ত কৃতিত্বের কথা বলিয়া শেষ করিবার এখানে স্থান নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে কণ্ট্রোলারের পদ খুব অল্প লোকই পাইয়াছেন। তাঁহার জীবন-কালের মধ্যে অনেক গ্রন্থাদিতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত কথা এবং একখানি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পর বহুসংখ্যক সংবাদপত্রাদিতে তাঁহার জীবন-কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

চন্দননগরবাসীদের জ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতি কল্পে পূর্বোক্ত নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে পুস্তকাগারের জন্য নির্দিষ্ট অংশ ভিন্ন সাধারণের ব্যবহারের জন্যও একটি সুবৃহৎ হল আছে। এই স্থানে সর্বদা সভাসমিতি হইয়া থাকে। শিক্ষাপ্রদ বা নির্দোষ আমোদের জন্যও স্থান আছে। ইহার ভিতর প্রায় ৭ শত ৫০ জন লোকের একসঙ্গে স্বচ্ছন্দে বসিবার ব্যবস্থা আছে। ভদ্রমহিলাদের আসন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কর্তৃপক্ষের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া শিক্ষার্থী বিদেশীয় ভদ্রলোকদের অল্পদিন থাকিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট কক্ষ আছে। শ্রীহরিহর শেঠের দ্বারা ১৩২৭ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীসাধুচরণ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র দে ও যজ্ঞেশ্বর শ্রীমানী মহাশয়েরা ইহার বর্তমান ট্রাস্টি। স্বর্গীয় তিনকড়ি বসু মহাশয় ইহার আর একজন ট্রাষ্টি ছিলেন, স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের পূর্বেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

চন্দননগরের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অধিবেশন এই "নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে" অনুষ্ঠিত হয়। এমন কি ১৩৫০ সালে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ কর্তৃক আহূত বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে মহা-সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনেই বঙ্গভাষাভাষী স্থানগুলি বঙ্গদেশে প্রত্যর্পণ করিবার প্রস্তাব সর্বপ্রথম গৃহীত হয়। শ্রীসুধীরকুমার মিত্র উক্ত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন।

রামলাল দাস দত্ত

চন্দননগরে সুগায়ক ও সঙ্গীত-রচয়িতা রামলাল দাস দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কে চাকুরী করিতেন ও কলিকাতা বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রধান সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার রচিত গীতগুলি সুললিত ও মধুর ছিল বলিয়া উহা যখন তাঁহার নিজ

কণ্ঠে গীত হইত তখন সকলেই মুগ্ধ হইত। শেষ জীবনে তিনি কাশীতে বসবাস করেন ও তথায় তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার রচিত একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

শ্যামাসংগীত

খাম্বাজ—মধ্যমান

শ্মশান ভালবাসিস্ বলে, শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা নাচ্‌বে যেথা নিরবধি॥
আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
সদায় আগুন জ্বলছে চিতে।
(ওমা) চিতাভস্ম চারি ভিতে,
রেখেছি মা আসিস যদি॥
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, রাখিয়ে মা পদতলে,
নাচ দেখি মা তালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদি।

॥ নিত্যানন্দ দাসবৈরাগী ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবিওয়াল নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় তিনি ডুগডুগী বাজাইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর খুব মিষ্ট ছিল বলিয়া তিনি সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী হয় এবং একটি কবির দল সৃষ্ট করয়া সমগ্র বংগদেশে সুনাম ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহার দল 'নিতে বৈষ্ণবের দল' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। **কবিসংগীত ও প্রণয়সংগীত** নামে তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ আছে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কাশীমবাজার রাজবাড়িতে কবিগান করিয়া ফিরিয়া সামান্য জ্বরে পবলোকগমন করেন। তিনি নিজের দলের জন্য গান রচনা ছাড়া গোর কবিরাজ ও নবাই ঠাকুর এই দুইজনের জন্যও গান বান্ধিয়া দিতেন। নিতাই সম্বন্ধে কবি ঈশ্বরগুপ্ত লিখিয়াছেন:

এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন, পরাজিত হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না। কত স্থানে কতবার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। ভাটপাড়ার ঠাকুর-মহাশয়েরা নিত্যানন্দকে নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। নিতাইয়ের এক প্রধান গুণ ছিল যে ভদ্রাভদ্র তাবল্লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন।

নিত্যানন্দ রচিত ও গীত একটি গান নিম্নে লিখিত হইল:

শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
নইলে কেন অবশ হইল, সুধা বরষিল শ্রবণে॥
বৃক্ষডালে বসি পক্ষী অগণিত, জড়বৎ কোন্ কারণে।
যমুনা জল বহিছে তরঙ্গ তরু হেলে বিনা পবনে॥
একি একি সখি, এ কিগো নিরখি, দেখি দেখি সব গোধনে।
তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ, আছে যেন হীন চেতনে॥

হায়! কিসের লাগিয়ে, বিদারিয়ে হিয়ে, উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাৎ একি প্রেম উপজিল, সলিল বহিছে নয়নে॥
আর একদিন শ্যামের ঐ বাঁশী, বেজেছিল কাননে।
কুললাজ ভয়, হরিলো তাহাতে, মরিতেছি গুরু গঞ্জনে॥

সিপাহী বিদ্রোহের একটি কাহিনী

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে **চন্দননগর খলিসানি** নিবাসী **তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়** মহাশয় ফরাক্কাবাদে যাইয়া তথায় তাহার স্বগ্রামবাসী রামচাঁদ মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি তারিণীবাবুকে ডাক বিভাগে একটি কর্ম করিয়া দেন; এই বিভাগে যোগ্যতার সহিত কার্য করিয়া ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তারিণীবাবু অবসর গ্রহণ করেন এবং আলীগড়ে সুবৃহৎ আবাস বাটি নির্মাণ করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। খলিসানিতে তাঁহার পিতা রামকানাই মুখোপাধ্যায় শস্যাদির ব্যবসায়াদি করিতেন এবং কালনা, ফরাসডাঙ্গা ও ভদ্রেশ্বরে তাহার চাউলের বৃহৎ গোলা ছিল। তারিণীবাবুও পিতার ন্যায় চাকুরী করিতে করিতে আলীগড়ে শস্যাদি ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং তথায় তিনি বহু জমিদারী খরিদ করিয়া স্থানীয় ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করেন।

তারিণীবাবুর তিনটি পুত্র—জ্যেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র, মধ্যম ঈশানচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ শরৎচন্দ্র। তারিণীবাবুর মধ্যম পুত্র ঈশানচন্দ্র ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় আলীগড়ের মুসলমানগণ ইংরাজ ও বাঙালীদের হত্যা করিবার জন্য যে ব্যাপক চেষ্টা করেন তাহা ঈশানচন্দ্রের চেষ্টায় কিভাবে ব্যর্থ হয় তদ্বিষয়ে কিছু বলিব। অসমসাহসী ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া বিদ্রোহ নিবারণে ইংরাজদের সহায়তা না করিলে আলীগড়ে একজনও হিন্দু বাঁচিয়া থাকিত না।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী ঈশানচন্দ্র পোস্ট অফিসে কর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় কর্মদক্ষতায় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ডেপুটি পোস্টমাস্টারের পদে উন্নীত হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফরাক্কাবাদের ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হন, পরে আজমীরের এ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার ও ট্রেজারি অফিসার পদেও কার্য করেন। ইনি তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় জমিদারী বৃদ্ধি করেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যখন সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয় তখন ঈশান চন্দ্র প্রমুখ চার-পাঁচ ঘর প্রবাসী বাঙালীর যে কিরূপ দুর্দিন গিয়াছিল, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। যখন আলীগড় হইতে সমস্ত সাহেবগণ পলায়ন করেন, তখন নসীরউল্লা নামক জনৈক মুসলমান নগরের শাসনভার গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের উপর যেরূপ অকথ্য অত্যাচার করে—ইতিহাস পাঠকগণ তাহা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। অত্যাচারের মাত্রা কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহার নিদর্শন আজও স্থানীয় প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের পাষাণশিল্পের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বৎসরের শেষে বিদ্রোহ দমন হইল বটে, কিন্তু এই কয়মাসের মধ্যে যে কত

শত হিন্দু পরিবার আলীগড় হইতে চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, আজ আর তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না।

আলীগড়ে বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের প্রধান সহায় ছিলেন দুইজন বাঙালী—ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রামকুমার রায়। কোয়েলের মুসলমানগণ ৩০শে জুন ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার সমস্ত স্থির করিয়াছিল, ঈশানচন্দ্র তাহা অবগত হইয়া মদ্রকে অবস্থিত ওয়াটসন সাহেবকে তাহা জ্ঞাপন করেন। এই সংবাদে অনেকেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হন; কিন্তু বিদ্রোহীরা ঈশানবাবুকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়। কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে দৈবক্রমে পলায়ন করিতে সমর্থ হন।

বিদ্রোহীদের নেতা ঘোষ খাঁ ঈশানবাবুকে ধরিতে না পারিয়া তাহার মস্তকের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ঈশানবাবু প্রথমে কোয়েল নামক স্থানে মুসলমান ফকিরের বেশে গুপ্তস্থানে লুকাইয়া থাকিয়া বিদ্রোহীদের গতিবিধি ও অবস্থিতির বিষয় আগ্রায় কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিতেন।

আলীগড়ের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্রামলে ঈশানবাবু সম্বন্ধে মীরাটের কমিশনার সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিত আছে:

During the whole time he kept almost daily communication with Eshan Chandra who was concealed at Coel or its neighbourhood. He was of great assistance in procuring Cossids for Dr. Clarke For this he was plundered by the rebels, and if seized, would no doubt have been put to death. He was the first to send news to Mr. Watson and party to Medruc, June 30 of the intended attack of the Coel Mahommedans.

বিদ্রোহাগ্নি নির্বাপিত প্রায় হইয়া আসিলে, তাহার সদা সংকটময় জীবন লইয়া অনাহারে, অনিদ্রায়, অশান্তিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলায়ন করিয়া থাকা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া আগ্রার দুর্গে তিনি আশ্রয় লাভ করেন। তথায় দুর্গ হইতে বাহিরে যাইবার জন্য যে ছাড়পত্র বাবু ঈশানচন্দ্র মুখার্জি পাইয়াছিলেন, নিম্নে তাহা হুবহু উদ্ধৃত হইল:

In and Out Pass

Fort Agra, 9th September, 1857.

No.	Name	Description
Government	Baboo Eshan Chandra Mukherjee Dy. Post Master of Allyghur (Sd.) J. H. Grames Asstt. Supdt. of Passses.	

ঈশানচন্দ্র ধন ও প্রাণপণ করিয়া অকপটে হিন্দুদের অত্যাচারের প্রতিকার করিবার জন্য *রাজ্যের দুর্দিনে যেভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন,* তাহা স্মরণ করিয়া আজ তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন।

বিপ্লবী ধর্মসাধক ও রাষ্ট্রসাধক মতিলাল রায় প্রতিষ্ঠিত **"প্রবর্তক সংঘ"** কেবল বাংগলা দেশের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। এই প্রতিষ্ঠানে বহু বিপ্লবী আশ্রয় গ্রহণ করেন।

প্রবর্তক সংঘে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তক সংঘে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে ২১ বৈশাখ ১৩৩৪ সালে শুভাগমন করেন। প্রবর্তক সংঘের যে ঘরে বসিয়া তিনি একটি গান রচনা করিয়া তথায় গাহিয়াছিলেন, উক্ত গানটি প্রবর্তক সংঘে উৎকীর্ণ আছে। নিম্নে উৎকীর্ণ গানটি উদ্ধৃত হইল:

"বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে—
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার করে' লও খেয়ার নেয়ে
ভেংগে এলাম খেলার বাঁশী, চুকিয়ে এলেম কান্নাহাসি
সন্ধ্যা-বায়ে শ্রান্ত কায়ে ঘুমে নয়ন আছে ছেয়ে।
ও-পারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে রে
আরতির শংখ বাজে সুদূর মন্দির পরে।
এস এস শ্রান্তিহরা, এস শান্তি সুপ্তিধরা,
এস এস, তুমি এস, এস তোমার তরী বেয়ে॥"

১২৮৮ সালে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম চন্দননগরে আসেন এবং ভাগীরথী তীরের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে মোরান্ সাহেবের বাড়িতে 'কিছু দীর্ঘকাল যাপন' করেন। চন্দননগরে তাঁহার কবিজীবনের উদ্বোধন হয় বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে নদীর প্রভাব বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়। জীবনস্মৃতি-তে চন্দননগরের এই মধুর দিনগুলির বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। অধ্যাপক মৃণাল ঘোষ "চন্দননগরে বিশ্বকবি" পুস্তিকায় নদীর উপর কবির যে সহজাত আকর্ষণ ছিল তাহা লিখিয়াছেন। নদীর প্রভাব সম্বন্ধে কবি স্বয়ং বলিয়াছেন:

শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান।
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে, চঞ্চল প্রাণ॥

॥ মতিলাল রায় ॥

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজরক্ষার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সেদিন চন্দননগরে যে যুগব্যাপী অসাধারণ প্রচেষ্টার সূচনা হইয়াছিল, তাহার কেন্দ্রপুরুষ ছিলেন মতিলাল ও তাঁহার সহকর্মিগণ। বিপ্লব ও সংগঠন, তাঁহার এই দুই পর্বের প্রবাহেই চন্দননগর ও তাহার বীর সন্তান মতিলাল যে অবদান ঢালিয়া গিয়াছেন, তাহা নব ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়

রহিবে। রাষ্ট্রীয় বিপ্লবযজ্ঞের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরও তিন ঋত্বিক্ ও জন্মবীর—কানাইলাল, রাসবিহারী ও শ্রীশচন্দ্র চন্দননগরেরই সুসন্তান। ইঁহাদের কর্মের ও মর্মের সহিত মতিলালের সংযোগ ও সম্বন্ধ অবিস্মরণীয়।

কানাইলালের বীরকীর্তি—আলিপুর জেলে। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার জন্য রিভলবার সংগ্রহ করার প্রস্তাব বন্দী কানাইলাল প্রথম করেন—মতিলালের কাছে। আর সেই রিভলভার সরবরাহের ব্যাপারে যে কয়েকজন দুঃসাহসী মানুষ জড়িত থাকিয়া জেলে কানাইলালের হাতে তাহা সুকৌশলে পেঁাছাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও অন্যতম ছিলেন মতিলাল। এই ঘটনায় লিপ্ত অন্য তিনজন হইতেছেন—শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কানাইলাল তাঁর শেষ ইচ্ছাও জানাইয়াছিলেন মতিলালের কাছে। রিভলভার হাতে লইয়া কানাই বলিয়াছিলেন "আমি মরিব—নরেনের রক্ত তর্পণের কথা তোমরা সংবাদপত্রে পড়িও। কেবল একটি অনুরোধ—আমার মৃতদেহ বিপুল শোভাযাত্রা করিয়া যেন শ্মশানক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। ইহা আমার মহিমার জন্য নয়, মির্জাফর, উমিচাঁদের দেশে প্রথম মৃত্যুদণ্ড বিশ্বাসঘাতক আমার হাতে গ্রহণ করিল, ইহার গৌরব যেন দেশ বুঝিতে পারে।" বীরের মনস্কামনা দেশবাসীই পূর্ণ করিয়াছিল। শ্মশানে অসংখ্য নরনারী স্বাধীনতার অগ্রপুরোহিত কানাইলালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং উচ্চারিত হইয়াছিল তুমুলরবে—"বন্দেমাতরম্।"

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারীর আত্মায় আগুন ধরাইয়াছিলেন একদিন শ্রীমতিলালই। অরবিন্দের প্রচারিত গীতার যোগের কথা তাঁহারই মুখে শুনিয়া রাসবিহারী মুগ্ধ চিত্তে মতিলালকে বলিয়াছিলেন ঃ "তোমার আত্মসমর্পণ যোগের অর্থ—অটোমেশন। যাহা কিছু হয়, তাহা ঈশ্বর করেন—এই অর্থে অটোমেশন।...আমি যে এইমাত্র ভোজন করিলাম বা এই যে তোমার সহিত কথা বলিতেছি—ইহার কর্তা আমি নহি—সব অটোমেশনে হইতেছে। এই অটোমেশনের দ্বারাই আমি বুঝিতেছি—ভারতের বিপ্লব সাধন আমার লক্ষ্য ও আদর্শ। ভারতের স্বাধীনতাই ঈশ্বর চাহিতেছেন—আমার ভিতর দিয়া।"

বীর রাসবিহারী যে অগ্নিবীর্য্য লইয়া ভারতব্যাপী বিপ্লবান্দোলন গড়িয়া তুলিতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, তাহার মূলশক্তি নিহিত ছিল এই অধ্যাত্মযোগেই। গীতার সিদ্ধ আত্মসমর্পণ যোগীর ন্যায় মহাকর্মরত এই রাষ্ট্রবীর চন্দননগর হইতে প্রস্তুত বোমা লইয়া দিল্লীর রাজদরবারে বসন্ত বিশ্বাস মারফৎ লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর নিক্ষেপ করিলে, সে ঘটনায় দোর্দণ্ড প্রতাপ বৃটিশ-রাজের হৃৎকম্প সৃষ্টি করিয়াছিল, ইহা আজ ঐতিহাসিক সত্য। বিপ্লবতন্ত্রের এই যুগান্তকারী ঘটনার পর শ্রীঅরবিন্দ উদ্বুদ্ধ উদ্বুদ্ধ চিত্তে তদ্বিষয়ে পণ্ডিচেরী হইতে চন্দননগরে মতিলালকে পত্র দিয়াছিলেন।

শুধু রাসবিহারী নয়, সে যুগে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বভারতের বিপ্লবী কর্মীগণ বৃটিশরাজের তাড়া খাইয়া চন্দননগরেই গোপন-বাসের জন্য ছুটিয়া আসিতেন। ইঁহাদের নিরাপদ আশ্রয়দাতা ছিলেন—শ্রীমতিলাল। সে গোপন যুগের অজ্ঞাতবাস-কাহিনী বলিতে

গেলে মহাভারতই রচনা করিতে হয়। তাহার ক্ষেত্র ইহা নহে। তবে রাসবিহারী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১০১৪ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। এবং সর্বভারতের বিপ্লবীগণ যাঁহারা চন্দননগরে আশ্রয় লাভ করেন, তাঁহাদের নাম ১০২৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

এই অজ্ঞাতচারীদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান আগন্তুক যিনি আসিয়া ভগবদাদেশে শ্রীমতিলালের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং। তাঁহার সহিত শ্রীমতিলালের পরিচয় ও মিলনের কথাও ভারতেতিহাসের এক বিশিষ্ট ঘটনা। কি ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে, কি তাহার অধ্যাত্মেতিহাসে, উভয় দিক্ দিয়াই এই মহতী যোগাযোগ-ঘটনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ধর্ম ও জাতীয়তার দিগদর্শনের প্রয়োজনেই একদিন উহার প্রকৃত তাৎপর্য ও ফলাফল-নিরূপণে নিশ্চয় যত্নবান্ হইবেন।

শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশেই বিপ্লবী মতিলাল তাঁর বৈপ্লবিক প্রতিভা ও প্রেরণা লইয়া রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে ধর্মক্ষেত্রে, সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতিক সংগঠনের সাধনায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন—'রয়েলক্লেমেন্সী'-ঘোষণার পর হইতে। এই সময়েই তিনি বিপ্লবী সহতীর্থ—ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি অজ্ঞাতচারী বীরগণকে গোপনবাস পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকেও ইঁহাদিগকে সেই সুযোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বিপ্লবী নায়কগণও তদবধি মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা-যুদ্ধের নবীন অধ্যায় রচনায় অগ্রসর হওয়ার পথ পাইয়াছিলেন।

শ্রীমতিলাল রায়ের আমন্ত্রণে মহাত্মা গান্ধীজী চন্দননগর আশ্রমে প্রথম শুভাগমন করেন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। শ্রীঅরবিন্দের আরব্ধ সংগঠনী প্রেরণা মহাত্মাজীর সংস্পর্শে নূতন সংবেগ ও গতি পাইল—শ্রীমতিলাল ও তাঁহার অনুবর্তী প্রবর্তক সঙ্ঘের জীবনে। স্বয়ং টেগার্ট সাহেবকে গান্ধীজী পত্র দেন—মতিলালের বৈপ্লবিক গতির পরিবর্তন সম্বন্ধে স্বকীয় দৃঢ় প্রত্যয় জ্ঞাপন করিয়া এবং তদবধি মতিলাল ও সহকর্মিগণ চন্দননগরের বাহিরে আসিয়া সংগঠনযজ্ঞ সম্প্রসারিত করার নূতন সুযোগ ও প্রেরণা লাভ করেন। বিপ্লবী মতিলাল অতঃপর প্রবর্তক সঙ্ঘের মধ্য দিয়া যে অভিনব কর্ম ও মর্ম-রচনার সূত্রপাত করিলেন তাহা এক কথায় বলিতে গেলে—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—

"to revolutionise the brain of the nation."

জাতির মস্তিষ্ক ও চরিত্রের পরিবর্তন—মানুষের চিন্তা ও প্রবৃত্তির শোধনে ও রূপান্তরে দিব্য জন্মলাভ ও এরূপ দিব্যচরিত্র নর-নারী লইয়া অভিনব মহাজাতির অভ্যুত্থান—এই বিরাট লক্ষ্য ও প্রেরণা লইয়াই, সঙ্ঘের গতিপথ আজ সুচিহ্নিত হইয়াছে। বিপ্লবী মতিলাল পরমপূজ্য সঙ্ঘগুরুরূপে সঙ্ঘের জীবনে এই মহত্তর অধ্যাত্মবিপ্লবের মহাদীক্ষাই দিয়া গিয়াছেন। তাঁর অশরীরিণী শক্তি ও আশীর্বাণী এই সিদ্ধ পথেই জাতিকে অলক্ষ্যে পরিচালিত করিতেছে ও করিবে। মতিলাল ৬ জানুয়ারী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০ই এপ্রিল ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

১৯০৮ হইতে ১৯২০ খৃঃ পর্যন্ত সর্বভারতের বিপ্লবী কর্মিগণ যাঁহারা চন্দননগরে মতিলাল রায়ের আশ্রয়ে ও আবাসে সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ঃ

বিপ্লবীবৃন্দ ঃ অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, বিজয়কুমার নাগ, সুরেশচন্দ্র দত্ত, কানাইলাল দত্ত, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, সৌরেন্দ্রমোহন বসু, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র রায়, রাসবিহারী বসু, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, সত্যচরণ কর্মকার, মনীলাল দে, নলিনচন্দ্র দত্ত, মাণিকলাল রক্ষিত, নটবর দাস, হারাধন বক্সী, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু দাস, যোগেন্দ্রনাথ শেঠ, সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার বিশ্বাস, অতুলচন্দ্র ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, মাখনলাল সেন, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন রায়), অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, আশুতোষ নিয়োগী, নির্মলচন্দ্র বক্সী, সাগরকালী ঘোষ, মণীন্দ্রনাথ নায়েক, অরুণচন্দ্র দত্ত, রামেশ্বর দে, দুর্গাদাস শেঠ, অরুণচন্দ্র সোম, জ্যোতিশচন্দ্র সিংহ, ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রূপলাল নন্দী, আশুতোষ দাস, পঞ্চানন সিংহ, ভূপতি মজুমদার, মন্মথকুমার বিশ্বাস, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ঘোষ, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গলী, সুদর্শন চট্টোপাধ্যায়, অমৃতলাল হাজরা, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, অনুকূল চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ কাহেলী, হরিশচন্দ্র সিকদার, ববীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র বিশ্বাস, রমেশচন্দ্র আচার্য, সুশীলকুমার সেন, বাবুরাম পরারকর, আউধবিহারী, প্রতাপ সিং, বালরাজ, নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অমৃতলাল সরকার, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী, রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, নিত্যকেশী ঘোষ, নলিনীকিশোর গুহ, শ্রীশচন্দ্র সরকার, কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র দাসগুপ্ত, সীতানাথ দাস, সুশীলকুমার লাহিড়ী, শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, আমীর চাঁদ, কর্তার সিং, বালমুকুন্দ, নরেশচন্দ্র সেন, অমরনাথ রায়, নরেন্দ্রনাথ সরকার, রামচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রমোহন সেন, লাডলিমোহন মিত্র, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র রক্ষিত, বিনোদিনী ঘোষ, রাধারাণী রায়।*

॥ স্বভাবকবি চণ্ডীকাণা ॥

চন্দননগরের তন্তুবায় বংশীয় স্বভাবকবি চণ্ডীচরণ 'চণ্ডীকানা' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। স্বরচিত গান ছাড়া অন্য কোন গান তিনি গাহিতেন না। তিনি চুঁচুড়ায় বাস করিতেন। তাঁহার রচিত ও গীত অসংখ্য গান আছে। ৬১৭ পৃষ্ঠায় তাঁহার বিষয় লিখিত হইয়াছে বলিয়া এই স্থানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

নিম্নে চণ্ডীকাণার একটি গান উল্লিখিত হইল ঃ

"চক্ষু বিনে ভাই, যত দুঃখ পাই, বলে কি জানাব, আমি তা জানি।
অন্ধের যত কষ্ট, জানেন ধৃতরাষ্ট্র, আর জানেন বিশিষ্ট অন্ধমুনি।

---

* ২৫-এ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় চন্দননগর প্রবর্তক সংঘমন্দিরে সমাগত এই ১০১ জন বিপ্লবীদের নামের স্মৃতিফলক উন্মোচন করেন।

দৃষ্টিহীন জন্য নামটি আমার কাণা, নামের এমনি দোষ আদর করে না।,
জগৎ পূজ্য কড়ি, সেও যদি হয় কাণা, চলে না গো—ওগো ইক্ষু
হলেও কাণা, অগন্য তিনি॥
সম্পূর্ণ দুঃখেতে বলে চন্ডীকাণা কাণার দুঃখ কিঞ্চিৎ জানে গো রাতকাণা।
ভেবে দেখলাম চিতে কাণার দোষ নানা—জগতে গো!
কেবল কাণা পুত্রের আদর করেন জননী॥
কষ্টে, সৃষ্টে করি পথে আনাগোনা, বালকেরা বলে কোথায় যাসরে কাণা।
স্বহস্তে কেটেছিস্ মহাপাপের খানা, তোর কি মনে নাইরে!
কাণা, খানায় প'ড়ে কেন হারাবি প্রাণী॥
জন্মাবধি আমার মরণ পর্যন্ত, হলো না হবে না এ দুঃখের অন্ত,
জীবনান্তে যদি করেন রাধাকান্ত করুণা গো—
চন্ডীর ঐ ভরসা মনে দিবা রজনী॥"

চন্দননগরের বিচিত্র কাহিনী *

পোর্তুগীজদের ভারতে আসার প্রায় একশ বছর পরে ইংরেজ বণিকগণ এদেশে আসে। তারপর মোগল শাসনাধীন ভারতবর্ষে ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, সুইডিশ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় বণিকগণ দলে দলে এসে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কুঠি স্থাপন করে। ভারত-সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালে ফরাসীরা প্রথম ভারতবর্ষে আসে। তদানীন্তন ক্ষয়িষ্ণু মোগল সাম্রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, এদেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে, ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরস্পর সংঘর্ষের ফলে অনেক উত্থান-পতনের পর ইয়োরোপীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীগুলির মধ্যে ইংরেজ এবং ফরাসীরা প্রাধান্য লাভ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বণিকের মানদন্ড দেখা দিল রাজদন্ডরূপে।'...... দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের পর ফরাসী অধিনায়ক দুপ্লেই ব্যবসায়ীর মুখোশ পরে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যনীতিকে সুপরিকল্পিত উপায়ে সার্থক করে তোলবার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের নজীর থেকে জানা যায় যে, তাঁর স্বদেশবাসীর সক্রিয় সমর্থনের অভাবে দুপ্লের সে স্বপ্ন ব্যর্থ হয় এবং ইংরেজই পরবর্তীকালে প্রকৃতপক্ষে বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়।

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা চন্দননগরে, তথা বাংলায় সর্বপ্রথম আসে। তদানীন্তন বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁর অনুমতি অনুসারে চন্দননগরের উত্তরে তালডাঙ্গায় ফরাসী অধিনায়ক দুপ্লে ছোট একটি কুঠি স্থাপন করে। স্থানটিকে গড়বন্দি করার পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তনের ফলে ফরাসীরা সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী অধিনায়ক দেলান্দ ঐ তালডাঙ্গায় ফিরে এসে আবার ব্যবসা-

* হুগলী জেলার ইতিহাসের জন্য অধ্যাপক মৃণাল ঘোষ কর্তৃক লিখিত।

কেন্দ্র স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে তালডাঙগার দক্ষিণে রোড়াকিশনপুর, খলিসানি আর গোন্দলপাড়া, এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে ফরাসীরা চন্দননগর শহর গড়ে তোলে। ঠিক এমনি করেই একদা তিনটি গ্রাম সুতানটি, কলিকাতা আর গোবিন্দপুরকে নিয়ে ইংরেজ কলিকাতা মহানগরীর গোড়াপত্তন করেছিল।

চন্দননগরের দক্ষিণপ্রান্তে গোন্দলপাড়া সংলগ্ন "ড্যানিস্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" কর্তৃক পরিত্যক্ত ভূখণ্ড দিনেমারডাঙ্গা থেকে আরম্ভ করে বরাবর পশ্চিম দিক দিয়ে একটি সরু লম্বা খাল কেটে চন্দননগরের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেকালের ইয়োরোপে 'ক্যাসেলে'র চারিদিকে যেমন খাল কাটা থাকত, চন্দননগরকে সুরক্ষিত করবার জন্য ফরাসীরা সেইরকম খালের দ্বারা তাদের সীমান্ত-রেখা নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। সে যুগের রাজনৈতিক আবর্তনে নবাবী আক্রমণ থেকে ফরাসীদের দুর্গ এবং চন্দননগরকে রক্ষা করবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থার কথা চন্দননগরের গভর্নরকে লিখিত দুপ্লের ১৭৪৩ সালের ৪ঠা জুনের এক পত্রেও উল্লিখিত রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের (২৩শে জুন ১৭৫৭) পর বাংলায় শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, সর্ববিষয়ে ইংরেজ সার্বভৌমত্ব লাভ করল। বাংলায় নবাবী শাসনের ছায়াটুকুও স্বল্পদিনের মধ্যে অপসারিত হল। সন্ধির পর থেকে বাংলার রাজনীতির মধ্যে ফরাসীদের অনুপ্রবেশের বিন্দুমাত্র সুযোগ-সুবিধা রইল না। ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষে চন্দননগর এক-সময় ইংরেজের করায়ত্ত হয়েছিল। ভাগীরথীতীরে ফরাসীদের ঘাঁটি চন্দননগরের গুরুত্ব সুচতুর ক্লাইভ বুঝেছিল বলেই যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে চন্দননগরকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল। চন্দননগরের অপূর্ব কারুকার্যময় নন্দদুলালের মন্দির ইংরেজের গোলায় বিধ্বস্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজের কাছে একরকম নতিস্বীকার করেই কয়েকটি ক্ষুদ্র উপনিবেশে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখা ছাড়া ফরাসীদের আর কোন গত্যন্তর রইল না।

বাংলাদেশে, হুগলী জেলায় গঙ্গাতীরে ছোট একটি শহর এই চন্দননগর, কিন্তু এর ইতিহাস বিস্ময়কর এবং ঐতিহ্য অবিস্মরণীয়। যদি কেহ বলেন, হুগলী জেলার প্রাণকেন্দ্র চন্দননগর, তাহলে সেটা একটুও অত্যুক্তি হবে না। "ইতিহাসের নজীর থেকে" জানা যায় যে, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে চন্দননগর বাংলার সমগ্র বৈদেশিক উপনিবেশের মধ্যে একদিন শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। শুধু হিমালয়ের অন্তরালে তুষারচ্ছন্ন তিব্বত, অজস্র গোলাপের সৌরভে আকুল বাসরার বাজারের সঙ্গে নয় মহাচীন, পেগু, জেড্ডা, সুরাট মোবা, ইরান প্রভৃতি দেশগুলিরও সহিত সেদিন চন্দননগরের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল অতি নিবিড়। সেকালে কলিকাতা অপেক্ষা বড় ব্যবসাকেন্দ্র ছিল চন্দননগর। চন্দননগরকেই বলা হত 'গ্রেনারি অফ দি ইস্ট'। অনুমান করা যায় আরো আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপনের বহু পূর্বে সপ্তগ্রামের বন্দরের মধ্য দিয়া চন্দননগরের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত অন্যান্য দেশের সঙ্গে জলপথে। তখন সরস্বতী নদী মজে যায় নি, সপ্তগ্রামের বন্দর থেকে সমুদ্রগামী জাহাজ এশিয়ায় এবং ইয়োরোপের বহুস্থানে যাতায়াত করত।

ভবিতব্যের অমোঘ বিধানে আজ লুপ্ত হয়েছে ভারতে ইংরেজ, ফরাসী এবং পর্তুগীজ

সাম্রাজ্যবাদ। আবার এমন একটা দিন ছিল যখন বিদেশী শাসন এবং শোষণে নিষ্পেষিত হয়ে বাংলার মুক্তিকামী তরুণদল দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গবার জন্য তাদের কর্ম এবং সংগঠনকেন্দ্র গড়ে তুলল এই চন্দননগরে। স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে প্রথম যে বীর বঙ্গযুবক আত্মদান করেন, সেই কানাইলালের জন্ম এবং শিক্ষাদীক্ষা সব এই চন্দননগরে। এখান থেকেই তরুণ রাসবিহারী বসু জাপানে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে রাসবিহারী-সুভাষচন্দ্রের মিলন এবং সম্মিলিত কর্মপন্থার কথা ভারতের মুক্তিসাধনার ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর বিপ্লবী মাখন ওরফে জীবন ঘোষাল স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর আহ্বানে জীবনদান করে গেলেন এই চন্দননগরে। আজ সারা ভারত জানে যে, বাংলার অগ্নিযুগের ঋত্বিক আচার্য মতিলাল রায়ের প্রবর্তক সঙ্ঘের এক নিভৃত কক্ষে মহা-মানব শ্রীঅরবিন্দ বিভোর হয়েছিলেন সে কোন্ দিব্যজীবনের ধ্যানে।

যদি কোনোদিন চন্দননগরের পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখা হয়, সেখানে থাকবে ভূদেবচন্দ্রের কর্মজীবনের প্রারম্ভে এখানে বিদ্যালয় স্থাপন এবং শিক্ষকতার কথা, প্রাতঃ-স্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গঙ্গাতীরে অবস্থান, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দননগরে অবসর বিনোদন, এখানে বড়বাজারের একটি বাড়িতে মধুসূদনের সনেট রচনা, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বাল্যকালে এবং পরিণত বয়সে চন্দননগরের সহিত সম্পর্কের কথা, এভারেস্ট আবিষ্কারক রাধানাথ শিকদারের চন্দননগরে স্থায়ী বসবাসের কথা ইত্যাদি। ভবিতব্যের কোন্ অদৃশ্য ইঙ্গিতে গঙ্গাতীরের ছোট এই শহরটিতে অবস্থান করেছেন কিংবা বারম্বার শুভাগমন করেছেন বহু দেশবরেণ্য মনীষী যথা রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, রাজা রামমোহন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মনস্বী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকে। মহাত্মা গান্ধী এখানে শুভাগমনের পর থেকে সারাজীবন চন্দননগরের সুখদুঃখের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন।" বহু দেশ-বিশ্রুত-কীর্তি মনস্বীর অবস্থিতিধন্য এবং পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত চন্দননগরকে আবার চিরঅম্লান গৌরবের জয়মাল্য এবং যশের মুকুট পরিয়ে দিয়ে গেছেন স্বয়ং কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ। চন্দননগর-কাহিনীর শেষ পর্বে সেই অবিস্মরণীয় স্মৃতিকথা আমরা নিবেদন করব।

সাম্প্রতিককালের 'চন্দ্রনগর' শীর্ষক একটি কবিতায় কবি সুধীর গুপ্ত লিখেছেন ঃ

"চন্দ্রনগর নাম কে রাখিল ?
কাহারা প্রথমে বাঁধিল ডেরা ?

কবির এ-প্রশ্নের সঠিক সমাধান করা কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষে আজ পর্যন্ত সম্ভবপব হয় নি। শহরটির নাম এখন চন্দননগর, চন্দ্রনগর আর বলা হয় না। চন্দননগরের পূর্বপ্রান্তে ভাগীরথী চন্দ্রকলার মত বেঁকে গেছে—এর থেকেই কি চন্দ্রনগর নামের উৎপত্তি ? শ্রীমন্ত সদাগর, চাঁদ সদাগরের সঙ্গে একসময় চন্দননগরের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শোনা যায় নদী-

পথেই তখন বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ওদিকে সরস্বতী নদী আর এদিকে ভাগীরথী, দুটোই তখন তাঁদের 'ট্রেড-রুট' ছিল। এখানে এ'দের ঐতিহাসিক কীর্তি, বোড়াইচণ্ডীতলার সুপ্রাচীন তীর্থমন্দির আজো বিদ্যমান। ফরাসীরা যেমন একসময়ে তালডাঙগায় কুঠি স্থাপন করেছিল, হয়ত এখানেও একসময়ে চাঁদ সদাগরের একটি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত ছিল। চাঁদ সদাগরের নগর, চাঁদের নগর থেকে চন্দ্রনগর নাম হয়েছিল এমন কথাও শোনা যায়। আবার মতান্তরে বলা হয়েছে প্রাচীনকালে এখান থেকে নাকি প্রচুর পরিমাণে চন্দনকাঠ রপ্তানী হত। চন্দনকাঠ বিক্রয়ের এখানে একটি বিরাট কেন্দ্র ছিল। নদীয়ার ধর্মপ্রাণ রাজা রুদ্র হুগলী জেলার এই অঞ্চল থেকে চন্দনকাঠ সংগ্রহ করতেন। কেউ কেউ বলেন, এই চন্দনকাঠের ব্যবসাকেন্দ্র থেকে চন্দননগর নাম হয়েছে।

চন্দ্রনগর, চন্দননগর—এসব নামের উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন, চন্দননগর হুগলী জেলার মধ্যে বহুকাল যাবত একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, এ-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ফরাসী শাসনের আদিপর্বের চন্দননগরকে লুই বোনার, মোরাল প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ নীলের চাষে প্রভূত অর্থোপার্জন করেছিল। আবার অতীতে নদীয়ার সঙ্গে চন্দননগরের নিবিড় বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল। কৃষ্ণনগরের কয়েকজন ব্যবসায়ী চন্দননগরের গঞ্জে চাউল ব্যবসায়ে অল্পদিনের মধ্যে এতই বিত্তশালী হয়ে ওঠেন যে, এখানেও সাড়ম্বরে কৃষ্ণনগরের রাজবংশ-প্রবর্তিত জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করেন। চন্দননগরের স্থানীয় সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়িগণও বিশেষ করে চাউলপটি, কাপড়েপটি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় সেই সময় থেকেই মহাসমারোহে জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজা-অর্চনা শুরু করেন। চন্দননগরের অর্থনৈতিক প্রাচুর্যই এখানকার লোকচিত্তকে স্বভাবতঃই জগদ্ধাত্রী পূজার দিকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু একথা বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না যে, জগদ্ধাত্রী পূজা যেমন জাঁকজমক আর সমারোহের সঙ্গে চন্দননগরে হয়, এমনটি আর কোথাও হয় না। ভারতের বিপ্লবতীর্থ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের উদ্বোধনতীর্থ ভাগীরথীতীরের এই ঐতিহাসিক শহরটি জগদ্ধাত্রী পূজার সময়ে জাতিধর্মনির্বিশেষে বহু মানবের আগমনে হাসিতে, গানেতে, সুরেতে, উচ্ছলতাতে সারা বাংলার আনন্দতীর্থে পরিণত হয়।

যদিও ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ও দেশসেবার ইতিহাসে চন্দননগর চিরদিনই এক বিশেষ মর্যাদার স্থান অধিকার করে আছে তথাপি "ধর্মসাধনা, কথকতা, নাট্যাভিনয়, যাত্রা, কবিগান, পাঁচালী কোন দিক দিয়েই চন্দননগর কারো পিছনে পড়ে থাকে নি। কি ধর্ম, কি রাজনীতি, কি স্বাদেশিকতা, কি সমাজসংস্কার—শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, যেদিক দিয়েই বাংলায় যখন যে প্লাবন এসেছে, তখনই চন্দননগর তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চিরদিনই সারা বাংলার সঙ্গে চন্দননগরের আত্মার সংযোগ অবিচ্ছিন্ন।"

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে ফরাসীদের পতনের পর, দীর্ঘকাল পরে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে চন্দননগর আবার এক সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ইংরেজ ভারত ছাড়বার পর ফরাসী-শাসিত চন্দননগর গণভোটের মাধ্যমে বিদেশী শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে আপন মুক্তিসাধন করে।

এই গণভোটে শতকরা ৯৯টি ভোট ভারতভুক্তির পক্ষে ছিল। গণভোটের পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ২৭শে নভেম্বর চন্দননগর মুক্তনগরীর মর্যাদা লাভ ক'রে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। চন্দননগরের মুক্তিসাধনার এই অভিনব দৃষ্টান্তের পর, ফরাসী উপনিবেশের রাজধানী পণ্ডিচেরী এবং তৎসহ মাহে, কারিকল, ইয়ানন প্রভৃতি স্থানগুলির ভারতভুক্তি সম্ভবপর হয়।

পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক বর্বরতার হাত থেকে গোয়া, দমন, দিউ আজ মুক্ত। এদেশে ব্যবসা অপেক্ষা জলদস্যুগিরিতে পর্তুগিজগণ অধিকতর কুখ্যাত। তাদেরি বংশধরগণ সাড়ে বারশ বছরেরও অধিককাল পশ্চিম-ভারতের একাংশে এদেশের মানুষকে পরাধীনতায় পঙ্গু করে রেখেছিল। পশ্চিম-ভারতের সমুদ্রতটের এই বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ, কুশাসনে নিষ্পেষিত অধিবাসীদের মুক্তিসাধনায় চন্দননগরই সর্বপ্রথম অনুপ্রাণিত করেছিল।

১৯৫০ সালের ২রা মে চন্দননগরের 'ডি ফ্যাক্‌টো ট্রান্সফার' হয়। ভারত রাষ্ট্রে কার্যতঃ হস্তান্তরিত হবার সময় এ সংক্রান্ত সনদে ফরাসী পক্ষে তদানীন্তন চন্দননগরের ফরাসী-ভারতের কমিশনারের প্রতিনিধি মঁসিয়ে তাইয়ার ও ভারতে পক্ষে নবনিযুক্ত শাসন-পরিচালক (অ্যাডমিনিস্ট্রেটার) শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষর করেন। ১৯৫১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের হাতে চন্দননগরের (আইনত হস্তান্তর) সম্পন্ন করা হয়। ভারত ও ফ্রান্সের চুক্তিপত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সর্দার হরজিৎ সিং মালিক এবং ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তরের মঁসিয়ে দে লা টুরনেল, নিজ নিজ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। অতঃপর ভারতীয় ও ফরাসী পার্লামেন্টের অনুমোদনের পর উহা কার্যে পরিণত করা হয়।

১৯৫৪ সালে ভরত সরকার ডাঃ অমরনাথ ঝাঁয়ের নেতৃত্বে চন্দননগরে একটি কমিশন পাঠান। চন্দননগরবাসীর সহিত সাক্ষাৎ, তথ্যাদি সংগ্রহ এবং গভীর পর্যবেক্ষণের পর ঝা-কমিশন চন্দননগরের বিপুল ঐতিহ্যের কথা কিছুটা উপলব্ধি করেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে, নূতন পরিস্থিতিতে চন্দননগরকে হুগলী জেলার শুধু বিশিষ্ট একটি নগর হিসেবে গণ্য করা চলবে না। ১৯৫৪ সালের ২রা অক্টোবর শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর, হরিপাল, তারকেশ্বর ও সিঙ্গুর এই চারটি থানা-সহ চন্দননগরকে নিয়ে হুগলী জেলার মধ্যে একটি নতুন মহকুমা সৃষ্ট করা হল। এখানে একটি নতুন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন বলবৎ করা হয়েছে যার ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনের মত এখানে কাউন্সিলারগদ-সহ মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং অল্ডারম্যান ইত্যাদি আছেন। এই নবসৃষ্ট মহকুমার আয়তন এখন ১৯৮·৫ বর্গমাইল (হুগলী জেলার আয়তনের শতকরা ১৬·৪ ভাগ)।

আজ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত চন্দননগর অনেক বিষয়ে এখনও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। চন্দননগরের গভর্নমেন্ট কলেজে ডক্টরেট উপাধিধারী অধ্যাপকের সংখ্যা আজ বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। চন্দননগররের আয়তনের তুলনায় বহুমুখী, উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হুগলী জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। এখানে বেসরকারী আর্ট স্কুল ও টেকনিক্যাল কলেজও আছে। দিল্লীর আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রকলা প্রদর্শনীতে এ-পর্যন্ত চন্দননগরের শিশুরাই সারা ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক

পুরস্কার পেয়েছে। চন্দননগরের রাইফেল ক্লাবের সভ্যদের কৃতিত্বও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদা চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্যগণই বাংলাদেশে ফুটবল খেলায় সর্বপ্রথম ট্রেডস কাপ বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেন। চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার ফ্রেন্ডস ক্লাবই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম 'নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মেলন এবং প্রতিযোগিতার' আয়োজন, অনুষ্ঠানাদি করেন। রবীন্দ্র-রচনা ও আদর্শের অনুশীলনের, গবেষণার এবং প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য চন্দননগরের 'রবীন্দ্র-মানস' আজ দেশবাসীর নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত। জেলার এই শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-অনুশীলন কেন্দ্র এবং ইহার গ্রন্থাগার সম্বন্ধে শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় বলেন ঃ

> "এই জেলার মধ্যে ইহার অনুরূপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কথা জানা যায় না।...এই... গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসমূহ এবং তাঁহার সম্পর্কীয় পুস্তকাবলী যাহা আছে এই জেলার মধ্যে তাহা আর অন্যত্র আছে কি না সন্দেহ।"(১৬)

আচার্য মতিলাল রায় প্রতিষ্ঠিত প্রবর্তক সংঘ একদিন বাংলায় দেশপ্রেমিক এবং ভারতের মুক্তিকামী বিপ্লবীদের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল। এই প্রবর্তক সংঘে অবস্থান এবং ধ্যানের পর শ্রীঅরবিন্দ দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রতীরে পণ্ডিচেরীতে গমন করেন। প্রবর্তক সংঘ আপন মহিমায় চির-সমুজ্জ্বল। কিন্তু দেশবরেণ্য স্বনামধন্য মনীষী এবং চিন্তানায়কের অবস্থিতি-ধন্য চন্দননগরকে অতুলনীয় গৌরবদান করে গেছেন স্বয়ং কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ। ১২৮৮ (মতান্তরে ১২৮৪) সালে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম চন্দননগরে আসেন। হুগলী জেলার গঙ্গাতীরবর্তী ছোট এই শহরটির কোন্ দুর্বার আকর্ষণ তাঁকে জীবনের প্রায় শেষপর্ব পর্যন্ত চন্দননগরে বারংবার টেনে এনেছে। প্রধানতঃ কবিগুরুর নিজের কথা নিবেদন করেই এখানে আমরা রবিতীর্থ চন্দননগর কাহিনী শেষ করছি।

দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার পথে হঠাৎ মত পরিবর্তন করে, মাদ্রাজের সমুদ্রতীর থেকে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে মুসৌরীর পর্বতশিখরে। সেখান থেকে সোজা চলে এলেন বাংলাদেশে তাঁর জ্যোতিদাদার আশ্রয়ে চন্দননগরে গোন্দলপাড়ার গঙ্গাতীরে। তখন সস্ত্রীক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মোরান সাহেবের বাগানে ভাগীরথীতীরে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় অবস্থান করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তখন কৈশোর আর যৌবনের দ্বন্দ্বক্ষণ। তিনি বারংবার বলেছিলেন যে, তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা সুমধুর দিনগুলি কেটেছে চন্দননগরে গোন্দলপাড়ায় মোরান হাউসে। সেই অবিস্মরণীয় অনুভূতির কথা জীবনস্মৃতির 'গঙ্গাতীরে' শীর্ষক অধ্যায়ে বিশ্বকবি উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখেছিন ঃ

> "আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মত একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখন বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়াম যন্ত্র ফেলে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটি মনের মত সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিনী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মত কাটাইয়া দিতাম, কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম—জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন আমি গান গাহিতাম।"

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে 'গাঙেগয়' বলতেন। জীবনস্মৃতির একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ গঙ্গাতীরের মোরান হাউসের স্মৃতিকথায় সমুজ্জ্বলঃ

"আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্ন পরিবেশন হইয়া থাকে।" ইত্যাদি

১৩৩৪ সালে ২১শে বৈশাখ চন্দননগরে নাগরিক সম্বর্ধনার উত্তরে কবিগুরু যে প্রতি-ভাষণ দিয়েছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে গোন্দলপাড়ার মোরান হাউসেরই অনবদ্য স্মৃতিকথাঃ

"ছেলেমানুষের বাঁশি ছেলেমানুষি সুরে যেখানে বাজত সে আমার মনে আছে। মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি বড় যত্নে তৈরী, তাতে আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু সৌন্দর্যের ভঙ্গি ছিল বিচিত্র। তার সর্বোচ্চ চূড়ায় একটি ঘর ছিল, তার দ্বারগুলি মুক্ত, সেখান থেকে দেখা যেত ঘন বকুল গাছের আগডালের চিকন পাতায় আলোর ঝিলিমিলি।......... এইখানে ছিল আমার বাসা, আর এইখানেই আমার মানসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলুমঃ

এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।" (১৭)

কয়েক বৎসর পরে ৯ই ফাল্গুন ১৩৪৩ সালে (২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭) চন্দননগরে বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সেই ঐতিহাসিক বিদ্বজ্জনসমাগমে আবেগভরা কণ্ঠে চন্দননগরের মোরান হাউসের সুমধুর স্মৃতিকথা রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন তাঁর উদ্বোধনী অভিভাষণেঃ

"আজকে আমার প্রতি ভার অর্পণ করেছেন এই সম্মেলনের উদ্বোধনের। উদ্বোধন এই কথাটি শুনে আমার মনে আর একদিনের কথা এল। সেই সময় এই সহরের একপ্রান্তে একটা জীর্ণপ্রায় বাড়ী ছিল। সেইখানে আমি আমার দাদার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তারপর মোরান সাহেবের বিখ্যাত হর্ম্যে আমাকে কিছু দীর্ঘকাল যাপন করতে হয়েছিল। বস্তুত এই গঙ্গাতীরে এই নগরের একপ্রান্তেই আমার কবি-জীবনের উদ্বোধন। সেটা ছিল আমার জীবনের সত্য ও সহজ উদ্বোধন.........আমার চিত্তের যথার্থ উদ্বোধন হ'ল সেইসময় — বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরে। বিশ্বের সুরে সুর বাঁধবার উপলক্ষ পেলাম আমি তখন।.... .... তখনই আমার কবিজীবনের প্রথম সূচনা হয়েছিল।" (১৮)

চন্দননগরে গোন্দলপাড়ার গঙ্গাতীরে মোরান সাহেবের বাগানের সুরম্য গৃহটির কথা রবীন্দ্র-মানসে ছিল চিরভাস্বর। ১২৯৯ কালে ২রা আষাঢ় বুধবার শিলাইদহ থেকে কবি ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে লিখেছেনঃ

"এমন এক একটি দিন সম্পত্তির মতো। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতলার ছাতের গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা. .... এইরকম কতকগুলি ক্ষণখণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে।"(১৯)

১৯৩৫ সালে চন্দননগর স্ট্র্যান্ডে পাতাল বাড়ীতে তিনি কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন।

সে সময়কার কথা শ্রীমতী রাণী চন্দ কিছু লিখেছেন। (২০) সে বৎসর আষাঢ় মাসে চন্দন-নগরেই তাঁর একখানি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ 'বীথিকা' লিখতে শুরু করেন। এতদিন পরে লেখা বীথিকার অনেকগুলি কবিতার মধ্যে আবার মোরান হাউসের স্মৃতি অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেনঃ

"বীথিকার পর্ব শুরু হইয়াছে আষাঢ়ে চন্দননগর হইতে; সেখানেও পুরাতনের বিস্মৃত স্মৃতির আকস্মিক আঘাত এবং তাহার পর হইতেই এই কাব্যধারার উদ্ভব। শান্তিনিকেতনে সেই ধারায় কবিতা চলিতেছে।" (২১)

চন্দননগরের মোরান হাউসের স্মৃতি বুঝি বা কবির অবচেতনলোকে চিরমুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। গল্পগুচ্ছের দুটি গল্প "অধ্যাপক" এবং "আপদ"-এর মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের যখন কবিজীবনের ছেলেবেলার কাহিনী শোনালেন, সেখানেও সেই মোরান বাগানের কথাঃ

"তার কিছুদিন পরে বাসা বদল করা হোলো মোরান সাহেবের বাগানে। সেটা রাজবাড়ি বললেই হয়। রঙিন কাঁচের জানলা-দেওয়া উঁচু-নিচু ঘর, মার্বেল পাথরে বাঁধা মেঝে, ধাপে ধাপে গঙ্গার উপর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে লম্বা বারান্দায়। এইখানে রাত জাগবার ঘোর লাগত আমার মনে, সেই সবরমতী নদীর পায়চারির সঙ্গে এখানকার পায়চারির তাল মেলানো চলত।" (২২)

চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার স্মৃতি কবিচিত্তে চিরজাগ্রত ছিল বললে একটুও অত্যুক্তি করা হবে না। ১৩৪৩ সালে শান্তিনিকেতনে বসে কবি লিখলেন 'খাপছাড়া'। ১০৫টি কবিতা এবং আরো ২৪টি সংযোজন করে খাপছাড়ার কবিতাগুচ্ছ তিনি মনস্বী রাজশেখর বসুকে উৎসর্গ করলেন। আশ্চর্য এই যে, এতদিন পরে বীরভূমে বসে লেখা এই ১০৩টি কবিতার ভূমিকা হিসেবে যে কবিতাটি লিখলেন, সেখানেও চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার কথাঃ

"ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে
ধুলোয় আসর সাজিয়ে দিয়ে
পথের ধারে বসল যাদুকর।
এল উপেন, এল রূপেন
দেখতে এল নৃপেন, ভূপেন
গোঁদলপাড়ায় এল মাধুকর।" (২৩)

চিরবিস্ময়কর রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, কবির প্রাণের সুর, তাঁর লিরিকধর্মী সুর প্রথম আত্মপ্রকাশ করে সন্ধ্যা-সঙ্গীতে। সন্ধ্যা-সঙ্গীতে ২৩টি কবিতা আছে। এই কবিতাসমষ্টির মধ্যে 'বিষ ও সুধা' ব্যতীত অধিকাংশ কবিতাই চন্দননগরের মোরান হাউসে লিখিত। মোরান হাউসে অবস্থানের সময়টাকে কবি নিজে বলেছিলেন, সেটা ছিল তাঁর জীবনে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের যুগ। চন্দন-নগরের এই কবি-ভবনটি সম্বন্ধে ইংরেজ লেখিকা মারজোরি সাইকস বলেনঃ

"It was beautiful place on the bank of the Ganges. He spent long hours watching the beauty of the river, the changing colours

of morning, noon, afternoon and sunset and at night the moon shining on the dark water.

In this happy home, among those beautiful scenes, he wrote the volume called Evening Songs. This book made him famous at once among the Bengali writers of the time." (২৪)

ফরাসী আমলে চন্দননগরের বিভিন্ন পল্লীর নির্বাচক সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

বিবির হাট, ৬৬০, বোড় পশ্চিম ৮৯১, বোড় পূর্ব ১৩০৩, নাড়ুয়া, ৭৬০ গঞ্জ ১০০৪, খলিসানি ৮৮৩, লালবাগান ৮২৭, যুগীপুকুর ১০০৩৬, হাটখোলা পশ্চিম ৫৯৬, হাটখোলা পূর্ব ৬৯২, গোন্দলপাড়া ১৬৭৪, বারাসাত ১৩০৬।

বিভিন্ন দিক হইতে চন্দননগর মহকুমার সংখ্যাতাত্ত্বিক তালিকা এইরূপ:

আয়তন: ১৯৮.৫ বর্গ মাইল (হুগলী জেলার আয়তনের শতকরা ১৬.৪ ভাগ)

লোকসংখ্যা: ৩,২২,৮৮৩ জন (হুগলী জেলার লোকসংখ্যার শতকরা ২০.১ ভাগ)

শহরের সংখ্যা: ৩—চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর ও চাঁপদানি (এই শহরগুলির লোকসংখ্যা ৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে)

ইউনিয়নের সংখ্যা: ২০ (হুগলী জেলায় মোট ইউনিয়নের শতকরা ১৫.৬ ভাগ)

থানার সংখ্যা: ৫—চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, হরিপাল, তারকেশ্বর, সিঙ্গুর

গ্রামের সংখ্যা: ৩৪৪ (হুগলী জেলায় মোট গ্রামের শতকরা ১৮ ভাগ)

জনবসতির ঘনতা: প্রতি বর্গমাইলে ১৬২২ জন

মোট বাড়ির সংখ্যা: ৩৭,৯২৪

ভারতে ফরাসী অধিকৃত স্থানগুলি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গভর্নমেন্ট ভারত সরকারকে উচিত মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য এক প্রস্তাব আনিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কারণ উক্ত স্থানগুলি হইতে তখন তাঁহাদের যে আয় হইত, তাহাতে তাঁহাদের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হইত না। এই সম্বন্ধে ১৭ই এপ্রিল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রে যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য:

It is rumoured in Chandernagore that the French Government have decided to dispose of their possessions in India to the Indian Government at a reasonable price. The cost of administering French India is more than the revenue it yields.

সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রাসু, নৃসিংহ, গোরক্ষনাথ, নিতাই বৈরাগী, নীলমণি পাটনি ও বলরাম কাপালী, পাঁচালী গায়ক চিন্তামালা, নবীন গুঁই, কথক রঘুনাথ শিরোমণি এবং প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা মদন মাষ্টার, ব্রজ অধিকারী ও মহেশ চক্রবর্তী চন্দননগরের অধিবাসী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ও কবি-সঙ্গীত রচয়িতা **নৃসিংহ রায়**—গোন্দলপাড়ায় ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দীনাথ রায় ফরাসী সরকারের সামরিক বিভাগে কার্য করিতেন। পিতৃবিয়োগের পর অভিভাবকহীন হইয়া তিনি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন এবং দাঁড়াকবি দলের সৃষ্টিকর্তা সুবিখ্যাত কবিওয়ালা রঘুনাথের কবির দলে প্রবেশ করেন। তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাসু উভয়ে মিলিয়া একটি কবির

দল সৃষ্টি করেন ও অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁহাদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের শ্রুতিমধুর গানে শ্লেষ এবং ব্যঙ্গোক্তি ছিল কিন্তু কোন অশ্লীলতা ছিল না। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। গানের ভণিতায় রাসু ও নৃসিংহ উভয়ের যুগ্ম নাম দৃষ্ট হয়।

॥ রাসু ও নৃসিংহ ॥

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেনঃ "ইঁহাদের রচিত সুর ও গীত শ্রবণে প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও বিশিষ্ট সন্তান মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি গীত ও সুর রচনায় নিপুণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, দুইজনের মধ্যে একব্যক্তি সুকবি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইঁহারা সখী সংবাদ ও বিরহ গান যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই অতি উৎকৃষ্ট, অতিশয় শ্রুতিসুখকর এবং সর্ববিষয়েই যশোযোগ্য।"

রাসু ও নৃসিংহ দুই সহোদর; ইঁহারা কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নে তাঁহাদের রচিত সখী-সংবাদ ও বিরহ নামক গান উদ্ধৃত হইলঃ

সখী সংবাদ—মহড়া

ইহাই ভাবি হে! গোবিন্দ সঘনে
আঁখি হাসে, পরাণো পোড়ে আগুনে।
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে ত্যজিলে
কুঁজীরে পূজিলে কি গুণে?

চিতেন

জগৎ সংসার ভুলাইতে পার
তোমার বঙ্কিম নয়নে।
ওহে! কুঁজী অবহেলে বসিয়ে বিরলে
তোমারে ভুলালে কি গুণে? ইত্যাদি

বিরহ—মহড়া

কহ সখি! কিছু প্রেমেরি কথা
ঘুচাও আমার মনের ব্যথ।
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো
হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে
প্রীতি প্রয়াগে মুড়াব মাথা।

চিতেন

আমি রসিকেরো স্থানো, পেয়েছি সন্ধানে
তুমি নাকি জানো, প্রেমবারতা।
কাপট্য ত্যজিয়ে, কহ বিবরিয়ে
ইহার লাগিয়ে, এসেছি হেথা। ইত্যাদি

॥ চন্দননগরের চিত্রকলা ও গীতবাদ্য ॥

চিত্রকলা ॥ চিত্রবিদ্যায় খ্যাতিসম্পন্ন সুনিপুণ চিত্রকর চন্দননগরে অনেক জন্মগ্রহণ না করিলেও উল্লেখ করিবার মত কয়েকজনের অভাব নাই। নিম্নে কয়েকজনের নাম উল্লেখ্যঃ

এখানকার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্রকর **বেণীমাধব পাল**। তিনি জাতিতে সূত্রধর ছিলেন। কখন কোন চিত্র-বিদ্যালয়ে বা অন্যত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলেও তাঁহার সুন্দর এবং সুভাবের দেবদেবী বিষয়ক তৈলচিত্র অংকনের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তাঁহার অংকিত দেবদেবী বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় চিত্রাবলী চন্দননগরে, কলিকাতায় ও নিকটবর্তী স্থানের অনেক অনেক ধনাঢ্যের ভবনে এখনও নূতনবৎ দেখিতে পাওয়া যায়। নৈসর্গিক ছবি আঁকিবার পারদর্শিতাও তাঁহার কম ছিল না। প্রতিকৃতি অংকনের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি অনেক দিন মারা গিয়াছেন। এখানকার উর্দিবাজারে তাঁহার চিত্রশালা বাটীটি এখনও আছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় একশত দশ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। তাঁহার পুত্র মতিলাল পালও সুন্দর চিত্র অংকিত করিতে পারিতেন। তিনি কলিকাতায় বাস করিতেন। তিনিও প্রায় নব্বই বৎসরেরও অধিককাল জীবিত ছিলেন।

স্বর্গীয় **বসন্তকুমার মিত্র** এখানকার একজন প্রতিভাবান চিত্রকর। তিনি একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং পুস্তক রচয়িতাও ছিলেন। চিত্রবিদ্যা লাভের জন্য তিনি কখনও বিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়াও একজন বিজ্ঞান সম্মত চিত্রকর ছিলেন। পূর্বোক্ত বেণী পাল মহাশয়ের চিত্রশালাতেই তাঁহার প্রথম শিক্ষালাভ হয়। মানুষের প্রতিকৃতি অংকনেই তাঁহার সর্বাপেক্ষা ক্ষমতা ছিল। অল্প বয়সেই তাঁহার চিত্রবিদ্যায় অনুরাগের ও পারদর্শিতার কথা জানা যায়। তিনি জাষ্টিস্ রমেশচন্দ্র মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্র, রংপুরের মহারাজা গোবিন্দলাল, ম্যাজিষ্ট্রেট্ বিট্সন্ বেল্ প্রভৃতি অনেক বড়লোকের তৈলচিত্র আঁকিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সুবর্ণ পদকাদি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাঁহার অংকিত মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র এখনও কলিকাতা হাইকোর্টে আছে।

বসন্তবাবু নৈসর্গিক ও অন্যান্য বিষয়ের চিত্রও খুব আঁকিতে পারিতেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতের গ্লাসগো শিল্পপ্রদর্শনীতে তাঁহার অংকিত একখানি চিত্রই বাংলার মধ্যে একমাত্র পুরস্কার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল। ইহা তাঁহার কম কৃতিত্বের কথা নহে। তাঁহার এরূপ ক্ষমতা ছিল, যে তিনি এক পরিচিত মৃত ব্যক্তির একখানি যথাযথ প্রতিকৃতি আঁকিয়াছিলেন। ফটোগ্রাফিতেও তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল।

আশুতোষ মিত্র—চিত্রবিদ্যায় ইঁহার অনুরাগ অল্প বয়স হইতেই ছিল। ইনি ৯।১০ বৎসর বয়সে প্রথম বেণী পাল মহাশয়ের কাছে শিক্ষার্থ যাইতেন। ইন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছেও সময় সময় শিক্ষা পাইতেন। মানুষের প্রতিকৃতির তৈলচিত্র ভালরূপ অংকনের ক্ষমতা থাকিলেও প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে জলের রংয়ে ও কালী-কলমে প্রতিকৃতি অংকনই ইঁহার বিশেষত্ব। প্রাকৃতিক দৃশ্য বা কোন লোককে দেখিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে তাহার যথাযথ ছবি আঁকিবার ক্ষমতা ইঁহার মত অল্প লোকেরই দেখা যায়।

গভর্ণমেণ্ট স্কুলে তিনি ড্রইংয়ের শিক্ষক ছিলেন, পরে পেন্সন পান। তিনিও স্মৃতি

হইতে ঠিকমত প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতেন এবং মৃত ব্যক্তির এরূপ ছবি আঁকিয়াছেন। আশুবাবু তাঁহার একত্রিংশৎ বৎসর বয়সে সামান্য সাংসারিক কারণে একবার কয়েক দিনের জন্য খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বধর্মে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী বিয়োগের পর ৩৯ বৎসর বয়সে কিছু অভিনব প্রকারে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ,, তাহাও তাঁহার জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে বহুদিন শিক্ষকতা করিয়া পেন্সন পান। চিত্র বিদ্যায় ইনিও একজন পারদর্শী ব্যক্তি, কিন্তু ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানের কাজেই সিদ্ধহস্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

পরেশনাথ সেন,—ইনি একজন উচ্চদরের চিত্রকর। প্রতিকৃতি, নৈসর্গিক ও অন্যান্য তৈলচিত্র অংকনে তাঁহার সমকক্ষ এক্ষণে এখানে কেহ নাই। তাঁহার অঙ্কিত বহু সুন্দর চিত্র কলিকাতার ঠাকুর মহাশয়দের বাটিতে আছে। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে তাঁহার অঙ্কিত মহারাণী ভিক্টোরিয়া'র উর্দু-শিক্ষক আলিগড় কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্যার সৈয়দ খাঁ বাহাদুরের একখানি ছবি আছে। উহা লর্ড কার্জনের আদেশ মত গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল হইতে তথায় রক্ষিত হয়। একসময় ছোট লাট স্যার জন উড্‌বরন কলিকাতা আর্টস্কুলের প্রদর্শনী হইতে পরেশবাবুর অনেকগুলি ছবি ক্রয় করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। পর বৎসর মহারাজা টিপারা-পুরস্কার ও বিশেষ বৃত্তি পান। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও অনেক পারিতোষিক ও পদক পাইয়াছেন। তিনি প্রথম ৩ বৎসর সরকারি আর্ট স্কুলে চাকুরি করিয়াছিলেন। পরে সে কার্য ত্যাগ করিয়া কতিপয় ইংরাজি বিদ্যালয়ে ও কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বংগ মহিলাকে চিত্র বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। ফটোগ্রাফিতেও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল।

দ্বিজপদ চৌধুরী—ইনি সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের বংশধর। ইনি একজন সুনিপুণ চিত্রকর ছিলেন। প্রকৃতি হইতে ও প্রতিকৃতি উভয় বিষয় অংকনেই দক্ষ ছিলেন। উন্মাদ রোগগ্রস্ত হওয়ায় শেষে পাগলা গারদে তাহার মৃত্যু হয়।

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—প্রতিকৃতি ও অন্যান্য তৈলচিত্র অংকনে ইঁহার ক্ষমতা আছে এবং ফটোগ্রাফিতেও ইনি সুদক্ষ। শেষোক্ত কার্যই অধিক করিয়া থাকেন। নিজ বাটীতেই তাঁহার ষ্টুডিও ছিল।

অনুকূলপ্রসাদ সরকার—প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি ও অন্যান্য তৈলচিত্র অংকনে ইঁহার বেশ ক্ষমতা আছে। ইনি প্রথম আশুতোষ মিত্র মহাশয়ের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে রামপুর ষ্টেটে চিত্রকরের কার্য করেন। পূর্বে কলিকাতায় ষ্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটারের দৃশ্যপট অংকনের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতার আর্ট গ্যালারিতে ইঁহার অঙ্কিত চিত্র আছে।

বিনয়কুমার দত্ত—চিত্রাংকন ইঁহার পেশা নহে, সখ করিয়া ছবি আঁকিয়া থাকেন। জলের রংয়ে নৈসর্গিক চিত্র অতি সুন্দররূপে ইনি অঙ্কিত করিতে পারেন। ইনি বি-এস্‌-সি পাশ করিয়া বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে কার্য করেন।

রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, তুলসীদাস গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও কতিপয় সখের চিত্রকর এবং আশুতোষ দাস, শরৎচন্দ্র ঘোষ, চিত্রশিল্পী আশুবাবুর পুত্র রাসবিহারী মিত্র ও সুধীরলাল চট্টোপাধ্যায়ের নামও এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। ইঁহারা উচ্চাঙ্গের চিত্রকর না হইলেও চিত্রাঙ্কনে ক্ষমতাবিশিষ্ট।

রাজেন্দ্রবাবু ভিন্ন এক্ষণে আর যে সকল ফটোগ্রাফার আছেন তন্মধ্যে বিনোদবিহারী ভড়, গদাধর দত্ত, গৌরগোপাল কুন্ডু ও দেবনারায়ণ কর্মকারের নাম উল্লেখযোগ্য। গদাধরবাবু তাঁহার কার্যের পুরস্কারস্বরূপ ফরাসী ভারতের গভর্ণর বাহাদুরের নিকট হইতে একখানি প্রশংসাপত্র এবং অন্যত্র হইতে পদকাদি পাইয়াছেন। সিটি ফটোগ্রাফার্স নামে তাঁহার ষ্টুডিও ছিল। শরৎচন্দ্র ঘোষও একজন ভাল ফটোগ্রাফার ছিলেন।

গীতবাদ্য ॥ সঙ্গীতের চর্চা চন্দননগরে বহুকাল হইতেই শুনা যায়। পূর্বে এখানে অনেক ভাল ভাল গায়ক ও সঙ্গীত-রসজ্ঞের বাস ছিল। কতিপয় বঙ্গবিশ্রুত কবি ও যাত্রাওয়ালার এই স্থানে আবাস ছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক গায়কদিগের মধ্যে **মধুবাবুর** (মধুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) নামই বৃদ্ধ লোকদের মুখে শুনা যায়। তিনি একজন দেশবিখ্যাত টপ্পা গায়ক ছিলেন। নিধুবাবুর ন্যায় মধুবাবুর টপ্পা এক সময়ে গায়ক সমাজে একটি প্রচলিত কথা ছিল। তিনি একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ সুললিত গান গাহিবার ক্ষমতা ছিল যে কথিত আছে একদিন স্থানীয় মুখোপাধ্যায় বংশের জনৈক ভদ্রলোকের সহিত কোন তর্কের পর, তাঁহার কথায় মধুবাবু তাঁহার গানের দ্বারা একটি মৃগকে মুগ্ধ করিয়া সমবেত সকলকে আশ্চর্য করিয়াছিলেন। গোন্দলপাড়ায় তাঁহার বাসগৃহের ধ্বংশাবশেষ মাত্র এখন দেখা যায়।

মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় যিনি মদন মাষ্টার নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি যাত্রাদলের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বিখ্যাত হইলেও, গীতবাদ্যে ও পালা রচনায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রথম একটি অবৈতনিক যাত্রার দল করিয়াছিলেন।

বসন্তলাল মিত্র চন্দননগরের একজন প্রতিভাবান সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ গায়ক প্রাণকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের পুত্র। সঙ্গীত বিষয়ে উন্নতির জন্য তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। তাঁহার উদ্যোগে রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগীতায় নকুড়চন্দ্র কর মহাশয়ের বাগবাজারস্থ উদ্যান ভবনে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চুঁচুড়ার খাতনামা সাহিত্যিক সুরসিক স্বর্গীয় দীননাথ ধর মহাশয় ইহার একজন সহায়ক ছিলেন। উহা কয়েক বৎসর থাকিয়া উঠিয়া যায়। পরে রাজারামবাবুর চেষ্টায় অন্যত্র স্থাপিত হইয়াছিল। সঙ্গীত শাস্ত্রের লুপ্তপ্রায় গ্রন্থসকলের অনুসন্ধান ও উদ্ধার সাধন বিষয়ে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। মাদ্রাজ হইতে **"সঙ্গীত পারিজাত"** কাশ্মীর হইতে **"রত্নাকর"** নামক দুইখানি সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া তিনি বিশেষ পরিশ্রমসহকারে উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ ও সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়দ্বয় দ্বারা পুস্তক দুইখানি সম্পাদিত হয়। **"গান্ধর্ব সংহিতা"** নামে আর একখানি সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রথম খন্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন। "নর্ত্তক নির্ণয়" নামক দেবনাগরি অক্ষরে হস্ত লিখিত একখানি

পুঁথি তিনি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। **"বিবাহ বা উদ্বাহতত্ত্বের গূঢ় রহস্য"** নামে তিনি আর একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন।

তিনি কলিকাতার 'ভারত সঙ্গীত সমাজের' একজন সভ্য ছিলেন এবং সঙ্গীত মিত্রালয় সভার সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন। রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই সভার সভাপতি ছিলেন। কি চিত্র বিদ্যায় কি সঙ্গীতে তিনি একজন যথার্থ বহুগুণসম্পন্ন শিল্পী ছিলেন।

রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস ঠিক চন্দননগরের ভিতরে না হইলেও চন্দননগরই তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল। তিনিও একজন সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বসন্তবাবুর প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম শিক্ষক ছিলেন। তিনি সঙ্গীত শিক্ষাকার্যেই বিশেষ রত থাকিতেন এবং গায়ক অপেক্ষা সঙ্গীত শিক্ষক বলিয়াই তাঁহার নাম অধিক ছিল। চন্দননগরে তাঁহার কতিপয় শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রফুল্লনাথ অধিকারী—ইনি রাজারামবাবুর প্রতিবেশী ও শিষ্য ছিলেন। তিনি খ্যাতনামা কথক তমালচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের পুত্র। তিনিও এখানে একজন গায়ক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কতিপয় যুবকের সহিত মিলিত হইয়া প্রফুল্লবাবু 'চন্দননগর সঙ্গীত সমাজ' নামক একটি সখের অপেরার দল গঠিত করিয়াছিলেন। অভিনয়েও ইহার কৃতিত্ব ছিল। গীতবাদ্যপ্রিয় যুবক সমাজে ইঁহার প্রতিপত্তি কম ছিল না। অল্প বয়সেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন॥

বলাইচরণ পাল নামক একজন উদীয়মান যুবক সঙ্গীতে বেশ উন্নতি লাভ করিতেছিলেন তিনিও মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন।

গোন্দলপাড়া নিবাসী **রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** একজন ভাল গায়ক ছিলেন। তিনি সুবিখ্যাত কথক রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র। টপ্প গানে তাঁহার সমতুল্য তৎকালে এ প্রদেশে কেহ ছিল না। তিনি কথকতাও করিতেন। তাঁহার পুত্র অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় একজন ভাল টপ্পা গায়ক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

রামেশ্বর ঘোষাল খেয়ালের একজন সুদক্ষ গায়ক ছিলেন। তিনিও যুবকদিগের সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন।

স্বর্গীয় বসন্তবাবুর পুত্র **মণিগোপাল মিত্র** একজন ভাল গায়ক বলিয়া খ্যাতিপন্ন হন। তাঁহার প্রধান বিষয় ধ্রুপদ। তিনি কতিপয় যুবককে গান শিখাইতেন।

এখানে গান বাজনার যখন একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তখন ভাল ভাল বাদকও যে অনেক আবির্ভূত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। শতাধিক বৎসর পূর্বে নিতাইদাসের কবির দলে মোহন নামে একজন ভাল ঢুলির নাম পাওয়া যায়। তৎপরে ঢোল বাদকদের মধ্যে মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী, নবীনচন্দ্র গুঁই, রামকুমার মাইতি ও সনাতনের নাম প্রসিদ্ধ। এই প্রথমোক্ত দুইজন মদন মাষ্টারের যাত্রার দল হইতে বাহির হইয়া যখন নিজেদের দল করেন তাহাতে ঢোল বাজাইতেন। বৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডুগি তবলায় প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি মধুবাবুর সহিত সঙ্গত করিতেন। পাখোয়াজ বাজিয়ের মধ্যে ঠাকুরদাস অধিকারী, দেবী

ঘোষ ও চন্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নামই বিশেষরূপে শুনা যায়। পীতাম্বর সর্দার ও উহার শিষ্য গুণমণি কর্মকার বেহালায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। গুণমণি একজন খুব নামজাদা লৌহকার ছিলেন। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন ভাল সেতারবাদক ছিলেন।

ইহা ছাড়া বসন্তবাবুর সহোদর শিবকৃষ্ণ মিত্র, দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের বংশধর গঙ্গাধর চৌধুরী ও কলিকাতার সুবিখ্যাত মৃদঙ্গবিশারদ দীননাথ হাজরার দৌহিত্র বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়দিগকে ভাল মৃদঙ্গবাদক বলিতে পারা যায়। তারিণীচরণ ভট্টাচার্য ও তাঁহার ভ্রাতা আদ্যনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ও ভাল বাদক। তারিণীবাবু ডুগি-তবলায় এবং আদ্যনাথবাবু হারমোনিয়মে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। (২৫)

॥ প্রবর্তক সঙ্ঘ ॥

হুগলী জেলার গৌরব প্রবর্তক সঙ্ঘ আজ বাংলা তথা নিখিল ভারতে সুপরিচিত। লোক-সেবায়তন বা ধর্ম প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রবর্তক সঙ্ঘ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া নিষ্কাম সংগঠনমূলক কর্মবৈচিত্র্যে ও স্বাবলম্বনের সাধনায় প্রবর্তক সঙ্ঘকে অগ্রণী বলা যাইতে পারে।

এই প্রতিষ্ঠান একটি যুগোপযোগী সামগ্রিক ভাবের বিকাশ। এই ভাবের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা শ্রীমতিলাল রায়। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্বে লিখিত হইয়াছে। এই রায় পরিবার চৌহান বংশীয় ছেত্রী রাজপুত। মতিলালের পিতামহ গোলকচন্দ্র রায় যুক্তপ্রদেশের ময়নাপুর জেলা হইতে প্রথম বাংলায় আসিয়া ফরাসডাঙ্গায় বসতি স্থাপন করেন। গোলক রায়ের পুত্র বিহারীলাল। বিহারীলালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমতিলাল রায়।

তিনি ১৫ বৎসর বয়সে চুঁচুড়ার সমগোত্রীয় •হরিনারায়ণ সিংহের নবম বর্ষীয় কন্যা **রাধারাণী দেবীর** পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর একটিমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া এক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনা তাঁর দাম্পত্য জীবনের পুনশ্চ মোড় পরিবর্তন করিয়া স্বল্পস্থায়ী প্রাকৃত ভোগ-জীবনের অবসান আনে। তিনি পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করেন। সাধ্বী পত্নীও স্বেচ্ছায় সম্মতিদান করেন এবং অকুণ্ঠচিত্তে আমরণ নারী জীবনেব সকল সাধ-আহ্লাদ, ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়া পতির ব্রত পূরণে সহায়তা করেন। যৌবনে যোগিনী সাজিয়া চিরতপস্বিনী এই নারী স্বামীর সহধর্মিণী-রূপে শুধু নিজের জীবন নয়, পতিদেবতার জীবনও পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ পবিত্রতা ও সংযমের বিগ্রহরূপিণী মহাশক্তির আধার রাধারাণী দেবীর দিব্য মাতৃত্বের মহিমা একদল সর্বোৎসর্গীকৃত সন্তানগোষ্ঠীকে অপূর্যমান স্নেহে লালনপালনের মধ্য দিয়া মণ্ডলীবদ্ধ করিয়া সঙ্ঘের জন্ম ও পুষ্টি দান করে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পর-লোক গমন করেন।

সঙ্ঘের তত্ত্ব আদর্শ ও লক্ষ্য

এই সঙ্ঘের সৃষ্টি কোন পূর্ব-পরিকল্পনাপ্রসূত নয়। বুদ্ধির অপেক্ষা 'বোধ'-এর অনুগামী হইয়া সঙ্ঘের সৃজনধারা বিকশিত। সঙ্ঘের সাধনা **আত্মসমর্পণ যোগ**। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমাহার এই যোগে। ভারতের শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়ের উপর সঙ্ঘের সাধনা

প্রতিষ্ঠিত। উহারই প্রতীক গুরু, মন্ত্র, প্রতিমা সাধনার আশ্রয়। প্রাচীন বৈদিক ভারতের যে ভাগবৎ জীবনবাদ বুদ্ধোত্তর যুগের ইহবিমুখ নৈষ্কর্ম ও নির্বাণবাদের আওতায় ম্লান হইয়া পড়ে, তাহাই পুনশ্চ পরাধীন ভারতের পৌরাণিক যুগে মোক্ষবাদে রূপান্তর লাভ করিয়া এ জাতিকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। এই ত্যাগ বৈরাগ্যের ও উৎসর্গের মুখ ফিরাইয়া এবং ধর্মবিষয়ক গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন করিয়া প্রবর্তক সংঘ এক বীর্যবন্ত পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব ও ভারতীয় মৌলিক দর্শনের উপর এ জাতির বনিয়াদ রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ। অন্তরে সর্বব্যাপক চৈতন্যময় বিশ্বাত্মার ভৌম সত্তার অনুভব এবং বাহিরে তাঁরই লীলাবৈচিত্র্য-দর্শন। এই পরিপূর্ণ ভাগবৎ চেতনার উপর সংঘের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের প্রতিষ্ঠা এবং ভাগবৎ কেন্দ্রের আনুগত্য প্রেম ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সাধনা সংঘের সাধক-সাধিকাগণ করিয়া চলিয়াছে।

প্রবর্তক সংঘ এই সমুচ্চ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া দীর্ঘদিন পথ চলিয়াছে: ইহা ধর্ম-প্রতিষ্ঠান। ধর্ম-জীবনের সর্বাঙ্গীন অখণ্ড প্রকাশ, তাই বিশুদ্ধ ভাগবৎ জীবনই ধর্মের মূর্তি। এইরূপ জীবন শুধু স্বার্থকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত জীবন নয়, পরন্তু নিষ্কাম সমষ্টি-গত তথা জাতিগত জীবন। প্রবর্তক সংঘের অভিনবত্ব এইখানে যে, সংঘ কর্ম ও পরি-বেশকে পরিবর্জনপূর্বক জীবনকে নিষ্কর্ম ও পঙ্গু করিতে চাহে না। ত্যাগ কর্ম বা বস্তু নয়—কর্মফল বা কর্মাসক্তি এবং বিষয়-লিপ্ততা। সংঘজীবনে আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম সাধনা। সংঘ সাধনা করিতে গিয়া যে বিশ্বজোড়া বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়িয়া তুলিযাছে তাহাও ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অভূতপূর্ব। সর্বপ্রকার ভোগক্ষেত্র হইতে দূরে পলাইয়া নয়, আকণ্ঠ ভোগ-উপকরণের মধ্যে থাকিয়াও আত্মজীবনে নিষ্কাম, নিরাসক্তি ও ও অসংগ্রহের সাধনা কবিযা সংঘ-সভ্যেরা চলিয়াছে। শিক্ষা, অর্থ, ধর্ম, সমাজ—জাতীয় জীবন-বিকাশের সর্বক্ষেত্রেই সংঘ যে সৃষ্টির শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছে তাহা স্বাধীন ভারতের স্বকীয় জাতীয়তারই পুষ্টিবিধান করিতেছে। এইখানেই প্রবর্তক সংঘের বৈশিষ্ট্য এবং এই সৃষ্টিকরী বিশিষ্টতা সংঘকে সমগ্র অতীত ও বর্তমানের ধর্ম-সংস্থাসমূহের অগ্রণী ও দিকদর্শক হিসাবে যুগচিহ্নিত করিয়াছে।

সংঘের আদর্শ ও লক্ষ্যঃ প্রেম ও ঐক্য মন্ত্রে সিদ্ধ জাতি গঠন। ভাগবৎ চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের মধ্যে প্রেম ও ঐক্যের সংহতি গঠন। এই আদর্শ লক্ষ্যে রাখিয়া দেশ ও জাতির অর্থনীতিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান। স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র সত্ত্বেও উৎসর্গীকৃত নারী-পুরুষের এখানে সর্ববিষয়ে সমানাধিকার। সংঘে দাবী নাই, আছে সেবা ও সমর্পণ।

অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব প্রবর্তক সংঘেরই জন্মোৎসব বলা চলে এইজন্য যে, এই পুণ্য তিথিতেই প্রথম প্রবর্তক সংঘের বীজাঙ্কুর হয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া এই উৎসব চন্দননগর সংঘের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

অক্ষয় তৃতীয়া হইতে বৌদ্ধ পূর্ণিমা পর্যন্ত ত্রয়োদশ দিবস প্রদর্শনী ক্ষেত্রে স্বদেশী শিল্পের প্রচার, মূর্তিতে, প্রাচীর-চিত্রে ও লেখনীতে এবং মনীষিবর্গের বক্তৃতায় জাতীয়

কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জীবন-বিকাশের আলেখ্য দেশ ও দশের সামনে পরিবেশিত হইয়া থাকে। এই ধরনের শিক্ষাপ্রদ উৎসব ও প্রদর্শনীর প্রবর্তক, প্রবর্তক সংঘকে বলা যায়।

সংঘের স্বাবলম্বন সাধনার অত্যন্ত ক্ষুদ্রারম্ভ আজ বিচিত্র ও ব্যাপক অর্থ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। মুষ্টিমেয় সংঘ-সন্তান ভিক্ষা বা দানের অর্থে দেশ-সেবা শ্রেয়ঃ না করিয়া স্বীয় প্রতিভা ও শ্রমকে অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। প্রবর্তক পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া প্রথম মুদ্রণ প্রেসের সৃষ্টি। তারপর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সংঘগুরু ৯, সুদে একলক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন কিন্তু বৈষয়িক অনভিজ্ঞতার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই ঋণকৃত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু সংঘের খাঁটি বিশ্বাসের মানুষ যারা, তাদের শ্রম, শক্তি ও সহযোগিতায় সংঘ এই ঋণ মুক্ত হয়।

সংঘের এই অর্থ সাধনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা আসে বৃটিশ ও ফরাসী গভর্ন-মেন্টের তরফ হইতে। ঈশ্বরেচ্ছায় এই বিঘ্ন আশীর্বাদের মতই হয়। অলক্ষ্যে এক তৃতীয় শক্তি সংঘের কর্মক্ষেত্র স্বল্পপরিসর চন্দননগর হইতে বৃহত্তর মহানগরী কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিতে যেন বাধ্য করে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে একমাত্র তৃতীয় শক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় প্রবর্তক ব্যাঙ্কের সৃষ্টি। ব্যাঙ্ককে মধ্যমণি করিয়া অতঃপর বিবিধ ব্যবসার প্রসার ঘটে। এই সময়ে ব্যক্তিগত উদ্যমকে ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত করিয়া বিভিন্ন অর্থ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংঘগত করা হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তক ট্রাস্ট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা। সংঘের প্রতিষ্ঠাতৃ সভ্যগণ কর্তৃক মনোনীত একটি ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক এই সব অর্থ-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত। ইহার মূল কেন্দ্র-অফিস ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (বর্তমানে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট) কলিকাতা।

সংঘের অর্থ প্রতিষ্ঠানসমূহঃ প্রবর্তক ট্রাষ্ট লিমিটেড্, প্রবর্তক জুট মিলস্ লিমিটেড, প্রবর্তক ফার্ণিশার্স লিমিটেড, প্রবর্তক কমার্সিয়াল করপোরেশন লিঃ, প্রবর্তক প্রিণ্টিং এণ্ড হাফটোন লিঃ, প্রবর্তক পাবলিশার্স, প্রবর্তক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, প্রবর্তক কৃষি বিভাগ, প্রবর্তক খাদি বিভাগ, প্রবর্তক কুটির শিল্প বিভাগ, নব-সংঘ প্রেস, আর-ডি-জি (ক্যাবিনেট মেকার্স)। সংঘের মুখপত্র হিসাবে মাসিক 'প্রবর্তক 'ও সাপ্তাহিক 'নব-সংঘ' ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এখন প্রবর্তকের সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ও নবসংঘের সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত।

॥ কার্তিক-গণেশ পূজা ॥

চন্দননগরে সরিষাপাড়া চৌমাথায় বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রায় শতাধিক বর্ষের পুরাতন কার্তিক-গণেশের একত্রে সার্বজনীন ভিত্তিতে পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। কার্তিক-গণেশের এইরূপ একত্রে পূজা পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও হয় না। কার্তিক মাসে এই পূজা হয় এবং তদুপলক্ষে এই স্থানে বহু লোকের সমাগম হয়।

॥ সংকেত সূত্র ॥

১ Hooghly Past and Present By Shumbhoo Chunder Dey
২ Calcutta Past and Present
৩ La Mission du Bengale Occidental, Vol I.
৪ History of the French in India.
৫ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (প্রবর্তক, ফাল্গুন ১৩২৮)
৬ A Journal (1811 till the year 1825) By Maria Lady Nugent.
৭ Survey Map 1751-52.
৮ Heber's Journey through the Provinces of India,
৯ পুরাতন দলিল—হরিহর শেঠ (প্রদীপ, ভাদ্র ১৩১১)
১০ The Good old days of Honourable John Company.
১১ A Gazetteer of the world.
১২ প্রজাবন্ধু (২৩ ফাল্গুন ১২৮৯)
১৩ La Compagnic Faancaise des India.
১৪ কানাইলাল—মতিলাল রায় ও মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই—সুধীরকুমার মিত্র
১৫ Adam's Report on Vernacular Education in Bengal
১৬ রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর—হরিহর শেঠ
১৭ বঙ্গবাণী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮ বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কার্যবিবরণী
১৯ ছিন্নপত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২০ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—রানী চন্দ
২১ রবীন্দ্র জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায
২২ ছেলেবেলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৩ খাপছাড়া—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৪ Story of Rabindranath Tagore By Marjorie Sykes.
২৫ চন্দননগরের চিত্রকলা ও গীতবাদ্য—হরিহর শেঠ (প্রবর্তক, কার্তিক ১৩৩১)

ভদ্রেশ্বর থানার সার্ভে-ম্যাপ

[১৯৩০-৩৩]
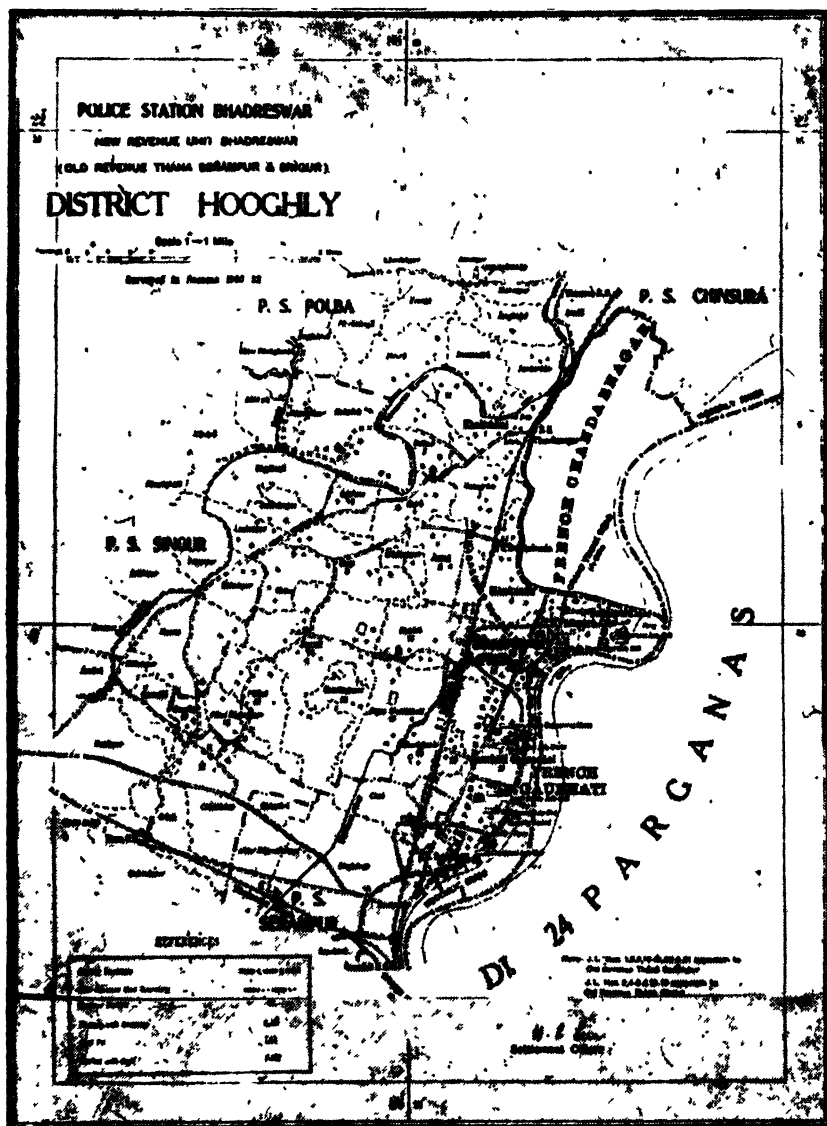
॥ ভদ্রেশ্বর ॥

শিল্পসমৃদ্ধ **ভদ্রেশ্বর** একটি প্রাচীন স্থান; ভদ্রেশ্বরনাথ শিবলিঙ্গ হইতে এই অঞ্চল ভদ্রেশ্বর বলিয়া প্রখ্যাত হয়। 'বুদেসী' নামেও এই স্থানের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের কবিতায় ভদ্রেশ্বরের নাম উল্লিখিত আছে; ভদ্রেশ্বর দেবের উৎপত্তির বিবরণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; জনসাধারণের ধারণা যে, ইনি কাশীর বিশ্বেশ্বর ও দেওঘরের বৈদ্যনাথ-দেবের ন্যায় স্বয়ম্ভূ। এই স্থান কলিকাতা হইতে আঠার মাইল দূরে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র শহর চন্দননগর মহকুমার অন্তর্গত। ইহা অক্ষাংশ ২২°৫৩´ উত্তর ও ৮৮·২১´ পূর্বে অবস্থিত। এই শহরের উত্তরে চন্দননগর দক্ষিণে চাঁপদানী, পূর্বে ভাগীরথী ও পশ্চিমে ইস্টার্ন রেলওয়ে লাইন। ভদ্রেশ্বর ও মানকুণ্ডু এই দুইটি স্টেশন শহরে আছে।

Bhadreswar is an old place, being mentioned in the poem of Bipra Das (1495 A. D.) and shown in the Pilot Chart of 1703 as Buddesy. (Hooghly District Gazetteers.)

সংস্কৃত শিক্ষার চর্চা ও ব্যবসায়াদির জন্য এই স্থান অতীত কাল হইতে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। অ্যাডম সাহেব ১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতে এই স্থানে দশটি চতুষ্পাঠী ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের পাদরি উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁহার পুস্তক *A view of the History, Literature and Mythology of the Hindoos*-এ নদীয়া, কাশী, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল চতুষ্পাঠী ছিল, তাহার বিবরণ ও অধ্যাপকবৃন্দের নাম দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন ঃ "ভদ্রেশ্বরে ৮টি ন্যায়-চতুষ্পাঠী আছে।"

কালনা হইতে কলিকাতা পর্যন্ত স্থানের মধ্যে ভদ্রেশ্বরের ন্যায় বড় গঞ্জ পূর্বে আর কোথাও ছিল না। ভদ্রেশ্বরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ত্রিশ-চল্লিশ মাইলের সকল ধান ও চাউল এই স্থান হইতে সরবরাহ হইত। এ ছাড়া জায়গাটি পূর্বে পাটজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়-কেন্দ্র হিসাবেও প্রসিদ্ধ ছিল। এই সম্বন্ধে হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখিত আছেঃ

In old days Bhadreswar was a great mart, serving Calcutta and the surrounding country within a radius of 20 miles.

ভদ্রেশ্বরের উত্তরে ফরাসী সীমানার যে গড় আছে, উহা পূর্বে ফরাসীদের অধিকারে ছিল না, ইংরাজদের অধিকারে ছিল। বর্তমান ভদ্রেশ্বরের অন্তর্গত কৃষ্ণপটি গ্রাম পূর্বে ফরাসীদের অধিকারে ছিল। ইংরাজ ও ফরাসীদের সীমানা বক্রভাবে ছিল বলিয়া তাঁহারা পরস্পরের সম্মতিক্রমে গড়টি সোজা করিয়া লন, ফলে কৃষ্ণপটি গ্রাম ইংরাজদের হইয়া যায়। এই কৃষ্ণপটি গ্রামে ফরাসীদের তেলেঙ্গী সৈন্য থাকিত বলিয়া এই অঞ্চল তেলেঙ্গীপাড়া বলিয়া প্রখ্যাত হয়: পরবর্তীকালে তেলেঙ্গীপাড়ার অপভ্রংশ হিসাবে এই পাড়া **তেলেনীপাড়ায়** পরিণত হয়।

ভদ্রেশ্বরের ইতিকথা ঘটনাবহুল। কলিকাতার আশেপাশে গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে বিদেশী বণিক সম্প্রদায় হুগলী জেলায় যে সব শহরের পত্তন করিয়াছিল, ইহা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। পল্লীর শান্ত ও নিস্তব্ধ পরিবেশ ইঙ্গ-ফরাসীর দ্বৈতভূমিকায় শিল্প মুখর অঞ্চলে রূপান্তরিত হয় এবং ব্যবসাজগতে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই ইঙ্গ-ফরাসী দ্বৈতভূমিকার সমন্বয়কেন্দ্রে সাম্রাজ্যবাদের আগমন, জাতীয়তাবাদের উত্থান ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শ্রমশিল্প-বিধৃত অঞ্চলটি নিজস্ব ঐতিহ্যে গড়িয়া উঠে। বিদেশী উপনিবেশের স্কেচ ম্যাপ ১০৫৭ পৃষ্ঠায় আছে।

ভদ্রেশ্বর সম্বন্ধে ওম্যালী সাহেব লিখিয়াছেন যে দুরারোগ্য ব্যাধি ও মনস্কামনা পূরণের জন্য ভদ্রেশ্বরনাথের নিকট নারীগণই এই স্থানে অধিক সংখ্যায় আসিয়া থাকেন। শিবরাত্রি, বারুণি ও পৌষ-সংক্রান্তির সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

The shrine is largely frequented, chiefly by females,in the hope of obtaining cure from illness or the attainment of some cherished wish.

মুসলমান রাজত্বকালে যে সকল ইউরোপীয় জাতি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এই দেশে আসিয়াছিল, দিনেমারগণ তাহাদের অন্যতম। শ্রীরামপুরে কুঠি নির্মাণ করিবার পূর্বে ফরাসী সীমানার গড়ের নিকট তাঁহারা একটি স্থান অধিকার করে। কালক্রমে ইংরাজ ও ফরাসীদের সহিত ব্যবসায় পাল্লা দিতে না পারায়, তাহারাও ভারতে বসবাস করা পরে বন্ধ করিয়া দেয়।

১৭২৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের সনন্দ লইয়া জার্মান সম্রাটের অধীন বেলজিয়ামের কতকগুলি বণিক হুগলীর নিকটে বাঁকিবাজারে (ভাগীরথীর অপর পারে) একটি কুঠি স্থাপন করেন।

ভদ্রেশ্বরে দিনেমারগণ প্রথম কুঠি নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান অদ্যাপি দিনেমারডাঙ্গা বলিয়া খ্যাত। জার্মানগণ "ইস্টার্ন জার্মান প্রসিয়ান কোম্পানী" নাম দিয়া এই দেশে যখন ব্যবসা করিতেন, তখন পূর্বোক্ত দিনেমারডাঙ্গার পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে কুঠি নির্মাণ করিয়া তাহারা অবস্থান করিত। চতুর ইংরাজ-বণিকগণের চক্রান্তে জার্মান ব্যবসায়িগণ নবাবের বিষ-নজরে পড়ায়, ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা বিতাড়িত হন। জার্মান ও অস্ট্রিয়ান জাতি এই স্থানে কুঠি নির্মাণ করিয়া পূর্বে ব্যবসায়াদি করিত।

অস্টেন্ড কোম্পানীর বণিকগণ অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা অল্পমূল্যে জিনিসপত্র বিক্রয় করিত বলিয়া তাহাদের ব্যবসা বাংলাদেশে খুব প্রসার লাভ করে। সেই-জন্য অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া, তাঁহারা যাহাতে আর সনন্দ না পান, তদ্বিষয়ে বহু প্রকার চেষ্টা করেন; কিন্তু চতুর নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় বাণিজ্য বাংলাদেশের মঙ্গল জানিয়া, অস্টেন্ড কোম্পানীকে কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন।

The Prussians established a factory a short distance south of Chandernagore. Their venture was short-lived, for they could not withstand the hostility of the other European Companies on whom, moreover, they were dependent for pilotage through the dangerous shoals of the Hooghly river and by 1760 the Company was wound up. —History of Bengal, Bihar & Orissa under British Rule. L. S. S. O' Malley.

ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকগণ একযোগে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ কামনায় কয়েকখানি যুদ্ধ-জাহাজ নিযুক্ত করেন এবং জার্মানদের একখানি মালবোঝাই জাহাজও তাঁহারা অধিকার করিয়া লন।

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে পীর খাঁ কালোয়াৎ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন; তাঁহাকে ইউরোপীয়, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকগণ উৎকোচে বশীভূত করিয়া ফেলেন এবং তিনি রাজকীয় প্রধান বন্দর হুগলীর এত নিকটে অস্টেন্ড কোম্পানীর দুর্গ নির্মাণের এক অতিরঞ্জিত সংবাদ নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাতে অস্টেন্ড কোম্পানীর সহিত হুগলীর ফৌজদারের বিবাদের সূত্রপাত হয়। জার্মানিগণ সেইজন্য গঙ্গায় নবাবের নৌকা যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেয়।

অস্টেন্ড কোম্পানীকে সায়েস্তা করিবার জন্য নায়েব ফৌজদার মীরজাফরের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। মীরজাফর দুর্গ অধিকার অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তাহাদের কুঠির সম্মুখে গড়বন্দী করিয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন। ফরাসিগণ এদিকে গোলা-বারুদ দিয়া অস্টেন্ড কোম্পানীকে সাহায্য করিবার ভান করিয়া শেষ পর্যন্ত যখন কিছুই করিল না, তখন খাদ্যাভাবে তাহারা মহাবিপদে পড়িল; বাহির হইবার কোন উপায় করিতে না পারিয়া, তাহারা ভিতর হইতে কামান চালাইতে লাগিল। দেশীয় সৈন্যগণ খাদ্যাভাবে পালাইতে লাগিল; কিন্তু তেরজন জার্মান বণিক সুকৌশলে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের অধ্যক্ষের হাতে গোলা লাগায়, তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইয়া রাত্রে পলায়ন করেন এবং মীরজাফর তাঁহাদের দুর্গ অধিকার করিয়া পরে তাহা ভূমিস্মাৎ করিয়া দেন। জার্মানদের বাংলাদেশে ব্যবসায় চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়।

॥ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ॥

তেলিনীপাড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ; বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই এই বংশের উন্নতি হয়। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির এই অঞ্চলের একটি দর্শনীয় জিনিস। নয়টি চূড়াবিশিষ্ট এইরূপ বিরাট মন্দির একমাত্র মহানাদ ও বাক্‌সা ব্যতীত অন্যত্র আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্তমানে সংস্কারাভাবে মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; দেবসেবা পালাক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ সুচারুরূপে করিয়া থাকেন।

দশশালা বন্দোবস্তের পর হইতে বন্দ্যোপাধ্যায়গণের সৌভাগ্য-রবি উদিত হয়; এই সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে; তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

জমিদারী ব্যতীত দান, বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি বহু সৎকীর্তি তাঁহাদের ছিল। বহু চতুষ্পাঠী এই স্থানে ছিল, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কালক্রমে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন কমিয়া যাইলে, এই দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়, তখন এই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ অগ্রণী হন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে ১২৪৬ সালের ৩০শে আষাঢ় তারিখের "সমাচার দর্পণে" প্রকাশিত একটি সংবাদ নিম্নে উল্লিখিত হইল:

"ইংরেজী পাঠশালা স্থাপন—জিলা হুগলীর অন্তঃপাতি তেলেনীপাড়াস্থ ধনী জমিদার

মহাশয়েরা ঐ স্থানে এক ইংরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়াছেন, ঐ বিদ্যালয়ের তাবদ্ব্যয় তাঁহারাই নির্বাহ করিবেন।”

॥ রসরাজ ধীরাজ ॥

তেলিনীপাড়ায় বর্ধমান মহারাজার গায়ক ধীরাজ বাস করিতেন। তাঁহার রচিত অসংখ্য গান আছে। সংগীতের সহিত রঙ্গরসে তাঁহার নিপুণতা অসাধারণ ছিল। একবার মশকের ডাকের অনুকৃতি করিয়া তিনি মহারাজার নিকট হইতে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পান। চন্দননগর স্টেশনের কাছে কালীদাস শেঠ প্রতিষ্ঠিত যে কালীমন্দির আছে, ঐ মন্দিরের কালীমূর্তি প্রথম তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার আসল নাম ছিল বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাপচাঁদ প্রদত্ত ধীরাজ উপাধিতেই ইনি পরিচিত ছিলেন। সেকালের বাঙ্গালী সমাজের বিভিন্ন লঘু-গুরু ঘটনাবলীর উপর তাঁহার অসংখ্য গান আছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লইয়া তাঁহার গান বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে রচিত হইলেও বিদ্যাসাগর মহাশয় ধীরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার গান শুনিতেন এবং তিনি ধীরাজকে খুব স্নেহ করিতেন।

মিস্ মেরী কার্পেন্টার ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উত্তরপাড়া স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে ধীরাজ একটি গান রচনা করেন। উত্তরপাড়ায় গাড়ী উল্টাইয়া যাওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পা ভাঙ্গিয়া যায়। এই স্থানে গানটি উদ্ধৃত হইলঃ

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে।
করে তুলেছে তোলাপাড়ী
এবার নাইকো ছাড়াছাড়ী।
মিস্ কার্পেন্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে,
কি মাদ্রাজ, কি বোম্বাই সবাই দেখেছে।
এখন এসে কলকাতাতে (এবার)
বাঙ্গালিদের নে পড়েছে।
উত্তরপাড়ার স্কুলে যেতে,
বড়ই রগড় হ'ল পথে, এটকিনসন্ উড্রো
আর সাগর সঙ্গেতে।
নাড়াচাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে
গাড়ী উলটে পল্লেন সাগর,
অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে॥

অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভদ্রেশ্বর ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। “ব্রহ্ম-সংগীতাবলী” রচয়িতা কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস সেই আন্দোলনের অগ্রবর্তী ছিলেন। তাঁহার রচিত গান ব্রাহ্মসমাজে এখনও গাওয়া হয়।

এই স্থানের মুখোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় বংশও বিশেষ সম্ভ্রান্ত; মুখোপাধ্যায় বংশের স্বর্গীয় ডাক্তার সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় চক্ষু-চিকিৎসক হিসাবে সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের দেওয়ান **আত্মারাম সরকার** এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাহার পুত্র কলিকাতার ডেপুটি-ট্রেডার বনমালী সরকার ব্যবসায়াদি করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাহার কুমারটুলির বাড়ি কলিকাতায় একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। বনমালী কিছুদিন পাটনার কমার্শিয়াল রেসি-ডেন্টের দেওয়ান পদে ছিলেন। তাঁহার কুমারটুলীর বাড়ি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আক্রমণের বহু পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। আত্মারামের রাধাকৃষ্ণ ও হরেকৃষ্ণ নামে আরও দুই পুত্র ছিল। অদ্যাপি তাহার বাড়ির বিষয় এই প্রবাদটি প্রচলিত আছেঃ

"গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি,
বনমালী সরকারের বাড়ি।"

জেলে এই স্থানের আদিম অধিবাসী। ভাগীরথী এই স্থান হইতে বাঁকিয়া যাওয়ায় গ্রামের তিন দিক দিয়াই ভাগীরথী প্রবাহিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ স্থান মৎস্য ধরিবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়া সুদূর অতীতকাল হইতে এই অঞ্চলে মৎস্যজীবিগণ বাস করিতেছে। মুসলমান রাজত্বকালে বহু অ-বাঙ্গালী মুসলমান সৈনিকের কার্য লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। বর্তমানে গ্রামের অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানগণ আংশিকভাবে এবং মধ্যভাগে মৎস্যজীবিগণ বাস করে।

॥ অবহেলিত রামসীতার মন্দির ॥

পাইকপাড়া অঞ্চলে এক অপূর্ব **রামসীতার** মন্দির আছে। এই মন্দিরটিরও নয়টি চূড়া অছে; কে যে এই মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। পূর্বে এই মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত, কালক্রমে ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় মন্দির হইতে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে ভাগীরথী সরিয়া গিয়াছে।

মন্দিরের পূর্ব দিকের প্রবেশপথটি বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রবেশপথের উপরে কারুকার্যখচিত ইষ্টকে সমগ্র কৃষ্ণলীলা অঙ্কিত আছে। কালক্রমে যত্নাভাবে বহু ইষ্টক নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, সাধারণ ইষ্টকদ্বারা সেইগুলি পূরণ করা হইলেও, এখনও সহস্রাধিক ইষ্টকের উপর অঙ্কিত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তকে একখানি ইষ্টকের আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল, ইষ্টকখানির এক-চতুর্থাংশ ভাঙ্গিয়া যাইলেও শ্রীকৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া আছেন, তাহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় বালকগণ মন্দিরের চিত্রিত ইষ্টকগুলি খুলিয়া যে ভাবের খেলা করিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এই মন্দিরের কারুকার্যখচিত ইষ্টকগুলি যে সমস্ত অদৃশ্য হইয়া যাইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পূর্বে অ-বাঙ্গালী মোহান্তগণ এই মন্দিরের অধিকারী ছিলেন। এক মোহান্ত পরলোক গমন করিলে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্য হইতে নূতন মোহান্ত নির্বাচিত হইতেন। পরে স্থানীয় গোস্বামীগণ এই মন্দিরের উত্তরাধিকারী হন, বর্তমানে শ্রীমতি গিরিবালা দেবীর

এক ভগ্নীর পুত্র শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এই মন্দিরের সেবাকার্যে ব্রতী আছেন।

মন্দিরের মধ্য হইতে অষ্টধাতু নির্মিত রামসীতার মূর্তি বর্তমান গিরিবালা দেবীর গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে। রামসীতার মূর্তি দুইটি প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা, সুন্দর একটি সিংহাসনের মধ্যে দণ্ডায়মান আছেন। গিরিবালার অবস্থা খুবই খারাপ বলিয়া প্রত্যহ বিগ্রহের সেবা পর্যন্ত এখন হয় না; আর মন্দিরের অবস্থার বিষয় পূর্বেই লিখিয়াছি। বর্তমান সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ হইতে এই প্রাচীন মন্দিরের সংরক্ষণ করা একান্ত কর্তব্য। ভদ্রেশ্বরে চন্দননগরের ন্যায় দশখানি বিরাট জগদ্ধাত্রী প্রতিমার পূজা এখনও অনুষ্ঠিত হয়।

এই স্থানে অন্নপূর্ণা গ্রন্থাগার, খেয়ালী সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি হুগলী জেলার গৌরব বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। প্রতিবৎসর খেয়ালী-সঙ্ঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত আবৃত্তি, বিতর্ক, বক্তৃতা, সমালোচনা প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় বহু প্রতিযোগী যোগদান করেন। খেয়ালী সঙ্ঘ হইতে 'আহুতি' নামক একখানি সাময়িকপত্র পূর্বে প্রকাশিত হইত।

এই স্থানটি ক্ষুদ্র হইলেও একটি মিল থাকায় জনসংখ্যা এই স্থানের খুব বেশী। এই স্থানে মিউনিসিপ্যালিটি, পোষ্ট অফিস, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতি আছে। ভদ্রেশ্বর গভর্নমেণ্ট কলোনী যুব সমাজের উদ্যম ও সংহতিতে একটি আদর্শ উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের "জনপদ বহুমুখী সমবায় সমিতি" একটি উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠান। ইহা ছাড়া ভদ্রেশ্বর সারদা-পল্লী কন্যা বিদ্যাপীঠ ভদ্রেশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

॥ ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটি ॥

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে ভদ্রেশ্বর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পৌর-সভার প্রথম সভাপতি হন চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়। পৌরসভার আয়তন মাত্র আড়াই বর্গ-মাইল। ভদ্রেশ্বরে বৈদ্যুতিক আলো ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে পৌরসভার সভাপতি অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সময়ে প্রথম হয়। এখন পৌর এলাকায় আলোর সংখ্যা প্রায় চারশত। মিউ-নিসিপ্যালিটি পাঁচটি ওয়ার্ডে বিভক্ত। এক নম্বর ওয়ার্ড ভদ্রেশ্বর, দুই নম্বর ওয়ার্ড গুরুটি বা গৌরহাটী, তিন নম্বর ওয়ার্ড তেলিনীপাড়া এবং চার ও পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড মানকুণ্ডু।

ভদ্রেশ্বরের মিল এলাকা ছাড়া অন্য স্থানগুলি খুব পরিষ্কার রাখা হয় না বলিয়া মধ্যে মধ্যে অসুখের প্রাদুর্ভাব হয়। এই মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে প্রধান রাস্তা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। এই রাস্তার গা দিয়া যে সব শাখা রাস্তাগুলি আছে, সেইগুলি অপ্রশস্ত ও ধূলি-ধূসরিত। এখানকার রাস্তার মাইলেজ ১৩·৬৭ মাইল। ইহার মধ্যে ৯·৮৫ মাইল হইতেছে কাঁচা রাস্তা। কাঁচা রাস্তাগুলিকে চলার উপযোগী ও সুসংস্কৃত করিলে পথচারীরা উপকৃত হইবেন। এই সব রাস্তার দুধারে গভীর কাঁচা অপরিষ্কার নর্দামা পৌরসভার কলঙ্ক। পরিমার্জনের অভাবে নর্দামা হইতে দুর্গন্ধ ও জল নিষ্কাশনের অব্যবস্থার জন্য পেটের অসুখের প্রাদুর্ভাব এই স্থানে প্রায়ই হয়।

পৌরসভার নিজস্ব 'ওয়াটার-ওয়ার্কস' নাই বলিয়া মিল এলাকা ছাড়া সর্বত্রই জলাভাব আছে। ৮০টি নলকূপের সাহায্যে জলদানের ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। তৃষ্ণা

নিবারণের জন্য মিল কর্তৃপক্ষের পৌরসভাকে সহৃদয়তার সহিত সাহায্য করা কর্তব্য। পৌরসভার একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করিলে এই প্রাচীন ঐতিহাসিক শিল্পসমৃদ্ধ শহরের ঐতিহ্য বজায় থাকিবে। পৌরসভার জনসংখ্যা ৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

ডাক্তার সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

অত্যন্ত সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় চেষ্টা ও অধ্যবসায় গুণে যে সমস্ত ব্যক্তি যশের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, সুশীলকুমার তাহাদের মধ্যে একজন। ইংরাজী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে (১২৯২ সালের আষাঢ় মাস) কোদিহাটি গ্রামে মাতুলালয়ে সুশীলকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম উষাঙ্গিনী দেবী ও পিতার নাম শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়। সুশীলকুমারের পিতা শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়াও কিরূপ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতার দ্বারা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। হরিপদবাবু বি, এল পাশ করিয়া হুগলী কোর্টে ওকালতি করিতেন, কিন্তু যে কারণেই হউক ওকালতিতে তাহার বিশেষ পসার না হওয়ায় সুশীলকুমারের ধনীর সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই; হরিপদবাবু অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী ও পুত্রদের লেখাপড়া শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে সুশীলকুমার ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং হুগলী কলেজ হইতে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার কলেজে ভর্তি হন। মেডিক্যাল কলেজে পাঠকালে তিনি সরকারী বৃত্তি ও অনার্স সার্টিফিকেট পান। তন্মধ্যে 'অপথ্যালমিক সার্জারি' সম্বন্ধীয় পরীক্ষাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনার্স পরীক্ষায় প্রথম হইয়া সুশীলকুমার সুবর্ণ পদক পান। এল, এম, এস পরীক্ষায় পাশ করিবার পর মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু চিকিৎসার হাসপাতালে কিছুদিন কার্য করেন. পরে কলিকাতা মেয়ো হাসপাতালে চাকুরি পান। এই চাকুরি করিতে থাকা কালে মেডিকেল কলেজের চক্ষু চিকিৎসালয়ে প্রধান চিকিৎসকের পদ শূন্য হইলে মেয়ো হাসপাতাল হইতে মেডিকেল কলেজে প্রধান চিকিৎসক হইয়া আসেন। কিছুদিন পরে কলিকাতায় বেলগাছিয়া নামক স্থানে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষগণ সুশীলকুমারকে উক্ত কলেজে প্রধান চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করেন। এখন এই কলেজ 'আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ' নামে খ্যাত।

১৯১৯ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তিনি বিলাত যাত্রা করেন। তদনন্তর বিলাতে যাইয়া তিনি 'মুরফিল্ড আই হসপিটাল-এ ভর্তি হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ডি, ও পরীক্ষায় পাশ হন। 'ডি, ও' পরীক্ষা চক্ষুরোগ সম্বন্ধে বিলাতের সর্বোচ্চ পরীক্ষা; লন্ডনে চক্ষুরোগ সম্বন্ধে কোন আলাদা পরীক্ষা তখন ছিল না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা করিতে থাকেন।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সুশীলকুমার পুরাপুরিভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়া দশের ও দেশের কার্যে

মনোনিয়োগ করেন। তিনি কলিকাতার টাউন স্কুলের সহকারী সভাপতি এবং বাংলা দেশে অন্ধতা নিবারণী সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

ইহা ভিন্ন গ্রামের তেলেনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় গ্রামের অনাথ ভাণ্ডার, গ্রামের লাইব্রেরী (অন্নপূর্ণা পুস্তকাগার) ও অন্যান্য ছোট বড় প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের জন্য সমভাবে কাজ করিয়া এতগুলি প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ রক্ষা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল তাহা সত্যই চিন্তার বিষয়।

গ্রামে ফিরিয়া যাও—এই বাক্যে তাঁহার আস্থা ছিল এবং দেশের মেরুদণ্ড সেই গ্রাম-সমূহের উন্নতি ভিন্ন দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়, একথা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চক্ষু চিকিৎসা সম্মেলনীতে তিনি ভারত গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন ও সেখান হইতে পরে ইউরোপের অন্তর্গত জুরিচ ভিনো ও ইউট্রেচট প্রভৃতি বড় বড় চক্ষু-চিকিৎসালয় সাম্প্রদায়িক অবিচারের প্রতিবাদে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং ১৯৪৯
সাম্প্রদয়িক অবিচারের প্রতিবাদে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং ১৯৪৯
খৃষ্টাব্দে তেলিনীপাড়াতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ন্যায় চক্ষু চিকিৎসক তৎকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিল না।

ভদ্রেশ্বর থানার মধ্যে একটি **ইউনিয়ন বোর্ড** আছে। ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য গ্রামের সংখ্যা ১৬ এবং জনসংখ্যা গত আদমসুমারীর তালিকায় ১২ হাজার ৫ শত ৮৪ জন বলিয়া লিখিত আছে। বর্তমান জনসংখ্যা কুড়ি হাজারের উপর। বিঘাটি ও খলিসানি এই দুইটি গ্রামের নামে ইউনিয়ন বোর্ডের নামকরণ হইয়াছে। ইউনিয়নের মধ্যে বেলকুলি, নবগ্রাম, বেজড়া, আলতারা, ধীতারা, পালাড়া, পাতুল-রাঘবপুর, গৌরাঙ্গ পুর, দিগড়া-মল্লিকহাটি প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বসবাস করেন। **পালাড়া** গ্রামে মহাবিপ্লবী **রাসবিহারী বসু** জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া গ্রামে 'রাসবিহারী স্মৃতিরক্ষা সমিতি' গঠিত হইয়াছে এবং এই বীরের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করিবার জন্য তাঁহার পুণ্য পবিত্র জন্মস্থানে একটি মর্মর মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।

পালাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে সুপ্রসিদ্ধ **পল্লীকবি রসিকচন্দ্র রায়** জন্মগ্রহণ করেন। ৪৪৯ পৃষ্ঠায় সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে এবং পরে সিঙ্গুর থানার মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় বিবৃত হইবে। তাঁহার জন্মস্থানে কবির স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

বেজড়া

বিঘাটি-খলিসানি ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত বেজড়া গ্রাম প্রাচীনকালে ধনজনসম্পদে প্রসিদ্ধ ছিল। এই গ্রাম চন্দননগর স্টেশন হইতে দেড় মাইল ও মানকুণ্ডু স্টেশন হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। বেজড়ার মিত্রবংশ বঙ্গদেশে বহুবিধ কারণে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। এই বংশের **গৌরমোহন মিত্র** ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড মিণ্টোর দেওয়ান ছিলেন এবং দানধ্যানের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তৎকালে ভারতের রাজধানী কলিকাতায় ছিল বলিয়া

রাজপ্রতিনিধিগণও কলিকাতায় থাকিতেন। এইজন্য দেওয়ান গৌরমোহন মিত্র বাহাদুর কলিকাতা আহিরীটোলায় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বসতি স্থাপন করেন। সরস্বতী নদীতে স্নানার্থিগণের সুবিধার জন্য তিনি প্রশস্ত একটি ঘাট নির্মাণ করিয়া দেন। বেজড়া গ্রামে **শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ** ও তাঁহার রথ তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গ্রামে কৃষ্ণরায়ের মন্দির, রাসমঞ্চ ও দোলমঞ্চ এখনও জীর্ণাবস্থায় বর্তমান আছে। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম রামধন দারহাট্টা রেশমকুঠির দেওয়ান ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রাস্তা নির্মাণের ভারপ্রাপ্ত হন।

ক্ষীরোদগোপাল মিত্র

রামধনের পৌত্র ক্ষীরোদগোপাল বৃটিশ এডমিরেলটি ও জর্মান রণতরীসমূহের একমাত্র এজেন্ট ছিলেন এবং স্বীয় অধ্যবসায় শ্রম ও ব্যবসাবুদ্ধিতে প্রভূত ধন অর্জন করেন এবং দান ও সৎকর্মে ব্যয় করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার ন্যায় মিতাচারী, দাতা ও ধর্মাত্মা পুরুষ বর্তমানে বিরল। কালীঘাটে স্নানার্থিদের জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্নানের ঘাট ও তীর্থযাত্রী মৃতকল্পগণের জন্য' মুমূর্ষু নিকেতন' তাঁহার অতুলনীয় কীর্তি। তাঁহার নামে কলিকাতায় ক্ষীরোদগোপাল মিত্র লেন ও কালীঘাটে ক্ষীরোদ মিত্র ঘাট লেন নামে দুইটি রাস্তা আছে। তাঁহার পিতা রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি শালিখায় রাজেন্দ্রশ্বর শিব নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় একটী ঠাকুরবাড়ী নির্মাণ করিয়া দেন। হাওড়াতে ক্ষীরোদ মিত্র ঠাকুরবাড়ী লেন নামেও একটি রাস্তা আছে। ২২শে জুলাই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র **কুমারকৃষ্ণ মিত্র** দেশজননীর অকৃত্রিম সেবক হিসাবে বঙ্গদেশে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় "স্বদেশী মেলার" প্রবর্তন করেন। নাট্যকলা ও সংগীতাদিতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি ইউরোপ ভ্রমণকালে নাট্যকলার উন্নতি দেখিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "আর্ট থিয়েটার" স্থাপনে অন্যতম উদ্যোগী হন এবং নাট্যকলার উৎকর্ষ সাধনকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই আর্ট থিয়েটার "কর্ণার্জুন" অভিনয় করিয়া বাংলার নাট্যজগতে যুগান্তর আনে। তাঁহার "জাগরণ" নামে একখানি ধর্মগ্রন্থ আছে।

॥ গরুটি ॥

গৌরহাটী নামক স্থানটি চাঁপদানী ও ভদ্রেশ্বরের মধ্যে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান; ইহার উত্তরাংশ ফরাসী ও দক্ষিণাংশ ইংরাজদের দ্বারা অধিকৃত। এই স্থানকে কেহ গিরটি, গিরেটা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোল্টের মানচিত্র বা জেমসেফের সার্ভে মানচিত্রে এই স্থান 'ফ্রেঞ্চ গার্ডেন' বলিয়া উল্লিখিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেইজন্য বোধহয় এই স্থানটি **ফরাসগঞ্জ** বলিয়া কথিত হইত। বর্তমানে ইহা গৌরহাটীর অপভ্রংশ **গরুটি** বলিয়া খ্যাত। সার্ভে-ম্যাপে এই অঞ্চলকে **ফ্রেঞ্চ গৌরহাটী** বলা হইয়াছে।

চন্দননগরের ফরাসী গভর্নর দুপ্লের একটি সুরম্য উদ্যানভবন এই স্থানে ছিল এবং তাঁহার নিমন্ত্রণে ক্লাইভ, ভিয়ারলেন্ট, হেস্টিংস, স্যার উইলিয়াম জোন্স, ফিলিপ ফ্রান্সিস এবং চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও কলিকাতার ইউরোপীয় সৌখীন নরনারীগণ এই

স্থানে সম্মিলিত হইত। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান পার্শ্বস্থ সুবিস্তৃত বৃক্ষবীথিকা সময় সময় নিমন্ত্রিতগণের শতাধিক যানাদিতে পরিপূর্ণ থাকিত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাসাদ কেবল যে আনন্দ আড়ম্বরে মুখরিত থাকিত তাহা নহে; রাজ্য সংক্রান্ত গোপন পরামর্শাদির জন্য এই ভবন তৎকালে মিলনের অন্যতম প্রধান স্থান ছিল।

গোরহাটী প্রাসাদের মধ্যে এরূপ একটি সুবৃহৎ হল ছিল, যাহার মধ্যে অনায়াসে এক-সঙ্গে শতাধিক নরনারী পান-ভোজন করিতে পারিত। ইহার উচ্চতা ছত্রিশ ফুট অর্থাৎ ত্রিতল অট্টালিকার মত ছিল এবং সুসজ্জিত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, অকস্মাৎ ফ্রান্সের ভার্সাই নগরের কোন সম্ভ্রান্ত পল্লী নিবাসের কথা মনে হইত। এই স্থানের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া গ্রাঁপ্রি এই প্রাসাদকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। রেভারেন্ড ডানিয়েল কুরি এই ভবনকে ইউরোপীয় ধরনের অট্টালিকা সমূহের মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া লিখিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ পল্লী-আবাসের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মার্শম্যান সাহেব দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে গৌড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদ ও মসজিদ সমূহ দর্শন করিয়া, দর্শকের মনে উহার পূর্ব গৌরবের কথা উদিত হইয়া যে একটা গভীর দুঃখে হৃদয় ভরিয়া উঠে, যদি এইরূপ দুঃখের নিদর্শন বঙ্গে আর কোথাও থাকে, তবে তাহা ফরাসী গভর্নরের ভগ্ন প্রাসাদ-পূর্ণ এই গরুটির বাগান।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের বোল্টস্-এর মানচিত্রে এই সুরম্য উদ্যানভবন "ফ্রেঞ্চ গার্ডেন" ও জোসেফ সাহেবের "সার্ভে অফ দি হুগলী"তে "ওল্ড ফ্রেঞ্চ গার্ডেন" বলিয়া উল্লিখিত আছে।

বিশপ কুরি ভারত ভ্রমণ কালে এই পরিত্যক্ত অসংস্কৃত প্রাসাদের সুন্দর সোপান, বৈচিত্র্যময় ভগ্নপ্রায় উচ্চ স্তম্ভসকল, বিবিধ কারুকার্য বিশিষ্ট পেডিমেন্ট প্রভৃতি দেখিয়া বিলাতের স্রপসায়ারের ধ্বংসপ্রায় 'মোরেটন কবরেট' নামক সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকার কথা তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন এই প্রদেশের মধ্যে ইহাই পতনোন্মুখ উন্নতির একমাত্র নিদর্শন। ফরাসী গভর্নর মঁসিয়ে শেভালিয়ে ইহার প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্য ইহাকে একবার সুসংস্কৃত করিয়াছিলেন। পরে ইংরাজ কর্তৃক ইহা আক্রান্ত হইলে, তিনি এই স্থান হইতেই গোপনে পলায়ন করিয়াছিলেন। অন্ধকূপ হত্যার পর বহু ইংরাজ কলিকাতা হইতে সিরাজদ্দৌলার ভয়ে "ফ্রেঞ্চ গার্ডেন" নামক ভবনে যাইয়া বাস করেন। সেই সময় বাণিজ্যপোতের পণ্যদ্রব্যাদির তত্ত্বাবধায়ক মিঃ ইয়ং উক্ত বাগানবাড়িতে বাস করিতেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্রে (প্লেট ১৯) গরুটির নীচে 'ক্যান্টনমেণ্ট' অর্থাৎ সেনানিবাস ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। কোন্ সময় সৈন্য এই স্থান হইতে সরান হয় তাহা জানা যায় না। মানচিত্রের গরুটির বানান 'গেরেটি' বলিয়া লেখা আছে।

At Garetty the English had a Military fort, often containing a thousand or more men. (Hooghly District Gazetteers)

গোরহাটীর পূর্ব কথা, এবং কিরূপে তাহা ফরাসীদের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা

অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। ফরাসী গভর্নরের প্রাসাদের সহিত গৌরহাটীর ইতিহাস বিজড়িত। এতদ্ভিন্ন ক্লাইভের সময় বাংলার সৈন্যদলের অধিকাংশই, সময় সময় এই স্থানে থাকিত বলিয়া জানা যায়। ষ্ট্যাভোরিনাস ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে ইংরাজদিগের সহস্রাধিক সৈন্য থাকিতে পারে, এইরূপ একটি দুর্গ দেখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসে মিরজাফরের সহিত সন্ধির উদ্দেশ্যে ক্লাইভ এই স্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং ১২ই জুন এই স্থান হইতেই মুর্শিদাবাদ অভিমুখে সৈন্য চালনা পূর্বক পলাশী প্রাঙ্গণে জয় লাভ করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। ২১ মার্চ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাব হইতে 'বেংগল আর্মি'র অর্ধেক সৈন্য 'গিরেটি' এবং অর্ধেক সৈন্য পাটনায় রাখার ব্যবস্থা হয়।

প্রাচীনকালে এই স্থানে ফরাসীদের একটি নাট্যশালা ছিল; ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাহা ভাঙিগয়া ফেলা হয়। "মোং গরেটির বাগানের বড়নাচ ঘর অতি পুরাতন হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তাহা ভাঙিগবার কারণ অনেক রাজ মজুর লাগিয়াছে" বলিয়া একটি সংবাদ ৫ই আগষ্ট ১৮২০ খৃষ্টাব্দের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বর্গীয় যদুনাথ সর্বাধিকারী ১২৬২ সালে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া 'তীর্থ-ভ্রমণ' নামক গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। বর্তমানে গরুটির প্রসিদ্ধ প্রাসাদ ও বাগানের কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু সর্বাধিকারী মহাশয় প্রায় শত বৎসর পূর্বেও 'গরুটির বাগ' দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন।

গৌরহাটি যক্ষ্মা হাসপাতাল

হুগলী জেলা যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে গৌরহাটীতে ৫০টি শয্যাবিশিষ্ট একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পূর্বে গৌরহাটীতে অল-ইন্ডিয়া রেডিওর ট্রান্সমিটিং স্টেশন ছিল। উহা ২৪ পরগণায় স্থানান্তরিত হইলে উহার ২৪ বিঘা জমির উপর ১৯৫৯ খষ্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহের-চাঁদ খান্না এই হাসপাতালের বহির্বিভাগের ভিত্তি স্থাপন করেন। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ও সন্দেহজনক রোগীদের চিকিৎসার জন্য বহির্বিভাগ খোলা হইয়াছে। শ্রীরামপুরে অবস্থিত সমিতির প্রধান কার্যালয়ে ৩৮০টি শয্যার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য এই হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। এইরূপ হাসপাতাল হুগলী জেলায় আর নাই।

॥ কবিওয়ালা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ॥

এই স্থানে পসিদ্ধ কবি অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি বসবাস করিতেন. তিনি জাতিতে পর্তুগীজ হইলেও এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত স্বামী স্ত্রী রূপে গরুটির এক বাগান বাড়ীতে বসবাস করেন। উক্ত স্ত্রীলোকটির নাম নিরুপমা। বঙ্গভাষায় অ্যান্টনী সাহেবের বিশেষ বুৎপত্তি ছিল এবং তিনি এক কবির দল করিয়া দ্রুত কবি গান রচয়িতা হিসাবে বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেন। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেনঃ

The Kavi is sung between two parties relating to Sakti, Krishna and other mythical topics. Towards the first half of the nineteenth

century Haru Thakur, Ram Basu, Antony Feringee, Sadhu Roy and others were greatly popular. (*Indian Stage, Vol. I*)

বাঙ্গলাদেশে কবিগান বা কবির লড়াই প্রধানতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সুরু হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কবিগান বা কবির লড়াই শ্রেণীর লোকসংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান ছিল বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য 'দাঁড়া কবি' নামে একটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ কোথাও কোথাও দেখা যায়। পরবর্তী কালে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিগানের প্রভূত প্রচলন হইয়াছিল এবং বিখ্যাত কবিগান রচয়িতা ও গায়কগণ তৎকালীন বঙ্গসমাজে যথোচিতরূপে সমাদৃতও হইয়াছিলেন।

এই সময়ে একজন বৈদেশিক কবির আবির্ভাব বাঙ্গলার কবিওয়ালাদের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। সম্ভবতঃ হন্সম্যান অ্যাণ্টনি-ই একমাত্র বিদেশী কবিওয়ালা, যিনি বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির সংবাহকরূপে এই দেশের জনসমাজে সমাদর লাভে সমর্থ হন।

অ্যাণ্টনি সাহেবের বিস্তারিত জীবনকাহিনী কালের প্রবাহে আর আমাদের আলস্য ও আত্মবিস্মৃতির ফলে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। বহিরাগত এই বিদেশী ব্যবসা বা অন্য কোন কর্মোপলক্ষে প্রথমে চন্দননগরে বসবাস সুরু করেন। এই প্রসঙ্গে ঋষি রাজনারায়ণ বসু "সেকাল আর একাল" নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য ঃ

"অ্যাণ্টুনি ফরাসডাঙ্গার একজন সম্ভ্রান্ত ফরাশিসের পুত্র। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ফরাশডাঙ্গার বিখ্যাত গাঁজিয়ালদিগের সংসর্গে পড়িয়া বয়ে গিয়াছিলেন। তৎপরে কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা হইয়া উঠিয়াছিলেন।"

রাজনারায়ণ বসু যদিও তাঁকে ফরাসী বলিয়াছেন, কিন্তু পরবর্তী কালের বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ, যেমন 'প্রাচীন কবি সংগ্রহ', 'বঙ্গের কবিতা', 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রভৃতির লেখকগণ অ্যাণ্টনি সাহেবকে পর্তুগীজ জাতীয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। অ্যাণ্টনি সাহেব ফরাসী বা পর্তুগীজ যাই হোন, তিনি হিন্দু সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া যেসব ভাবাত্মক ও ভক্তিমূলক গান রচনা করিয়াছিলেন, সমকালীন কবিদের রচিত গানের তুলনায়, তা সত্যই দুর্লভ।

বিদেশী হইয়াও অ্যান্টনি সাহেব বাঙ্গলাদেশের গ্রাম্য অর্থাৎ চলতি ভাষা যেভাবে রপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর সমসাময়িক ঠাকুর সিংহ নামে এক কবিওয়ালা ছিলেন। এক সভায় এই ঠাকর সিংহ অ্যাণ্টনিকে আক্রমণ করিয়া গাইলেনঃ -

"বলো হে এণ্টনি, আমি একটি কথা শুনতে চাই,
এসে এদেশে, তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই ?"

তার জবাব দিয়াছিলেন অ্যাণ্টনি এইভাবেঃ—

"এই বাংলায় বাঙালীর বেশে আনন্দে আছি।
হোয়ে ঠাকুর সিং-এর বোনের জামাই, কুর্তি টুপি ছেড়েছি॥"

আর একবার বিখ্যাত কবিওয়ালা রাম বসু বলেনঃ—

"সাহেব, মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালী।
ও তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চুণ-কালি॥

অ্যাণ্টনি সাহেব জবাব দিয়াছিলেনঃ

'খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই,
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই!
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে—
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

এসব ছাড়া দেবী দুর্গার প্রতি তাঁহার একটি গান, প্রায় প্রবাদ বাক্যের মতই বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার লাভ করিয়াছে। সেই গানটি এইঃ—

যদি দয়া করে তর মোরে এ ভবে মাতঙ্গি!
ভজন সাধন জানি না, মা! জেতেতে ফিরিঙ্গী॥

শুধু মাত্র কবিওয়ালারূপেই যে অ্যাণ্টনি সাহেব বাংলা ও বাঙালীর জয়গান গাহিয়াছিলেন তাহা নয়, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বাঙালীর নানা সামাজিক উৎসবেও তিনি সানন্দে যোগদান করিতেন। এই বাঙালী প্রীতির জন্য শেষ পর্যন্ত তাহাকে এক এক বাঙালী ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হয়। এই সহধর্মিণীর অনুরোধেই অ্যান্টনি সাহেব কলিকাতা বহুবাজার স্ট্রীটে একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অ্যান্টনি সাহেব ঐ অঞ্চলেই বসবাস সুরু করেন। কবিওয়ালা অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গী প্রতিষ্ঠিত এই কালীমূর্তি আজও 'ফিরিঙ্গী কালী' নামে বিখ্যাত।

কবি গানের আসরে অ্যান্টনী সাহেব মাথার টুপি ও কোট-প্যান্ট খুলিয়া, ধুতি পরিধান পূর্বক খালি গায়ে গান করিতেন; কিন্তু তাহাকে হারাইবার জন্য প্রায়ই তাঁহার ব্রাহ্মণীর কথা আসরে বলা হইত। নিম্নে, একবার ভোলা ময়রা ও এণ্টনী সাহেবের কবির গানে, ভোলা ময়রা তাহাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল। এই গান হালসী বাগানে হইয়াছিল এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন।

ওরে সাহেবের পো এণ্টনি!
তোর কটা বাপ বল শুনি।
না বলতে পারলে দেখবি আজ, ভোলার কেমন শক্ত ঘানি॥
বিলাতে তোর আসল বাবা, এখানে তোর পাদরী বাবা।
তোর মত হাবা-গোবা, আমি আর দেখিনি॥
পথে ঘাটে দেখিস যারে, বলিস বাপ অমনি তারে।
যেতে হবে শীঘ্র গোরে, তার কিছু তুই করলিনি॥
শোন রে গুণধর, তোর নাই বংশধর,
তোর বংশরক্ষার বন্দোবস্ত করবে তোর বামনী।

অ্যান্টনী সাহেব তাহার সামাজিক ধর্ম ও বর্ণ বৈষম্য একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি একবার আসরে রাম বসুকে বলিয়াছিলেনঃ—

"আমি ভজন সাধন জানি না মা নিজেত ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া করে কৃপা কর মোরে, হে শিবে মাতঙ্গী॥"

অ্যান্টুনি ফিরিঙ্গির পুত্র পাঁচু ফিরিঙ্গি বাংলার নবাব সরফরাজের গোলন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। আলীবর্দী খাঁর সহিত যুদ্ধে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

গৌরহাটীতে সেওড়াফুলি রাজবংশের কোন ব্যক্তি 'হরগৌরীর' মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও তাহার সহিত একটি হাট বসান। উক্ত হাটের জন্য এই স্থান পরবর্তীকালে 'হর-গৌরীর হাট' নামে খ্যাত হয়। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, হরগৌরীর হাট কালক্রমে 'গৌরীর হাট' ও তৎপরে লোকমুখে বিকৃত হইয়া 'গৌরহাটী' ও বহু লোকে পরে 'গরুটী' বলিয়াও অভিহিত করে। হরগৌরীর মন্দিরের কোন নিদর্শন এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি যে, এইস্থানে পাটের কল স্থাপনের সময় উক্ত মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়: কিন্তু এই জনশ্রুতি আমরা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিনা।

গৌরহাটীর মিত্র বংশ একটি প্রাচীন বংশ, এই স্থানে বহু দিন হইতে তাঁহারা বসবাস করিতেছেন।

পূর্বে ভদ্রেশ্বর গরুটি চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে গঙ্গায় হাঙ্গরের খুব উৎপাত ছিল। এখন গঙ্গা মজিয়া যাওয়ায় আর হাঙ্গরের কথা বিশেষ শোনা যায় না। ১০৬ পৃষ্ঠায় গঙ্গায় হাঙ্গরের কথা ও দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণে কুমীরের বিষয় লিখিত আছে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে "ষ্টেটসম্যান" পত্রে ভদ্রেশ্বরে হাঙ্গরের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ

SHARKS—Sharks (Hangors) in the River Hooghly have becomes a dread to the inhabitants of Chandernagore Bhadressur, and other-adjacent places.

কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার

উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের আদিবাস গরুটিতে ছিল। তাঁহার গৌরীবিলাস ও কঙ্কাবতীর অভিশাপ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭৬ ও ইহাতে ৬ খানি চিত্র আছে। তন্মধ্যে ২ খানি কাঠ-খোদাই ও ৪ খানি লাইন এনগ্রেভিং। গ্রন্থমধ্যে কবি তাঁহার নাম-ধাম ও পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন ঃ

গরিটি সমাজ ধাম গোপাল মুখুটি নাম তার সুত দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় তিন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন গৌরী গুণ করিল রচন ॥

কবিকেশরী রামচন্দ্রের আরও চারখানি প্রাচীন পুস্তকের সন্ধান ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়াছেন। উহাদের নাম নলদময়ন্তী, হরপার্বতী মঙ্গল, অক্রুর সংবাদ, ও মাধব মালতী। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের অব্যবহিত পূর্বেই রামচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া ১৩৪০ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নলদময়ন্তী গ্রন্থ শেষে কবি বলিতেছেন ঃ

নল-দময়ন্তী কথা করিলে শ্রবণ। কলির নাহিক ভয় পাপ বিমোচন ॥

মাধব-মালতী পুস্তকখানি ১৯ চৈত্র ১২৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের শেষে রচনাকাল এই ভাবে দেওয়া আছে ঃ

চন্দ্র চন্দ্রযোনি চন্দ্রললাট বদন। চন্দ্র হ্রাস বৃদ্ধি যাতে শকনিরূপণ ॥

এই পুস্তকখানি এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত আছে।

॥ চাঁপদানী ॥

রেনেলের মানচিত্রে ভাগীরথী তীরে ইউরোপীয় উপনিবেশসমূহ
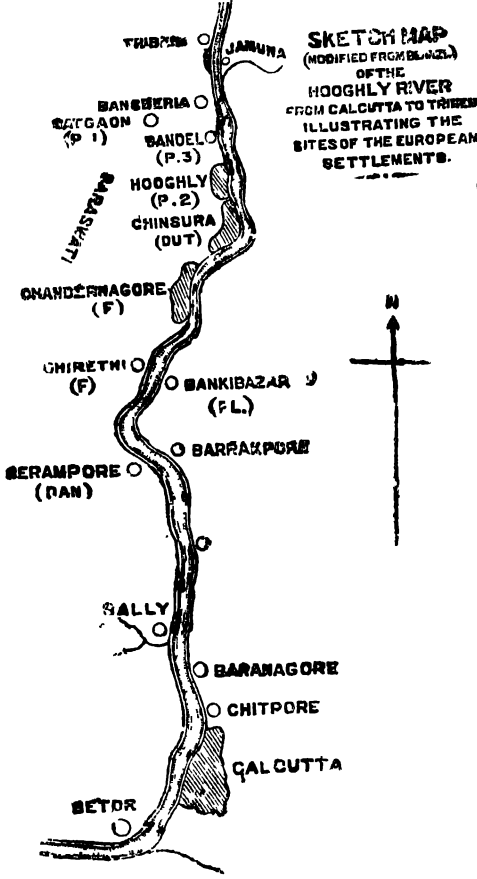
চাঁপদানী হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দননগর মহকুমার একটি প্রাচীন স্থান। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' এই স্থানের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র স্থানটি বৈদ্যবাটী ও গৌরহাটীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে।

চাঁপদানী বাংলার নবাব নাজিম মিরজাফরের নিকট হইতে ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার অয়ার কুট যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং তিনি তাঁহার সুন্দরী যুবতী মিসেস সুসন্না হাচিন্সনের সহিত এই স্থানে বহু বর্ষ যাবত বাস করেন।

It was granted by Mir-jafar, the Nawab Nazim of Bengal, to Colonel Coote, afterwards Sir Eyre Coote, Commander-in Chief of India. (Bengal Past & Present).

কর্ণেল কুটকে মিরজাফর এই স্থান উপহার দেওয়ায়, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস বিশেষভাবে আপত্তি করেন কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস স্যার ফিলিপের আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল পিয়ার্সের নেতৃত্বে হায়দর আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে মেদিনীপুরে প্রেরিত অবশিষ্টাংশ সেনাবাহিনী পরিদর্শন করিবার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস স্বয়ং চাঁপদানীতে আসিয়াছিলেন।

বঙ্গের অন্যতম প্রাচীন চটকল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে চাঁপদানীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ডাকাতির জন্যও প্রাচীনকালে এই স্থান হুগলী জেলায় বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। পাটশিল্প সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ ১৫৯ পৃষ্ঠায় ও পাটকলের বিষয় ৫৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

The Jute Mill at Champdani is one of the oldest in the province having been built in 1872. (Hooghly District Gazeteers.)

॥ চাঁপদানী মিউনিসিপ্যালিটি ॥

চাঁপদানী শিল্পসমৃদ্ধ নগর। এই স্থানের পৌরসভা ১লা অক্টোবর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার আগে চাঁপদানী বৈদ্যবাটী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যবাটী পৌরসভার পত্তন হয়। চাঁপদানী চারটি ওয়ার্ডে বিভক্ত এবং ইহার আয়তন আড়াই বর্গ মাইল। পৌর সহরে চারটি বড় বড় জুট মিল থাকায় ইহার আর্থিক সচ্ছলতা উল্লেখ্য এবং উদ্বৃত্ত অর্থ পুরবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয়িত হয় বলিয়া এই স্থানের শাখা-রাস্তাগুলি অন্যান্য পৌরসভা হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল। ভাগীরথী তীর বরাবর এই পৌর সহর অবস্থিত হওয়ায় ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড চাঁপদানীর প্রধান রাস্তা। চাঁপদানীর রাস্তার মোট মাইলেজ আঠার মাইল। ইহার মধ্যে মেটাল্ড রোড সাড়ে এগার মাইল। পাঁচ মাইল পিচের রাস্তা এবং দেড় মাইল কাঁচা রাস্তা। রাস্তাগুলি ধূলিধূসরিত নয়—ইহা পৌরসভার কৃতিত্বের পরিচায়ক। চাঁপদানী কলিকাতা হইতে ঊনিশ মাইল দূরে অবস্থিত এবং শিল্প-কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ। বহু প্রাচীনকাল হইতে ভাগীরথীতীরবর্তী এই সকল অঞ্চল শ্বেতাঙ্গ বণিকদের আবাসভূমি ছিল বলিয়া, তাহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই সব সহরের পত্তন ও ক্রমিক উন্নতি হয়। বিদেশী বণিক ও শাসকগণের হাত বদল হওয়ায় এই স্থানে যে রূপবৈচিত্র্য ঘটিয়াছিল তাহার চিহ্নও এই সব জায়গায় বিদ্যমান আছে।

চাঁপদানী পৌরসহরে ৬১৮টি বিজলী বাতি জ্বলে। পৌরসভা অনেকগুলি অব্যবহার্য রাস্তা এবং পুকুরের পাড় দিয়া যেসব অপ্রশস্ত রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, তাহার সংস্কার করিয়াছেন। সেই সব অঞ্চলেও বিজলী বাতির ব্যবস্থা প্রসারিত হইলে সহরের আরো উন্নতি হইবে। পৌর এলাকায় শতাধিক নলকূপ আছে। ইহা ছাড়া পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপে বৈদ্যুতিক মোটরযোগে চালিত ওয়াটার ওয়ার্কসও দৈনিক এক লক্ষ গ্যালন পানীয় জল সরবরাহ করিয়া থাকেন। পৌরসভা চাঁপদানীতে জল সরবরাহ করিবার জন্য কোন কর আদায় করেন না বলিয়া এখানকার অধিবাসীরা বিনাকরে লব্ধ পানীয় জলের অপচয় করিয়া থাকে।

চাঁপদানীতে পৌরসভার নিজস্ব কোন বাজার নাই, কোন পার্ক নাই এবং শবদাহের কোন ঘাট নাই। ভদ্রেশ্বর বা বৈদ্যবাটী নিমাই তীর্থের ঘাটে শবের সৎকার করিবার জন্য শববাহকগণকে চার-পাঁচ মাইল হাঁটিতে হয়। এই অসুবিধা দূরীভূত হইলে চাঁপদানী আদর্শ পৌরসহর বলিয়া পরিগণিত হইবে। চাঁপদানীর উত্তরে ভদ্রেশ্বর, দক্ষিণে বৈদ্যবাটী, পূর্বে ইস্টার্ন রেলওয়ের লাইন এবং পশ্চিমে ভাগীরথী। ইহার বর্তমান জনসংখ্যা ৭২ হাজার ২ শত ১ জন। জনসংখ্যার অন্যান্য হিসাব ৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

চাঁপদানী পৌরসভার দুইটি নিজস্ব অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ইহার জন্য বাৎসরিক পনের হাজার টাকা ব্যয় হয়। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিজস্ব গৃহ আছে।

চাঁপদানীর শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার মাতা মহামায়া দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সিঙ্গুরে বিদ্যালয়ের জন্য একটি ভবন নির্মাণ করিয়া দেন।

॥ সিঙ্গুর ॥

সিঙ্গুর হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দননগর মহকুমার অধীন একটি আধা-শহর হইলেও প্রাচীনকালে সরস্বতী তটে ইহা সিংহবাহুর রাজধানী **সিংহপুর** বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিবর্গ এই স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই স্থান কলিকাতা হইতে মাত্র একুশ মাইল দূরে অবস্থিত। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের তারকেশ্বর শাখায় সিঙ্গুর নামে একটি স্টেশন আছে।

খৃষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দে মহারাজ সিংহবাহু সিংহপুরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র বিজয়সিংহ অবাধ্যতাদোষে পিতা কর্তৃক বিতাড়িত হইলে তিনি সাতশত যুদ্ধকুশল অনুচর লইয়া সমুদ্রযাত্রা করেন এবং তাম্রপর্ণি দ্বীপে অবতরণ করিয়া তথাকার অধিবাসি-গণকে পরাস্ত করেন ও লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করেন। এই সম্বন্ধে জি. সি. মেণ্ডিস 'আর্লি হিস্ট্রি অফ সিলোন' গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

> ***The landing of Vijaya with his seven hundred followers i generally regarded is the starting point of the history of Ceylon. Thi is not surprising as the 'Mahavansa' the chief source for the recons truction of the early history of this island, refer to this went as its first human settlement.***

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেনঃ

> একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
> সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।

বিজয়সিংহ তাম্রপর্ণি বা লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করিয়া তত্রত্য রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং তথাকার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপের রাজা হইবার পর উক্ত দ্বীপেব নাম সিংহল নামে রূপান্তরিত হয়। "মদ্যার্যবংশ ভিক্ষু" নামক গ্রন্থ হইতে বিজয়সিংহের সম্বন্ধে বহু কথা জানিতে পারা যায়; নিম্নে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইলঃ

"লঙ্কাদ্বীপে আগত প্রথম রাজকুমার যক্ষলোপকারী বিজয়বাহু বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্য-স্থিত রাঢ়দেশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন; ইনি সিংহবংশীয় অনুরোধকুমার শাক্যবংশীয়। তাঁহাকে অনুরোধপুর দান করা হইয়াছিল।"

সিংহলের, পালী ভাষায় লিখিত 'মহাবংশ' নামক ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, বঙ্গ-দেশীয় কোন এক রাজার সুপ্রদেবী নামে একটি সুন্দরী কন্যা ছিল; যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাহার বিবাহ না হওয়ায়, তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন এবং পথিমধ্যে এক সার্থপতিকে দেখিয়া রাজকুমারী তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সার্থপতির ঔরসে ও সুপ্রদেবীর গর্ভে সিংহবাহু জন্মগ্রহণ করেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সিয়াং সার্থপতিকে জম্বুদ্বীপের মহাবণিক ও সিংহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

রাজা সিংহবাহু রাঢ়দেশের অন্তর্গত শতযোজনব্যাপী এক অরণ্য পরিষ্কার করিয়া সিংহপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সিংহপুর রাজ্য পালী 'মহাবংশ' নামক গ্রন্থে 'লাউরট্ট'

নামেও বর্ণিত আছে। সিংহরণ নদীর তীরে সিংহবাহুর রাজধানী ছিল এবং আজও এই ক্ষীণা নদীর চিহ্ন সিঙ্গুরে দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা হিসাবে সিংহবাহুর আসন তৎকালীন সামন্তরাজাদের অনেক ঊর্ধ্বে ছিল। কারণ তিনি কখনও কোন কালে কোন বাদশাহ বা সম্রাটের অধীন ছিলেন না। রাজা হিসাবে তিনি স্বয়ং একজন সম্রাটরূপেই তৎকালে অধিষ্ঠিত ছিলেন কারণ আশেপাশের সমস্ত রাজারা তাঁহাকেই কর দিতেন।

সুপ্রসিদ্ধ কবি কালিদাস সিংহপুর হইতে সিংহলে গমন করিয়া তত্রত্য রাজকবি কুমার দাসের রচিত শ্লোকের দুই পদ পূরণ করিয়া বারাঙ্গনাহস্তে নিহত হইয়াছিলেন। নিম্নে শ্লোকটি উদ্ধার করিঃ

"সিয় তাঁবরা, সিয় তাঁবরা, সিয় সেবনী।
সিয় সসুরা নিদিন লেবাতন সেবনী॥"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ উক্ত শ্লোকটির পাঠোদ্ধার করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, উহা যদি ষষ্ঠ শতাব্দীর বাঙলা হয়, তাহা হইলে হুগলী জেলা সংস্কৃত ও প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে মহামূল্য মণি প্রসব করিয়াছিল বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। নিম্নে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পাঠোদ্ধার উদ্ধৃত হইলঃ

"ধন কোবরা তল নোতনা রোটন্ বনী।
মন দেদরাপণ গলবা গিয়ে সুবেণী॥"

সিংহপুরের নাম বহু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে; 'দীপবংশ' নামক গ্রন্থে "সিংহবাহুর পুত্র ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিজয় সিংহ লাল প্রদেশের অন্তর্গত সিংহপুর নামক স্থান হইতে অনুচরবর্গ সহ সিংহলদ্বীপে উপনীত হইয়া তথায় একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে।"

সিংহপুরে ধর্মাদিত্য, ক্ষেমেশ্বর, হরিবর্মা প্রভৃতি কয়েকজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ব্রজসিংহের নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে উক্ত মুদ্রাটি রক্ষিত আছে; মুদ্রাটি সিংহপুরের কোন রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মুদ্রাটির মধ্যে সিংহের প্রতিমূর্তি আছে এবং 'ব্রজসিংহ' এই নামটি উপরে লিখিত আছে—অপর দিকে একটি ত্রিশূল অঙ্কিত আছে।

কালক্রমে সিংহপুর সিঙ্গুরে পরিণত হইলেও, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সিঙ্গুরের পশ্চিম দিকে রাজা হরিপাল রাজ্য স্থাপন করেন বলিয়া "দিগ্বিজয় প্রকাশে" লিখিত আছে। সিঙ্গুর প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়াই নির্দেশার্থে "সিঙ্গুরের পশ্চিমে" অবস্থিত এইরূপ লিখিত আছে।

"জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুর পশ্চিমে স্বনামং বসতিং কৃতঃ।
হরিপালো মহাগ্রামো হট্টব্যাপীসমন্বিতঃ॥ ৬৭১।"

পরবর্তীকালে ঘটকগণের কুলজিতেও সিংহপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; নিম্নে 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিত 'আদিশূর' নামক প্রবন্ধে উদ্ধৃত প্রাচীনকুল-পরিচয় বিষয়ে কবিতাটি লিখিত হইলঃ

"আকনাতে গেল ঘোষ, মাহিনাতে বসু।
বাড়িশা রহিলা মিত্র, দুঃখ রহে কিছু॥
বালিতে রহিলা দত্ত প্রতাপ প্রচুর।
ব্রহ্মগ্রামে গেল সেন, দেও চিত্রপুর॥
সিংহপুরে রয় সিংহ, হরিপুরে দাস।
পানিহাটি গত চন্দ্র, গুহ বঙ্গবাস॥"

বর্তমান সিংহবংশীয় কেহ সিঙ্গুরে বসবাস না করিলেও, লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে, দশশালা বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই সিঙ্গুরের দ্বারকানাথ সিংহ যে বোর্ড হইতে জমিদারী ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

The principal purchasers of the lats sold on the Board were Dwarka Nath Singh of Singur, Chhaku Singh of Bhastara, the Mukherjies of Janai and Banerjies of Talinipara. Statistical Account of Bengal.

পাঠান রাজত্বকালে সিঙ্গুরে বহু হিন্দুস্থানী আসিয়া বসবাস করেন; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেনাবিভাগে কার্য করিতেন এবং বৃত্তি স্বরূপ ভূমি ভোগ করিতেন। এতদ্ভিন্ন বহু ভদ্র গৃহস্থ পশ্চিম হইতে এই অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের মধ্যে সিঙ্গুরের বাবুরা দানশীলতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। শতবৎসর পূর্বেও সিঙ্গুরের নবাব বাবুকে জানিত না বা তাহার নাম শুনে নাই, এইরূপ লোক বঙ্গদেশে খুব অল্পই ছিল। নবাব বাবুর প্রকৃত নাম শ্রীনাথ রায়। বহুদিন হইতে ডাকাতির জন্য সিঙ্গুর প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই স্থানের ডাকাতে-কালীর নিকট প্রতি অমাবস্যায় নরবলি দেওয়া হইত। অদ্যাপি জঙ্গলাকীর্ণ বৃহৎ ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে কালীমাতার ভীষণ মূর্তি বিরাজিতা আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। ডাকাতদের অনেক দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর কাহিনী আজও শোনা যায়। তৎকালীন দুর্ধর্ষ ডাকাত **গগন সর্দারের** নাম আজও হুগলীর লোক ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করে। মল্লিকপুরের এই বিশাল কালীমূর্তির ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া দর্শকের প্রতি লোমকূপে কেবল শিহরণ জাগায় না--সমস্ত দেহ-মন ত্রাসের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

নর-বলি কেবল যে আমাদের এই দেশে প্রচলিত ছিল তাহা নহে, প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্বত্র এই প্রথা ছিল। প্রাচীন মিশরীয় সমাজে নরবলী হইত সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ডায়ডোরাস বলেন ঃ মিশরের রাজা লোহিতকেশ লোকদিগকে ওসিরিস দেবতার নিকট উৎসর্গ করিয়া বলি দিতেন। মিশরের অপেক্ষা সভ্যতায় উন্নত রোমীয় সমাজেও বিজিত বন্দিগণকে হত্যা করিয়া রোমানরা আনন্দ উৎসব করিতেন। বহুকাল এই প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু রাজকীয় আইন দ্বারা এই প্রথা রোমীয় সমাজ হইতে রহিত করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গ্রীক সমাজে ও এথেন্স নগরে এপেলো দেবতার পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী বলি দেওয়া হইত। সুতরাং বঙ্গদেশের কাপালিকগণই যে কেবল নরবলি দিত, তাহা যেন কেহ মনে না করেন।

ডাকাতির জন্য সিঙ্গুর এবং হরিপাল প্রসিদ্ধ ছিল। এই ডাকাতি দমন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও, ইংরাজ সরকার কোন কূলকিনারা করিতে পারেন নাই। ইহা রোধ

করিবার জন্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে একটি ডাকাতি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত কমিশনের রিপোর্ট এবং অন্যান্য বিষয় ২৯৬—৩১৯ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এইস্থানে আর পুনরায় লিখিত হইল না।

॥ সিঙ্গুর বাবুদের বংশ ॥

সিঙ্গুরের বাবুদের পূর্ব হইতেই ডাকাত-পোষক বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল; কেবল সিঙ্গুরের বাবুরা নহেন বাংলা দেশের বর্তমান বহু প্রসিদ্ধ বংশের পূর্বপুরুষগণ তৎকালে যে দস্যু ছিলেন, তাহা আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন!" যাহা হউক সিঙ্গুরের বাবুদের বংশে নবাব বাবু ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া, সন্দেহে ঠগী দমনের বড় কর্তা ওয়াকোপ সাহেবের তিনি সুনজরে পড়িলেন এবং সেইজন্য হুগলী জেলে তাহাকে কিছুদিনের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

পাঞ্জাব প্রদেশের সেরিনগাঁও নামক পল্লী হইতে নবাব বাবুর পূর্বপুরুষ গোপীনাথ ওয়ালী বঙ্গদেশে ব্যবসা করিতে আসেন এবং সিঙ্গুরের তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মহাতাব বাবুর বাড়ীতে বিবাহ করিয়া এই স্থানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। গোপীনাথের পুত্র দ্বারিকানাথ ওয়াহী, সিঙ্গুর জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা; দান ও বিবিধ ক্রিয়া-কলাপাদি করিয়া তিনি তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দ্বারিকানাথ সিঙ্গুরের নিকটে জলাঘাঠা নামক স্থানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সিঙ্গুরের সপ্ত-শিব-মন্দির ও অন্যান্য বহু দেবালয়ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত দেবালয় আজও সিঙ্গুরে বিদ্যমান আছে।

দ্বারিকানাথের মাতুলবংশ অর্থাৎ মহাতাব বাবুর বংশের উপর, বঙ্গদেশের এই অঞ্চলে বর্গী নিবারণের ভার তৎকালীন নবাব কর্তৃক অর্পিত হইয়াছিল এবং সেই জন্য তাহাদের বহু লাঠিয়াল রাখিতে হইত। বহুবার এই স্থান হইতে তাহারা বর্গী বিতাড়ন করেন বলিয়া নবাব তাহাদিগকে "থানদার" উপাধি দেন। বর্তমানে এই বংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইলেও, অদ্যাপি তাহাদের ভদ্রাসন "থানদার বাবুদের ভিটা" বলিয়া সিঙ্গুরে প্রসিদ্ধ।

দ্বারিকানাথের চতুর্থ পুত্র (ন' ছেলে) শ্রীনাথ রায় বাবুয়ানার জন্য 'নবাব বাবু' (ন' বাবু হইতে, নবাব বাবু) বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার ন্যায় সুপুরুষ ব্যক্তি তৎকালে বঙ্গদেশে খুব অল্পই ছিল! তাঁহার জমিদারীর মধ্যে তিনি মেদিনীপুর মণ্ডলঘাট পরগণায়, প্রজাবৃন্দের সুবিধার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি রূপনারায়ণ নদীর বাঁধ তৈয়ারী করিয়া দেন। অদ্যাপি উক্ত বাঁধ 'নবাব বাবুদের বাঁধ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার সময়ে তারকেশ্বরে মোহান্ত স্থাপনের সূত্রপাত হয় এবং তিনি বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও, তিলকদান পূর্বক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কমললোচন গিরিকে, তারকেশ্বরের গদিতে বসান। বঙ্গদেশে বর্ধমানের মহারাজার পরেই তাহার স্থান ছিল এবং অপ্রতিহত প্রভাবে তিনি শাসন কার্য নির্বাহ করিতেন। বাৎসরিক প্রায় দশলক্ষ টাকা তাহার জমিদারির আয় ছিল। তাহার বহু লাঠিয়াল ছিল এবং ইংরাজ সরকার সেইজন্য তাহাকে ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া জেলে আবদ্ধ রাখেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি; তিনি হুগলী জেলেও মহা ধুমধামের সহিত

সর্বপ্রথম কালীপুজো করেন এবং পুজোর প্রসাদ হুগলী জেলার সর্বত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার সাহেবরা পর্যন্ত কালীমাতার প্রসাদ খাইয়া বিশেষ তৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। বর্তমানে ইহাদের ভগ্নাবস্থা হইলেও গড়খাত সমন্বিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা, পুরাতন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। শ্রীযুক্ত অবনীনাথ বর্মণ বর্তমানে এই বংশের সর্বপ্রধান ব্যক্তি। তিনি হুগলী জেলার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিয়া জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

॥ ভৈরবচন্দ্র হালদার ॥

সিঙ্গুরের সহিত বঙ্গ সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এইস্থান প্রসিদ্ধ গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দলের সঙ্গীত রচয়িতা ভৈরব হালদার বসবাস করিতেন এবং তিনি সিঙ্গুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার গানগুলি অতি সহজ, সরল ও সুললিত ভাষায় রচিত হইত এবং ইতরভদ্র সকল শ্রেণীর লোক তাহার গান শুনিয়া বিমোহিত হইত। তিনি স্বয়ং গান করিতেন এবং তাহার কণ্ঠও অতি সুন্দর ছিল। তাঁহার রচিত গানের কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে বাংলা ভাষায় ভৈরব হালদার কিরূপ রচনা করিতেন তাহাই দেখা যাইবে।

রাগিণী মঙ্গল বিভাগ—তাল কাওয়ালী

তোমার চরিত্র চিনতে পাওয়া ভার।
হও বরের মাসী, কণের পিসী, দেখি সেই প্রকার॥
দু পক্ষেতে এস যাও, সমানে দুকাটী বাজাও।
ভানুমতির খেলা দেখাও, একি চমৎকার॥
কখনও হও ধনকুবীর, কখনও পেঁড়োর ফকির।
কখনও হও যুধিষ্ঠির ধর্ম অবতার॥
বেড়াও তুমি যোগে যাগে, হাড়ে তোমার ভেল্কি লাগে।
মুখের চোটে ভুত ভাগে, কথায় হীরের ধার॥

॥ গোপাল উড়ে ॥

গোপাল জাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে করণ-কায়স্থ। তাঁহার পিতা মুকুন্দ বেগুনের ও আদার চাষ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন। সেই সময় কলিকাতায় বহুবাজারের প্রসিদ্ধ ধনী রাধামোহন সরকার একটি সখের যাত্রার দল স্থাপন করেন, ইহাই বাংলা দেশের প্রথম সখের যাত্রা **"বিদ্যাসুন্দর"** অভিনয় বলিয়া খ্যাত। গোপালের ভাগ্যক্রমে একদিন মধ্যাহ্নে যখন তিনি চাঁপাকলা ফিরি করিতেছিলেন, তখন, তাহার গলার স্বর শুনিয়া রাধামোহন তাহাকে দশ টাকা বেতনে যাত্রার দলে নিযুক্ত করেন। দলের ওস্তাদ হরিকিষণ মিশ্রের নিকট গান শিখিতে লাগিল এবং এক বৎসরের মধ্যে একজন গুণী হইয়া উঠিল এবং চালচলনে একজন বাঙ্গালী হইয়া গেল। দুই বৎসর পর শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাড়িতে যাত্রার প্রথম আসরে গোপাল মালিনী সাজিয়াছিল। তাঁহার গানে ও ভাবভঙ্গীতে দর্শকগণ মোহিত হইয়া গেল। গোপালের জয়-জয়কার হইল। এই যাত্রা

ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে রাধামোহনের দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তিন রাত্রি অভিনয়ের পর রাধামোহন চল্লিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে দলের মৃত্যু হইল কিন্তু রহিল গোপাল উড়ে ও বিদ্যাসুন্দরের পালা। গোপাল রাধামোহনের সকল আসবাবপত্র পাইল এবং নিজে এক দল গঠন করিল। গোপাল আসরে আসিয়া মধুর কণ্ঠে যখন গান ধরিতঃ

জয় দে গো মা কালী।
আদ্যাসনাতনী সর্বস্বরূপিণী, অচিন্ত্যাব্যক্ত করালী॥
দলবল যত যোগিনী সঙ্গে
মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি রঙ্গে
বারেক করুণা কর অপাঙ্গে, করি কৃতাঞ্জলী।

তখন সকল দর্শকগণের প্রাণে শিহরণ হইত। গোপাল বিদ্যাসুন্দরের একেবারে পরিবর্তন করিয়া ফেলিল। ১২৩০ সালে ভৈরব হালদারকে দিয়া তিনি সহজ বাংলা ভাষায় গান রচনা করাইয়া নূতন বিদ্যাসুন্দর পালার সৃষ্টি করেন। দশ বৎসর ধরিয়া এই যাত্রা সারা বাংলা দেশের সকল বিশিষ্ট যাত্রার আসরে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ৪০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত "যাদু এমন কথা কেন বলিলি" গানের প্রথম দুই-তিন লাইন আজও রাখাল বালকগণ মাঠে গরু চরাইতে চরাইতে গাহিয়া থাকেঃ

"যাদু এমন কথা কেন বলিলি
ভোরের বেলা সুখের স্বপন
এমন সময় আমায় জাগালি।"

ভৈরব হালদার সম্বন্ধে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইরূপঃ

In Sakher Yatra none achieved so much success as Gopal Ooray. His fame spread from one end of Bengal to the other. He was invited almost from every quarter. The songs of his Vidya-Sunder Pala are still sung in Bengal. Gopal got songs composed in simple language by one Bhairab Haldar of Singur and got them also set to tune by him. With those songs he charmed his audience. The songs were so composed that they were greatly used for dancing. (The Indian Stage. Vol. I.)

ভৈরবচন্দ্র হালদার হুগলী জেলার অন্তঃপাতী মল্লিকপুর গ্রামে বাস করিতেন। ১১৯৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং কার্যোপলক্ষে ১২১৫ সালে কলিকাতায় বাস করিতে বাধ্য হন। তাঁহার বেশ রচনাশক্তি ও বিশেষরূপ সুরজ্ঞান ছিল। তিনি নিমকির দারোগা ছিলেন, এবং সৌহার্দ্যসূত্রে ঝামাপুকুর নিবাসী দীননাথ মিত্রের বাটীতে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার ও সিন্দুরেপটী নিবাসী কাশীনাথ মল্লিক মহাশয়ের অনুরোধে, তিনি ১২৩০ সালে সালে বিদ্যা সুন্দর যাত্রাগানের প্রথম পালা রচনা করেন। কিছু দিন ঐ পালা সখের ভাবে গাইয়াছিলেন। তখন গোপাল উড়ে মালিনীর অভিনয় করিত। কালীঘাটে হালদারদিগের বাটীতে উক্ত পালার অভিনয়কালে গোপাল গোপনে কিছু টাকা গ্রহণ করে, ইহাতে উক্ত মিত্র ও মল্লিক মহাশয়েরা ভৈরব হালদার মহাশয়কে লাভের কিয়দংশ প্রদানের

অঙগীকারে বাধ্য করাইয়া গোপালকে পেসাদারী ভাবে ঐ পালা গাইতে অনুমতি দেন। হালদার মহাশয় ২য় ৩য় পালা ঐ সময়ে রচনা করিয়া দেওয়াতে গোপাল ঐ সমুদয় পালা কিছু দিন খুব ধুমধামের সহিত গাইয়াছিল, পরে কার্য্যোপলক্ষে হালদার মহাশয় বিদেশে থাকিতে বাধ্য হওয়ায় কাশীনাথ ধোপা ঐ পালার দলের অধিকারী হইয়াছিল। কাশীনাথ বেলিয়াটা নিবাসী উমেশচন্দ্র মিত্রের সহযোগে দলটি বজায় রাখিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণ অধিকারীর কালীয়দমন যাত্রার দল হইতে ভোলানাথ দাসকে আপনাদের দল ভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। কাশীনাথের লোকান্তর প্রাপ্তির পর উমেশ ও ভোলানাথ কর্তৃক দলটী সংরক্ষিত হয়। তখন রূপচাঁদ বৈষ্ণব মালিনীর অভিনেতা ছিল। রূপচাঁদের পরে মল্লিকপুর নিবাসী বিশ্বম্ভর চক্রবর্তী উক্ত দলে মালিনীর অভিনয় কার্য বহুদিন অতি প্রশংসার সহিত নির্বাহ করেন। তদনন্তর উমেশ ও ভোলানাথের মধ্যে মনোমালিন্য বশতঃ দুইটী দল হয়।

১৩২০ সালে গোপাল উড়ের আসল **বিদ্যাসুন্দর** যাত্রার একটি শোভন প্রামাণ্য সংস্করণ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন। উহার মুখবন্ধে চুঁচুড়ার সুরসিক কবি দীননাথ ধর ভৈরবচন্দ্র হালদার সম্বন্ধে বিদ্যাসুন্দর পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ্যঃ

জেলা হুগলী সিঙগুর সন্নিকট মল্লিকপুর নিবাসী মৃত ভৈরবচন্দ্র হালদার ১২৩০ সালে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার গান নাটকাকারে বাঁধিয়া দেন; তাহার পূর্বে ঐ যাত্রার কতকগুলি গান প্রচলিত ছিল, কিন্তু হালদার মহাশয়ের রচিত গানের মত সে সকলের তেমন প্রচলন ছিল না। হালদার মহাশয়ের গানের সুর সুমিষ্ট ও সহজ এবং ভাষা সরল, সাধারণে অনায়াসে বুঝিতে ও গাইতে পারে, অধিকন্তু ঐ সকল গানের ভাষা খাঁটি বাঙগলা। অনেক গানে অনেক বাঙগলা প্রবাদ ও পৌরাণিক বিষয় ও আখ্যায়িকা জ্ঞাত হওয়া যায়। আসল বাঙগলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি পক্ষে ঐ সকল গানের ভাষা কথঞ্চিত সাহায্য করিতে পারে। বটতলার গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর গানের বইতে অনেক ভুল দৃষ্ট হয়, হালদার মহাশয়ের রচিত নাটকের খাতা হইতে উক্ত মল্লিকপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর চক্রবর্তী অবিকল নকল করিয়া লন এবং যত্নে রক্ষা করেন। উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনেক অনুসন্ধান, ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া নকল খানি উক্ত চক্রবর্তীর নিকট হইতে আনাইয়া সহজ সরস সঙগীত ও কাব্য প্রিয় জনের চিত্ত বিনোদন জন্য মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। উক্ত বিশ্বম্ভর চক্রবর্তী গোপাল উড়ের যাত্রায় মালিনী সাজিতেন।

ভাল জিনিষেরও অপব্যবহার হইয়া থাকে। যে বঁটীতে তরকারী কুটা যায় তদ্দ্বারা নরহত্যাও হইতে পারে। কেহ কেহ বিদ্যাসুন্দর যাত্রার বিরোধী, কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধতার বিশেষ কারণ বুঝা যায় না; গন্ধর্ব ও স্বয়ম্বর বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে। রাজা বীরসিংহ ও যুবরাজ সুন্দর ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিদ্যা-সুন্দর মধ্যে উক্ত দুই প্রকার বিবাহের একপ্রকার বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছিল; ভৈরব হালদার যাত্রা গানের একজন সামান্য বাঁধনদার মাত্র ছিলেন না, তিনি একজন প্রকৃত কবি ছিলেন আসল বাঙগালা ভাষায় তাঁহার বেশ দখল ছিল অপিচ তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দর যাত্রা গানের বইখানি একখানি নাটকস্বরূপ। ভূপেন্দ্রবাবু তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া একটী ভাল কাজ করিলেন।

বর্তমানে সিঙ্গুর থানায় অন্তর্গত ছয়টি ইউনিয়ন বোর্ড আছে। ইউনিয়ন বোর্ডের নাম সিঙ্গুর, নসীবপুর, গোপালনগর, বলরামবাটী, আনন্দনগর ও বড়া। এই গ্রামগুলির মধ্যে বহু জমিদার বংশ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির বসবাস আছে; তন্মধ্যে সিঙ্গুর ইউনিয়নের মধ্যে অপূর্বপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং বড়া ইউনিয়নের মধ্যে স্বর্গীয় রায়-সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কারণ তাঁহারা দুইজনেই স্ব স্ব পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার্থে পল্লীর উন্নতিকল্পে বিদ্যালয়, হাপসাতাল প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইহা ছাড়া বঙ্গের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেটের' সম্পাদক গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, ছাপাখানার জন্য প্রথম কাঠের অক্ষর প্রস্তুতকারক পঞ্চানন কর্মকার 'রায়-রায়ন' (দিনেমার গভর্নর তাহাকে 'রায়-রায়ন' উপাধি দিয়াছিলেন), প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার কবি রসিকচন্দ্র রায় অস্ত্রচিকিৎসায় সুনিপুণ রামপুরহাট রেলওয়ে হাসপাতালের সুবিখ্যাত ডাক্তার কেদারনাথ মিত্র এবং ইষ্টবেঙ্গল ও আসামের কেমিক্যাল একজামিনার রায় সাহেব ডাঃ প্রিয়নাথ বসু প্রভৃতি বহু কৃতি সন্তান বড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া এই জেলাকে ধন্য করিয়াছেন। সিঙ্গুরের নিকট দলুইগাছা গ্রামে মুন্সেফ নৃত্যগোপাল সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তাহার কন্যা কবি **নগেন্দ্রবালা মিত্র মুস্তৌফী সরস্বতী**। সাহিত্য প্রসঙ্গে ৪৬২ পৃষ্ঠায় নগেন্দ্রবালা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত ভৈরবনাথ কাব্যতীর্থ সিঙ্গুরে জন্মগ্রহণ করেন।

পুরুষোত্তমপুর হইতে দলুইগাছা পর্যন্ত সিঙ্গুর বাজার রোডের পার্শ্বেই হিমঘর, নূতন বাজার, থানা, জলকর অফিস, রেলস্টেশন, সিঙ্গুর বাজার, অর্ধ সাপ্তাহিক হাট, খাদ্যশস্যের পাইকারী ডিলারের গুদাম, উচ্চতর বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়- বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস, ফুটবল ময়দান, রাইফেল ক্লাবের প্যাভিলিয়ান বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিস, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড কার্যালয়, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস, পাট উন্নয়ন অফিস, কালীমন্দির, সরকারী ৫০-শয্যার হাসপাতাল, যক্ষ্মা-চিকিৎসার ক্লিনিক, রাজ্য সরকারের হেল্থ স্কুল, বিশেষ শিশু চিকিৎসাভবন এবং সর্বোপরি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া স্বাস্থ্যশিক্ষাকেন্দ্র বিদ্যমান। উক্ত রাস্তা হইতেই উত্তরে খেয়ানদী পর্যন্ত প্রতিটি ৬ মাইল দীর্ঘ তিনটি রাস্তা এবং দক্ষিণে সিঙ্গুর-মশাট, সিঙ্গুর-গঙ্গাধরপুর ও সিঙ্গুর-বড়া নামে তিনটি জেলা বোর্ড রাস্তা বাহির হইয়াছে।

দাঙ্গাহাঙ্গামা এই অঞ্চলে প্রায়ই হয়। "যুগান্তর" পত্রে ৩০ জুন ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের একটি সংবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্যঃ

জমি লইয়া দু' ভায়ের দাঙ্গায় একজন নিহত

হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রামে দুই ভাই-এর মধ্যে একখণ্ড ভূমি লইয়া কলহের ফলে রবিবার সকালে এক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। উহাতে এক ভাই ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং তার তিন পুত্র গুরুতর আহত হইয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইয়াছে। নিহত ব্যক্তির নাম সুরেন্দ্রনাথ মান্না। পুলিস এই সম্পর্কে ২ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

সিঙ্গুরের ডাক্তার **রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক** একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন; কারণ তিনিই

প্রসিদ্ধ কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের পিতা। রাজেন্দ্রনাথ ভবানীপুরে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন এবং তৎকালে ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রধান সৌসাদৃশ্য যে তাঁহারা যেমন অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই দেশের জন্য দুইজন কর্মবীর আশুতোষ ও সুরেন্দ্রনাথকে তাহারা রাখিয়া গিয়াছিলেন। ডাঃ রাজেন্দ্র ও ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের নামে কলিকাতায় দুইটি রাজপথের নামকরণ হইয়াছে।

১৩৩৭ সালের ১৮ই ফাল্গুন তারিখে স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের ভগ্নী শ্রীমতী গুণময়ী দেবী "রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক চিকিৎসা মন্দিরের" ভিত্তি স্থাপন করেন এবং পর বৎসর ৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২) তারিখে বঙ্গের তৎকালীন গভর্নর স্যার স্টান্‌লি জ্যাক্‌সন কর্তৃক এই হাসপাতালের উদ্বোধন হয়।

রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক চিকিৎসা মন্দিরের গাত্রে শ্বেতপ্রস্তরে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে ঃ

ঁরাজেন্দ্রনাথ মল্লিক

জন্ম—সিঙ্গুর, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২০০ **মৃত্যু**—কটক, ২রা আশ্বিন, ১৩০৪

যিনি ইচ্ছাপূর্বক নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দরিদ্র লোকের সাহায্যের জন্য নিতান্ত অভাব ও অসুবিধা সত্ত্বেও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যশস্বী হইয়া দক্ষিণ কলিকাতা ও সিংগুর ও নানা স্থানের দরিদ্র রোগিগণের চিকিৎসার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—যাঁহার ভবানীপুরের বসতবাটীতে স্থানীয় ও সিংগুর অঞ্চলের এবং দূর-দূরান্তের নিঃস্ব রোগিগণ আশ্রয় ও চিকিৎসালাভ করিতেন যিনি সর্বপ্রকারে লোক-সেবাকেই জীবনের ব্রতস্বরূপ করিয়াছিলেন এবং সিংগুর যাঁহার অতি প্রিয় ছিল তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার তৃপ্তির জন্য ও মহৎ জীবনের স্মৃতির উদ্দেশ্য ঈশ্বরপ্রীতি কামনায় এই চিকিৎসা-মন্দির উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি. ৮ই ফাল্গুন. সন ১৩৩৮ সাল।

সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে এম-এ এবং পর বৎসর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং তাঁহার কার্যকালে চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পৌর-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের **মন্ত্রী** ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইয়া বিলাত যাত্রা করেন রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। আধুনিক শিক্ষিত ও পদস্থ বাঙালীগণ সাধারণতঃ পল্লীগ্রামের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া শহরের বিলাসিতার মধ্যে ডুবিয়া থাকেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ একজন আদর্শ পল্লীসেবক ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খগেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবীকে বিবাহ করেন এবং এই মহীয়সী মহিলার প্রেরণায় তিনি দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সিংগুরে

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে রাজেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও মাতার নামানুসারে গোলাপমোহিনী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সুদূর পল্লী অঞ্চলে আধুনিক যাবতীয় সাজসরঞ্জামে সুজ্জিত এইরূপ সুরম্য হাসপাতাল নির্মাণ করিয়া তিনি হুগলী জেলার যে প্রভূত উপকার করিয়াছেন, লেখনীতে তাহা প্রকাশ করা যায় না। স্ত্রী-শিক্ষার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং গোলাপমোহিনী বালিকা বিদ্যালয় ২০শে মার্চ ১৯৩৫ খৃঃ স্থাপন করিয়া গ্রাম্য বালিকাগণের শিক্ষার তিনি যে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন সেইজন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এইরূপ প্রথম শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় তৎকালে গ্রামে দেখিতে পাওয়া যাইত না। সিঙ্গুর মহামায়া ইনস্টিটিউশন বলিয়া একটি উচ্চ বালকদের বিদ্যালয় বহুদিন হইতেই ছিল; তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের সভাপতিরূপে বহু উন্নতি করিয়া দিয়াছেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তিনি কলিকাতায় অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হন। কেওড়াতলা শ্মশানে সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিসৌধের উপর নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছেঃ

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক

জন্ম—	মৃত্যু
৯ ভাদ্র ১২৭৯ জন্মাষ্টমী	২৮ চৈত্র ১৩৪২ গুডফাইডে
শ্রীরামপুর	ভবানীপুর

শত্রুমিত্র উচ্চনীচ ভেদ জ্ঞান জয়ী
তুমি দার্শনিক। ছিলে চিরদিন
সত্য ন্যায় নিষ্ঠাব্রতী উদার নির্ভীক।
মূঢ়ে শিক্ষা, আর্তে সেবা, দীনহীন জনে
হে বিশ্বপ্রেমিক! নিঃস্বার্থ গোপন দানে
ছিল তব অকিঞ্চন ছিল তব
অকপট স্মিত স্নিগ্ধ সৌজন্য মধুর।
যুগে যুগে আদর্শের পূজা করি নর
হে মহামানব! ভিন্ন নামে ভিন্ন রূপে
তোমাকেই করেছে অমর।

কর্মস্থল--আলিপুর কোর্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা কর্পোরেশন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, লীগ অব নেশন নিজ গ্রাম সিঙ্গুর ইত্যাদি।

সুরেন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর তাঁহার সহধর্মিণী স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি আদর্শ প্রসূতিসদন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ তারিখে তৎকালীন বাংলার লাট-পত্নী লেডী রবার্ট রিড্ ইহার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। আমেরিকার রকফেলার ফাউন্ডেশনের কর্তৃপক্ষ এবং বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট ইহার ব্যয় বহন করেন। সিঙ্গুরে "সুরেন্দ্রনাথ মডেল হেল্থ ইউনিট অ্যান্ড মেটার্নিটি ক্লিনিকের" ন্যায় প্রতিষ্ঠান আমেরিকা, বার্মা ও সিংহল ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও নাই। লেঃ কর্নেল এ সি চ্যাটার্জির চেষ্টায় ইহা সিঙ্গুরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিঙ্গুরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্বর্গীয় মথুরানাথ বর্মন *ত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহা প্রাচীনতম বিদ্যালয়; অতঃপর ইহা বর্ধমান সিয়ারসোল রাজবংশের মতিলাল মালিয়ার অর্থসাহায্যে পরিচালিত হইত বলিয়া মতিলাল মালিয়া ইনস্টিটিউশন বলিয়া পরিচিত ছিল। পূর্বে এই জমিদারবংশ এই গ্রামেই বাস করিতেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চাঁপদানীর শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার মাতা মহামায়া দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে বিদ্যালয়ের জন্য সুরম্য ভবন নির্মাণ করিয়া দেন; তদবধি ইহা "সিঙ্গুর মহামায়া ইনস্টিটিউশন" বলিয়া কথিত হইতেছে।

সিঙ্গুরে জৌনপুর নিবাসী বাবুলাল সাহু ১৯৭৭ সম্বতে একটি কালীবাড়ি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরগাত্রে দাতার ও তাঁহার স্ত্রীর নাম এবং নির্মাণের তারিখ হিন্দী ও বাঙলায় ক্ষোদিত আছে। পূর্বে সিঙ্গুরে বহু পণ্ডিতের বাস ছিল। তন্মধ্যে সীতানাথ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং ঠাকুরদাস ন্যায়রত্নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত এই স্থানের ঘোষ বংশ ও চট্টোপাধ্যায় বংশ এবং নসিবপুরের রায় বংশ ও গোপালনগরের মিত্র বংশ বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সিঙ্গুরে প্রাচীনকালে পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী সমাজের সমাবেশ ছিল বলিয়া এই স্থানে পূর্বে বহু টোল ছিল, দূর-দূরান্তের বহু শিক্ষার্থীর সমাগমে সিঙ্গুর মুখরিত থাকিত। পণ্ডিত সমাজের মধ্যে **ঠাকুরদাস ন্যায়রত্নের** বিষয় আগেই বলা হইয়াছে। তিনি ১২০৪ সালে সিঙ্গুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত ছিলেন তাই বাঙলার সুধী ও শিক্ষাবিদ্ সমাজ শ্রদ্ধার সঙ্গে এখনও তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করেন।

সিঙ্গুরের পলতাগড় অঞ্চলে পাথরের একটি প্রাচীন **মনসা মূর্তি** আছে। এটি ঠিক কতকালের প্রাচীন, তাহা জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় হুগলীর কোন এক স্থানে হয়তো এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তারপর মূর্তিটি হারাইয়া যায়। আজ থেকে সত্তর বছর আগে ১২৯৯ সালে আবার তা পাওয়া যায় চালকেবাটীর মোড়ল পুকুরে। রঘুনন্দনের 'তিথ্যাদিতত্ত্বম্'-এর টীকায় কাশীরাম বাচস্পতি এই মনসা দেবীর একটি ধ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ-উদ্ধৃতি কোথাকার তার কোনো উল্লেখ নেই। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই ধ্যানটি সংগ্রহ করিয়া নলিনীকান্ত ভট্টশালীকে দেন। ধ্যানটি এই ঃ

"হেমাম্ভোজনিভাং লসদ্বিষধরালংকার সংশোভিতাম্ স্মেরাস্যাং পরিতো মহোরগগনৈঃ সংসেব্যমানাং সদা। দেবীমাস্তিকমাতরং শিশুসুতাং আসীন-তুঙ্গস্তনীং হস্তাম্ভোজযুগেন নাগযুগলং সংবিভ্রতিমাশ্রয়ে॥"

বিভিন্ন মন্দিরের মধ্যে **বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির, কালী মন্দির ও মনসামন্দির** সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ১১৩৮ বঙ্গাব্দে। বর্তমানে ২২২ বছর এর বয়স। এত প্রাচীন, অথচ কত সুন্দর এর অবস্থিতি। জরাজীর্ণ হইলেও ভাস্কর্যের দিক থেকে এ-মন্দির বাঙালীর কাছে আজও মহামূল্য সম্পদ। এর বিস্ময়কর অধিষ্ঠান বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির এক অপরূপ স্বাক্ষর।

শিয়ারসোলের মালিয়া উপাধিকারী রাজবংশ পূর্বে এই গ্রামে বাস করিতেন।

॥ বড়া ॥

সিঙ্গুর থানার মধ্যে বড়াগ্রামের **নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** ২১শে ফাল্গুন ১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্বপুরুষ কল্যাণচরণ মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার মধ্যে খলিসানী নামক গ্রাম হইতে আসিয়া এই স্থানে বসবাস করেন। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে ইনি সমর্থ হন নাই এবং সরকারী কার্যে প্রবিষ্ট হন। স্বীয় অধ্যবসায় ও সকর্মকুশলতায় তিনি ব্রহ্ম সরকারের পূর্ত বিভাগে একটি উচ্চপদ অধিকার করিয়া 'রায়সাহেব' উপাধি প্রাপ্ত হন। সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি স্বীয় পল্লী বড়া গ্রামে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার পিতা মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-রক্ষার্থে ১৭ই পৌষ ১৩৪০ সলে 'বড়া মধুসূদন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তাঁহার মাতা প্রসন্নময়ীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে "প্রসন্নময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়" প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন কার্যে তাঁহার সারা জীবনের অর্জিত অর্থ, দেশের কল্যাণকামনায় অর্পণ করিয়া তিনি ১৩৪৫ সালে গতায়ু হন। **'মানস সরোবর ও কৈলাস পর্বত ভ্রমণ'** নামে একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বড়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ পল্লীকবি ও পাঁচালীকার **রসিকচন্দ্র রায়ের** নিবাস ছিল। হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপালে তাঁহার পূর্ব নিবাস ছিল; কিন্তু তাঁহার পিতা হরিকমল রায় মাতামহের জমিদারী পাইয়া এই গ্রামে বসবাস করেন। ১২২৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কাব্যপ্রতিভার বিকাশ হয়। ১২৪৫ সালে "জীবন তারা" নামক প্রথম কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হয়; কিন্তু উক্ত পুস্তক আদিরসের মধ্যে অশ্লীলতা থাকায় সরকার হইতে উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর অশ্লীল অংশ পরিহার করিয়া ১২৫০ সালে নব্যজীবনতারা, ও ছয় খণ্ড পাঁচালী প্রকাশ করেন। ইহার পর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাঙ্কুর, হরিভক্তি চন্দ্রিকা, পদাঙ্ক দূত, দশম-মহাবিদ্যা, বৈষ্ণব মনোরঞ্জন, নবরসাঙ্কুর, কুলীন কুলাচার প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ১২৯৯ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে দেহরক্ষা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁহার নির্দেশেই বহু বিবাহ নিবারণকল্পে 'কুলীন কুলাচার' নামক কবিতা পুস্তকখানি রচিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনার নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

হায় রে বঙ্গের পদ্য হায়! হায়! হায়!
পূর্বের অপূর্ব মান এখন কোথায়?
কত ছটা কত ঘটা কত দম্ভ ছিল,
পদ রে! তোমার তেজ সর্কলি ঘুচিল।
বিলাতী খেলাতী পদ্য দেখিয়া বিস্তার
বাঙ্গালী! কাঙ্গালী তোরে করেছে এবার
পয়ার! দয়ার নাই তোর প্রতি টান,
হতিস বিলাতী বরং পেতিস সম্মান।
বঙ্গের রঙ্গের পদ্য থাক্ থাক্ থাক্
বাজুক কত না বাজে গদ্য জয়ঢাক।

॥ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ॥

প্রথম বাঙালী সাংবাদিক গঙ্গাকিশোর (ওরফে গঙ্গাধর) বড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। একটি কারণে তাঁহর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রীরামপুর নিবাসী হরচন্দ্র রায়ের সহকারিতায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতা হইতে **"বাঙ্গাল গেজেটি"** নামক বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাসে" ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। কৌতুহলী পাঠক উহা দেখিতে পারেন।

এ ছাড়া তিনি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষার ইংরাজী ব্যাকরণ ও ভারতচন্দ্রের **অন্নদামঙ্গল** প্রকাশ করেন। এই অন্নদামঙ্গলে ছয়খানি ছবি আছে, ছবির ব্লকগুলি রামচাঁদ রায়ের তৈয়ারী। ছবিগুলি লাইন-এনগ্রেভিং। ইহার আগে আর কোন সচিত্র বাংলা বই বোধ হয় এদেশে প্রকাশিত হয় নাই।

গঙ্গাকিশোর আরও কতকগুলি পুস্তকের রচয়িতা বা প্রকাশক ছিলেন। তন্মধ্যে যে কয়খানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের নাম ঃ শ্রীভগবদ্গীতা, দ্রব্যগুণভাষা, বেতাল পঞ্চবিংশতি, চাণক্য শ্লোক ও চিকিৎসার্ণব। **শ্রীভগবদ্গীতার** দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র এইরূপ ঃ

শ্রীশ্রীহরি | শ্রীভগবদ্গীতা | নমা ভগবতে বাসুদেবায় | অষ্টাদশ অধ্যায় সংস্কৃত মূল গ্রন্থ। | [এবং] | গদ্যরচিত ভাষাঅর্থ সংগ্রহ | শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যেন প্রকাশিত। | বাঙ্গলা যন্ত্রে। | দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল | মোকাম বহরা | সন ১২৩১ সাল। | [পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৬]

১২২৬ সালে বলাগড় নিবাসী বৈকুণ্ঠনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁহার সংস্কৃত মূল গ্রন্থ শ্রীভগবদ্গীতার পদ্যে রচিত অনুবাদও গঙ্গাকিশোর প্রকাশ করেন। বৈকুণ্ঠনাথ রাম-মোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার সম্পাদক ছিলেন। উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে এই পুস্তক আছে। পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার তাঁহার নামধাম এইভাবে দিয়াছেন ঃ

কোটি কোটি নতি স্তুতি করি কায়মনে,
কোন পণ্ডিতের সহকারাবলম্বনে।
দ্বিজ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্য বংশ জাত,
ভাগীরথী তীরে বেলগড্যা গ্রামে স্থিত॥

গঙ্গাকিশোর রচিত **চিকিৎসার্ণব** পুস্তকের রচনার নিদর্শন প্রদত্ত হইল। এই গ্রন্থ রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে আছে।

ব্যাধিতে পীড়িত লোক নানা মতে পায় শোক তার কিছু করি যোগ উপায় কারণ॥
বৈদ্যকের শস্ত্রমতে পাঁচনাদি আছে কত তার মধ্যে সার যত এই গ্রন্থে করি নিরূপণ॥
সুরধনি তিরে ধাম ধন্য বহরা গ্রাম গঙ্গাকিশোর নাম দ্বিজদিন অতি॥
চন্দ্রতেজ করি চুর তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর ভুবনে দ্বিতীয় শূর মহারাজা তাঁর অধিকারেতে বসতি॥
গ্রন্থে কোন থাকে ভুল গুনিগণ দিবে কুল দোষ ছাড়া নাহি মূল সাধুজনে আছয়ে প্রকাশ॥
অল্প দোষে সুধাকরে কি করিতে পারে তাঁরে গঙ্গাধর ধরে শিরে
অন্ধকার ঘোরতরে করয়ে বিনাশ॥

১৮১৯-২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ৩য় বার্ষিক কার্যবিবরণীতে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর তালিকায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের নাম আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যসাধক চরিতমালার সপ্তম গ্রন্থে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের বিষয় লিখিয়াছেন।

ব্যাপটিস্ট মিশনারিগণ শ্রীরামপুরে বাঙলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করিলে গঙ্গাকিশোর কম্পোজিটর রূপে মিশনের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। এইখানে তিনি ছাপাখানার সমস্ত কাজকর্ম শিখিবার সুযোগ পান। শ্রীরামপুরে কিছুকাল কাজ করিবার পর তিনি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য কলিকাতায় আসেন। এবং কলিকাতায় একটি অফিস ও বইয়ের দোকান খোলেন ও "বাঙ্গাল গেজেটি" নামে বাঙলী-প্রবর্তিত প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহার পর হরচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হওয়ায় তিনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে "বাঙ্গালা গেজেটি যন্ত্রালয়" নিজ গ্রাম বহরায় লইয়া যান। ইহার উল্লেখ ১৮২০ খৃষ্টাব্দের 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় আছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ জুন মাসের আগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। লং সহেবের বাঙলা পুস্তকের তালিকায় গঙ্গাকিশোরের নাম গঙ্গাধর বলিয়া লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ দুই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। গঙ্গা-কিশোর সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য ৪২৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।

পার্শ্ববর্তী পার-গোপালনগর গ্রামের মিত্রগণ সুবিখ্যাত। শশীভূষণ মিত্র কলিকাতা সহরে ব্যবসায়ের দ্বারা প্রভূত ধনোপার্জন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বটকৃষ্ণ ও ২য় পুত্র ধনকৃষ্ণ ও অন্যান্য পুত্রগণও ব্যবসায়ী। ইহাদের পরোপকারিতা প্রসিদ্ধ। ইহারা পাঁচ ভ্রাতাই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার আজীবন সভ্য ছিলেন এবং স্বগ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হন।

সিঙ্গুরের মাটিতে সেকালে বহু শিল্পী, গায়ক, পটুয়া ও লোককবি জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু সামন্ত রাজাদের আমলে এমন কি মুসলিম শাসকদের আমলেও এই সমস্ত শিল্পী, পটুয়া, পল্লী-কবিদের মর্যাদা ছিল। তৎকালীন শাসকরাই তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাহাদের মর্যাদা লোপ পায় বলিয়া পেটের দায়ে তাহারা নিজ ধর্মচ্যুত হইয়া অন্য পেশা গ্রহণ করে।

সিঙ্গুর থানার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের জনসংখ্যা

নাম	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
গোপালনগর	১২,৯৯০	৬,৬৭০	৬,৩২০
বলরামবাটী	১৬,৬১৯	৮,৫২১	৮,০৯৮
সিঙ্গুর	১৪,৯০২	৭,৯০৩	৬,৯৯৯
আনন্দনগর	১৬,১৬০	৮,৪৬৯	৭,৬৯১
নসিবপুর	১২,৬৭২	৬,৬২৬	৬,০৪৬
বড়া	১৭,৫৭২	৯,১৫৩	৮,৪১৯

॥ হরিপাল ॥

হরিপাল—ইহার পুরাতন নাম সিমুল। "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নৃপতি কুলপালের হরিপাল ও অহিপাল নামে দুই পুত্র ছিল। হরিপাল সিংহপুর বা সিঙ্গুরের পশ্চিমে হাটবাজার ও দীঘি-সরোবর শোভিত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া স্বীয় নামানুসারে উহার নাম "হরিপাল" রাখেন। এই হরিপালের কন্যা কানড়ার বীরত্ব কাহিনী মানিকরাম গাঙ্গুলী প্রণীত ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে। গৌড়েশ্বর ধর্মপাল কানড়ার সৌন্দর্য ও সাহসের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য হরিপালের নিকট ভাট প্রেরণ করেন। গৌড়েশ্বরের প্রতাপে ভীত হরিপাল তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত থাকিলেও কানড়া এই বিবাহে অসম্মত হন। ধর্মপালের তরুণ সেনাপতি মহাবীর লাউসেনের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া কানড়া মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ভাটকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়া দেন। ক্রুদ্ধ গৌড়েশ্বর সসৈন্যে সিমুল বা হরিপাল আক্রমণ করিলে পুরবাসীসহ রাজা হরিপাল হইতে দূরে পলায়ন করেন। একমাত্র দাসী ধুমসীকে সঙ্গে লইয়া বীরবালা কানড়া রণসাজে সজ্জিত হইয়া গৌড় সেনাবাহিনীর সম্মুখবর্তী হইলেন। তাহার অপূর্ব রণসজ্জা দেখিয়া গৌড়াধিপতি ও তার সৈন্যগণ অস্ত্র সংবরণ করিলেন। তখন সম্মুখবর্তী বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর ধর্মপালকে সম্বোধন করিয়া কানড়া বলিলেন যে, তাহার একটি পণ আছে যে, যে ব্যক্তি তরবারির একচোটে একটি লৌহ নির্মিত গন্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিবে তাহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন। এই দুষ্কর কার্য স্বীয় শক্তির সাধ্য নহে বিবেচনা করিয়া গৌড়েশ্বর গৌড় হইতে সেনাপতি লাউসেনকে সংবাদ দিয়া আনয়ন করিলেন। ধর্মের বরপুত্র লাউসেন তরবারির একচোটে লৌহ গন্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। তাহার কণ্ঠে বরমাল্য প্রদানে উদ্যতা রাজপুত্রীকে বলিলেন যে, তাঁহার প্রভু গৌড়েশ্বরের আদেশ-ক্রমেই তিনি এই দুষ্কর কার্য সাধন করিয়াছেন। সুতরাং কানড়ার বরমাল্য ধর্মপালের কণ্ঠেই শোভা পাওয়া উচিত। কানড়া তাঁহার এই যুক্তি না শুনিয়া তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। এই সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ পরে বিবৃত হইয়াছে।

মহারাজ শশাঙ্কের রাজত্বের পর হইতে পাল রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশ বহু বিদেশী রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। সেই জন্য উক্ত সময়ে বঙ্গদেশে কোন প্রকারের শান্তি ছিল না। সেই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিয়া সন্ধাকর নন্দী বঙ্গদেশকে 'মাৎস্যন্যায়ের' সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'মাৎস্যন্যায়' বলিতে অরাজকতা বুঝায়। দেশে নানারূপ বিদ্রোহ ও অশান্তি চলিতেছিল বলিয়া শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করিবার জন্য প্রজাপুঞ্জ পাল বংশের প্রথম রাজা গোপাল দেবকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিল। ধর্মপালের তাম্রশাসনেও তিনি যে অরাজকতা হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য জনসাধারণ কর্তৃক অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন ঃ

Bengal suffered from prolonged anarchy which become so intolerable that the people (C. A. D. 750) elected as their King Gopal of the race of the sea, in order to introduce settled Government. (The Oxford History of India.)

গোপালদেব পাল বংশের প্রথম রাজা; তিনি প্রৌঢ় বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পকাল রাজ্য শাসন করিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। গোপালদেব ৭৯০—৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেহত্যাগ করেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ধর্মপাল রাজা হন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন, এবং পাল রাজাদের গৌরব তাঁহার দ্বারাই সারা ভারতময় প্রচারিত হয়। সমগ্র উত্তর-ভারত তিনি জয় করেন এবং তাঁহাকে বঙ্গ, বিহার ও উত্তর-ভারতের নৃপতি বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি কিরূপ দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন, তাহা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত খালিমপুর তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায়। ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং মগধ বঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমে তিনটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন।

ধর্মপালের পর দেবপাল এবং দেবপালের পর বিগ্রহপাল রাজা হন। বিগ্রহপাল বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন বলিয়া তাঁহার পুত্র নারায়ণ পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহীপাল ৯৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি জনপ্রিয় নৃপতি ছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ গীতাবলী অদ্যাবধি বঙ্গদেশের সর্বত্র শ্রুত হইয়া থাকে।

পালবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের বহু স্থানে তাঁহাদের নানা শাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রচলিত আছে; তাঁহারা ভূ-স্বামী বা ভুঁইয়া নামে জনসাধারণে পরিচিত হইয়াছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হুগলী জেলায় রাজা কুলপাল সতীদেবীর বরে সেইরূপ একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

যে সময় পাল নৃপতিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই সময় পালবংশীয় কুলপাল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'মহাবলবান' ও 'দেশপালক' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল. জ্যেষ্ঠ হরিপাল এবং কনিষ্ঠ অহিপাল। জ্যেষ্ঠ হরিপাল হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুরের পশ্চিমে নিজ নামানুসারে হট্টবাপিযুক্ত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় ব্রাহ্মণ, তন্তুবায় ও সাঙ্গাই ব্রাহ্মণদিগের রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই সম্বন্ধে 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক প্রাচীন গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি:

"সতীদেব্যা বরনৈব ভীমভুজবল পুত্রকঃ॥ ৬৭৭
কুলপালো দেশপালো বিখ্যাতঃ পশ্চিম তটে।
কুলপালস্য দ্বৌ পুত্রৌ হরিপালো অহিপালকৌ॥ ৬৭৮
জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুর পশ্চিমে স্বনামবসতিং কৃত।
হরিপালো মহাগ্রামো হট্টবাপীসমন্বিতঃ॥ ৬৭৯
হরিপালো হি তত্রৈব তন্তুবায়স্য গোষ্ঠীষু।
রাজা বভূব বিপ্রেষু সাঙ্গায়ি সংজ্ঞকেষু চ॥" ৬৮০

রাজা হরিপালের কানড়া নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য

গৌড়েশ্বর রাজা হরিপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং রাজকুমারী বৃধ রাজাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়ে' লিখিয়াছেনঃ

"হরিপাল রাজার কন্যা কানড়া পরমা সুন্দরী; বৃদ্ধ গৌড়াধিপ, হরিপালের নিকট তদীয় কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া দূত প্রেরণ করেন। বৃদ্ধ রাজার হস্তে তরুণী সুন্দরী কন্যাকে প্রদান করিতে হরিপাল অনিচ্ছুক, কিন্তু গৌড়েশ্বরের অসীম পরাক্রম স্মরণ করিয়া ভীত। রাজকুমারী কানড়ার প্ররোচনায় রাজা অবশেষে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর দিলেন। গৌড়েশ্বরের সৈন্য হরিপালের রাজ্য অবরোধ করিল এবং রাজকুমারী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। তাঁহার সাহায্যার্থে স্বয়ং চণ্ডীদেবী তদীয় ডাকিনী ধূমসীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং গৌড়েশ্বরের সৈন্য পরাজিত হয়।"

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্তী রচিত 'শ্রীধর্মমঙ্গলে' রাজকুমারী কানড়ার যুদ্ধের একটি বিবরণ আছে। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলামঃ

"সেনাগণ দানাগণ সমরে নিদারুণ
দুদলে করে হানাহানী॥
রঙ্গিনী রণজয়ী দুন্দভি বাজই
ঘর ঘোর গাজই দামা।
রাজপুত্র মজবুত যৈছন যমদূত
সমযুত বুঝে খানসামা॥
ঘুড়ী পীঠে কানড়া ঝাঁকে ঝাঁকে ঝকড়া
ঝাপটে ঝিকে ঝুপ ঝুপ।
না মানিয়া সংশয় রণজিৎ রণজয়
রোষে বীর রণভীম ভূপ॥
করয়ে অর্জ্জন ঘোরতর গর্জ্জন
দুর্জ্জন দানাগণ দর্পে।
সংগ্রামে সেনাগণ সংহারে যৈছন
ক্ষুধিত খগপতি স্বর্পে॥"

ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেনের পুত্র লাউসেনের সহিত রাজকুমারী কানড়ার বিবাহ হয়। ধর্মমঙ্গলসমূহে ইঁহাদের বিষয় লিখিত আছে। ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ঘটনা।

বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক কিছু জানিবার উপায় নাই—কারণ এখানকার জলবায়ুর প্রভাবে এবং ধ্বংসলীলার জন্য প্রাচীন কীর্তিসমূহ অধিকাংশ স্থানেই মৃত্তিকা-ভ্যন্তরে নিহিত আছে। বগুড়া জেলার মহাস্থান, দিনাজপুর জেলার বাইগ্রাম এবং হুগলী জেলার মহানাদ খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় কথা জানা গিয়াছে। কৈকালা গ্রামে প্রাপ্ত দত্তাত্রেয় মূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় হুগলী তথা

সমগ্র বাংলার সহিত দাক্ষিণাত্যের যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল তাহা প্রমাণ হয়।

হরিপালের চতুঃপার্শ্বস্থিত কয়েকখানি গ্রামের নাম হইতে শিলস্ ফ্রি কলেজের হেড মাষ্টার এবং ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদক কবি রাধামাধব মিত্র ১২৯৯ সালে 'তোমার কথা' নামক একটি কবিতায় এই স্থানে যে পূর্বে রাজধানী ছিল তাহা লিখিয়াছিলেন। নিম্নে উক্ত কবিতাটির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইলঃ

"সমীপস্থ গ্রামের অভিধান
তাতে রাজধানী ছিল, সপ্রমান।
'বন্দীপুর' কারাগার বুঝা যায় ভাবে,
'হাতশেওলা' হাতীশাল লোকে অনুভবে।
'নইটি' যে নবহাট কে আর না কয়,
'চিত্রশাল' ছবিঘর অমূলক নয়।
রাজার নিশ্চয় ছিল, প্রকাণ্ড ভাণ্ডার
তাইতো 'ভাণ্ডারহাটী' নাম হয় তার।
প্রতিষ্ঠিত ভগবতী দেবীর ভবন,
'ভগবতীপুর' নাম হয়েছে গ্রহণ।
ছিল বলি নৃপতির জামাতার-বাটী,
তাইতো হয়েছে নাম 'জামাই-বাটী'।
ছিল বলি নৃপতির বড় আম্রোদ্যান,
হইয়াছে 'আম্রোগেছে' সেতো অ্যাখ্যান।
'জেজুরে' যে পূর্বে ছিল রাজার ভবন
লক্ষণেতে হ'লো প্রায় সংশয় ভঞ্জন।
রাজধানী ছিল বটে, বুঝা যায় ভাবে
বলিতে না পারা যায় কোন্ কালে কবে?"

রাজা হরিপালের রাজ্য ষোল ক্রোশব্যাপী বিস্তৃত এবং ইহা সাতাশটি পটিতে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে এক-একটি পটি এক-একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে এবং পূর্বের বহু নামও বর্তমানে পরিবর্তিত হইয়াছে। কৌশিকী নদীতীরে অবস্থিত এই সুন্দর স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব মনোরম ছিল। মাণিক গাঙ্গুলী ধর্মমঙ্গলে লিখিয়াছেন ঃ

"নগরের শোভা স্বর্গসম কিবা
দেখে মনে মোহ পায়।
শ্রীধর্ম চরণ, করিয়া স্মরণ,
দ্বিজ শ্রীমানিক গায়॥"

হরিপাল বর্তমানে হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম; কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইষ্টার্ন রেলওয়ের তারকেশ্বর লাইনে ইহা একটি প্রধান স্টেশন। ধর্মমঙ্গলসমূহে রাজা হরিপালের প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও, হরিপালে তাঁহার কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন নাই।

হরিপাল নামক স্থান পূর্বোক্ত সাতাশটি পটির অন্যতম প্রধান পটি ছিল এবং ইহার পূর্ব নাম 'সিমুলাই' বলিয়া খ্যাত ছিল। সূক্ষ্ম কার্পাস সূত্র নির্মিত বস্ত্রের জন্য এই স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অদ্যাপি হরিপালে বহু তন্তুবায় বাস করেন এবং এই স্থানের প্রস্তুত বস্ত্রাদি 'সিমুলাই কাপড়' বলিয়া বঙ্গের সর্বত্র পরিচিত। তৎকালে সিমুলাই যে সমৃদ্ধশালী নগর ছিল, তাহা নিম্নোক্ত দুইটি পঙ্‌ক্তি হইতে প্রতীয়মান হইবেঃ

"সাক্ষাৎ সোনার লঙ্কা সিমুল নগর।
ব্রাহ্মণ বেষ্টিত তায় যেমন সাগর॥"

হরিপালের ষোল ক্রোশব্যাপী রাজ্যের মধ্যে পাঁচটি গড় ছিল—বাহির গড়, পাথর গড়, লোহার গড়, তামার গড় এবং ভিতর গড়। এই গড়গুলি বর্তমানে বিভিন্ন গ্রামে পরিণত হইয়াছে। বাহির গড় নামক স্থান অধুনা বাহিরগড়া নামক গ্রামে পরিণত হইয়াছে এবং ইহা জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত। এই গ্রামে বর্তমানে রাজা বিষ্ণুদাসের বংশধরগণ বাস করেন। এই সম্বন্ধে ঘনরাম চক্রবর্তী যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

"ধন কড়ি ধান্য কেহ রাখে মাটি খুঁড়ে।
সভয় সকল লোকে ষোল ক্রোশ জুড়ে॥
রাজার মোকামে সবে দেখে শূন্যাকার।
চীল উড়ে গগনে বাহির গড় পার॥"

গৌড়ের রাজার সহিত রাজা হরিপালের যুদ্ধ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেনঃ

He (Emperor of Gauda) also sent Lau Sen to punish King Haripal who had refused the old Emperor's proposal to marry his young and beautiful daughter Kaneda. A battle ensued in which the army was led to the field by the lovely princess herself. The encounter between her and our hero was sharp and aniented, but she could not long withstand the superior skill and heroism of Lau Sen and King Haripal was ultimately forced to submit Kaneda was, however, given in marriage to Lau Sen with the consent of the Emperor. (Bengali Language & Literature)

॥ রাজা হরিপাল প্রতিষ্ঠিত বিশালক্ষী দেবী ॥

হরিপাল রাজার প্রতিষ্ঠিত বিশালক্ষী দেবীর মূর্তি অদ্যাপি এই গ্রামে বিদ্যমান আছে এবং ইহা বর্তমানে চণ্ডালকন্যা বিশালক্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ: এই স্থানে বহু নরবলি হইয়াছে। বিশালক্ষী দেবীর 'চণ্ডালকন্যা বিশালক্ষী' নামকরণ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে। বহুদিন পূর্বে এই স্থানে বহু চণ্ডাল রাজার সৈনিকের কার্য করিত। জনৈক চণ্ডাল দলপতি তাহার পুত্রের বিবাহ দিয়া দেবীকে প্রণাম করিবার জন্য বর ও কন্যাকে লইয়া মণ্ডপে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহার নিকট প্রণামী না থাকায় বর-কন্যাকে তথায় রাখিয়া সে প্রণামী আনিতে যায়; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর কন্যাকে দেখিতে পায় না। অথচ দেবীর মুখে চেলীর কিয়দংশ ঝুলিতেছে দেখিতে পায়। চণ্ডাল ক্রন্দন করিতে করিতে

প্রার্থনা জানাইল—"মা কন্যাকে ফিরাইয়া দেন।" প্রত্যাদেশ হইল "আমি কন্যাকে খাইয়া ফেলিয়াছি—আজ হইতে আমাকে যেন চণ্ডালকন্যা-বিশালক্ষী বলিয়া অভিহিত করা হয়।"

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও হরিপাল একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে রাজবলহাট হইতে এজেন্সী হরিপালে স্থানান্তরিত হয়। হরিপালে কোম্পানীর অধীনে একজন ইংরাজ 'রেসিডেণ্ট' ও একজন ইংরাজ ডাক্তার থাকিতেন। ইহাদের কতকগুলি গোমস্তা ও সরকার সোনামুখী, কৈকালা, দ্বারহাট্টা প্রভৃতি স্থানে তাঁতীদিগকে দাদন দিয়া তসর, গরদ, ও নানাবিধ সুতার কাপড় বুনাইয়া লইত। হুগলীর কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে এই এজেন্সী পরিচালিত হইত; ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিলে এই এজেন্সীগুলি উঠিয়া যায় এবং ওয়াটসন কোম্পানী উহা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। এই সম্বন্ধে শ্রীঅশোক মিত্র ডিস্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক (হুগলী) গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ

> **Cotton cloths are manufactured on hand-looms in considerable quantities in the neighbourhood, Haripal and Dwarhatta being centres of the industry.**

হরিপাল ও তাহার পার্শ্বস্থিত গ্রামগুলিতে বহু প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, বিচারপতি হরিনাথ রায়, মহাকবি গিরিশচন্দ্র মৌলভী বজলাল করিম, নীলকমল মিত্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের এই অঞ্চলে বাসস্থান। হরিপালের রায় বংশ ও ভড় বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। রায় বংশের বহু কীর্তি অদ্যাপি এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী বামাচরণ ভড় হরিপালের মৃতকল্পা কৌশিকী নদীর সংস্কারের জন্য এক সময় ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ডেপুটি কালেক্টার নিত্যানন্দ ভড় ও তাহার পুত্র ব্যারিষ্টার সতীশচন্দ্র ভড় এখানে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত ডিটেকটিভ বকাউল্লা সাহেবের নিবাসও হরিপালে ছিল।

ইহা ছাড়া ঘোষ, চৌধুরী ও গঙ্গোপাধ্যায় বংশেরও খ্যাতি আছে। নাট্যসম্রাট মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ হরিপালের ঘোষবংশ সম্ভূত। এখনও ঘোষপাড়ায় তাঁহার বাস্তুভিটা বিদ্যমান আছে। তাঁহার সম্বন্ধে ৪৫৩-৪৫৬ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে বেলুড় মঠে **"গিরিশ-ভবন" হইয়াছে**। সাহিত্য ক্ষেত্রে টেকচাঁদ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধামাধব মিত্র, রসিকচন্দ্র রায়, বিপ্লবী দেবব্রত বসু, অতুল্য ঘোষ এবং বংশ-পরিচয়ের লেখক জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার হরিপাল থানার অধিবাসী ছিলেন।

হরিপালে গুরুদয়াল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, বালিকা বিদ্যালয়, সাব-রেজেস্ট্রি অফিস, থানা প্রভৃতি সমস্তই আছে। এই থানার অধীনে আটটি ইউনিয়ন বোর্ড বর্তমানে আছে; ইউনিয়ন বোর্ডগুলির নাম জেজুর, কৈকালা, ফরিদপুর, ইলিপুর, বন্দীপুর, দ্বারহাট্টা, হরিপাল ও নালিকুল। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনস্থ গ্রামগুলি এক সময় বিশেষ সমৃদ্ধ ও সঙ্গতিপন্ন লোকের আবাসস্থল ছিল; কিন্তু ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে এই অঞ্চলে দেখা দিবার পর হইতেই গ্রামগুলির অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে মহামারীর সময় এই স্থানে একটি সরকারী চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের সহানুভূতির অভাব বলিয়া উক্ত

চিকিৎসালয় সরকার বাহাদুর বন্ধ করিয়া দেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে জেলা বোর্ডও এই স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া ছিলেন, কিন্তু অর্থের অনটন বলিয়া কিছুদিন পরে তাহা তুলিয়া দেন। হরিপালের কার্পাস-সূত্র নির্মিত বস্ত্র অদ্যাপি **'সিমলাই কাপড়'** বলিয়া বঙ্গদেশে খ্যাত। বর্তমানে বালির জন্যও এই স্থান প্রসিদ্ধ। বালির ব্যবসা সম্বন্ধে ৫৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

॥ রায় বংশ ॥

হরিপলের রায়বংশ পূর্বে দানধ্যান ও বিবিধ হিন্দুধর্মোক্ত ক্রিয়াকলাপাদির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শিবদাস মজুমদার এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা—তাঁহার সাত ছেলে ছিল বলিয়া তাঁহারা "সাতবাড়ির রায়" বলিয়া প্রখ্যাত। রায় বংশে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ইউরোপীয় স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর নন্দদুলাল রায়, একজামিনার অফ মিলিটারী একাউন্টস যোগীন্দ্রনাথ রায়, ইনকামট্যাক্স অফিসার শৈলেন্দ্রপ্রসাদ রায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের শরৎচন্দ্রের রায়ের নাম উল্লেখ্য। বর্তমানে শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় এই বংশের প্রবীনতম ব্যক্তি।

হরিপালে বহু প্রাচীন মন্দির আছে। তন্মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত রায় বংশের **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর মন্দির** বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মন্দিরগাত্রে কারুকার্যখচিত ইঁটে বহু দেবদেবীর লীলা কাহিনী অঙ্কিত আছে। মন্দির ১১৪৪ শকাব্দে মেরামত করা হয় বলিয়া লেখা আছে। মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরের ছাদ ভগ্ন হইলে পরবর্তী-কালে উহা করোগেটের টিন দিয়া ছাউনি করায় মন্দিরের সৌন্দর্য অনেকখানি নষ্ট হইয়াছে। রাধাগোবিন্দের রাসমঞ্চটি স্থাপত্যশিল্পের একটি অপূর্ব নিদর্শন। বৃহৎ তোরণের মত ইহার সম্মুখভাগ এবং চারিদিকে চারটি গম্বুজ ও মধ্যে গম্বুজের উপর একটি বড় চূড়া ইহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। রাসমঞ্চের সম্মুখস্থ সুবৃহৎ চাতালে অষ্টসখীর নামানু-সারে আটটি তুলসীমঞ্চে রোপিত তুলসীবৃক্ষ স্থানটিকে মধুময় করিয়াছে। প্রতিটি তুলসী-মঞ্চে সখীদের নাম খোদিত আছে। নামগুলি এইঃ চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, ললিতা ও বিশাখা। সংস্কার করিবার জন্য মন্দির ও রাসমঞ্চের জীর্ণাবস্থা হয় নাই বটে তবে প্লাস্টার করিবার সময় অনেক চিত্রের উপর বালি লেপিয়া উহার সৌন্দর্য নষ্ট করা হইয়াছে। রাধাগোবিন্দের দোলমঞ্চও আছে।

রায়েদের বুড়ো শিবের মন্দিরও খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া আরও পাঁচটি শিবমন্দির বর্তমানে বিদ্যমান আছে ও দুইটি পড়িয়া গিয়াছে। বর্ধমানের মহারাজা প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির ও ভড়েদের জোড়া শিবমন্দির ১৭৪৫ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লেখা আছে। ভট্টাচার্যদের **আনন্দদেবের মন্দির** (বর্তমান সেবায়েত নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়) ও কালীমাতার মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। কালীমন্দিরে এখন কোন প্রতিমা নাই, তামার ঘটে প্রত্যহ পূজা হয়। রায় বংশের কুলপুরোহিত শ্রীঅমিয়কুমার হড় ইহার সেবায়েত। হড়েদের কৌলিক উপাধি চট্টোপাধ্যায়। তারাচাঁদ হড় এই বংশের আদি পুরুষ। পাণ্ডিত্যে ও অমায়িকতার জন্য হড় বংশের পূর্বে খ্যাতি ছিল। কালীমাতার মন্দির ১১৪৯ সালে নির্মিত হয় বলিয়া দেখা যায়।

রায় বংশের দুর্গোৎসব কেবল প্রাচীন নয়, ইহাদের দুর্গা প্রতিমারও কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহাদের দুর্গা প্রতিমার কার্তিক ও গণেশ উপরে থাকেন এবং তাঁহাদের নীচে থাকেন সরস্বতী ও লক্ষ্মী। এক পক্ষকাল ধরিয়া দেবীর কল্প হয় এবং কলাবউ হয় তিনটি। বলি হয় নয়টি—চারটি ছাগল, একটি ভেড়া, একটি মহিষ, একটি আখ, একটি কুমড়া ও একটি লেবু। মহিষবলি দেখিতে পূজার সময় হরিপালে বহুলোকের সমাগম হয়।

হরিপাল বিবেকানন্দ সংসদ কর্তৃক ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে **হরিপাল মহাবিদ্যালয়** স্থাপিত হইয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য মহাবিদ্যালয়ের সম্পাদক এবং তাঁহারই আপ্রাণ চেষ্টায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হরিপাল রেলওয়ে স্টেশনের পশ্চিমে পঞ্চাশ বিঘা জমি সংগৃহীত হইয়াছে এবং শীঘ্রই উহার সুরম্য ভবন নির্মিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কৈলাসচন্দ্র সাধারণ পাঠাগার

হরিপালের কৈলাসচন্দ্র পাঠাগার হুগলী জেলার গৌরব। এই পাঠাগারের বিষয় শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য ১৩৬০ সালেব ২২শে বৈশাখ "দৈনিক বসুমতী" পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

বহুদিন সুপ্ত জাতি একদিন হঠাৎ পেল নবচেতনার বাণী—জোয়ার এলো জাতির জীবনে, দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়লো তার সৃষ্টিপ্রয়াসী কর্মপ্রবাহ দুকূল ছাড়িয়ে। জাতীয় জীবনে জোয়ার-ভাটা এক ঐতিহাসিক সত্য। তেমনি জোযার এসেছিল বাঙ্গালীর জীবনে অসহযোগ আন্দোলনের সময়। ১৯২১ সালের কথা সে। তারি ফলে গড়ে উঠতে লাগলো জাতীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আর বিদ্যায়তনগুলি। হরিপাল কৈলাসচন্দ্র সাধারণ পাঠাগারের মতো দু-চারটি ছাড়া সে সময়ে গড়ে-উঠা প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকতে পারেনি। বাজরোষে ও অন্যান্য নানা কারণে। একটা জাতি যখন জাগে তখন সব দিক দিয়েই তার অগ্রগতি সমান তালে চলে। পরবর্তীকালে অনেক সময় কাজের আসল কারণ হারিয়ে যায়—আর চোখে পড়ে না। তেমনি হরিপাল কৈলাসচন্দ্র পাঠাগারের আরম্ভের ইতিহাসে কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের গ্রন্থাগার আন্দোলনই সব কথা নয়, জাগ্রত জাতির উদ্বুদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার এ একটা চিহ্ন—অবশ্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূলেও আসলে ওই এক কথাই রয়েছে।

হরিপাল হুগলী জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। অসহযোগ আন্দোলনে এ গ্রাম কর্মী-দের কর্মকেন্দ্র পরিণত হয়েছিল। এখানে সমাবেশ হয়েছিল বহু কর্মীর, আজীবন দেশসেবক শ্রীধরানাথ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় কাজ চলছিল এ জায়গায়। বিশেষ করে তাঁরি চেষ্টায় সে সময় গ্রামোন্নয়নেব কাজও চলতে থাকে। সে সময়ে উন্নত কোন পাঠাগার ছিল না এ অঞ্চলে। কদাচিৎ দু-একজন উৎসাহী যুবক নিজের বৈঠকখানায় সামান্য বই যোগাড় কবে বন্ধুবান্ধবদের পড়তে দিতেন ও তার পরিচয় দিতেন সাধারণ পাঠাগার বলে। আসলে এর ভাণটাই ছিল প্রকাণ্ড, সমাপ্তি ঘটতো শুধু পরিচয় দেওয়াতেই। এর থেকে একটা কথা বোঝা যায়, গ্রন্থাগারের অভাব সে অঞ্চলে অনুভূত হচ্ছিল আর সদিচ্ছাও ছিল লোকের লাইব্রেবী প্রতিষ্ঠার। ঠিক এই রকম যখন অবস্থা সেই সময় এ

কাজে হাত দিলেন শ্রীধরানাথ ভট্টাচার্য ও তাঁর সহকর্মীরা। আর স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের কাছ থেকেও সাড়া পাওয়া গেল। ধরানাথ ভট্টাচার্যের সহকর্মীদের ভেতর এ ব্যাপারে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের ভেতর শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগোবর্ধন মল্লিকের নাম করা যায়। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় যুবকদের চেষ্টাও বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ চেষ্টাকে সত্যিকারের কার্যে পরিণত করেছেন হরিনাথ ভড় মহাশয়। তাঁর পিতা কৈলাসচন্দ্র ভড়ের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি শুধু যে গ্রন্থাগার ভবনের জায়গা দান করেছেন তাই নয়, বহু অর্থ ব্যয়ে পাঠাগারের নিজস্ব সুপ্রশস্ত ভবনও তিনিই নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন। পাঠাগার ভবনটি গ্রামের মধ্যস্থলে জেলা বোর্ডের রাস্তার উপর অবস্থিত। এর নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় ১৯২১ সালে ও ১৯২৩ সালে গৃহ নির্মাণকার্য শেষ হয়। পুস্তক সংগ্রহ ও বই লেন-দেন সেই সময় থেকেই চলতে থাকে। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বসাধারণের নিকট পাঠাগার ভবন উন্মুক্ত হয় ১৯২৫ সালে ও ১৯২৬ সালের ১৭ই আগস্ট আইনমতে তা রেজিস্ট্রী করা হয়। আরম্ভে অনেকেই নানাভাবে সাহায্য করেছেন এ পাঠাগারকে। পুস্তক ও আসবাবপত্র দিয়ে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের ভেতর জিতেন্দ্রনাথ বসু, দ্বারিকানাথ সরকার, আশুতোষ দাস, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য প্রভৃতি। পাঠাগারের প্রথম সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র রায়চৌধুরী ও তাঁর ভাই সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী নিজেদের নিঃস্বার্থ সেবা ও সুপরিচালনায় পাঠাগারকে অল্পদিনের ভেতরেই বিশেষ জনপ্রিয় করে তোলেন। তারপর দেখতে দেখতে পাঠাগার এই অঞ্চলের কৃষ্টিমূলক আলাপ-আলোচনা ও কার্য কলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠলো।

'হুগলী জেলার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের মন্তব্যের কিয়দংশ তুলে দিলেই পাঠাগার ভবন ও পাঠাগারের অবস্থা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, "হুগলী জেলার ইতিহাস রচনা করিবার জন্য হুগলী জেলার সহস্রাধিক গ্রাম দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, কিন্তু কোন গ্রামের মধ্যে পাঠাগারের এইরূপ সুরম্য নিজস্ব ভবন আমার নয়নগোচর হয় নাই। পল্লীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে এইরূপ গ্রন্থাগার দেখিয়া আমার নিজেরই এই ভবনে থাকিয়া কিছুদিন পড়াশুনা করিবার ইচ্ছা হইতেছিল। যাঁহারা গবেষণা করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই পাঠাগারে বসিয়া গবেষণা করিলে সুফললাভ করিবেন বলিয়া আমার দৃঢ়বিশ্বাস। গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি সুনির্বাচিত।"

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পাঠাগারটিতে গ্রন্থ সংগ্রহ পরিমাণে যথেষ্ট ও সুনির্বাচিত বলিয়া বোধ হইল।... পল্লীগ্রামে এমন একটি পাঠাগার প্রায়ই দেখা যায় না।..." এর থেকেই হরিপাল কৈলাসচন্দ্র সাধারণ পাঠাগারের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঠাগার সভ্যদের চাঁদার উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে চললেও তারকেশ্বর এস্টেট থেকে বার্ষিক ৬০ টাকা, হরিপাল ইউনিয়ন বোর্ড থেকে বার্ষিক ৫০ টাকা ও হুগলী জেলা বোর্ড থেকে বার্ষিক ২০ টাকা করে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। পাঠাগারের বর্তমান সভ্যসংখ্যা ১৭৫ জন ও চাঁদা মাসিক ছয় আনা করে। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য পাঠাগার সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে নটা ও বিকালে সাড়ে তিনটা থেকে ৬টা পর্যন্ত খোলা রাখা

হয়ে থাকে। পাঠাগারে বসে সাধারণের পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পাঠাগারের বর্তমান গ্রন্থসংখ্যা ৩২০০ খানা, কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য বই এ লাইব্রেরীতে রয়েছে। এর গ্রন্থ সংগ্রহ সুনির্বাচিত ও সত্যি ভালো, লাইব্রেরী যাঁরাই দেখেছেন, গ্রন্থ সংগ্রহের প্রশংসা করেছেন তাঁরাই। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি এখানে সংগৃহীত হইয়াছে।"

॥ স্বামী জ্ঞানানন্দ ॥

তারাপীঠ ভৈরব নামক গ্রন্থে শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

হরিপালের (তারকেশ্বর লাইনে) অন্তর্গত গবাটি গ্রামে ১৩১৬ সালে এক বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় বংশে এক শিশুর জন্ম হয়। ভাগ্য বিড়ম্বনায় পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শিশুর পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতৃবিয়োগে শিশুটি খুবই ক্ষুণ্ণ হয় ও পিতার অভাব অনুভব করে; সহসা এক রাত্রে শিশু স্বপ্ন দেখ্লো, বামদেব স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে বলেছেন, "বাবা নেই বলে ভয় কি বাবা, আমি আছি।" শিশু অবস্থায় এই ঘটনায় বামদেব সম্বন্ধে অজ্ঞাত হলেও ইহার গুরুত্ব বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বালকের ভবিষ্যৎ জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটায়। জাঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত ফুরফুরিয়া ইউনিয়নের ইউ, পি, বিদ্যালয় হতে ফেরবার পথে কোন এক মধ্যাহ্নে বালক এক বৃক্ষমূলে বসে আপন মনে ভাবছে, "বাড়ীতে দুধের সর চুরি করে খাই, বকুনি খাই আর বিদ্যালযে পড়া পারি না, মার খাই, কি করি, কোথায় যাই, বকুনি ও চোরের হাত কি করে এড়াই ? আমার কি কেউ নেই ?" সহসা বালক দেখলো সম্মুখে মাটি হতে শূন্য অবধি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়েছে এবং ধোঁয়ার মধ্য হতে শিশু অবস্থায় দৃষ্ট স্বপ্ন মূর্তি পুনরায় আবির্ভূত হয়ে বলছেন, "তুই শালা ভয় পাস কেন ? তোর কেউ নেই, আমি আছি।" সহসা এই দৃশ্যে বালক আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভয় পেল। পরে বামদেবের পট দেখে বালক স্বপ্নের তাৎপর্য জ্ঞাত হয়। যৌবনে ধর্মপিপাসা বৃদ্ধি পায় ও দৈবচক্রে যুবক পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট তারা মন্ত্রে দীক্ষিত হন। যুবকের ১৩৩৩ সালে বিবাহ হয় কিন্তু ১৩৪১ সালে স্ত্রী বিয়োগ হয়। যুবক সন্ন্যাস গ্রহণ করে হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল তেলিখানা শ্মশানে সাধনায় মনোনিবেশ করেন ও প্রতি বৎসর বামদেবের আর্বির্ভাব উৎসব পালন করেন। উৎসবে প্রায় ১০।১২ হাজার দরিদ্র নারায়ণ ও ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ইনি **স্বামী জ্ঞানানন্দ** নামে পরিচিত।

বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাস হইবার অব্যবহিত পরই হরিপালে সর্বপ্রথম দলিল রেজিষ্টারী পূর্বক সাতশত টাকা দিয়া জনৈক ভদ্রলোক বিবাহ বিচ্ছেদ করেন। নিম্নে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উক্ত সংবাদটি উদ্ধৃত হইল:

৭৫৫৲ দিয়া বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ॥ সম্প্রতি হরিপাল সাব রেজেষ্ট্রী অফিসে স্ত্রীকে ৭৫৫ টাকা দিয়া দলিল রেজেষ্ট্রী করিয়া জনৈক ভদ্রলোক বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। প্রকাশ, যুবতী স্ত্রীও ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, দীর্ঘদিন ধরিয়া শ্বশুর জামাতায় মোকদ্দমা চলিতেছিল। শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদে বিচারকের সম্মতি পাওয়া যায়। হরিপাল থানায় হিন্দুদের বিবাহ বিচ্ছেদের দলিল এই প্রথম সম্পাদিত হইল।

॥ দ্বারহাট্টা ॥

হরিপাল থানার অন্তর্গত দ্বারহাট্টা একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। প্রাচীন গ্রাম্য দেবতা দ্বারিকাচণ্ডীর নামানুসারে গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। হরিপাল স্টেশনের চার মাইল দক্ষিণে গ্রামটি বর্তমান। হরিপাল-গজা-রাজবলহাট রাস্তায় এখন বাস চলাচল করিতেছে বলিয়া যাতায়াতের বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। বাসের প্রধান রাস্তা হইতে এক মাইল পশ্চিমে কানাদামোদর নদীর তীরে দ্বারহাট্টা গ্রাম অবস্থিত। দ্বারহাট্টার বর্তমান জনসংখ্যা ১,৩৬৪ জন। পূর্বে এই গ্রামে ওলন্দাজ ও দিনেমারদের বাণিজ্যকুঠি ছিল।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলা তিনটি মহকুমায় বিভক্ত হয়। সদর দ্বারহাট্টা ও ক্ষীরপাই। দিনেমার শাষিত শ্রীরামপুর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্রয় করিলে উহা হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং দ্বারহাট্টা মহকুমা পরিবর্তন করিয়া শ্রীরামপুর মহকুমা করা হয়।

অতীতে দামোদরের মূল শাখা কানা দামোদরের খাতে প্রবাহিত হইত বলিয়া এই অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব সমৃদ্ধ ছিল। সুক্ষ্ম বস্ত্র নির্মাণের জন্য এই স্থানের খ্যাতি দেখিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বারহাট্টায় একটি আড়ং অর্থাৎ কারখানা স্থাপন করেন। হরিপালে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর এজেন্সী রাজবলহাট হইতে স্থানান্তরিত হয়। ইংরাজ রেসিডেণ্টের অধীনে কৈকালা, দ্বারহাট্টা, সোনামুখী প্রভৃতি গ্রামে তখন কোম্পানীর গোমস্তা ও সরকার তাঁতীদিগকে দাদন দিয়া তসর, গরদ ও নানাবিধ সুক্ষ্ম তাঁতের কাপড় বুনাইয়া লইত এবং উহা বিদেশে রপ্তানী হইত। এই সম্বন্ধে বিবরণ ১২৭ পৃষ্ঠায় আছে।

দ্বারহাট্টা গ্রামের নিকট কৌশিকী বিমলা ও দামোদর এই তিনটি নদীর অবস্থানের জন্য পূর্বে গ্রামের শোভা অপরূপ ছিল এবং স্থানীয় ব্যক্তিগণ ইংরাজদের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যে লিপ্ত থাকায় বিশেষ অর্থশালী ছিল। একটি গ্রামে ত্রিশটি মন্দির তাহার অন্যতম নিদর্শন। মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী এই গ্রামের অদূরে দ্বীপা গ্রামে আসিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিবার জন্য বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গৌরগোপাল বিগ্রহ অদ্যাপি দ্বীপায় আছে। কথিত আছে, দামোদরের প্রবল স্রোতে গৌরগোপালের পূজার দ্রব্য ভাসিয়া যাওয়ায় কৃষ্ণানন্দ দামোদর নদকে অভিশাপ দেন যে, তুই আমার পূজার দ্রব্য ভাসাইয়া দিলি দেখিতে পাইলি না—তোর চক্ষু কানা হইয়া যাক। আর তুই এই স্থান হইতে সরিয়া যা। বলা বাহুল্য তদবধি দামোদর নদ ছয় মাইল দূরে চাপাডাঙ্গার নিকট সরিয়া যায় ও দামোদর এই অঞ্চলে কানা দামোদর বলিয়া খ্যাত হয়।

দ্বারহাট্টা গ্রামে **দ্বারিকাচণ্ডীর মন্দির ও রাজরাজেশ্বর মন্দির** কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত। দ্বারিকাচণ্ডী দ্বিভুজা দুর্গামূর্তি। কিম্বদন্তী স্থানীয় একটি পুষ্করিণী হইতে সিংহরায় বংশের জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দেবীকে উত্তোলন করেন। তিনি দেবীর জন্য একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেবীর মন্দিরে প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে একটি শৃগাল দেবীর বেদীর উপর প্রস্রাব করায় উক্ত মন্দির পরিত্যাক্ত হয়। উহা এখনও বিদ্যমান আছে।

পরে মোহিনীমোহন সিংহরায়ের পূর্বপুরুষ বর্তমান মন্দিরটি তৈয়ার করিয়া দেন। মন্দিরের গায়ে "শুভমস্তু শকাব্দ ১৬৮৬" এই তারিখ উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের গায়ে ইঁটের অপূর্ব কারুকার্য একটি দর্শনীয় বস্তু। বর্তমানে মন্দিরের সম্মুখভাগ পড়িয়া

গিয়াছে এবং দেবীও অন্যত্র স্থানান্তরিতা হইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের অসংখ্য চিত্রে এই মন্দির সুশোভিত ছিল। একটি ইঁটের আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল। এই চিত্র হইতে সেকালের বাঙগালী শিল্পী কিরূপ দক্ষ ছিল তাহা জানিতে পারা যাইবে। মন্দিরের পশ্চাতে পঞ্চমুন্ডীর আসন ও পাশে দেবীর পুষ্করিণী এখনও আছে।

দুর্গাপূজার সময় দ্বারিকাচন্ডীর বলিদান হইবার পর চতুঃপার্শ্বস্থিত দশ-বারটি গ্রামের পূজার বলিদান হয়। এইরূপ নিয়ম বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

দ্বারহাট্টার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দির শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরের মন্দির। অপূর্বমোহন সিংহরায় এই বিরাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরের গায়ে একটি পাথরে মন্দির ১১৩৬ সালে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া লেখা আছে। ব্যবসায়াদি করিয়া সিংহরায় বংশ প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া এই অঞ্চলের বহু জমিদারী ক্রয় করেন এবং দানধ্যান, পূজাপার্বণ, পুষ্করিণী খনন, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়া করিয়া তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রাজরাজেশ্বর সিংহরায় বংশের কুলদেবতা—শালগ্রাম শিলা। এই বংশের প্রবীনতম ব্যক্তি ফকিরচন্দ্র সিংহরায় (বয়স ৯৬) বলেন, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে যোধপুর হইতে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। মানসিংহের ভগ্নীর সহিত আকবরের বিবাহের পর মুসলমানদের সহিত সম্বন্ধ করিবার ভয়ে বহু ছত্রী সেই সময় জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বাঙলা দেশে চলিয়া আসেন।

রাজরাজেশ্বরের টেরাকোটা একটি দর্শনীয় বস্তু। অসংখ্য চিত্র মন্দিরের শোভাবর্ধন করিয়াছে। রামরাবণের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস, ছাড়া মন্দিরের সম্মুখের দুইটি থামের একটিতে দুর্গা, মহাবীর, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অন্যটিতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ও পোর্তুগীজ সৈন্যদের চিত্র শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন বলিতে পারা যায়।

ইহা ছাড়া রায়-সরকার বংশের জোড়া শিব মন্দিরের সম্মুখে দুইটি সুন্দর মূর্তি অঙ্কিত আছে। এই শিব মন্দির শকাব্দ ১৭০০ সন এবং ১১৮৫ সালে নির্মিত বলিয়া লেখা আছে। এই স্থানটিকে চাঁদবাটি বলে।

দ্বারহাট্টার হাটতলার পশ্চিমে কানা দামোদরের তীরে কামদেবপুর গ্রামে জাগ্রত **মনসাদেবী** আছেন। মনসাদেবীর কাশীর ঔষধ লইবার জন্য দেবীর নিকট বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। দ্বারহাট্টা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভাল পড়াশুনার জন্য খুব খ্যাতি আছে।

॥ সর্দার শংকর ॥

অধুনা বিস্মৃতপ্রায় সাংগঠনিক দেশপ্রেমিক শংকর চক্রবর্তী হরিপাল থানার অন্তর্গত দ্বারহাট্টার নিকটবর্তী **প্রসাদপুর** গ্রামে ষোড়শ শতকের শেষার্ধে বাস করিতেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি বাংলাদেশের এক স্বাধীন রাজার প্রধান পরামর্শদাতা ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি **সর্দার শংকর** নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশে তখন যুদ্ধবিপর্যস্ত ও মোগল বিজেতাদের অধীন। কঠোর মোগলরাজ শাসনে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ। শংকর তাঁহার সাহস, চরিত্র ও বুদ্ধিবলে ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ এবং অধিবাসীরা তাঁহাকে নিজেদের পরিত্রাণদাতা মনে করিত। সেই সময়ে কায়স্থকুলোদ্ভব শ্রীহরি গুহ "রাজা বিক্রমাদিত্য" উপাধি

ধারণ করিয়া যশোহরে নূতন রাজ্য সংস্থাপনে নিযুক্ত। শংকরের পরামর্শানুযায়ী প্রসাদপুরের অধিবাসীরা এই নূতন রাজ্যে চলিয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্য শংকরের সমবয়সী এবং শংকরের চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। শংকর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কেবলমাত্র মুখ্য পরামর্শদাতাই ছিলেন না, তিনি মোগলশক্তির সহিত প্রতিনিয়ত মহারাজাকে যুদ্ধ-কৌশলের নির্দেশ দিতেন।

শংকরের চিত্তাকর্ষক কাহিনী উপলব্ধি করিতে হইলে তদানীন্তন বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সহত কিঞ্চিৎ পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। ষোড়শ শতকের বাংলাদেশ দিল্লীর মোগল সম্রাটের অধীন। দিল্লীশ্বর যদিও সাম্রাজ্য শাসন করিবার জন্য গভর্ণর নিযুক্ত করিতেন তথাপি রাজ্যসমূহ শক্তিশালী হিন্দু ও মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হইত তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। প্রধানেরা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতেন এবং প্রায়ই পর্তুগীজ আক্রমণকারী, জলদস্যু অথবা শীর্ষ ক্ষমতার অধিকারী মোগলদের সহিত পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন। এমনকি গভর্ণররা দিল্লীর দূরত্বের সুযোগ লইয়া বিদ্রোহ করিয়া নিজেদের স্বাধীন বলিয়াও ঘোষণা করিতেন।

দায়ুদ খাঁ ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং দীর্ঘ সাত বর্ষব্যাপী যুদ্ধে বাংলার আফগান নেতৃবৃন্দকে মোগল শক্তির বিপক্ষে একত্র করিতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরাজিত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। এইরূপে যুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠতার দ্বন্দ্বে বাংলাদেশে বার জন ভূম্যধিকারী প্রাধান্য লাভ করেন এবং নিজেদের অধীনে তাঁহারা রাজ্য শাসন করিতেন। ইতিহাসে এই বারজন প্রধান নেতা বারভূঁইয়া নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে খিজিরপুরের ঈশা খাঁ শ্রীপুরের দুই ভাই চাঁদ রায় ও কেদার রায় এবং যশোহরের প্রতাপাদিত্য ইতিহাসে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহাদের এক উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয়িত হইলেও প্রজাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য তাঁহাদেব ইচ্ছা ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন দুইজন পর্তুগীজ মিসনারী ভারত ভ্রমণের পথে তথায় উপস্থিত হন তখন শ্রীপুরের কেদার রায় যশোহরের প্রতাপাদিত্য কেবলমাত্র সমাদরের সহিত তাহাদের অভ্যর্থনাই করেন নাই তাঁহারা তাহাদিগকে গীর্জা নির্মাণকল্পে জমি ও অর্থদান করেন এবং প্রজাদের মধ্যে যাহারা খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী তাহাদের ধর্মান্তরিত করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। বারভূঁইয়াদের মধ্যে প্রতাপাদিত্যকেই তাঁহার রাজ্য রক্ষার জন্য মোগল শক্তির সহিত কঠোরতম সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য মোগল সম্রাট আকবরের সৈন্যবাহিনীকে বারবার পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন। মোগলশক্তিকে পরাজিত করিবার মূলে সর্দার শংকর এবং সূর্যকান্ত গুহের সামরিক কৌশলই প্রধান ছিল। প্রতাপাদিত্য তাঁহার নিজ লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজপুত সেনাপতি মানসিংহের হস্তে পরাজিত হন। বন্দী অবস্থায় দিল্লীর পথে বারাণসীতে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

প্রতাপ ধূমঘাট সুরক্ষিত নগরীতে নিজ রাজ্য স্থাপন করেন। দুর্ধর্ষ পর্তুগীজ জলদস্যু রাডারিককে দমন করিয়া তাহাকে নিজ নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত করেন। শাসন ব্যাপারের সমস্ত ব্যবস্থাই শংকরের দক্ষ পরিচালনায় সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহার পরই শংকর মোগলশক্তিকে পরাজিত করিবার জন্য দেশে গণ-উত্থানের কার্যে মনোনিবেশ করেন।

তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশে রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হইল। তাঁহার কার্যকলাপ মোগলশক্তির শ্যেনদৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। চতুর শংকর রাজমহল পর্যন্ত গোপনে এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন এবং এক ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিবার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলেন। রাজমহলের গভর্ণর শের শাহ ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিবার জন্য শংকরকে আদেশ করেন কিন্তু তিনি আদেশ অমান্য করায় গ্রেপ্তার হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু শংকর কৌশলে কারাগার হইতে পলায়ন করেন। শেরশাহ শংকরকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে এই নির্দেশ দিলে প্রতাপাদিত্য তাহা অগ্রাহ্য করেন। ইহার ফলে শেরশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই সংগ্রামে শেরশাহ কেবলমাত্র পরাজিত হইলেন না, পাটনা ও রাজমহল প্রতাপাদিত্যের অধিকারে আসিল। শেরশাহের পরাজয়-বার্তা শুনিয়া সম্রাট আকবর একের পর এক সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়াও প্রতাপকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। তখন কলিকাতার উৎপত্তি হয় নাই কিন্তু বর্তমান কলিকাতার নিকটবর্তী বসিরহাট ও মাতলা প্রভৃতি স্থানে ভয়াবহ যুদ্ধের নিদর্শন আছে। প্রতাপের মৃত্যুতে শংকর ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রগণকে দান করিয়া বর্তমান কলিকাতা হইতে ১৪ মাইল দূরবর্তী বারাসাত নামক স্থানে চলিয়া যান।

শংকরের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা কর্পোরেশন দক্ষিণ কলিকাতার একটি রাস্তার নামকরণ ও সর্দার শংকর রোড রাখিয়াছেন। এই রাস্তার একটি বাড়ির প্রাচীরে প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি ক্ষোদিত রহিয়াছেঃ

The Councillors of the Corporation of Calcutta have been pleased to name this road to perpetuate the memory of Chakravarty Sanker (of Chattopadhy family of Prosadpur, Hooghly, subsequently settled at Baraset) who was the comrade and Chief Commander to the last glorious and mighty King of Bengal, Maharaja Pratapaditya Rai of Jessore (Dhoomghat) in the 16th Century.

গোপীনাথপুর গ্রামে পূর্বে বহু ব্যবসায়ী বাস করিত॥ এখন ইহা একটি নগণ্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এই গ্রাম দুইটি পটিতে বিভক্ত—পশ্চিম গোপীনাথপুর ও পূর্ব গোপীনাথপুর। পশ্চিম গোপীনাথপুরে পোষ্ট অফিস আছে, জনসংখ্যা ৭৭০ জন। পূর্ব গোপীনাথপুরের জনসংখ্যা ১,১৪৮ জন। গোপীনাথপুরে ১৬ই জুন ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে নগেন মাঝির একমাত্র পুত্র হারান মাঝির পার্শ্ববর্তী কুলপাই গ্রামে বিবাহ হয়। বিবাহের পরদিন চন্দ্রবোড়া নামক এক বিষধর সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু হয়। দুইদিন ওঝার চিকিৎসাধীনে থাকিবার পর মৃতদেহ বৈদ্যবাটী হাতিশালা মহাশ্মশানে আনা হয়। পাঁচ হাজার নরনারী ১৫ মাইল ব্যাপী পথের শোকযাত্রায় যোগদান করে। সাধারণ একজন কৃষকের মৃত্যুতে এই জনসমাগম কখনও হয় না। চিতায় তোলার পূর্বে মৃতদেহে উত্তাপ লক্ষিত হয় এবং শ্মশানে ডাক্তার ও ওঝা আসিয়া চিকিৎসা চালায়। সাময়িক চৈতন্য আসিবার পর সমস্ত চেষ্টা বিফল হয় ও হাজার হাজার অশ্রুসিক্ত নরনারীর সম্মুখে মৃতদেহ ভস্মীভূত করা হয়। নববিবাহিতা পত্নী স্বামীর সহিত অনুমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলে সকলে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্তা করে।

॥ দ্বীপা ॥

দ্বীপা নামক গ্রাম হরিপাল হইতে মাত্র চার মাইল দূরে অবস্থিত একটি নগণ্য স্থান হইলেও, মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দপুরী এই স্থানে হরিনাম বিতরণ করিয়া এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারপূর্বক মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করায়, বৈষ্ণবদিগের নিকট ইহা অন্যতম পুণ্য পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া খ্যাত। কৃষ্ণানন্দ পুরী হইতেই দ্বীপা গ্রামের ইতিহাস আরম্ভ হয়। দ্বীপার বর্তমান জনসংখ্যা ৫৮০ জন। গ্রামে পোস্ট অফিস আছে।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে এই স্থান জঙ্গলাবৃত ছিল এবং ইহার তিন দিক বেষ্টন করিয়া কৌশিকী, রিমলা ও দামোদর নদী প্রবাহিত হইত বলিয়া স্থানটিকে দ্বীপের ন্যায় দেখাইত এবং সেইজন্যই ইহার 'দ্বীপ' নামকরণ হয়। পরবর্তীকালে 'দ্বীপ' নামটি 'দ্বীপায়' পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহা দ্বীপগ্রাম বলিয়া উল্লিখিত আছেঃ

"ভাঙ্গামোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্বান বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান॥
দ্বীপগ্রামে স্থিত কৃষ্ণানন্দ অবধূত।
সোনাতলা রঙ্গাদেশে রঙ্গনকৃষ্ণ দাস নিশ্চিত॥"

কিম্বদন্তী এইরূপ যে, মহাপ্রভুর তিরোধানের পর কৃষ্ণানন্দ পুরী এই দ্বীপের জঙ্গলে আগমন করিয়া, নিজ হস্তে তাঁহার একটি সুন্দর গৌরগোপাল বিগ্রহ প্রস্তুত করেন এবং উক্ত বিগ্রহের সেবা করিয়া তিনি বিরহ যন্ত্রণা লাঘব করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, দামোদর নদের প্রবল স্রোতে তাঁহার পূজার ব্যাঘাত হওয়ায়, তিনি দামোদরকে অভিশাপ দেন যে, আমার পূজার দ্রব্যাদি তুই ভাসাইয়া দিলি, দেখিতে পাইলি না: তোর চক্ষু কানা হইয়া যাক। তদবধি দামোদর 'কানা দামোদর' বলিয়া এই অঞ্চলে খ্যাত এবং এই স্থান হইতে বর্তমানে দামোদর নদও প্রায় ছয় মাইল দূরে চাঁপাডাঙ্গার নিকট সরিয়া গিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন দামোদর এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন না; কিন্তু ৭২-৭৮ পৃষ্ঠায় নদনদী প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর কিছু বলা হইল না। সহদেব চক্রবর্তীও তাহার 'ধর্মমঙ্গলে' লিখিয়া গিয়াছেনঃ

"বন্দীপুরে বন্দিব ঠাকুর শ্যামরায়।
দামোদর যাহার দক্ষিণে বয়্যা যায়॥"

বস্তুতঃ দামোদর বর্তমান খাতে প্রবাহিত হইবার পূর্বে যে খাতে প্রবাহিত হইত তাহা পাড়াম্বুয়া, সাহাবাজার, দ্বীপা, জগৎবল্লভপুর প্রভৃতি গ্রাম দিয়া হরিপালের উত্তর দিয়া পূর্বমুখে বন্দীপুরের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং সেইজন্যই হরিপালে এবং তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে আজও প্রচুর পরিমাণে বালি পাওয়া যায়। দামোদরের প্রাচীন খাতের মানচিত্র ৭৩ পৃষ্ঠায় আছে।

কৃষ্ণানন্দ পুরীর তিরোভাবের পর, হরিপালের সন্নিকট জ্যোত-সিন্দুর গ্রামের বিষ্ণুদেব সিদ্ধান্ত নামক এক ভক্ত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দ্বীপা গ্রামে আসিয়া মহাপ্রভুর গৌরগোপাল বালগোপাল মূর্তির সেবাভার গ্রহণ করেন। অতঃপর দ্বারহাট্টার জমিদারগণের সাহায্যে বনজঙ্গল কাটাইয়া তিনিই প্রথম এই গ্রামে স্থায়িভাবে বসতি করেন এবং পরবর্তীকালে

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদেব ঠাকুরকে দ্বীপায় আনাইয়া প্রভুর সেবায় নিয়োজিত করেন। ইঁহাদের বহু শিষ্য ও ভক্ত আছেন এবং ইঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি এই স্থানে বসবাস করিয়া মহাপ্রভুর সেবাকার্য বিশেষ অনুরাগের সহিত নির্বাহ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে নিত্যানন্দ, রাধাবিনোদ ও রাধারানীর তিনটি বিগ্রহ আছে এবং প্রতিবৎসর রথযাত্রার বার্ষিক মহোৎসবের সময় এই গ্রামে বহু জনসমাগম হইয়া থাকে।

'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' ভক্তিকল্প বৃক্ষের যে বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণানন্দ পুরীর নাম দৃষ্ট হয়। ইনি ভক্তিকল্প বৃক্ষের নবমূলের একটি মূল ছিলেন বলিয়া গ্রন্থে লিখিত আছে। নিম্নে উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল ঃ

"শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি কল্প বৃক্ষ রুইল সিঞ্চি ইচ্ছা পানি॥
শ্রী ঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হইল।
আপনে চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
নৃসিংহানন্দ-তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
তার অষ্ট মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্য মূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
অষ্ট দিকে অষ্ট জড় বৃক্ষ কৈল স্থির॥
স্কন্ধের উপরে বাহু শাখা নিকসিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥"

দ্বীপা গ্রামে পোষ্ট অফিস আছে। গ্রামের জনসংখ্যা ৫৮০ জন। দ্বীপা ও দ্বারহাট্টা এই দুই গ্রাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দ্বীপা গ্রামের **গিরীন্দ্রনাথ সাহা** রাজ্য সরকারের শস্যোৎপাদন প্রতিযোগিতায় ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দের আলু উৎপাদনে এক একর জমিতে ৫৮৯ মণ ২৫ সের ১৩ ছটাক আলু ফলাইয়া প্রথম পুরস্কার আড়াই হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। ১৫১ পৃষ্ঠায় হুগলী জেলার কৃতি আলু চাষীগণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

হরিপাল থানার মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

১। **বাসুড়ি॥** দ্বারহাট্টার নিকটবর্তী একটি গ্রাম; পিয়াসাড়া গ্রামের জমিদার **বলাইদাস সরকার** ১৫ই জুলাই ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে 'বর্ধমানের জ্বর' নামক মহামারীর সময় এই চিকিৎসালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। কোন সময় ইহা বন্ধ হইয়া যায় তাহা বলিতে পারা যায় না।

২। **বন্দীপুর॥** ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে **নীলকমল মিত্র** এই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং মহামারীর সময় তিনি অর্ধেক এবং সরকার হইতে অর্ধেক ইহার ভার বহন করিতেন। মহামারীর পর তিনি স্বয়ং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা পরিচালনা করেন এবং পরে জেলা বোর্ডের হস্তে কিছু টাকা দিয়া তাহাদিগকে উহা পরিচালনের ভার দেন। কিন্তু ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তাঁহার প্রদত্ত টাকা নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় জেলা বোর্ড চিকিৎসালয় তুলিয়া দেন।

॥ বন্দীপুর ॥

বন্দীপুর হুগলীর একটি প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রাম। ইহার নামে পরগণা প্রচলিত; এখানে উচ্চ ডাকঘর, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং বহু লোক ও জাতির বাস। বন্দীপুরের ঘটক (বন্দ্যোপাধ্যায়) জমিদারগণ একসময় বিখ্যাত ছিলেন। বন্দীপুর গ্রামের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বংশ "রায় বংশ"। এই বংশ রাজপুতানা হইতে প্রথম বঙ্গদেশে আসিয়া বন্দীপুরে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের আদিপুরুষ রাণা লক্ষ্মণ সিংহের বংশধর। কুঞ্জলাল সিংহ মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং নিখিল ভারত কায়স্থ সম্মেলনে বঙ্গদেশের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল সরস্বতী।

বর্তমানে চুঁচুড়া কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীব শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত জ্ঞান চৌধুরী মহাশয় এই বংশোদ্ভব। কলিকাতায় এই বংশের অনেক ব্যক্তি বাস করেন।

এই বংশের একজন মহাপুরুষ ৺মধুসূদন সিংহ মহাশয় বন্দীপুরে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারকে বহু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। গত সেটেলমেণ্ট করার সময়ে এই সকল নিষ্কর সম্পত্তির বর্তমান মালিকরা যে তায়দাদ দাখিল করেন বা উল্লেখ করেন তাহাতে '৺মধুসূদন সিংহ মহাশয়ের নাম 'মুদাফত' নামে লিখিত আছে। বন্দীপুরের ঘোষ ও মিত্র বংশ রায়বংশের দৌহিত্র হিসাবে বন্দীপুরে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই বংশের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺গোপীজন বল্লভ জীউ। ইঁহার নিত্য সেবা ও জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা ও অন্যান্য উৎসব নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। এই বংশ বহু প্রাচীনকাল হইতে শ্রীশ্রী৺দুর্গা পূজারও প্রবর্তন করিয়াছেন। বর্তমানেও এই পূজা চলিতেছে। অন্যান্য দেবতা ও বিগ্রহের মধ্যে ৺গঙ্গাধর শিব আছেন। তাঁহারও নিয়মিত সেবা ও চড়ক পূজার সময় গাজন হইয়া থাকে। এই বংশের শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায় সিঙ্গুর মহামায়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

বন্দীপুরের বাইতি জাতি মাদুরশিল্পে একসময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখন তাহারা প্রায় নির্মূল হইয়াছে। বন্দীপুরের ঘোষেরাও বিখ্যাত। তাহাদের বার মাসে তের পার্বণ এখনও প্রচলিত আছে। বন্দীপুর হরিপাল রাজার আদি নিবাস ছিল বলিয়া কথিত হয়। পার্শ্বেই উক্ত রাজার চিত্রশালার জন্য প্রসিদ্ধ চিত্রশালি গ্রাম অবস্থিত।

বন্দীপুরের গৌরব ছিলেন **নীলকমল মিত্র**; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "এলাহাবাদ বা প্রয়াগ" নামক ইংরাজী গ্রন্থে নীলকমল সম্বন্ধে বহু কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বন্দীপুর অপেক্ষা এলাহাবাদে তাঁহরে প্রচুর কীর্তি রহিয়াছে। "দেবগণের মর্তে আগমন" গ্রন্থে তাঁহার ভূয়সী সুখ্যাতি এবং নীলকমল পার্কের কথা উল্লিখিত আছে। তাঁহার জীবিত কালে যে কোন বাঙ্গালী ভারতের যে কোন স্থান হইতে এলাহাবাদে যাইতেন, তাহারাই মিত্র মহাশয়ের আদর-আপ্যায়ন লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। তিনি মিলিটারীতে রসদ সংগ্রহ করিয়া দিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিযা গিয়াছেন। তথায় তাঁহার নির্মিত "অ্যালফ্রেড পার্কের ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড"-এর ছবি রামানন্দবাবুর গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। তারকেশ্বর রেল লাইন জনাই-এর ভিতর দিয়া যাইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। নীলকমল মিত্র তাহা শুনিয়া তাড়াতাড়ি তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বন্দীপুরের পার্শ্ব

দিয়া উক্ত রেলপথ লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। বহু অর্থব্যয়ে গ্রামে আসিয়া মাতার তিনি দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার খ্যাতি আজও শোনা যায়। দেশে তাহার বিরাট অট্টালিকা এখনও বিদ্যমান। তাহাতে স্কুলের ছাত্রাবাস, পোষ্টাফিস, লাইব্রেরী প্রভৃতি রহিয়াছে। গ্রামের পার্শ্ব দিয়া কানানদী প্রবাহিতা। ইহার উপর দিয়া তিনি একটি লোহার পুল নির্মাণ করিয়া দেন। তাহা নীলকমল মিত্রের নামে আজও তাঁহার হিতৈষণার সাক্ষ্য দিতেছে। তাহার পুত্র চারুচন্দ্র মিত্রও কীর্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। ইহার কন্যা সরোজিনী দেবীর সহিত সিভিলিয়ান কিরণচন্দ্র দের বিবাহ হয়। চারুচন্দ্র মিত্রের পুত্র ফণী মিত্র ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বন্দীপুর হাই স্কুল নির্মাণকালে জমি ও ইষ্টক দান করিয়া স্কুল নির্মাণ কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন। নালিকুল ষ্টেশনের নিকট আলোকপন্থী পাঠাগারের নিজস্ব ভবন আছে। প্রজাপতি সম্পাদক **জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার** বন্দীপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

বন্দীপুরে ধর্মঠাকুর শ্যাম রায় প্রসিদ্ধ। বুদ্ধদেবই বঙ্গদেশে ধর্মঠাকুর নামে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। সমগ্র বঙ্গদেশে অগণিত ধর্মঠাকুরের মধ্যে বন্দীপুরের শ্যাম রায় এবং বাঁকুড়ার যাত্রাসিদ্ধি রায়ই প্রসিদ্ধ। শ্যাম রায়ের পূজারিরা জেলে জাতীয়, উপাধি পণ্ডিত। ইহারা শ্যাম রায়ের নামে জলপড়া ও নানা রোগের ঔষধ দেন। এই স্থানে নদীগর্ভে বুদ্ধদেবের কয়েকটি মূর্তি পাওয়া যায়।

ডন সোসাইটির স্থাপয়িতা স্বদেশীযুগের অগ্নিমন্ত্রের সাধক ডন ম্যাগাজিন-এর সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। এই গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মোদক, কিংকরবাটী গ্রামের ধরণীধর কয়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নালিকুল গ্রামের মন্মথ রায় কর্মকার ব্যবসার দ্বারা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

পার্শ্ববর্তী গজা গ্রামের ভট্টাচার্য জমিদারগণ এককালে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহাদের বিশাল জমিদারী মোহালের মধ্যে বন্দীপুরের নাম প্রজাদের মধ্যে আজও প্রচলিত। চিত্রশালার সিংহ বংশীয় কায়স্থগণও প্রসিদ্ধ। বন্দীপুরের নিকটেই বড়গাছিয়া গ্রাম। এই গ্রামের সিংহ বংশীয় কায়স্থগণ এক সময়ে জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের অতিথিশালায় নিত্য বহুদূর হইতে অতিথি সমাগম হইত; নানা দেবকীর্তি আজও এই স্থানে বিদ্যমান।

করালীচরণ বিদ্যালঙ্কার বন্দীপুরের স্বনামধন্য দশকর্মান্বিত পণ্ডিত ছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। রাসেশ্বর বিদ্যারত্ন প্রমুখ তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতী ছিলেন। রাসেশ্বর কলিকাতা গোরীবাড়ী লেনে অনেকগুলি ইষ্টক নির্মিত আবাস ভবন নির্মাণ করেন। জ্যোতিষ চর্চ্চা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

বন্দীপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশও প্রসিদ্ধ; এই বংশের রামনাথ চট্টোপাধ্যায় আলমবাজারে আসিয়া বাস করেন। আলমবাজারে ইঁহাদের বাড়ী "থামওয়ালা চাটুয্যেদের বাড়ী" বলিয়া খ্যাত। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই ভবনে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় বংশের নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় ও পান্নালাল চট্টোপাধ্যায় স্বনামখ্যাত ব্যক্তি।

বড়গাছিয়া গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ নানা এষ্টেটের নায়েবী কার্য করিয়া একদা প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পরোপকারী মুক্তহস্ত এবং শত বর্ষ জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সারদাপ্রসাদের পুত্র ভোলানাথ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নানা প্রবন্ধ প্রকাশ ও

হোমিওপ্যাথিক সমাচারের সম্পাদনা করিয়া যশস্বী হন। তাঁহার লিখিত "শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত" ও "শ্রীনিবাস আচার্য" তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজ যখন যুগপৎ "ভক্তি" "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয় গৌরাঙ্গ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন বৈষ্ণব সমাজের সর্বস্থান হইতেই তিনি আশীর্বাদ লাভ করেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে তিনি শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের জীবনী লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

এই গ্রামের ঘোষাল বংশ প্রসিদ্ধ। ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের বাংলা ইংরাজী অভিধান একদা প্রসিদ্ধ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীরামপুরে চিকিৎসাকার্যে ব্রতী হইয়া যশস্বী হন। তাঁহার পুত্র সাংবাদিক যতীন্দ্রনাথ ও উকিল মণীন্দ্রনাথও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সিংহ বংশের যোগেন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইয়া আসিয়া সুখ্যাতির সহিত তাহাদের কলিকাতা আবাস ভবনে থাকিয়া চিকৎসা করিতেছিলেন। তিনি এম্ ডি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শশিভূষণ এল্-এম-এস ও মধ্যম ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার ছিলেন।

পার্শ্ববর্তী নওপাড়া গ্রামের ডাঃ সারদাচরণ দাস এল্ এম্ এফ, ধাত্রীবিদ্যায় খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার দাদা কুঞ্জবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রিত ছিলেন। ইহারা মাহিষ্য জাতীয়।

এই স্থানে অবান্তর হইলেও সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিযুক্ত-স্মৃতি চুঁচুড়া কাঁকশিয়ালীর মজুমদার বাটির ৺শ্যামনাথ মজুমদারের নাম আমরা উল্লেখ করিব। তাঁহার তত্ত্বকুসুম প্রভৃতি বহু উচ্চাঙ্গের কবিতা গ্রন্থ বসন্ত প্রভৃতি উপন্যাস একদা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

ইংরাজ আমলের প্রথমাংশে সার্ভে কার্যের সুবিধার জন্য নানা সুউচ্চ গম্বুজ নির্মিত হইয়াছিল। তন্মেধ্যে বড়গাছিয়া গ্রামের পার্শ্বে ভোলাগ্রামে এইরূপ একটি ত্রিকোণমিতিক জরীপের সুউচ্চ গম্বুজ আজও বিদ্যমান। 'দেবগণের মর্তে আগমন' গ্রন্থে ভুলক্রমে উহাকে ভোলার গির্জা বলা হইয়াছে। মিঃ ক্রফোর্ড হুগলী মেডিক্যাল গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন ঃ

> The only thing of interest near the line is the great Trigonometrical Survey tower at Bhola, which is within a few yards of the line on the north side, halfway between Singur and Nalikul station.

এই স্থানে বড়গাছিয়া গ্রামের সীমানায় তারকেশ্বর সেওড়াফুলি রাস্তার উত্তর পার্শ্বে বহু চটি বা যাত্রী নিবাসের কথা উল্লিখিত আছে। তারকেশ্বর রেলপথ নির্মিত হইবার পূর্বে এই সকল চটি লোক সমাগমে পূর্ণ থাকিত এবং বহু ঘোড়ার গাড়ী যাত্রী বহনের জন্য এই স্থানে বিদ্যমান থাকিত। উহার বর্ণনা উক্ত গ্রন্থে আছে। এক্ষণে তাহাব চিহ্ন নাই।

অখিলচন্দ্র পালিত এনট্রান্স পাশ করিয়া কুচবিহারে দারোগাগিরি করেন; মহারাজার আদেশে তথায় ব্যবহারজীবীর কার্য করিয়া যশস্বী হন। তিনি সুকবি সুলেখক ও বহুভাষাবিৎ ছিলেন। ইংরাজী বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য পারদর্শিতা ও পাণ্ডিত্য ছিল। সমসাময়িক বহু প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী, বাংলা মাসিক, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম বয়সের হৃদয় শাখা ১ম ২য় ভাগ, মেঘদূতের সুললিত পদ্যানুবাদ একদা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধ আজও অমুদ্রিত রহিয়াছে।

॥ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন হুগলী জেলার বন্দীপুর গ্রামে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত তাহার স্কুল কলেজের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ দুই বৎসরের বড়, আচার্য স্যার ব্রজেন্দ্রলাল শীল ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মাত্র এক বৎসরের ছোট ছিলেন। ইহাদের সকলেরই আজীবন বন্ধুপ্রীতি ছিল।

আনুমানিক ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সতীশ মুখোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরে এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করিয়া মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সহিত পরিচিত হন; তখন মহারাজ তরুণ যুবক। এই সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই পরিবেশের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ও ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। ইহারা সকলেই তাঁহার গুরুভাই ছিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্রের দলের সহিত পরিচিত হন। মিত্র মহাশয় ভাগবৎ চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত সাহিত্য, উপনিষদ. গীতা ও হিন্দু দর্শনের আলোচনা হইত। এখানেই পন্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের সহিত তাহার আন্তরিক সখ্য স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ প্রচারকল্পে মাসিক পত্রিকা "ডন" প্রকাশ করা হয়। এই বৎসরেই স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে রামকৃষ্ণদেব ও ভারতের ধর্মমত প্রচার করেন। স্বামীজীর প্রচারকার্যে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় অনুপ্রাণিত হইয়া সাংবাদিকতায় ও বিশ্ববাসীর নিকট ভারতের সাংস্কৃতি প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। গত শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি বিচারক শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ ও শ্রীমতিলাল ঘোষের সহিত পরিচিত হন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে উপরোক্ত দুইটি দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় তীব্র সমালোচনা করেন। শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ কলিকাতার কলেজের তরুণ ছাত্রদিগকে স্বদেশভক্তি, আত্মত্যাগ, সর্বপ্রকার সমাজ-সেবা শিক্ষা দেওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ কলেজ ছাত্রদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানকল্পে বাঙলা ভাষায় সাপ্তাহিক গীতা পাঠ ও আলোচনা। তখনকার মেট্রোপলিটান কলেজ অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজের একটি ঘরে "ডন সোসাইটির" সভা হইত। বরং ইহাকে সভা না বলিয়া পাঠচক্র বলা যাইতে পারে। 'নেশন' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ সেনের উপর ছিল কলেজের পরিচালনার ভার।

'ডন সোসাইটির' সঙ্গে সঙ্গে মুখোপাধ্যায় মহাশয় উহার মুখপত্র 'ডন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পুরাতন মাসিক পত্রিকা 'ডনের'ই ইহা পরিবর্ধিত সংস্করণ; এই নূতন পত্রিকায় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার বিচিত্র সংবাদ ও সমালোচনা এবং তৎকালীন সাহিত্য ও ভাষার সরস আলোচনা স্থান পাইল। ভারতের নানা নানা তথ্য ও বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রদের পত্র প্রকাশ করিয়া 'ডন সোসাইটির' সদস্যদিগকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত।

সোসাইটির উদ্যোগে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের তৈয়ারী ধুতি গেঞ্জী ও অন্যান্য জিনিষ বিক্রয়ের জন্য স্বদেশী ভাণ্ডার খোলা হইল। সোসাইটির সদস্যাদিগকে তত্ত্বাবধান ও জিনিষপত্র বিক্রয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হইল। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভগিনী নিবেদিতা, দীনেশচন্দ্র সেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তগণ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতেন। সতীশ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। সপ্তাহে দুইবার ক্লাস লওয়া হইত। চার বৎসর ধরিয়া সোসাইটির কাজ চলে। এই সময়ে কলিকাতার প্রায় ৫ শত তরুণ তাঁহার সংস্পর্শে আসে। বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, আসাম ও বিভক্ত বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলা হইতেই তরুণেরা এখানে আসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে। এই সকল অঞ্চলের গত যুগের আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, শিক্ষক প্রভৃতি স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অসাধারণ ত্যাগ ও জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন তাহার প্রথম পাঠ সমস্তই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতেই গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার ও প্রফুল্লকুমার সরকারের নাম স্মর্তব্য।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও 'ডন সোসাইটির' সহকর্মিগণ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ ও পরিচালনা করেন। বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া এই শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া উঠে; সোসাইটির কর্মীরা জেলায় জেলায় আন্দোলন ছড়াইয়া দিয়া নেতা হইয়া উঠিলেন।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের সহকর্মীরাই আবার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তক। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে এই আন্দেলেনের বাস্তবরূপ প্রকাশ পায়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যাদবপুরের ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজে পরিণত হইয়াছে। ন্যাশনাল কলেজের প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় আর প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর 'ডন সোসাইটি' বিলুপ্ত হইল বটে, কিন্তু সোসাইটির মুখপত্র পূর্বেকার ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রথম ন্যাশনাল কলেজ ও বঙ্গীয় টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের প্রথম ডিরেক্টরসের কাজ করিয়াছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ হইতে ভারতের ইতিহাসে গান্ধীযুগের সূত্রপাত। ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গান্ধীজীর সহিত শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের যুগে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়েকজন কর্মী গান্ধীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত হইয়া উঠেন। তিনিও রচনার মধ্য দিয়া গান্ধীজীর বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি অবসর জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। গত ২৫ বৎসর ধরিয়া বাহিরের লোক তাহার কোন সংবাদ রাখে নাই। বাঙ্গলার বিপ্লবের তিনি ছিলেন অন্যতম স্রষ্টা এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে কাশীধামে তিনি দেহত্যাগ করেন।

॥ জেজুর ॥

জেজুর হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দননগর মহকুমার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পূর্বে এই গ্রামের নাম ছিল কসবা এবং জনশ্রুতি আছে যে, ১০৫০ সালে গোবিন্দরাম মিত্র এই গ্রামের জেজুর নামকরণ করেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, পুরাকালে এই গ্রাম নাগর নামক এক রাজার রাজধানী ছিল। বর্তমানে যে-স্থানে জেজুরের শ্মশান অবস্থিত, তথায় রাজপ্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রকাশ। প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ অচ্যুতকুমার মিত্র কয়েক বৎসর পূর্বে শ্মশানের নিকটে একটি পাথরের মূর্তি আবিষ্কার করেন। তাঁহার অভিমত এই যে, জেজুর পূর্বে একটি নগর ছিল। শ্মশানটিকে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ বর্তমানে 'নাগর গাছি' বলেন। অধুনা জেজুর গ্রামের উত্তরে 'মোগলপুর' ও 'ময়নাপাতা' নামক দুইখানি গ্রাম, পশ্চিমে 'নৃসিংহ আড্ডি রোড' নামক ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা; দক্ষিণে 'নারায়ণপুর' ও 'মল্লাপাড়া' এবং পূর্বে 'বন্দীপুর' নামক গ্রাম। এই গ্রামের মধ্য দিয়া কানা নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। 'নাগর-গাছি' নামক শ্মশানের উত্তরে 'রানীয়া' নামক একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উহার চারিপাশে সুন্দর ফুলের বাগান এবং বহু বাঁধান ঘাট ছিল বলিয়া প্রকাশ। বর্তমানে ঘাটগুলি নষ্ট হইয়া গেলেও, তাহাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। কিংবদন্তী এইরূপ যে, রাজার মহিষীগণ ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন বলিয়া উহার নাম রাণীয়া হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে পুষ্করিণীটির পঙ্কোদ্ধার কালে উহা হইতে বহু বিষ্ণুমূর্ত্তি বাহির হয়। পূর্বে নগরটি শৈব প্রধান ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, কালাপাহাড় আসিয়া যুদ্ধে 'নাগর' রাজাকে পরাস্ত করিয়া শেষে তাঁহার রাজধানীর সমুদয় দেব-দেবীর মূর্তি রাণীয়া পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেন। বর্তমানে এই গ্রামের মধ্যে একটি খুব বড় মাঠ দেখা যায়; উহাকে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ 'গড়ের মাঠ' বলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, রাজার এইস্থানে 'গড়' ছিল। 'নাগর' রাজার পূর্ব সমৃদ্ধির বহু পরিচয় সর্বত্র পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। ডঃ মিত্র আবিস্কৃত মূর্তিটি শ্রীধরজীউর মন্দিরে রক্ষিত আছে।

জেজুরের পার্শ্বস্থিত গ্রাম সমূহের নামকরণ 'নাগর' রাজার সূত্র হইতে হইয়াছে বলিয়া গ্রামবাসীগণের বিশ্বাস। যেমন, বন্দীগণকে যে স্থানে রাখা হইত, তাহার নাম 'বন্দীপুর', রাজার ধনদৌলত যেখানে থাকিত, তাহার নাম ভাণ্ডারহাটি প্রভৃতি। এ-সমস্ত কথার সত্যতা নিশ্চয় করিয়া বলা একপ্রকার-অসম্ভব, তবে বহু পুরাকাল হইতে এই সমস্ত লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে। 'নাগর' রাজার বহুপরে, কুচপালের নবাব বংশের এক নবাবও এখানে থাকিতেন বলিয়া শুনা যায়। তাঁহাকে সকলে মোগল-শা বলিত। কিংবদন্তী এইরূপ যে, তাঁহার নাম হইতে জেজুরের পার্শ্বে 'মোগলপুর' গ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে।

জেজুরে বহু **দেবালয়** আছে। তাহার মধ্যে হাটতলার কালীমন্দির ও শিবমন্দির প্রাচীনতম দেবস্থান। ঘোষ বংশের ও বসু বংশের দুর্গাপুজার ঠাকুর দালান একটি দর্শনীয় বস্তু। বসুবংশের ঠাকুরদালান এখন করবংশের দখলিভুক্ত। উহার অর্ধাংশ পড়িয়া গিয়াছে। মিত্রবংশের শ্রীধরজীউর মন্দির ও লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরের অবস্থাও ভগ্নপ্রায়। **শ্রীধরজীউ** জাগ্রত দেবতা বলিয়া কথিত। একবার মাখনলাল মিত্রের চেষ্টায় শ্রীধরের মন্দির

ও হীরেন্দ্রনাথ মিত্রের চেষ্টায় লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের কিছু সংস্কার করা হয়। ইহা ছাড়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভবনে কুলদেবতা আছেন। দেবদেউলগুলি সংরক্ষণ করা কর্তব্য।

জেজুরের ঘোষ, বসু এবং মিত্রবংশ প্রসিদ্ধ; ঘোষ বংশে **গোপাল ঘোষ ও বগল ঘোষ** হিন্দু ধর্মোক্ত ক্রিয়া-কলাপাদি করিয়া খুব সুনাম অর্জন করেন। মিত্রবংশে বিশ্বম্ভর মিত্রও অনুরূপ কার্য করিয়া যশস্বী হন। এই বংশে জয়রাম মিত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নামানুসারে কলিকাতায় "জয় মিত্র ষ্ট্রীট" বলিয়া একটি রাস্তা আছে। এতদ্ভিন্ন কবি রাধামাধব মিত্র* এবং আশুতোষ মিত্র এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বিপ্লবী দেবব্রত বসু এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা প্রিয়ব্রত বসুও এই অঞ্চলে বিশেষ খ্যাত ছিলেন। ভারতীয়গণের মধ্যে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'ডক্টর' উপাধি প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত অচ্যুতকুমার মিত্র জেজুরে জন্মগ্রহণ করেন। মিত্র বংশে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিস্তারিত বিবরণ "জেজুরের মিত্র বংশ" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এই গ্রামের ঘোষাল বংশও খুব প্রাচীন বংশ বলিয়া খ্যাত। বসু বংশে প্রসিদ্ধ শিল্পী নন্দলাল বসুর জন্ম হয়। ঘোষ বংশে প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা শ্রীঅতুল্য ঘোষ এম পি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী বিভাবতী ঘোষের চেষ্টায় জেজুরে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠাগার ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামের যাবতীয় মঙ্গলকর্মে তিনি অগ্রণী হন বলিয়া সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

জেজুরের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান **জেজুর হরিসভা** ও **জেজুর অবৈতনিক নাট্যসমাজ।** ১২৮০ সালে জেজুরের হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তদবধি প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে তিনদিন ধরিয়া সমারোহের সহিত ইহা অনুষ্ঠিত হয়। নাট্যসমাজ ১৩০০ সালে প্রতিষ্ঠিত। যাত্রা এবং থিয়েটার উভয়ের অভিনয় প্রতি বৎসর হয়। অভিনয়ে ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ, মনসা ঘোষাল, হরি ঘোষ, প্রবোধ মিত্র, সুরেশ মিত্র, কালীপদ মুখোপাধ্যায় ও অনিল ঘোষাল সুনাম অর্জন করেন। সঙ্গীতে ও নৃত্যাদি পরিচালনায় কড়ি হাড়ির কৃতিত্ব সর্বাধিক ছিল। পরিচালনা ও প্রয়োগ ব্যাপারে অতুল্য ঘোষ ও পরে হীরেন্দ্র মিত্রের নামও উল্লেখ্য। নাট্যসমাজের নিজস্ব দৃশ্যপট ও পোশাকাদি আছে। বর্তমানে পুণ্যব্রত বসু ও শান্তিময় ঘোষের প্রতি বৎসর যাহাতে অভিনয় হয় সেই বিষয়ে উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

জেজুরে পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। পণ্ডিত **বামাচরণ উপাধ্যায়** উহা পরিচালনা করিতেন। বর্তমানে পুণ্যব্রত বসু, কিরণময় ঘোষ ও শান্তিময় ঘোষের চেষ্টায় গ্রামে **উচ্চ বিদ্যালয়** এবং বিদ্যালয়ের জন্য সুরম্য ভবনাদি নির্মিত হইয়াছে। বিভাবতী ঘোষের চেষ্টায় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে জেজুরে **মহিলা সমিতি** স্থাপিত হইয়াছে এবং সমিতির কার্যাবলী সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। মহিলা সমিতির উদ্যোগে জেজুরের **সেবাভবন** ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ প্রসূতি সদন গ্রামাঞ্চলের গৌরব। ১৭ই আগস্ট ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে সেবাভবনে মান্নাপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ দের একটি পৌত্র হয়। জন্মের পরই শিশুটির মৃত্যু হয়। শিশুটিকে দেখিতে একটু অদ্ভুত রকমের ছিল। শিশুটির একটি মাথা, দুইটি

---

* রাধামাধবের কাব্যগ্রন্থমালা—সুধীরকুমার মিত্র, বঙ্গশ্রী ১৩৫৩ **দ্রষ্টব্য।**

পিঠ, দুইটি চক্ষু, চারটি কান, একটি গলা, একটি মুখ ও দুইটি নাক ছিল বলিয়া উহা সেবাভবনে সংরক্ষিত হইয়াছে।

জেজুরে **ইউনিয়ন বোর্ড** স্থাপিত হইলে নন্দলাল মিত্র বোর্ডের প্রথম সভাপতি হন। তাঁহার চেষ্টায় জেজুরে পোস্ট অফিস ও হরিপাল হইতে ময়নাপোতা পর্যন্ত চার মাইল রাস্তা এবং কানা নদীর উপর যানবাহন চলাচলের জন্য গোপালচন্দ্র মিত্রের ব্যয়ে যে সেতু নির্মিত হয় তাহা সম্পন্ন হয়। গোপাল মিত্র তাঁহার পুরোহিত ঘোষাল বংশের কুলদেবতার মন্দিরও নির্মাণ করিয়া দেন। বোর্ডের সভাপতি হিসাবে পরবর্তীকালে বসন্তকুমার মিত্র, প্রিয়ব্রত বসু, হরিমাধব মিত্র ও কিরণময় ঘোষ পল্লীর উন্নতিকল্পে বিশেষভাবে চেষ্টা করেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জেজুরে **কংগ্রেস কমিটি** স্থাপিত হয়। প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন সুধীরকুমার মিত্র ও সম্পাদক হন ডাঃ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। হরিপালের ডাঃ আশুতোষ দাসের প্রবর্তিত কল্যাণ সংঘের একটি শাখা বহু বৎসর যাবৎ জেজুরে জনসেবা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জনসাধারণের কি করা কর্তব্য সে বিষয়ে গোপনে কার্য করিয়াছিল। কল্যাণ সংঘ বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হইলে জেজুর হইতে কংগ্রেস অফিস উঠিয়া যায়।

॥ আশুতোষ মিত্র ॥

আশুতোষ মিত্র জেজুরের আর এক মহান পুরুষ। বিস্তৃত খ্যাতি বা জনপ্রিয়তা যদিও তিনি লাভ করেন নাই, তথাপি জেজুর তথা হুগলীর মানুষের মানসমন্দিরে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। ভাবময় বিলাসস্বপ্নের জড়ত্ব হইতে তিনি জন্মাবধিই মুক্ত। সর্ববিধ সংস্কারমুক্তির কর্তা হিসাবে সাধারণ মানুষের তিনি বান্ধব।

৬ই বৈশাখ ১২৭৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাধারমণ মিত্র। শিশুকাল হইতেই তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টি ছিল উজ্জ্বল। গভীর মানবিকতার সুরে তাঁর জীবন ছিল চিহ্নিত। সাহিত্য, সমাজসেবা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে তিনি যেভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তা আজও গ্রামবাসীর স্মরণে আছে। বাল্যে মাতৃবিয়োগের জন্য দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জীবন সুরু হইলেও গতিধর্মে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। তাই নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি ছিলেন দীপ্তিমান। গ্রামের প্রতিটি মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা, দেশের জন্য তাঁর প্রবল অনুরাগ যদিও অন্যান্য অনেকের মতো দূর-প্রসারিত হয় নাই তথাপি শতাধিক ব্যক্তিকে জীবিকার সন্ধান দিয়া আশুতোষ স্বমহিমায় ভাস্বর।

তৎকালীন বিষ্ণুপ্রিয়া, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আশুতোষ মিত্রের রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হইত। সহজে গুণ, ভাগ করিবার নিয়ম সম্পর্কে "রেডিরেকনার" নামে প্রথম গ্রন্থ আজ তাঁর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। পত্নী শ্রীমতী রাধারাণী দেবী মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র গুরুদাস সিংহের কন্যা। একমাত্র পুত্র সুধীরকুমার মিত্র 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের লেখক। এবং পৌত্র পলাশ মিত্র তরুণ সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত।

যে সময়ে গ্রামের বহু বাসভবন ধ্বংসের মুখে সে-সময় তিনি পিতামহের স্মৃতিরক্ষার্থে **'বিশ্বম্ভর ধাম'** নির্মাণ করেন। কালীঘাটে ১৩৫০ সালের ২২শে ভাদ্র ২নং কালী লেনে তাঁহার মৃত্যু হয়। **আশুতোষ মিত্রের জীবনী** গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আছে।

॥ দেবব্রত বসু ॥

যে বৈপ্লবিক পাঞ্চজন্যের শঙ্খধ্বনিতে বাংলায় বিপ্লব যুগের শুভাগমন ঘোষিত হইয়াছিল, দেবব্রত বসু তৎকালীন সেই 'যুগান্তর' পত্রিকায় (বিপ্লবীদের মুখপত্র) 'যোগাক্ষ্যাপা' নামে লিখিতেন। সে যুগে তাঁহার লেখায় সমগ্র বাংলা দেশে দেশাত্মবোধের এক উন্মাদনা আনিয়াছিল। আলিপুর বোমার মামলা হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। তখন তাঁহার নাম হয় প্রজ্ঞানন্দ। সন্ন্যাস আশ্রমেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

দেবব্রত বসু সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ও লেখক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অপ্রকাশিত রচনা এখানে দেওয়া হইলঃ

দেবব্রতের বাড়ী ছিল হুগলী জিলায় জেজুর গ্রামে। তাঁহার পিতা কর্মব্যপদেশে কলিকাতায় আসিয়া গ্রে স্ট্রীটে অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার কাকা বঙ্কুবাবু দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছিলেন। দেবব্রতরাও ব্রাহ্মমতে অনুরাগী ছিলেন; তবে ঠিক দীক্ষিত ছিলেন কি না আমি বলিতে পারি না। ব্রাহ্ম সমাজের এক অনুষ্ঠানে তিনি গান গাহিয়াছিলেন। ইহার পর আরও অনেক ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানে তাঁহাকে আমি গান গাহিতে দেখিয়াছি।

ইহার পর ১৯০৩ সালে বিপ্লবী আখড়ায় (ব্যায়ামগারে) তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হয়। ক্রমে তাঁহার সঙ্গে আমার ভাব হয়। তিনি তখন বি এ পাশ করিয়াছেন। কিছুদিন পরে ঐ ব্যায়ামাগার উঠিয়া যায়। এই সময়ে তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কলিকাতায় কাজকর্ম চালাইতেন। তিনি যেমন বিদ্বান ছিলেন, তেমন বুদ্ধিমানও ছিলেন। মন্মথ চাটুজ্যের টাউন স্কুলে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। সেখানে আমাদের পাঠচক্র (Study Circle) ছিল। শ্রীঅরবিন্দ, সখারাম গনেশ দেউস্কর প্রভৃতি মাঝে মাঝে আসিয়া বক্তৃতা করিতেন। ইহার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ে এবং বিদ্যালয় উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়।

বিপিনচন্দ্র পালের "নিউ ইণ্ডিয়া" কাগজে দেবব্রত কিছুদিন সাব-এডিটরের কাজ করেন। এই সময়ে অর্থকষ্টে তাঁহার দিন চলিতেছিল, আমি তাহা জানিতাম।

এই সময়ে পি মিত্র বা প্রমথনাথ মিত্র ছিলেন আমাদের বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রেসিডেণ্ট। মফস্বল শাখাসমিতি হইতে কেহ কলিকাতায় আসিলে প্রথমে তাহাকে দেবব্রতর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইত। পরে প্রয়োজন হইলে দেবব্রতই তাহাকে মিত্র মহাশয়ের নিকট লইয়া যাইতেন অথবা অন্য কাহাকেও দিয়া পাঠাইয়া দিতেন।

১০৮নং আপার সার্কুলার রোডে যখন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিপ্লবী কেন্দ্রের কাজ চলিতেছিল, আমি একদিন সংবাদ শুনিয়া সেখানে যাই। আমি তখন ব্রাহ্ম মিশনারী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। কারণ, প্রবীণদের মুখে শুনিয়া শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ধর্মপ্রতিষ্ঠা এবং সমাজ উদ্ধার না হইলে স্বাধীনতা আসিবে না। ইহা ১৯০২ সালের কথা। পরে আমার এই ধারণার কিছু পরিবর্তন হয় এবং আমি বিপ্লবী দলভুক্ত হই।

ক্রমে আমাদেব ইচ্ছা হইল যে একটা কাগজ বাহির করি। আমি, দেবব্রত, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং বারীন্দ্রকুমার এই মতাবলম্বী ছিলাম। সখারামবাবুর নিকট প্রস্তাব করিলে

তিনিও সম্মত হইলেন। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে আমার সম্পাদনায় **'যুগান্তর'** বাহির হইল। শিবনাথ শাস্ত্রীর যুগান্তর উপন্যাস হইতে আমিই এই নাম দেই।

দেবব্রতবাবু 'যোগক্ষ্যাপা' ছদ্মনামে নিয়মিতভাবে যুগান্তরে লিখিতেন। পরে তিনি মনোরঞ্জন গুহের 'নবশক্তি' কাগজেও লেখকরূপে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্যের নিকট শুনিয়াছি, যুগান্তরের কর্মীরাই দৈনিক নবশক্তি কাগজ পরিচালনা করিতেন। এই বাড়ীরই একটা ঘর ভাড়া করিয়া শ্রীঅরবিন্দ থাকিতেন। বোমার মামলা সম্পর্কে ১৯০৮ সালের ২রা মে এখানেই তিনি গ্রেপ্তার হন। দুই একদিন পরে দেবব্রতকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেবব্রত এক বৎসর আলিপুর জেলে ছিলেন। ইহার পর মুক্তি পাইয়া বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী হন। তাঁহার নাম হয় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। সন্ন্যাসী অবস্থায় তিনি 'ভারতের সাধনা' নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

এক তরুণ বিপ্লবী কর্মী হরিশ ঘোষ সন্ন্যাসী অবস্থায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন —আপনি বৈপ্লবিক সাধনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে গেলেন কেন? তিনি উত্তর দেন— "পুলিশ যখন ঐ দিকের কাজ করতে দিলে না, আমি অন্য দিকে দেশের কাজ করছি।" সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়াও তিনি বিপ্লবীদের সম্পর্কে খোঁজখবর লইতেন। তাঁহার ভগিনী সুধীরাও বৈপ্লবিক কার্যে অনুরাগী ছিলেন। অনেক সময়েই তিনি আমাদের সাহায্য করিতেন। সুধীরা রেল দুর্ঘটনায় মারা যান।

দেবব্রতের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। কিন্তু যথার্থ সুযোগ ও সুবিধা না পাওয়ায় উহা যথার্থরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। সম্ভবত ১৯০৪ সালে বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের তিনিই ছিলেন কেন্দ্র। এক সময়ে পার্টীর দ্বিতীয় পংক্তির নেতৃবৃন্দের খেয়াল হইল, গেরুয়া পরিয়া প্রচারে বাহির হইতে হইবে। দেবব্রত ও তাঁহার ভগিনী সুধীরা অগ্রণী হইলেন। তাঁহারা এইভাবে কটক ও পুরী পর্যন্ত যান। কটকে তাঁহারা ধীরেন চৌধুরীর গৃহে উঠেন এবং তাঁহাকে দলভুক্ত করেন। ক্রমে ধীরেনবাবু কটক শাখার নেতা হন। নব্য ভারতে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধীরেনবাবু কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তখনও যুগান্তর বাহির হয় নাই।

জেলে শ্রীঅরবিন্দের সহিত বাস করিয়া ধ্যান-ধারণার দিকে দেবব্রতের মতি যায় এবং উহারই ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন।

দেবব্রত শুধু সুকণ্ঠ ছিলেন না, সঙ্গীত রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। একবার রঘুনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে তিনি বিপ্লব প্রচার উদ্দেশ্যে উড়িষ্যা যাইতেছিলেন। রাত্রিকাল, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। তাঁহারা গঙ্গার মধ্য দিয়া স্টীমারে যাইতেছেন। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়ের সংবাদে সকলেই এই সময়ে উল্লসিত। দেবব্রত স্বরচিত গান ধরিলেন ঃ

দে মা অসি।
সন্তানে অক্ষম ভেবে, বল আর কত স'বে

অধোবদনে কেন নীরবে বসি?
দে মা অসি।
আদিতে যেরূপে গো মা আর্যভূমে দাঁড়ালি,
দাঁড়া গো মা বাধাবিঘ্ন নাশিতে মা করালী,
নিজ সত্য রাখিবারে ডাকি মা আজ তোরে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি?
অধোবদনে কেন নীরবে বসি?
গাণ্ডীব রচেছিলি যে হাতে মা অতীতে
শৃঙ্খল কিঙ্কিণী আজি বাজে গো মা সে হাতে
সন্তানের শিরাতে শোণিত এক বিন্দু থাকিতে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি?
গুরু গুরু দূরে ঐ রণবাদ্য বাজিছে,
মহাকাল ইঙ্গিতে গো মা রণক্ষেত্রে ডাকিছে,
কাল-ই ঐ রণ মাঝে নব যুগে নব সাজে
বাজিবে রুধির পূত ভারতে পশি।
দে মা অসি।

গাহিতে গাহিতে দেবব্রতের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। দেশকে তিনি এরূপ একান্তভাবেই ভালবাসিয়াছিলেন।

দেবব্রতর আর একটি গান বহুল প্রচারিত, কিন্তু অনেকেই জানে না যে, উহা দেবব্রতের রচনা। সম্ভবত উহা অন্য নামেও চলিয়া থাকিবে।

এস কে কেঁদেছ নীরবে?
মায় মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে
সে মুখ উজ্জ্বল করিবে?
নিজের ভাবিয়া অক্ষম দুর্বল
বাড়ায়েছ মার যাতনা কেবল
যার মাতৃকণ্ঠে বাজিছে শৃঙ্খল
দুর্বল সবল সে কি ভাবিবে?
জান না যে মূঢ় জননী তোমার
পুরাকাল হতে কি শক্তি আধার
সন্তানের কণ্ঠে শুনিলে হুঙ্কার
নয়নে বিজলী খেলিবে।
কে আছ বিপদে না করি দৃক্‌পাত
মৃত্যু নির্যাতন দৈব বজ্রাঘাত
খণ্ড খণ্ড হয়ে মার মুখ চেয়ে
এসে কে মরিবে মারিবে?

দেবব্রত মাতৃভূমিকে কিরূপ নিবিড়ভাবে ভালবাসিতেন, এই সমস্ত সঙ্গীত তাহার প্রমাণ। দেবব্রত বসুর এক ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম প্রিয়ব্রত বসু। তিনি জেজুর গ্রামের উন্নতিকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং নৃসিংহ আড্ডি রোড হইতে জেজুর হাটতলা পর্যন্ত রাস্তা তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় সম্ভব হয়। তাঁহার এক পুত্র পুণ্যব্রত বসু কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সলিসিটর। তিনিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গ্রামের সর্ববিধ মঙ্গলকর্মে অগ্রণী হন। দেবব্রত বাবুর ভগ্নীর নাম সুধীরা বসু। তাঁহার সম্বন্ধে নিবেদিতা প্রসঙ্গে নির্ঝরিণী সরকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

॥ সুধীরা বসু ॥

সুধীরা দিদি তখনকার অগ্নিযুগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী দেবব্রত বসুর ছোট বোন। তিনি তখন রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেছিলেন এবং পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রজ্ঞানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হয়েছিলেন। সিস্টার ক্রিশ্চিয়ানা দেবব্রতবাবুর বন্ধুস্থানীয়া ছিলেন, সুধীরা দিদি তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন। সুধীরা দিদি এত পবিত্র, এমন কোমল-স্বভাবা ও ভালবাসাময় ছিলেন যে, এমন আর আমি কখনও দেখিনি, যাকে শাসন করা দরকার তাকেও তিনি শাসন করতে পারতেন না, তাঁর বয়স তখন খুবই কম ছিল, আমাদের চেয়ে কয়েক বৎসরের মাত্র বড় ছিলেন। তিনি যেন সত্যসত্যই আমাদের বড়বোনের স্থান গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর উপর আমাদের ভালবাসা ও মান-অভিমানের অন্ত ছিল না। নিবেদিতার স্মৃতির সঙ্গে সুধীরা দিদির স্মৃতি এমনভাবে জড়িত যে, একজনকে স্মরণ করলে সঙ্গে সঙ্গে অপরের কথা মনে এসে পড়ে।

নিবেদিতা আসার পর আমাদের স্কুলের শিক্ষার ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়ে যায়। এই সকল বিষয়ে সিস্টার অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, কোন সামান্য দুর্বলতাও সহ্য করতে পারেতেন না, তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টির সামনে এতটুকু ত্রুটি, অলসতা, ফাঁকি লুকাবার যো নাই, এমন কি সুধীরা দিদি, সিস্টার ক্রিশ্চিয়ানা পর্যন্ত কেহই তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ পেতেন না। ভাববিলাসিতা সম্বন্ধে তিনি বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিতেন না, সামান্য এতটুকু জিনিসও তিনি নষ্ট করা পছন্দ করতেন না, সুতা, পেন্সিল, কাগজ প্রভৃতি যাতে আমরা এতটুকু নষ্ট না করি সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। সুধীরা দিদি একদিন সিস্টার ক্রিশ্চিয়ানাকে বলেছিলেন, আমরা সেই সন্ন্যাসিনী, এত ছোট ছোট বিষয়ে আসক্তি থাকা কি ভাল? সিস্টার ক্রিশ্চিয়ানা কোনদিন গল্পচ্ছলে এই কথা নিবেদিতাকে বলেছিলেন, তৎক্ষণাৎ দৃঢ়ভাবে সিস্টার বলেছিলেন, এরকম মনোভাবের কখনও প্রশ্রয় দেবে না।

সিস্টার নিবেদিতার আসার অল্প দিনের মধ্যেই সিস্টার ক্রিশ্চিয়ানা আমেরিকাতে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে সুধীরা দিদির কাছে বিদায় নেওয়ার সময় সুধীরা দিদি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন, কিন্তু কয়েক দিনের ভিতরে সুধীরা দিদি নিবেদিতার ভাবে তন্ময় হয়ে গেলেন। একদিন আমাদের কাছে সিস্টারের কথা বলতে বলতে নারকেলের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেছিলন, উপরের কঠোরতা ভেদ করলে যে কি অসীম স্নেহ পারাবার, সেই অমৃতের আস্বাদন একবার পেলে আর ভোলা যায় না।' পরবর্তী কালে নিবেদিতার সাধনার ধন

বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার সুধীরা দিদিকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল। সিস্টারের আদর্শ প্রচারের জন্যই তিনি জীবন সমর্পণ করেছিলেন।

॥ বলদবাঁধ ॥

জেজুর ইউনিয়নের মধ্যে **বলদবাঁধের ঘোষবংশ** একটি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ। এই বংশে **তারকনাথ ঘোষ** জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুকলেজের একজন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করায় হেয়ার সাহেব তাঁহাকে তাঁহার বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে গ্রহণ করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণ কর্তৃক হেয়ার সাহেবের যে তৈলচিত্র স্থাপিত হয় তারকনাথ সেই চিত্রে স্থান পাইয়াছেন। দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়াছেন ঃ

দেয়ালে রয়েছে ওই হেয়ারের ছবি।
তারক দাঁড়ায়ে কাছে জ্ঞানালোক রবি॥

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তারকনাথ থাকবস্তার ডেপুটি-কলেক্টরের পদ লাভ করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তারকনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র গিরিশচন্দ্র সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল ছিলেন এবং চতুর্থ পুত্র গোপীনাথ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। ইহাদের বংশধরগণ কলিকাতায় ঝামাপুকুরে বসবাস করেন।

কৈকালা

হরিপাল থানার অন্তর্ভুক্ত কৈকালা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই স্থানের বসু বংশ ও বিশ্বাস বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকালে বহু পন্ডিতের এই গ্রামে বাস ছিল। স্বর্গীয় **চন্দ্রনাথ বসু** এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কৈকালা তাঁতের জন্য এক সময় খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও বেশ কিছু **তাঁতের কাপড়** এইস্থানে প্রস্তুত হয়। কৈকালায় ইউনিয়ন বোর্ড, পোষ্ট অফিস ও রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। পূর্বে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল, বর্তমানে উহা উঠিয়া গিয়াছে। এই স্থান কলিকাতা হইতে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

॥ চন্দ্রনাথ বসু ॥

চন্দ্রনাথ বসু তাঁহাব আত্মজীবনীতে কৈকালা গ্রামের পূর্ব সমৃদ্ধির বিষয় লিখিয়াছিলেন। নিম্নে উহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইলঃ

সন ১২৫১ সালের ১৭ই ভাদ্র হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন হরিপাল থানার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা ৺সীতানাথ বসু, পিতামহ ৺কাশীনাথ বসু। ধর্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ হিন্দু বলিয়া সে অঞ্চলে আমার পিতামহের বড় প্রসিদ্ধি ছিল। পিতৃদেবকে পিতামহের পদাঙ্কানুসরণ করিতে দেখিয়াছি। আমি তাঁহাদের কাহারও পদাঙ্কানুসরণ করিতে পারি নাই। হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি ভাগীরথীর পশ্চিমকূলস্থিত জেলা সকল তখন অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। কলিকাতায় পীড়া হইলে আমরা গ্রামে চলিয়া যাইতাম এবং বিনা চিকিৎসায় তথায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিতাম, এবং মহোল্লাসে খাইয়া খেলাইয়া বেড়াতাম। স্কুল কলেজের ছুটী হইলেই দেশে যাইতাম, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইত না, ছুটী ফুরাইলে একমাস দেড়মাস পরে কলিকাতায় আসিতাম, তাও একরকম কাঁদিতে কাঁদিতে। আমার পুত্র পৌত্রাদি

সে গ্রামও দেখিল না, সে গ্রাম্য সুখের আস্বাদও পাইল না। তাহাদের জীবন অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন হইল। সে গ্রাম্যজীবন যাহাদের হইল না, বঙ্গদেশ কি জিনিস তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। তাহারা যথার্থই হতভাগ্য।

কৈকালা তখন জনপূর্ণ ছিল। তথায় প্রায় একশত ঘর ব্রাহ্মণ এবং প্রায় চারিশত ঘর তন্তুবায় ছিল। কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতিও অনেক ছিল। সকলেই একরকম স্বচ্ছন্দে ছিল। কারণ, ধান চাল সস্তা ছিল এবং স্বাস্থ্যসুখে কেহই বঞ্চিত ছিল না। কৈকালার মিহি মোটা বিস্তর কাপড় বয়ন হইত—সে বস্ত্রের বড় আদর ছিল, খুব নাম ছিল, খুব কাট্‌তি ছিল। কৈকালায় প্রকৃত ধনাঢ্য তন্তুবায় ছিল। কৈকালা গ্রামে কুড়ি-পঁচিশখানা পূজো হইত। কিন্তু কৈকালা আজ ম্যালিরিয়ায় প্রায় জনশূন্য। গত ৪০ বৎসরে বোধ হয় শতকরা ৭৫ জন চলিয়া গিয়াছে গ্রামে গৃহ অতি অল্পই আছে। তন্তুবায় দুই-দশজন মাত্র আছে তাহারা এখনও কাপড় বুনিতেছে। হাওড়ার হাটে তাহাদের কাপড়ের আদর এখনও আছে। কিন্তু দুই দশজন বই নয়, তাও ম্যালিরিয়ায় মৃতবৎ; কয়খানা কাপড়ই বা তাহারা বুনিবে, কয়টা টাকাই বা পাইবে সমস্ত গ্রামে এখন একখানি মাত্র পূজো হয়—তাহাতেও ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় কুড়ি পঁচিশটির অধিক ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। বাগ্দী দুলে সব মরিয়া গিয়াছে—তারকেশ্বর রেলরাস্তা নির্মাণার্থ অন্য স্থান হইতে আনীত কুলীমজুর কোল সাঁওতাল তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রামে জঙ্গল বাড়িয়াছে বন্য শূকরাদি হিংস্র জন্তু দেখা দিয়াছে। ম্যালিরিয়ার জন্য প্রায় চল্লিশ বৎসর সোনার কৈকালায় যাই নাই।

সাহিত্য প্রসঙ্গে ৪৫৭ পৃষ্ঠায় চন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কৈকালায় তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি ৫নং রঘুনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্রদের নাম হরনাথ বসু ও প্রকাশনাথ বসু।

তাঁহার অন্যতম পৌত্র মহেন্দ্রনাথ বসু দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার "কান্তিক প্রেস" ক্রয় করেন। এই প্রেস হইতে এক সময় বহু পুস্তক ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইত। মহেন্দ্রবাবুর সহায়তায় বহু সাহিত্যিক তাঁহাদের পুস্তকাদি প্রকাশ করেন।

কৈকালার বসুবংশে **প্রিয়নাথ বসু** জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসার দিকে তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং "মেডল্যান্ড বসু এন্ড কোং" নামক অফিস প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বকীয় উদ্যম ও অধ্যবসায়ে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করেন এবং বিবিধ ক্রিয়াকলাপাদি গ্রামে করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার চতুর্থ পুত্র যতীন্দ্রনাথ বসু পিতার অফিস যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করেন। তিনিও স্বগ্রাম কৈকালার উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র অজিতকুমার বর্তমানে তাঁহাদের পৈত্রিক ব্যবসাদি পরিচালনা করেন।

॥ দত্তাত্রেয় বিষ্ণুমূর্তি ॥

কৈকালা হইতে একটি **দত্তাত্রেয় বিষ্ণুমূর্তি** ১৩৬৮ সালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার আলোকচিত্র গ্রন্থে প্রদত্ত হইল। মূর্তিটি আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষের দিকে এবং একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশের সহিত দাক্ষিণাত্যের যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল, এবং সে যোগাযোগ যে বাঙালীর ধর্মীয় চিন্তাধারার উপরেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সম্প্রতি তাহার একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রমাণটি হইল পাল-যুগের একটি শিল্পশ্রীমণ্ডিত মূর্তি—দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ্ণু দত্তাত্রেয়। হরিপাল থানার বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন নদী (বর্তমানে খাল) কৌশিকীর তীরে কৈকালা গ্রাম হইতে সম্প্রতি ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের গবেষক শ্রীমৃণালকান্তি পাল।

দুই ফুট ১০ ইঞ্চি উঁচু ও ১ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া এই মূর্তির দুইপাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিচিত্র দেহভঙ্গিমায় দণ্ডায়মানা। উপরে পশ্চাদপটে ক্ষোদিত আছে ব্রহ্মা ও শিবের দুইটি ক্ষুদ্রাকার উপবিষ্ট মূর্তি। সমগ্র মূর্তিটির কমনীয় শিল্পশৈলী, অগ্নিশিখার মতো ক্রমসূচ্যগ্র পশ্চাদপট এবং মণ্ডনশিল্পের আধিক্য। ইহার তারিখ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের দিকে ইঙ্গিত করে।

এই প্রথম বাংলাদেশের ধর্মসাধনায় ত্রিমূর্তি কল্পনার পরিচয় পাওয়া গেল। এ পর্যন্ত যে অগণিত বিষ্ণুমূর্তি বাংলায় পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিতেই বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মা ও শিবের মূর্তি একসঙ্গে নাই। এই দিক দিয়া কৈকালার মূর্তিটি অনন্যসাধারণ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ত্রিমূর্তি কল্পনা (দত্তাত্রেয় রূপ) প্রধানতঃ দক্ষিণ-ভারতেরই বিশেষত্ব। পশ্চিম-ভারতেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার বাহিরে বাদামী, হালেবিড ও আজমীড়ে দত্তাত্রেয় মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে মধ্য-ভারতের কলচুরিদের মধ্যেওএই রূপকল্পনা প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের মধ্য হইতেই এই ধারা বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়।

দত্তাত্রেয় বিষ্ণুরই এক অবতার। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে যে, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্রাহ্মণ কৌশিক ঋষি অনিমাণ্ডব্য কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তাঁহার সাধ্বী পত্নীর প্রচেষ্টায় বিপদোত্তীর্ণ হন। পুণ্যবতী নারী কৌশিকী দেবতাগণের নিকট বর লাভ করেন যে, ব্রহ্মা ও শিব তাঁহার গর্ভে জন্মলাভ করিবেন এবং দত্তাত্রেয় নামে পরিচিত হইবেন। দত্তাত্রেয় মূর্তিতে তিনজনকেই একসঙ্গে দেখানো হয়। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিশেষ বিশেষ দেবতাকে ছোট বা বড় করিয়া দেখান হইয়া থাকে। কৈকালার দত্তাত্রেয় মূর্তিতেও যে এইরূপ ঘটিয়াছিল (এখানে বিষ্ণুকে বড় করা হইয়াছে) তাহা অনুমান করা যায়, এবং কৌশিকী নদীর নামের সহিত পুরাণোক্ত কাহিনীর যে সংযোগ আছে তাহা সুনিশ্চিত।

আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটার শ্রী ডি পি ঘোষ মনে করেন যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হুগলী অঞ্চলে দত্তাত্রেয় পূজার বহুল প্রচলন হইয়াছিল এবং কৈকালা গ্রামে একটি দত্তাত্রেয় মন্দির থাকাও অসম্ভব নহে। মূর্তিটি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি নূতন দিকের সূচনা করিতেছে। কৌশিকী উপত্যকায় অনুসন্ধান কার্য চালাইলে এক প্রাচীন আবাসভূমির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ইহা সংগ্রহ করিতে স্থানীয় শিক্ষক শ্রীঅজিতকুমার সরকার বিশেষ সাহায্য করেন।

কৈকালা-রাধানগর কানানদী রাস্তা॥ হরিপাল তারকেশ্বর ও ধনিয়াখালি থানার মধ্য দিয়া "কৈকালা-রাধানগর-কানানদী রোড" নামক যে ১০ মাইল রাস্তাটি গিয়াছে, তাহা বহু দিন হইতে অবহেলিত হইয়া পড়িয়া আছে। উক্ত রাস্তাটি দুই পাকা রাস্তাকে যোগ করিয়াছে—উত্তরে চুঁচুড়া তারকেশ্বর পাকা রাস্তার কানানদী গ্রামে এবং দক্ষিণে বৈদ্যবাটী তারকেশ্বর পাকা রাস্তার কৈকালা গ্রামে। উক্ত রাস্তাটি পাকা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন কেননা প্রায় ৩০।৪০ খানি গ্রাম উক্ত রাস্তার উপর নির্ভরশীল। ইহার পার্শ্বে চারিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে—মহেশপুর, চাঁদপুর, ধামাইটিকর এবং সালালপুর এবং একটি জুনিয়র হাই স্কুল আছে। রাস্তাটি চাষীপ্রধান গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে, সেইজন্য চাষের মালপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইলে গরুরগাড়ী করিয়া উত্তরে কানানদী এবং দক্ষিণে কৈকালা আসিতে হয়। এই রাস্তা দিয়া প্রত্যহ বহু লোককে যাতায়াত করিতে হয়। রাস্তাটিকে ফীডার রোড বলা চলে। অবিলম্বে যাহাতে কৈকালা হইতে রাধানগর পর্যন্ত রাস্তাটি (৩ মাইল) (পূর্বতন লোকাল বোর্ডের রাস্তা) পাকা হয়, এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত।

॥ কলাছড়া ॥

জেজুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম। সুলতান গাছার জমিদার মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের নামানুসারে পূর্বে এই গ্রামের নাম 'মধুয়াবাটী' ছিল, পরে ইহা শুভিপুর বলিয়া খ্যাত হয়। বর্তমানে ইহা কলাছড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানের রজব আলী সরকার ১২৭৬ সালে মেডিক্যাল কলেজের যাবতীয় কণ্ট্রাক্ট লইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তাঁহার পুত্র মৌলভী আবদুল গণি সরকার তিরিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া গ্রামে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করিয়া দেন। গ্রামের উন্নতিকল্পে পুষ্করিণী খনন, তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ হন। কলাছড়ায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। গ্রামের জনসংখ্যা ৩২৮ জন।

॥ পানসেওলা ॥

জেজুর ইউনিয়নের মধ্যে পানসেওলা পূর্বে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। হরিপাল স্টেশন হইতে দেড় মাইল দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে বসু, মিত্র ও সিংহরায় বংশের বহু প্রাচীন কীর্তি আজও বিদ্যমান আছে। মিত্রবংশে টেঁকচাঁদ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র ও বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের জন্ম হয়। টেঁকচাঁদ ঠাকুরের আসল নাম প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস **"আলালের ঘরের দুলাল"** রচনা করেন। তাঁহার সময়ে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন এবং ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বেথুন সোসাইটির প্রথম সম্পাদক থিওজফিক্যাল সোসাইটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

প্যারীচাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা **কিশোরীচাঁদ মিত্র** তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" নামক সংবাদপত্র পরিচালনা করেন। হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং

তাঁহার চেষ্টায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরে জুনিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের পদপ্রাপ্ত হন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

॥ সারদাচরণ মিত্র ॥

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সারদাচরণ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন এবং 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ' বৃত্তি লাভ করেন। তিনি বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বহু প্রাচীন গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে জজের পদপ্রাপ্ত হন। বিচারাসনে স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য তাঁহার খুব খ্যাতি ছিল। গ্রামের উন্নতিকল্পে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং হরিপাল গুরুদয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্যও তাঁহার উদ্যম স্মরণযোগ্য। গ্রামে তাঁহার বিরাট ভবন এখনও বিদ্যমান আছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বসন্তকুমার মিত্র আইনজীবী হইলেও জেজুর ইউনিয়ন বোর্ডের বহু বৎসর সভাপতি থাকিয়া গ্রামের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কনিষ্ঠ পুত্র শরৎকুমার কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যাডভোকেট ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। সারদাচরণ কলিকাতায় একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন বর্তমানে উহা "সারদাচরণ এরিয়ান ইনস্টিটিউসন" নামে পরিচিত। সারদাচরণের স্মৃতিরক্ষাকল্পে বৈদ্যবাটীতে "সারদাচরণ মিউজিয়ম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পানসেওলা গ্রামে প্রাচীনকালে বহু মন্দিরাদি ছিল। এখনও ভগ্নাবস্থায় কয়েকটি বর্তমান আছে। বসুবংশের শিবমন্দির ও কালীমন্দির এবং সিংহরায় বংশের ছয়টি শিব-মন্দির তাঁহাদের বংশের পূর্ব স্মৃতির এখনও পরিচয় দিতেছে। বসুবংশের প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকার ভগ্নাবস্থা দেখিলে মনে দুঃখ হয়। এই গ্রামের ঘোষাল বংশের অশ্বিনীচরণ ঘোষালের স্মরণার্থে তাঁহার স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী বৈদ্যবাটী নিমাইতীর্থের ঘাটের নিকট ১৩২৫ সালে স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য একটি ঘাট নির্মাণ করিয়া দেন।

পানসেওলার নিকট **বাসুদেবপুর** গ্রামের **পঞ্চানন ঠাকুর** জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত। সন্তানাদি হইয়া যাহাদের বাঁচে না, তাহারা এই দেবতার নিকট মানত করিবার জন্য সমাগত হন ও ঔষধ লইয়া যান। বাসুদেবপুরে পোষ্ট অফিস আছে। গ্রামের জনসংখ্যা ৭০৩ জন। হুগলী জেলার বহুস্থানে **পঞ্চানন** প্রতিপত্তিশালী গ্রাম্য দেবতারূপে পূজিত হন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব গ্রাম-দেবতা কেন যে অন্তর্ধান করিলেন তাহা অনু-সন্ধানের যোগ্য। এই সকল দেবতা এক সময় বাঙ্গালী সংস্কৃতির উৎস ছিল। ইঁহাদের উৎপত্তি, প্রভাব ও প্রসারের ধারাবাহিক কাহিনী যতদিন না রচিত হইবে ততদিন বঙ্গ সংস্কৃতির বহু মূল্যবান ঐশ্বর্য ও উপকরণ আত্মগোপন করিয়া থাকিবে। পঞ্চাননের ধ্যান ঃ

পঞ্চাননং মহাদেবং রক্তবর্ণং দিগম্বরং
পদ্মাসনস্থং দ্বিভুজং নানালংকারভূষিতম্
প্রলম্ব বাহুসুবলং পট্টযজ্ঞোপবীতকং
শিরে পিঙ্গ জটাভারং শিশুগ্রীবারিমর্দনং
বামহস্তে শিশু ধরং দক্ষ হস্তে ত্রিশূলকং

গো মৃগবাহনম্ চৈব বেষ্টিতং মণিমণ্ডলং
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা চ শোভিতং রক্ত লোচনং
উগ্র তেজোময়ং রুদ্রং ব্রহ্মাষ্টং চ তপস্বীনং
ধ্যায়েৎ পঞ্চাননং দেবং ভক্তানুগ্রহকারকম্'

॥ ইলিপুর ॥

ইলিপুর গ্রাম হরিপাল থানার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাচীন গ্রাম এখন ইহা একটি নগণ্য স্থানে পরিণত হইয়াছে। এই গ্রামের নামে ইউনিয়ন বোর্ড হইয়াছে। ইউনিয়নের মধ্যে দুইটি বিদ্যালয় আছে। পূর্বে এই অঞ্চলে খুব নীলের চাষ হইত। এখানে ধান, পাট, আলু ও অন্যান্য শাক-সব্জী এখন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে এই স্থানের অনেক গ্রাম উজাড় হইয়া যায় এবং সেই জন্য বহুলোক গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইলিপুর গ্রামের জনসংখ্যা ৯৫৩ জন।

বর্তমানে ডি-ভি-সি কর্তৃপক্ষের থামখেয়ালিতে ইলিপুর গ্রাম একটি দ্বীপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ৮।৯ বৎসর পূর্বে জমিতে সেচের জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই গ্রামের উত্তর ও পূর্বপার্শ্ব দিয়া ডি ভি সি-র যে খাল খনন করা হইয়াছিল, উহা নাকি দূরবর্তী গ্রামের মাঠে জল সরবরাহের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হইতেছে। তজ্জন্য ইলিপুর গ্রামের পশ্চিমপার্শ্ব দিয়া নাকি নূতন খাল খনন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে জমি দখলের জন্য হুগলী জেলা সমাহর্তা উক্ত গ্রামের অধিবাসীদের উপর নোটিশ জারি করিয়াছেন। নোটিশের নির্দেশ অনুযায়ী (১১ই জুন ১৯৫৩, নূতন খালের জন্য জমির দখল লওয়া হইয়াছে। অনুপযোগী খালটি যথারীতি বজায় থাকিবে। চাষীরা উহা বুঝাইয়া চাষের জমিতে পরিণত করিতে পারিবে না। ইহার ফলে এই গ্রামের অনেক চাষীর প্রায় ভূমিহীন কৃষি মজুরে পরিণত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

বসতিহীন গ্রাম॥ হরিপাল থানার মধ্যে দুইটি বসতিহীন গ্রাম আছে। একটি গ্রাম বাসুড়ি ও দ্বীপার মধ্যস্থলে অবস্থিত **ভূপতিপুর** আর একটি নালিকুলের নিকট শ্রীপতিপুরের পার্শ্বে **কুমিরগাড়ি** গ্রাম। জনশ্রুতি একসময়ে এই দুইটি গ্রামে মড়ক লাগিয়া সমস্ত লোক মরিয়া যায় বলিয়া ভয়ে কেহ আর এই গ্রামগুলিতে বসতি স্থাপন করে নাই'

হরিপাল থানার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের জনসংখ্যা

নাম	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
জেজুর	১০,২৩৮	৫,১৮৩	৫,০৫৫
ফরিদপুর	৭,৭২১	৩,৮৮৩	৩,৮৩৮
বন্দীপুর	১০,৬৭৫	৫,৪৬৯	৫,২০৬
কৈকালা	৮,৩৬৫	৪,৩৭৫	৩,৯৯০
দ্বারহাট্টা-গোপীনাথপুর	১১,৭৩৯	৫,৯১৩	৫,৮২৬
হরিপাল	১২,৮৪১	৬,৫৯২	৬,২৪৯
নালিকুল	১১,৮৯১	৬,৩০৩	৫,৫৮৮
ইলিপুর	৯,৬৯৮	৪,৯২৮	৪,৭৭০

॥ অতুল্য ঘোষ ॥

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা স্বনামধন্য অতুল্য ঘোষ হুগলী জেলার জেজুরের ঘোষ বংশ সম্ভূত। পিতার নাম কার্তিকচন্দ্র ঘোষ। পিতামহ গোপালচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার আদি স্টিভেডোরদের মধ্যে অন্যতম। ব্যবসায়ে তিনি যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন, তেমনি দান-ধ্যান করিয়া যশস্বী হন। দোল, দুর্গোৎসব, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতিতে ঘোষ বংশে ভূরিভোজনের কথা আজও তাই গ্রামে গল্পচ্ছলে লোকে বলিয়া থাকে। অতুল্যবাবুর মাতামহ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার। তাঁহার নিকট হইতে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকটি পাইয়াছেন। অতুল্য ঘোষের পরিচালনায় শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত পত্র, নির্মোক ও নির্ণয় নামক সাময়িক পত্র এক সময় হুগলীতে খুব খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। কংগ্রেসের মুখপত্র দৈনিক জনসেবক পত্রেরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

অসহযোগ আন্দোলনে অতুল্য ঘোষ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন ও বিভিন্ন সময়ে দশ বৎসরের অধিক কাল কারাগৃহে বাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ না করিলেও জেলে থাকাকালীন তিনি ইতিহাস অর্থনীতি, সমাজনীতি বিশেষ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থরাজি পাঠ করেন এবং রাজনীতিতে তাঁহার সুক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞানের জন্য স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি কংগ্রেসের কর্ণধার হন। হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হইতে শুরু করিয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক ও সভাপতি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বহু কার্য করিয়া সমগ্র ভারতে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ও সাংগঠনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন। সমস্যাসংকুল পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের দায়িত্ব তাঁহার উপর থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও খেলাধূলার সহিত তিনি পূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করেন বলিয়া তিনি বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও ইণ্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি নির্বাচিত হন। কল্যাণী কংগ্রেসেও তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। বর্ধমান হইতে অতুল্য ঘোষ মহাশয় ভারতীয় পার্লামেণ্টেরও সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

তিনি সর্বসাধারণের কাছে 'অতুল্য-দা' বলিয়া খ্যাত। গান্ধীজীর তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত এবং ধর্ম সম্বন্ধে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী। তাঁহার 'অহিংসা ও গান্ধী' ও 'নৈরাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে গান্ধীবাদ' সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার কয়েকখানি পত্র শ্রীসুকুমার দত্ত 'পত্রালী' নাম দিয়া বাহির করিয়াছেন।

ভারতের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ তাঁহার ধীশক্তি ও কার্যদক্ষতার জন্য তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন। বাল্যে যাত্রা, থিয়েটার ও কীর্তনের প্রতি তাঁহার খুব অনুরাগ ছিল। কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠা সহকারে দেশমাতৃকার সেবার জন্য তিনি প্রশংসা খ্যাতি ও গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরলোকগমনের পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশে ইতিপূর্বে এত অধিক অর্থ সাধারণের নিকট হইতে কখনও সংগৃহীত হয় নাই। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহাদের কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটস্থ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন।
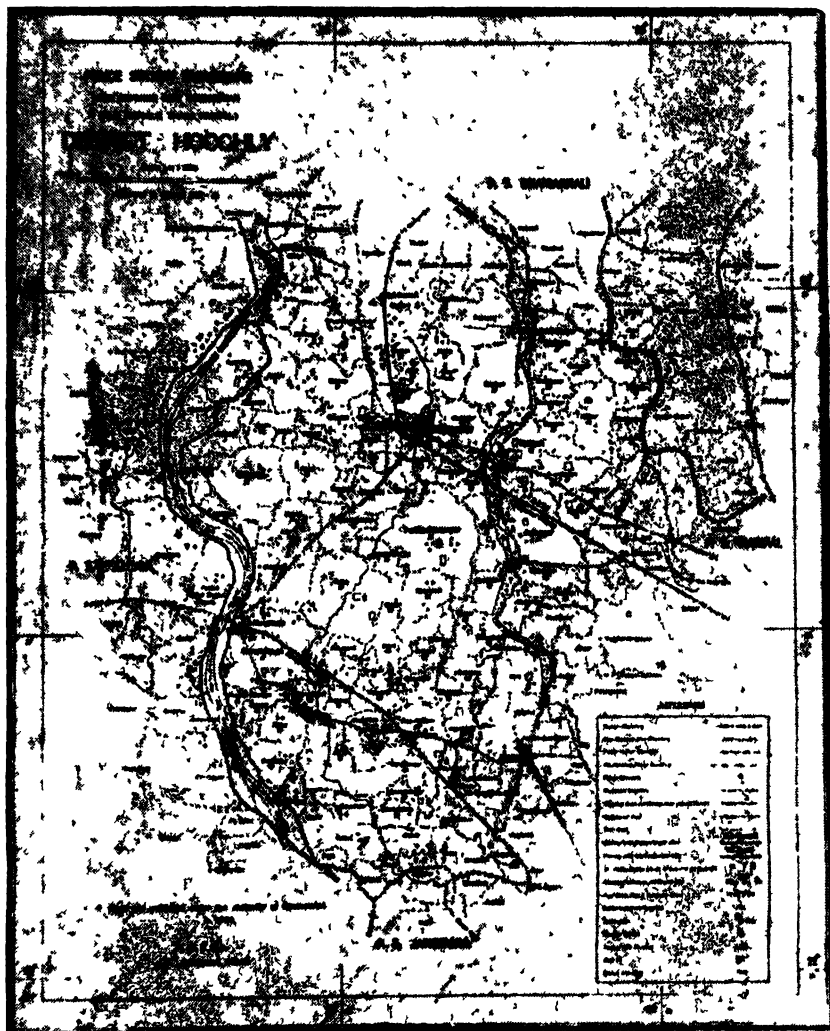
তারকেশ্বর থানার সার্ভে-ম্যাপ

[১৯৩০-৩৩]

॥ তারকেশ্বর ॥

তারকেশ্বর শৈব-তীর্থ বলিয়া বঙ্গদেশের একটি প্রসিদ্ধ পবিত্র পুণ্যস্থান; চন্দননগর মহকুমার অন্তর্গত ২২° ৫৩´ উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮° ২´ পূর্বে অবস্থিত। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে (৭/৮) এই লিঙ্গের উল্লেখ থাকিলেও তারকেশ্বরের উৎপত্তি আধুনিক বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন পুরাণ বা তন্ত্রাদিতেও তারকেশ্বরের কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না; রেনেলের ১৭৭৯—১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গদেশের মানচিত্রে তারকেশ্বরের অস্তিত্ব নাই। তবে ১৮৩০—১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা সরকার বঙ্গদেশের যে জরীপ করাইয়াছিলেন, তাহাতে **'তারেশ্বর'** নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে। উহাই আধুনিক **দশনামী শৈবসম্প্রদায়ের প্রধান মঠ তারকেশ্বর।** মঠ প্রতিষ্ঠা বাঙ্গলার নিজস্ব সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট না হইলেও, উত্তর ভারতের শৈবসম্প্রদায় প্রধানতঃ দশনামী শৈবগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার অধিনায়ক হন মোহান্ত। 'মোহ' যাঁদের 'অন্ত' হইয়াছে—তাঁরাই মোহান্ত অথবা সংস্কৃত 'মহৎ' এই মূল শব্দ হইতেও মোহান্ত কথাটি আসিতে পারে। উত্তরভারতে যেমন মোহান্ত দক্ষিণভারতে তেমনি ইঁহারা মঠাধিপ, মঠাধিশ, আচার্য বলিয়া পরিচিত। এই দশনামী শৈবমঠ বাঙ্গলাদেশের নিজস্ব ধর্ম-প্রতিষ্ঠান নয়। ইহা অবাঙ্গালীদের আরোপিত ধর্মপ্রতিষ্ঠান। এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত "তারকেশ্বর বন্দনা" পুঁথিতেও তারেশ্বরের নাম উল্লিখিত আছে দেখা যায়।

শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ও জৈন মত খণ্ডন করিবার জন্য পরিভ্রমণ করেন এবং বেদান্ত প্রচারের জন্য শৃঙ্গগিরিতে 'শৃঙ্গগিরি মঠ', দ্বারকায় 'সারদা মঠ', শ্রীক্ষেত্রে 'গোবর্ধন মঠ' এবং বদরিকাশ্রমে 'যোশী মঠ' স্থাপন করেন। শঙ্করাচার্যের শিষ্যবর্গ তাঁহার আদেশে ভারতের সর্বত্র পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার করিয়া শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার উপাসনা বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্রচারের জন্য নানা স্থানে প্রবর্তিত করেন. শঙ্করাচার্যের প্রধান চারজন শিষ্য পদ্মপাদ, হস্তামলক, সুরেশ্বর ও তোটক। এই চারজন মঠাচার্যের দশজন শিষ্য হইতে পরবর্তীকালে দশনামী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। এই দশটির নাম তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী। এই দশটি নামের তাৎপর্য আছে এবং শঙ্করাচার্যের সময় তাঁহার উদার ভাবের জন্য দশনামীরা সম্প্রদায়বিভক্ত হন নাই। জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে পরবর্তীকালে এই সন্ন্যাসীগণ সন্ন্যাসাশ্রমকে কলুষিত করিয়া ফেলে। কৌতুহলী পাঠক স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' এবং বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশিত *"The Throne Transcendental Wisdom"* ***By K. R. Venkataraman.*** গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক মূল্যবান্ তথ্য জানিতে পারিবেন।

শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষে উপনিষদসমুদ্র মন্থন করিয়া জীবকে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সন্ধান দেন। তাঁহার বাণী ঃ হে জীব, যাহা দ্বৈত তাহা দুঃখ, তুমি অদ্বৈত ব্রহ্ম, তুমি অমৃতের সন্তান—তোমার ব্যাধি নাই, তোমার মরণ নাই, তোমার জরা নাই—তুমি ও পরমাত্মা অভিন্ন। তুমি **সৎ**—তুমি চিরকাল আছ, চিরকাল থাকিবে, তোমার অস্তিত্ব কখনও বিলুপ্ত হইবে

না। তুমি **চিৎ**—তুমি জড় নহ, তুমি চৈতন্যময়, চৈতন্যই তোমার স্বরূপ। তুমি **আনন্দ**—তোমার দুঃখ নাই, তুমি সুখময়, সুখপ্রচুরতা তোমার কখনও ব্যাহত হওয়ার নহে।

মহালিঙ্গার্চন গ্রন্থে বঙ্গদেশের শৈবতীর্থ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা উল্লেখ্য ঃ

ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈবচ
বীরভুমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ॥
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকরো নদীতটে॥
ভাগীরথী নদীতীরে কপালেশ্বর ঈরিতঃ॥
ভদ্রেশ্বরশ্চ দেবেশি কল্যানেশ্বর এবহি।
নকুলেশ্বরঃ কালীঘাটে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ॥

ষোড়শ শতাব্দীতে তারকেশ্বরের নিকটবর্তী হুগলী-বর্ধমানের সংযোগস্থলে দামুন্যা গ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন; তল্লিখিত চণ্ডীকাব্যে বঙ্গদেশের যাবতীয় তীর্থক্ষেত্রের উল্লেখ আছে, এমন কি দামুন্যায় চক্রাদিত্য শিবের বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তারকেশ্বরের বিষয় উক্ত চণ্ডীতে কোন উল্লেখ নাই। তাই পণ্ডিতগণ কালীঘাটের নকুলেশ্বরের ন্যায় তারকেশ্বরের উৎপত্তি আধুনিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের বিশ্বাস এই যে, ষোড়শ শতাব্দীতে তারকেশ্বর প্রকটিত না হইলেও উক্ত স্থানেই তিনি ছিলেন, কিন্তু স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলিয়া উহা সর্বসাধারণের অগোচরে ছিল। পশ্চিমবঙ্গে **নাথধর্ম** নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আজ প্রায় অবলুপ্ত। তারকনাথ নামটিতে 'নাথ' থাকা সত্ত্বেও ইহা শিবের সাধারণ নাম নয়। তারকনাথের পার্শ্বেই লোকনাথ আছেন। অদূরে মহানাদে জটেশ্বরনাথ। সুতরাং 'নাথ'যুক্ত দেবতাগণ মূলত নাথদের, না জৈনদের, না বৌদ্ধদের দেবতার অবশেষের অস্তিত্ব তাহা আজ আর ঠিক করিয়া বলা সম্ভব নয়। বাঙলার বাহিরেও বিশ্বেশ্বর 'বিশ্বনাথ' এবং রামেশ্বর 'রামনাথ' বলিয়া কথিত হন।

॥ রাজা বিষ্ণুদাস ॥

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত জেলা জৌনপুরের ডোভী পরগণার গোমতী তীরস্থ হরিহরপুর নামক স্থানে **রাজা বিষ্ণুদাস** নামে এক ক্ষত্রিয় ভূস্বামী ছিলেন। তিনি মুসলমানদের আধিপত্য অস্বীকারপূর্বক প্রায় পাঁচশত অনুচর ও কান্যকুব্জ হইতে একশত ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপালের নিকট রামনগর নামক স্থানে আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহার বিস্তর লোকজন অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া স্থানীয় হরিপালের অধিবাসীবৃন্দ উহাদিগকে দস্যু মনে করিয়া বিশেষ ভয় পায় এবং তাহাদের বিরুদ্ধে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট অভিযোগ করে। নবাব সমক্ষে রাজা বিষ্ণুদাস সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া, তাঁহার কথা যে সত্য, তাহা দিব্য প্রমাণার্থে তৎকালীন প্রথামত হস্তমধ্যে জ্বলন্ত লৌহ শাবল ধারণপূর্বক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বঙ্গদেশে বাসের অনুমতি প্রদান করেন এবং বর্তমান তারকেশ্বরের তিন মাইল দূরে রামনগর নামক স্থানে বসবাসের জন্য প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমি প্রদান করেন। ইহা ১৭১০-১৭২৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

এই সম্বন্ধে "লিস্ট অফ অ্যানসিয়েণ্ট মনুমেণ্টস ইন বেঙ্গল" গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ

The supremacy of the Mahomedans, who invaded having deprived his residence of safety and comfort the Raja came away and took up his abode in a jungle two miles from Tarakeswar, the side of village Ramnagar or Balagar in Thana Haripal. 500 peoples of his own caste and 100 Brahmins of Kanuj came and settled with him but the inhabitants of the neighbourhood who suspected them of being robbers informed the Nawab of Bengal at Murshidadad of the arrival of person in the locality ; they were sent for and the Raja presented himself before the Nawab and declared that they were perfectly harmless people who wanted only some land to settle. The tradition says that as a proof of his innocence, Vishnu Das held in his hands a red hot iron bar without being injured in the least. His success in thus passing through the ordeal of fire not only led to his acquital but also procured for him from the Nawab a grant of 500 bighas of land in Bahirgora.

রাজা বিষ্ণুদাসের দেশত্যাগের কারণ সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। রাজা বিষ্ণুদাসের স্বদেশে (নবাব সাদৎ আলির) মুসলমানদের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া বঙ্গদেশে নবাব মুর্শিকুলী খাঁর অধীনে বাস করিবার কারণ কি? এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মনোমোহন সিংহ-রায় মহাশয়ের অভিমত যে, কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহের সহিত সংঘর্ষের জন্যই রাজা বিষ্ণুদাস দেশত্যাগ করেন। আমরাও তাঁহার অভিমত গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় দেওয়ান হরিনাথ রায়ের সহিত অনুসন্ধান করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্মার্থ সংক্ষেপে এই ঃ

অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলি বেনারস প্রভৃতি বিরানব্বইটি পরগণা তাঁহার বন্ধু মীর রোস্তম আলীকে বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত প্রদেশের শাসনভার তাহার উপর অর্পণ করেন। রোস্তম আলী অলস ও রাজকার্যে অপটু ছিলেন বলিয়া, নবাব তাহাকে অপসৃত করিয়া ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাপুরের জমিদার মনসারাম সিংহকে তৎপদে নিযুক্ত করেন।* তিনি বিচক্ষণ ও দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র বলবন্ত সিংহের জন্য তিনি দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি অনুমোদিত করাইয়া লইয়া অযোধ্যার নবাবের অধীনতা অস্বীকারপূর্বক স্বাধীন হইলেন এবং তাহার রাজ্য সুরক্ষিত করিবার জন্য কাশীর মধ্যে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিলেন। অতঃপর রাজা বলবন্ত সিংহ স্থানীয় সর্দারগণকে স্ববশে আনিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই উপলক্ষে ডোভী পরগণার অন্তর্গত হরিহরপুরের রাজা বিষ্ণুদাসের সহিত তাহার সংঘর্ষ হয় এবং কথিত আছে যে, হিয়াতী সিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি ফৈজাবাদের পথে মনসারামকে নিহত করেন এবং তাহার ছিন্নমুণ্ড রাজা বলবন্ত সিংহের নিকট উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দেন। ইহার পর ঘোরতর যুদ্ধ হয়, কিন্তু ডোভীর রঘুবংশীয়দের পরাজিত করিতে না পারিয়া তিনি পানীয় জলের কূপমধ্যে বিষ দিয়া তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া রাজা বিষ্ণুদাস দেশত্যাগ করেন এবং হরিপালের নিকটবর্তী রামনগরে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। ডোভী রেলওয়ে স্টেশন হইতে হরিহরপুর গ্রাম মাত্র দুই মাইল দূরে অবস্থিত এবং অদ্যাপি হরিহরপুরে 'সতীকূপ' রহিয়াছে; রাজা বিষ্ণুদাসের জ্ঞাতিগণ বিবাহকালে উক্ত কূপের তটে ভোজন করিয়া অতীতে যাহারা বিষমিশ্রিত জল

* এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মল্লিখিত তীর্থ-সপ্তক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

পান করিয়া দেহত্যাগ করে, তাহাদের স্মৃতি স্মরণ করে এবং বর্তমানে এইরূপ ভোজন তাহাদের বিবাহের কুলাচাররূপে পরিগণিত হইয়াছে।

॥ ভারামল্ল ॥

যাহা হউক রাজা বিষ্ণুদাস রামনগরে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভারমল্ল নামে এক সংসার ত্যাগী ভ্রাতা ছিলেন; তিনি জঙ্গলে যোগ সাধনা করিতেন। রাজার গড়ে-ভাটা *গ্রামের মুকুন্দরাম ঘোষ* নামক একজন গো-রক্ষক ছিল এবং রাজবাটীর যাবতীয় গাভীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। কিংবদন্তী এইরূপ যে, কয়েকটি গাভী গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি শিলাস্তম্ভের উপর তাহাদের বাঁট হইতে দুগ্ধ শূন্য করিয়া ফিরিয়া আসিত। মুকুন্দরাম গাভীদিগের শিলাখণ্ডের উপর দুগ্ধ দেওয়ার বিষয় রাজার ভ্রাতা ভারামল্লকে জ্ঞাপন করিলে, তিনিও উক্ত স্থানে যাইয়া গাভীদিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়া দেখিতে পান যে, এক শিলার মস্তকে গাভিগণ বাঁটের দুধ ঢালিয়া দিতেছে। সরকারী গ্রন্থে এবং তারকনাথ মাহাত্ম্যে যাহা লিখিত আছে, তাহা উল্লেখ্যঃ

It is said that while temporarily residing in the woods of Tarakeswar, then known by the name of Jote Savaram, he observed that several kine entered deep into the jungle with udders full of milk but returned with empty ones. Anxious to discover the same, one day followed a kine and saw it discharging its milk at a stone having a hole on the surface. (*List of Ancient Monuments in Bengal*)

একদা কপিলা যায় চরিবারে বন।
তার পিছে পিছে করে মুকুন্দ গমন॥
কপিলা ক্রমেতে যায় বনের ভিতর।
ধীরে ধীরে উপনীত যেখানে পাথর॥
আড়ালে মুকুন্দ থাকি করে দরশন।
পাথরের কাছে কবে কপিলা গমন॥
বাঁট হৈতে দুগ্ধ ধারা পাথর উপরে।
কপিলা ফেলিছে তাহা অনর্গলি ধারে॥
বুঝিল মুকুন্দ ইহা, পাথর ত নয়।
নিশ্চয় অনাদি লিঙ্গ শিব দয়াময়॥

দেবাদিদেব তারকনাথ-শিব সয়ম্ভুলিঙ্গ। অবিভক্ত বাঙ্গলায়, একমাত্র চন্দ্রনাথ ছাড়া তারকেশ্বরের ন্যায় শৈবতীর্থ আর নাই। বর্তমান মন্দিরটি যে স্থানে অবস্থিত পূর্বে উহা গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। উহার চতুর্দিকের নিম্নভূমি নল ও খাগড়ায় পূর্ণ ছিল এবং উচ্চ ভূভাগ সিংহল দ্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল। এই দ্বীপের অরণ্য মধ্যে পাষাণময় দেবাদিদেব তারকনাথ বিরাজিত ছিলেন। পরবর্তীকালে গ্রাম্য স্ত্রীলোকগণ এই শিবলিঙ্গকে সামান্য পাথর জ্ঞানে উহার উপর ধান ঝাড়িত। বহু বৎসর যাবত এইরূপ ধান ভানিবার জন্য শিবলিঙ্গের উপরে একটি গর্ত হইয়া যায়। এই গর্ত আজও তারকনাথের মাথায় আছে দেখিতে পাওয়া যায়। তারকেশ্বর-বন্দনায় উক্ত আছেঃ

চৌদিকে জঙ্গল জলা গহন কানন।
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি রম্য বন॥

তারকেশ্বরের মন্দির

ভারামল্ল রাজা বিষ্ণুদাসকে উক্ত শিলার সম্বন্ধে বলিলে তিনি রামনগরে উহাকে তুলিয়া আনিবার বন্দোবস্ত করেন এবং একদিন পঞ্চাশ হাত খনন করিয়া উহার মূল প্রাপ্ত না হওয়ায় খননকার্য পরদিনের জন্য স্থগিত থাকে। সেই রাত্রে রাজা ভারামল্ল স্বপ্নে দেখিলেন যে, তারকনাথ যেন তাহাকে বলিতেছেন যে, আমি তারকেশ্বর শিব, কেহ আমাকে তুলিতে পারিবে না; কারণ গয়া গঙ্গা কাশী পর্যন্ত আমার প্রসার আছে। তুমি আমায় তুলিবার চেষ্টা করিও না, বরং এই স্থানেই আমার মন্দির তারকেশ্বরের মন্দির বলিয়া নির্মাণ করিয়া দাও॥ অতঃপর উভয় ভ্রাতা তারকেশ্বরে মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন, পরবর্তীকালে মন্দির ভগ্ন হইলে বর্ধমানের মহারাজা মন্দিরটি পুনঃনির্মাণ করিয়া দেন।

এই সম্বন্ধে সহদেব গোস্বামী 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লিখিয়াছেনঃ

তারকেশ্বর শিব আমি কাননে বসতি।
অবনী ভেদিয়া বাছা আমার উৎপত্তি॥
অকারণ দুঃখ পায়া মোরে কেন খোঁড়।
গয়া গঙ্গা বারাণসী আদি মোর জড়॥

ভারামল্ল দেবতার সেবার জন্য এক হাজার তেইশ বিঘা জমি অর্পণ করেন এবং মুকুন্দরাম ঘোষের উপর যাবতীয় সেবার ভার অর্পিত হয়। মায়াগিরি তারকেশ্বরের প্রথম মোহান্ত; অনেকে ভারামল্লকে প্রথম মোহান্ত বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যের মধ্যে যোগ সাধনা করিতেন বলিয়া মুকুন্দের উপর দেবসেবা এবং মন্দির পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। মুকুন্দরাম ইহার অল্পদিন পরেই দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার ভৌতিক দেহ মন্দিরের পূর্বদিকে সমাহিত করা হয়। **মুকুন্দ ঘোষ** হইতেই তারকনাথের প্রথম প্রকাশ এবং মুকুন্দ ঘোষই তাঁহার প্রথম সেবক। ভারামল্লের জীবদ্দশাতেই মুকুন্দ গতায়ু হন এবং নূতন মোহান্ত তাঁহার নির্দেশানুসারে নিযুক্ত হন॥ ভারামল্ল প্রথম মোহান্ত হইলে, মুকুন্দের দেহরক্ষার পর তিনিই মোহান্ত থাকিতেন; নূতন মোহান্তের কোন প্রয়োজন হইত না। হান্টার সাহেব লিখিয়াছেনঃ

Vishnu Das had a brother who having given up all worldy things, wandered about as a beggar near Vishnu Das's Palace.

তারকেশ্বরের আবির্ভাব সংবাদ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচারিত হইল এবং বঙ্গের নানা স্থান হইতে যাত্রিগণ জোত-সভারাম নামক স্থানে সমাগত হইতে লাগিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই স্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। তারকেশ্বর জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত এবং শতসহস্র নরনারী এই স্থানে 'হত্যা' দিয়া দুঃসাধ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি বঙ্গবাসী ইহার নামে ভীত হইয়া থাকেন! প্রাচীনকালে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা ছিল এবং যাত্রিগণকে বৈদ্যবাটী হইতে হাঁটিয়া যাইতে হইত বলিয়া

বৈদ্যবাটীতে একটি বাংলো নির্মিত হয় এবং ইহাই বঙ্গের অন্যতম প্রাচীনতম বাংলো। কলিকাতা হইতে তারকেশ্বরের দূরত্ব মাত্র ছত্রিশ মাইল; এই পথ হাঁটিয়া যাইবার সময় বহু যাত্রী পূর্বে দুর্দান্ত দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হইত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শেওড়াফুলি হইতে তারকেশ্বর পর্যন্ত নূতন রেলপথ স্বর্গীয় নীলকমল মিত্রের চেষ্টায় নির্মিত হওয়ায় যাত্রিগণের দুঃখের লাঘব হইয়াছে। ১০৮৯ পৃষ্ঠায় তাঁহার বিষয় লেখা হইয়াছে।

বাবা তারকনাথের নিকট বিভিন্ন কামনায় 'ধর্ণা' দিয়া ভক্তগণ সিদ্ধিলাভ করেন তাহার অসংখ্য বিবরণ তারকেশ্বর মঠ হইতে প্রকাশিত 'পুণ্যভূমি' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তারকেশ্বরের অর্ধমাইল দূরে ভঞ্জিপুর গ্রামে তারকেশ্বর মঠের অন্তর্ভুক্ত কালীমাতার একটি মন্দির আছে। বাবা তারকনাথ অনেক সময় ভক্তগণকে অভিপ্রেত ফললাভের জন্য এই কালী মন্দিরে পাঠাইয়া দেন বলিয়া শুনা যায়।

তারকেশ্বরের দুঃসাধ্য রোগীর আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ

As time went on the temple fell into decay and over it the present one was built at the expense of the Burdwan Raja. People of all classes excepting the Mahomedans have from the very earliest days of the temple resorted to it for the cure of their diseases and lay prostrate before the devine image with a view to die of starvation at his feet if no remedy is suggested to them.

তারকেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বে **"দুধপুকুরে"** যে যাহা মনে করিয়া স্নান করিবে, তাহার সেই মনস্কামনা সিদ্ধ হয় বলিয়া খ্যাত। মুকুন্দের মৃত্যুর পর জগন্নাথ গিরি তারকেশ্বরের দেবসেবক পদে নিযুক্ত হন। তিনি চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, রামনগরে অনাদি লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। চন্দ্রনাথও শৈবতীর্থ, তথায় যাইবার পূর্বে তিনি এই লিঙ্গের পূজা সমাপন করিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবসেবক পদে নিযুক্ত হন। তিনি চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে শুনিতে তাহাকে তারকেশ্বরে থাকিতে অনুরোধ করেন। বৃদ্ধের কথামত তিনি এই স্থানে থাকিয়া যান এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় মুকুন্দরাম দেহরক্ষা করেন। অতঃপর ভারামল্লের নির্দেশানুযায়ী তিনি দেব সেবক নিযুক্ত হন। তিনিই তারকেশ্বরে মোহান্তদের পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম পূজার প্রবর্তন করেন। তারকনাথের মন্দিরের নিকটেই অপর একটি মন্দিরে চতুর্ভূজা কালী বিরাজিতা আছেন। এই কালী মন্দিরের উঠানের পশ্চিম দিকে কয়েকজন পূর্বতন মোহান্তের সমাধি আছে। তারকনাথের মন্দিরের সম্মুখস্থ, নাটমন্দিরে মনস্কামনা পূর্ণ ও রোগমুক্তির আশায় প্রত্যহ বহু নরনারী 'ধর্ণা' দেন।

হুগলী জেলার শেয়াখালার অন্তর্গত পাতুল-সন্ধিপুর নিবাসী **গোবর্ধন রক্ষিত** বর্তমান তারকেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। বর্ধমানের মহারাজা নির্মিত মন্দির ছোট বলিয়া যাত্রিগণের বিশেষ অসুবিধা হইত; গোবর্ধন রক্ষিত ছোট মন্দিরের উপর বর্তমান বৃহৎ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে দুইটি মন্দিরই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ধমানের মহারাজার পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে চিন্তামণি দে, দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দির নির্মাণ

করিয়া দেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর সেন 'সিদ্ধপুকুরের' ঘাট বাঁধাইয়া দেন এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পূর্বোক্ত চিন্তামণি দে, তারকেশ্বরের বাজার এবং রাস্তাঘাট পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দেন। বর্তমানে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ও যাত্রীদের সুবিধার জন্য কয়েকটি ধর্মশালা তারকেশ্বরে নির্মাণ করিয়াছেন। গোবর্ধন রক্ষিতের বিষয় ১১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বলাগড়ের রাজা স্বাধীন ছিলেন; কিন্তু ১৭০২ খৃষ্টাব্দে মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায় তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমান রাজ্যের অন্তর্গত করেন। এই সম্বন্ধে পেটারসন সাহেব বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেনঃ

He (Kirti Chandra Rai) also seized the estates of the Raja at Balagar situated near the celebrated Shrine of Tarakeswar in Hooghly. (Burdwan District Gazetteer By J. C. K. Paterson.)

রাজা ভারামল্ল রায় প্রদত্ত তারকেশ্বরের সেবার জন্য ছাড়পত্রটি তারকেশ্বরের মোহান্তের প্রসিদ্ধ মামলার পেপার-বুক হইতে শ্রীজহরলাল বসু, তাঁহার "বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে" প্রথম বাঙলা গদ্যের নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত ছাড়পত্রটি এইঃ

"শ্রীশ্রীরাম"

স্বস্তি সকল মঙ্গলময় শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর ঠাকুর চরণ যুগলেষু—

দেবদত্ত জমি পত্রহ মিদং কার্য্যনঞ্চাগে পরগণে বালিগড়ি ও সেনাবাগ দীঃ গ্রাম জোৎশমস, ভঞ্জপুর, জমি শালিশুনা হর্দ্দা মহদুদ দৌড় জাত জোত করিতে পার তাহা জোত করিবে— সেবাৎ শ্রীযুট মায়াগিরি ধুম্রপান মোহন্তীকে নিযুক্ত থাকিয়া জুতিয়া যোতায়া শ্রীশ্রীসেবা করহ এ সকল জমির রাজস্ব সহিত দায় নাস্তি। ইতি সন ৭৮৫ সাল, ১০ই চৈত্র।

(স্বাক্ষর) শ্রীরাজা ভারামল্ল রায়"

রাজা ভারামল্ল প্রদত্ত মঠের যে দানপত্র পাওয়া যায় এবং তারকেশ্বর মোহান্তের মামলার সময় যাহা আদালতে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার 'সন ৭৮৫' তারিখটি যে জাল তারিখ তাহা কোর্টে প্রমাণিত হয়। আসল তারিখ "সম্বত ১৭৮৫" "১" অক্ষরটি তুলিয়া দিয়া সম্বতকে সন করা হয় বলিয়া কোর্টে প্রমাণ হয়। সুতরাং ১৭৮৫ সম্বত বা ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে **তারকেশ্বরের মঠ** প্রতিষ্ঠিত হয়। মায়াগিরির পূর্বেও যে তারকেশ্বরের কথা জনসাধারণ জানিত তাহা সুনিশ্চিত। মন্দিরে একটি পাথরে **'শকাব্দ ১৫৪৩'** লেখা আছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন ঃ "ভারামল্লের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুদাসই প্রথম বালিগড়ি পরগণার জমিদার ছিলেন, তাঁহার অধস্তন দশম পুরুষ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তদনুসারে তিনপুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া রাজা বিষ্ণুদাসের অভ্যুদয়কালে খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পড়ে। বিষ্ণুদাসকে কিছুতেই ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের পরে টানিয়া আনা যায় না। এখানে সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক, ৺তারকেশ্বরের প্রথম দেবোত্তর সম্পত্তি রাজা বিষ্ণুদাস প্রদত্ত নহে, তাঁহার ভ্রাতা ভারামল্ল প্রদত্ত। অনুমান হয়, রাজা বিষ্ণুদাসের মৃত্যুর পর সন্ন্যাসিভক্ত ভারামল্ল কিছুকাল জমিদার ছিলেন এবং সেই সময়েই ৺তারকেশ্বর মায়াগিরিকে প্রদত্ত করিয়াছিলেন।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ দাসের 'শিবায়ণ' কাব্যে তারকেশ্বরের

নাম আছে। এর অভ্যুদয়কাল সম্পর্কে দীনেশবাবু বলেন ঃ "ভূরশীটের রাজা নরনারায়ণ রায় কবির প্রপৌত্র বাসুদেব রায়কে মহত্রাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন (হাওড়া কালেক্টরীর ৪৩০৫৮নং তায়দাদ)। উক্ত বাসুদেব ১১৫৯ সালে জীবিত ছিলেন না। অপরদিকে রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকাল ঠিক ১০৯২—১১১৮ সাল। সুতরাং বাসুদেবের প্রপিতামহ কবি রামকৃষ্ণের প্রথম অভ্যুদয়কাল ১৬২৫ খৃষ্টাব্দের পরে যাইবে না। কবির বাসস্থান আমতার নিকটবর্তী রসপুর গ্রাম। তাঁহার পক্ষে তারকেশ্বরের প্রথম আবিষ্কারবার্তা সহজেই পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব। কবির বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, তখনও তারকেশ্বর 'পর্বত-গহ্বরে' জনসাধারণের দুষ্প্রাপ্য স্থানে অবস্থিত ছিলেন। পরে ভারামল্ল মায়াগিরির সময়ে ঐ পর্বত গহ্বরই লোকপ্রসিদ্ধ মহাতীর্থে পরিণত হয়। সুতরাং মায়াগিরির পূর্বেও তারকেশ্বরের অস্তিত্ব শিষ্টসমাজে অজ্ঞাত ছিল না।"

॥ শৈব মঠ ॥

দশনামী সন্ন্যাসীগণ বাঙ্গলাদেশের নানাস্থানে বিশেষ করিয়া হুগলী, হাওড়া মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় যে সব মঠ প্রতিষ্ঠা করেন তাহার বিবরণ "তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। দশনামীদের শৈবমঠের বিবরণ এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য ঃ

স্থাপিত প্রধান গদী শ্রীতারকেশ্বরে।
মল্লের ভূভাগ রাজ্য খণ্ড খণ্ড করে॥
দ্বিতীয় বড়াশী মঠ গঙ্গার সাগরে।
২৪-পরগণা ভুক্ত হাতিয়ার গড়ে॥
তৃতীয় মঠের নাম আমডাঙ্গা নাম।
চতুর্থ হইল মঠ কৃষ্ণবাটী স্থান॥
পঞ্চম স্থাপিত মঠ নাম বর্ধমান।
ভুবনেশ্বর শিবনাম সর্বশক্তিমান॥
হংসেশ্বর শিব নামে ষষ্ঠ মঠ হয়।
রায়না মঠের নাম সপ্তম নিশ্চয়॥
অষ্টম মঠের নাম বিহিত আমড়াব।
নবম স্থাপন মঠ হয় সেলুয়ায়॥
দশম হইল মঠ নাম বৈদ্যবাটী।
গঙ্গাতট সন্নিকট কালী পরিপাটী॥
একাদশ মঠ হয় খামারপাড়া গ্রামে।
দ্বাদশ মঠের নাম চাঁইপাট ধামে॥
গড় ভবানীপুরে মঠ হয় সুবিহিত।
ভারামল্ল রায় করে ত্রয়োদশ ভুক্ত॥
অতঃপর হয় মঠ গমগড় নামে।
চতুর্দশ সংখ্যা করে রেঞাপাডা গ্রামে।
পঞ্চদশ হয় মঠ নয়নগর গ্রাম।

ষোড়শ সন্তোষপুর মঠ হয় ধাম॥
আর এক মঠ হয় মল্লের বিধান।
চেতুয়া গ্রামেতে হয় মঠের আস্থান॥
কাঁথি মহকুমা স্থানে পঞ্চবদনধাম।
মঠের স্থাপন হয় বালুযুক্ত গ্রাম॥
ক্রমান্বয়ে দেশভেদে হইল স্থাপিত।
উড্র-বঙ্গদেশে হয় সন্ন্যাসী ব্যাপৃত॥

তারকেশ্বরের প্রথম মোহান্ত মায়াগিরির ৫৬৫ জন চেলা ছিল। সম্বত ৮৫৫ সালে তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন বলিয়া ভট্টগ্রন্থে উল্লিখিত থাকিলেও উহা ঠিক নয়। তিনি কুড়ি বৎসর যাবত মোহান্ত ছিলেন। কিম্বদন্তী যে, তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে গিয়া অন্তর্ধান হইয়া যান। শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে থাকিয়াও তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় নাই।

তারকেশ্বরের মোহান্তদের সঠিক পারম্পরিক তালিকা পাওয়া যায় না। অনেকে আবার অস্থায়ীভাবে মোহান্ত হইতেন দেখা যায়। সেকালে মূল মোহান্ত ছাড়া বিবিধ দেবমন্দিরের পূজাদির অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকেও জনসাধারণ মোহান্ত বলিত। শ্রীমন্ত গিরি নামক ঐরূপ কোন সন্ন্যাসীর ফাঁসির বিষয় সেকালের সংবাদপত্রে দু-একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সমাচার দর্পণ' পত্রের দুইটি সংবাদ এইস্থানে উদ্ধারযোগ্য ঃ

তারকেশ্বরের মোহান্তের পুণ্য প্রকাশ—শুনা গেল যে তারকেশ্বর নিবাসী শ্রীমন্ত গিরি সন্ন্যাসী স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম সংস্থাপনার্থ এক বেশ্যা রাখিয়াছিলেন, তাহাতে জগন্নাথপুর নিবাসী রামসুন্দর নামক এক ব্যক্তি গোপের ব্রাহ্মণ ঐ বেশ্যার সহিত কি প্রকারে প্রসক্তি করিয়া ছদ্মভাবে গমনাগমন করিত। পরে সন্ন্যাসী জানিতে পারিয়া ২ চৈত্র [১২৩০] শনিবার রাত্রিযোগে সন্ধানপূর্ব্বক হঠাৎ যাইয়া বেশ্যাকে কহিল যে একটু পানীয় জল আন আমার বড় পিপাসা হইয়াছে, তাহাতে বেশ্যা জল আনিতে গেলে সন্ন্যাসী সময় পাইয়া ঐ ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলের উপর উঠিয়া তাহার উদরে এমত এক ছোরার আঘাত করিল যে, তাহাতে তাহার মঙ্গলবারে প্রাণ-বিয়োগ হইল পরে তথাকার দারোগা এই সমাচার শুনিয়া ঐ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এইমাত্র শুনা গিয়াছে। (১৬ই চৈত্র ১২৩০)

ফাঁসি—পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছিল যে, তারকেশ্বরের শ্রীমন্তরাম গিরি এক বেশ্যার উপপতিকে খুন করিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন, তাহাতে জিলা হুগলীর বিচারকর্তারা তাহাকে বিচারস্থলে আনাইয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তিনবার অস্বীকার করিলেন কিন্তু সূক্ষ্মা গতিপ্রযুক্ত চতুর্থবারে স্বীকার করাতে শ্রীযুক্তেরা বহুতর আক্ষেপ পূর্ব্বক ফাঁসি হুকুম দিলেন তাহাতে ১৩ ভাদ্র তারিখে রিতানুসারে তাহার ফাঁসি হইয়া কর্ম্মোপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে। (২৮শে ভাদ্র ১২৩১)

॥ এলোকেশীর কাহিনী ॥

ইহার পর মোহান্ত মাধব গিরি এলোকেশী নামক এক মহিলার সতীত্বনাশের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করেন: তাহার কারাবাসকালে, তদীয় শিষ্য শ্যাম গিরি তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি কারাগার হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মোহান্তের গদীতে পুনরায় বসিতে চেষ্টা

করিলে, শ্যাম গিরি আপত্তি করেন এবং উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়গণও মাধব গিরির মোহান্ত হওয়াতে আপত্তি করেন, কিন্তু তিনি মোহান্তের গদি লইয়া মামলা করেন এবং নিজ পক্ষ সমর্থনকালে আদালতে বলেন, "যেহেতু আমি দশনামা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত, সেইহেতু আমার পরনারী গমনে কোন বাধা নাই, আমি ফৌজদারী জেল খাটিয়া আসিয়াছি, এইজন্য আমার মোহান্তপদে পুনরায় বসিতে কোন বাধা নাই।" এই মামলায় মাধব গিরি জয়ী হন।

স্বর্গীয় দুর্গাচরণ রায় লিখিয়াছেন ঃ তারকেশ্বরের সন্নিকটে কুমরুল নামক একটি পল্লীগ্রাম আছে। ঐ গ্রামে নীলকমল মুখোপাধ্যায় নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। নীলকমলের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম এলোকেশী। এলোকেশীর নবীন নামক এক যুবার সহিত বিবাহ হয়। নবীনের আত্মীয় স্বজন কেহ না থাকায়, স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিত এবং মাস মাস খরচ পাঠাইত। নীলকমলের প্রথমা স্ত্রী গত হইলে, দ্বিতীয় পক্ষে যে স্ত্রীর পানিগ্রহণ করে, সেই স্ত্রীর সহিত মোহান্তের বিশেষ ভালবাসা ছিল। মোহান্ত একদিন যুবতী এলোকেশীকে দেখিয়া উন্মত্ত হয় এবং তাহার বিমাতাকে প্রলোভনে বশ করিয়া দূতীর কাজে নিযুক্ত করে। ঐ বিমাতা নিজ পতি নীলকমলকে 'রাজার শ্বশুর হবে, মোহান্ত বিষয় করিয়া দেবে' ইত্যাদি প্রলোভন বাক্যে বশীভূত করিয়া মেয়েটিকে মোহান্তের করে সমর্পণ করিবার পরামর্শ দেয়। স্ত্রী পুরুষের পরামর্শ স্থির হইলে, বিমাতা মেয়েকে তারকেশ্বরে ছেলে হইবার ঔষধ খাওয়াইতে লইয়া যায়। মোহান্ত প্রথম দিন বালিকা এলোকেশীকে সন্তান হইবার ঔষধ খাওয়ানোর ছলে মাদক দ্রব্য সেবনে অচৈতন্য করিয়া তাহার সতীত্ব নাশ করে। পরে নানারূপ সোনারূপার গহণা পাইয়া এলোকেশীর মন ক্রমশঃ মোহান্তের প্রতি অনুরক্ত হয়। সে সর্বক্ষণ মোহান্তের ভবনে স্ত্রী পুরুষের ন্যায় বাস করিতে থাকে। ক্রমে এই কথা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইল, নবীনের কানেও সেই কথা কিছু কিছু উঠিল। নবীন সন্দিগ্ধচিত্তে শ্বশুরালয়ে আসিয়া এলোকেশীকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলে, এলোকেশী কোন কথা গোপন না করিয়া সমস্ত বিষয় তাহাকে খুলিয়া বলিল। সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে নবীনের ইচ্ছা হইল না; সে বলিল "এলোকেশী, তুমি আমায় যথার্থ কথা বলায় তোমাকে ক্ষমা করিলাম, চল তোমাকে কলিকাতায় লইয়া যাই।" ইহা বলিয়া পাল্কি বেহারার অনুসন্ধান করিতে যায়। মোহান্ত দেখিল, এলোকেশী হাত ছাড়া হইতেছে; সে ছিনাইয়া লইবার জন্য ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাহারা বসাইল। নবীন দেখিল যে স্ত্রীকে লইয়া যাওয়া দুর্ঘট, মোহান্ত এতকাল ভোগ দখল করিয়া, এখনও এলোকেশীকে ছাড়িতে চায় না, তখন উভয়কেই নিবাশ করি। এই স্থির করিয়া সে স্ত্রীকে আঁশবঁটিতে কাটিয়া পুলিশে গিয়া উপস্থিত হইল। দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাস্তায় রাস্তায় এই কথা, এই গান, এই সম্বন্ধে বহু পুস্তক বাহির হইতে লাগিল। দেশের কত ধনী লোকে অর্থ দিয়া নবীনকে খালাস করিবার জন্য মোকদ্দমা করিতে লাগিলেন। গোলযোগে মোহান্ত ধরা পড়িল। রাজবিচারে ইহার নাকে দড়ি দিয়া জেলঘানিতে জুতে খাঁটি সরিষার তৈল বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

মোহান্ত মাধব গিরির আচরণের কথা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় পুণ্যতীর্থে কুলবধূর সতীত্বনাশের পরও বঙ্গবাসী লম্পট মোহান্তকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে এই ব্যাপার লইয়া বহু নাটক উপন্যাস এবং গান রচিত হয়। নিম্নে একটি গান উদ্ধৃত হইল ঃ

"মোহান্তের তেল নিবি যদি আয়।
ঐ তেল তৈয়ার হচ্ছে, হুগলীর জেলখানায়॥
যার পতি বিদেশে
তেল নিলে সে এক শিশে,
তেলের গুণে, মনের টানে,
পতি তার ঘরে ফিরে আসে॥

মোহান্ত মাধব গিরি ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত কুমরুল গ্রামে এলোকেশী নামক এক সুন্দরী যুবতীর সতীত্ব নাশের অপরাধে ধৃত হন এবং কারাবাস করেন। এলোকেশী তাহার স্বামী নবীনচন্দ্রকে মোহান্তের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে, নবীন তাহাকে মোহান্তের কামানলে আহুতি না দিয়া স্বহস্তে একখানি আঁশবটি দিয়া হত্যা পূর্বক থানায় যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন। বিচারে মোহান্তের জেল এবং নবীনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। পরে নবীনকে খালাস করিয়া দেওয়া হয়। নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় মিলিটারী অরফ্যান প্রেসে চাকুরী করিতেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তিনি হুগলীর জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মোহান্ত মাধব গিরির বিরুদ্ধে নালিশ করেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কলিকাতা 'বেঙ্গল থিয়েটারে' ইস্-মোহান্তের-এ-কী-কাণ্ড নামক একখানি নাটক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে অভিনয় হয় ও বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মোহান্তের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করেন এবং বেঙ্গল থিয়েটারও এই অভিনয়ের দ্বারা বহু অর্থ প্রাপ্ত হন। এই নাটকের সাফল্য দেখিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' এলোকেশীর ঘটনা সম্বলিত 'আমি তো উন্মাদিনী' নামক একখানি নাটিকা অভিনয় হয় এবং রসরাজ অমৃতলাল বসু এলোকেশীর পিতা নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকায় সুষ্ঠু অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে বিমোহিত করেন। কুমরুলের মধ্যে এলোকেশীর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

॥ তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ ॥

তারকেশ্বরের মোহান্তগণ দশনামা সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরূপে দেবসেবা করিবেন ইহাই ভারামল্ল নির্দেশ দিয়া যান। তাহারা বিবাহ করিয়া সংসার করিতে পারিবেন না এবং মোহান্ত গতাসু হইলে, তাহার প্রধান শিষ্য মোহান্তপদে অভিষিক্ত হইবেন, ইহাই চিরাচরিত প্রথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু মোহান্ত সন্ন্যাসধর্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্ত্রী সংসর্গের দ্বারা কদাচারে নিযুক্ত হইয়া উক্ত পদের অমর্যাদা করেন। ধর্মের আবরণে মোহান্তগণ যে অধর্মের খেলা খেলিতেন, দরিদ্র প্রজাগণ সে অনাচারের প্রতিকারের চেষ্টা করিতে কোন দিন সাহসী হয় নাই। ১৩৩১ সালে স্বামী বিশ্বানন্দ নামক এক সন্ন্যাসী

সর্বপ্রথম এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহৃত হন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভীত না হইয়া স্বামী সচ্চিদানন্দের সহযোগিতায় দ্বিগুণ উৎসাহে ইহা লইয়া আন্দোলন করেন। অতঃপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তারকেশ্বরের যাবতীয় ব্যাপার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। পরে তারকেশ্বরের সম্পত্তি সর্বসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া আদালত হইতে সিদ্ধান্ত হয় এবং মোহান্তের 'গদি' তাহাদের শিষ্যগণ প্রাপ্ত হইবেন, এই প্রথার বিলোপসাধন হয়।

সত্যাগ্রহীগণ প্রত্যহ কিভাবে কারাবরণ করিত, তাহার সংবাদ ও সত্যাগ্রহীর জেলে মৃত্যু বিষয়ক একটি সংবাদ আনন্দবাজার পত্রিকা [৩০ জুলাই ১৯২৪] হইতে উদ্ধৃত হইল ঃ

তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ ॥ ২৯শে জুলাই ১৬ জন সত্যাগ্রহী লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করাতে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

সত্যাগ্রহীর শোচনীয় মৃত্যু ॥ কৃষ্ণনগর জেলে সত্যাগ্রহী বন্দী পরিতোষ কুণ্ডু নিউমোনিয়া রোগে গত ২৮শে জুলাই মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মোহান্ত সতীশ গিরির সময়ে, তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অনাচারী মোহান্তকে বিদূরিত করিবার জন্য সর্বপ্রথম স্বামী বিশ্বানন্দ এবং পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য আন্দোলন করেন। তারকেশ্বর মন্দির দেশবাসীর সম্পত্তি, মোহান্তের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে; সুতরাং তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য সত্যাগ্রহ করা স্থির হয় এবং স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট কংগ্রেস যাহাতে সত্যাগ্রহের যাবতীয় ভার গ্রহণ করে, তদ্বিষয়ে আবেদন করেন। তারকেশ্বরের ব্যাপার অনুসন্ধান করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি একটি অনুসন্ধান সমিতি' গঠন করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ জে এম দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়, পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মৌলানা আক্রাম খাঁ উক্ত সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন। ১৩৩১ সালে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে কংগ্রেস সত্যাগ্রহের ভার গ্রহণ করে এবং মৌলানা আক্রাম খাঁ কার্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়ের উপর কংগ্রেসের পক্ষে যাবতীয় ভার প্রদান করা হয়।

স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ, দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জন প্রভৃতি শতসহস্র যুবক তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ করিয়া কারাবরণ করেন। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল হইতে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে চারিমাস যাবৎ এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিবার পর পরিশেষে মোহান্ত সতীশ গিরি গদিতে বসেন। ধরণীধর সিংহরায় প্রমুখ সাতজন ব্যক্তি তখন মোহান্তের বিরুদ্ধে এক মামলা উপস্থিত করেন; কিন্তু মোহান্তের ভয়ে তাহার বিরুদ্ধে কেহই সাক্ষ্য দিতে রাজী হন নাই। শ্রীপতি হাজরা ও উমাপদ মোদক সর্বাগ্রে মোহান্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন এবং শ্রী তীর্থবাসী সিংহরায়ের নিকট হইতে মোহান্ত তাহার স্ত্রীকে চান বলিয়া তিনিও সাক্ষ্য দেন। পরিশেষে সত্যের জয় হয় এবং তারকেশ্বরের সম্পত্তি দেশবাসীর হস্তে আসে।

হুগলীর জেলাজজ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৩৪৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মোহান্তের যোগ্যতা দেখিয়া **দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রমকে** প্রথম মোহান্ত নিযুক্ত করেন। সম্পত্তি পরিচালনের জন্য পরিচালক সমিতি যে ব্যবস্থা করিবেন মোহান্ত তাহাই মানিয়া লইবেন

এবং মোহান্তের পরিচালনায় প্রজাবর্গের উপর যদি কোন অত্যাচার হয়; তাহা হইলে পরিচালন সমিতি যথাকর্তব্য নির্ধারণ করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহারা নূতন মোহান্তও নিয়োগ করিতে পারিবেন বলিয়া হুগলীর জেলা জজ কর্তৃক নির্দেশ দেওয়া হয়।

গিরি উপাধিধারী পশ্চিমদেশীয় মোহান্ত সম্প্রদায় তারকেশ্বর হইতে অপসারিত হইয়াছে এবং বাঙগালী সন্ন্যাসী এখন মোহান্তের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রম মহারাজ নবপর্যায়ের প্রথম বাঙগালী সন্ন্যাসী মোহান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অধ্যাত্ম সাধনা করিবার জন্য তাঁহার শিষ্য **শ্রীমদ্দণ্ডীস্বামী হৃষিকেশ আশ্রমকে** মোহান্ত পদ দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার সুপরিচালনায় এই স্থানের সকল অনাচার দূরীভূত হইয়া ইহা একটি আদর্শ তীর্থে পরিণত হইয়াছে। ১৩৪০ সালে তিনি ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সতের বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস নেন এবং আঠার বছর বয়সে ১৩৫৮ সালের চৈত্র মাসে তিনি মোহান্ত হন। তারকেশ্বরে এত অল্পবয়সে পূর্বে কেহ মোহান্ত হন নাই। জজ রেবতি চট্টোপাধ্যায় ইহা অনুমোদন করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস বাঁকুড়া।

জগন্নাথ আশ্রম ১৩০১ সালের কার্তিক মাসে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার তৃতীয় পুত্র। তাঁহার পিতা কামাখ্যায় এক সাধুর নিকট শুনিয়াছিলেন যে তাঁহার তৃতীয় পুত্র সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইবেন। সেই সাধুর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে এবং তিনি অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও জপতপে আত্মনিয়োগ করেন। বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাঁহার একাধিক গ্রন্থ আছে। প্রাচীন পদ্ধতির সংস্কৃত শিক্ষার সমুন্নতি বিধানার্থ মোহান্ত থাকাকালে ১৩৪৫ সালে তিনি এক **সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়** স্থাপন করেন। তারকেশ্বরের মোহান্ত পদ তাঁহার শিষ্যকে দিয়া তিনি ১৩৩৪ সালে তদপ্রতিষ্ঠিত কাঁকো শঙ্কর মঠে যান। এই মঠে সাধু মহাত্মাগণ আশ্রয় পাইয়া থাকেন ও তথায় কত যে যাগ যজ্ঞ ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজায় সপ্তাহব্যাপী বিশ্ব-কল্যাণার্থে কাঁকো শঙ্কর মঠে "বিষ্ণুমহাযজ্ঞ" অনুষ্ঠিত হয়। এই স্থানে আবাসিক একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে। আরা ও বালিয়া জেলায় সতীশ গিরি বহু সম্পত্তি বেনামী করিয়া রাখিয়া যান। তথায় সতীশ গিরি একটি উচ্চ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রমের চেষ্টায় তাঁহার যে সব বেনামী সম্পত্তি ছিল তাহা উদ্ধার হয়।

ভারামল্ল তারকনাথের সেবার জন্য যে বৃহৎ জমিদারী দিয়া যান, তাহার বার্ষিক আয় ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া সরকার কর্তৃক জমিদারী লইবার আগে পর্যন্ত দুই লক্ষ টাকা ছিল। প্রণামী হইতে বৎসরে লক্ষাধিক টাকার উপর আয় হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত তারকেশ্বরের রাস্তাঘাটের বা ষ্টেশন হইতে মন্দির পর্যন্ত দুই পার্শ্বের কুটিরগুলির কোন উন্নতি হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তারকেশ্বরের যে অবস্থা ছিল, আজও ঠিক সেইরূপই আছে। দেবতার সেবার জন্য পূর্বে আট-দশ হাজার টাকা মাসিক ব্যয় হইত, বর্তমানে উক্ত ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে সংস্কৃত টোল এবং হাসপাতাল পরিচালনা করা হয়। পল্লীসংস্কার দেশবন্ধুর শেষ জীবনের কামনা ছিল, কিন্তু অকালে লোকান্তরিত হওয়ায়, তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তারকেশ্বরে বৈদ্যুতিক আলো হইয়াছে কিন্তু রাস্তাঘাটের উন্নতি হয় নাই বলিয়া শীঘ্রই এই স্থানে

ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্তে পৌর সভা স্থাপিত হইবে বলিয়া সরকার স্থির করিয়াছেন।

প্রত্যহ তারকেশ্বরে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের থাকিবার এখন আর কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এখানে ধর্মশালা ও বহু যাত্রীনিবাস আছে এবং মোহান্ত মহারাজও তাঁহার ভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মোহান্তের অমায়িক ব্যবহার সকল তীর্থস্থানের অধ্যক্ষগণের অনুকরণযোগ্য। তারকেশ্বরে হিন্দুস্থানীদের তিনটি ধর্মশালা, মান্দ্রাজীদের শেঠির ধর্মশালা ও ১৩৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিড়লা অতিথিশালা উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত অতিথিশালা মাননীয় অতিথিগণের থাকিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে তারকেশ্বরে শিবরাত্রি ও গাজন মেলায় লোক-সমাগম প্রচুর তো হয়ই পরন্তু সারা বছর ধরিয়া শুধু কলিকাতা ও মফঃস্বলই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বহু-সংখ্যক পুণ্যার্থীর আগমন হইয়া থাকে। এই যাত্রী আগমনের মধ্যে তারকেশ্বর মাহাত্ম্য সম্পর্কে হিন্দুদের আগ্রহ যে কত প্রবল এবং বিশ্বাস যে কত গভীর তা প্রমাণিত হয়। অবশ্য অলৌকিক কাহিনী এবং নানা ধরনের কিম্বদন্তী এই সব বিশ্বাসের মূল কারণ কাজেই শৈবতীর্থে এই দুইটি মেলায় যে বিরাট লোকসমাগম হইবে ইহা স্বাভাবিক।

॥ চৈত্র সংক্রান্তির মেলা ॥

পশ্চিম বাংলার অন্যতম প্রধান শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে প্রতি বৎসর **চৈত্র সংক্রান্তি** উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী মূল অনুষ্ঠানের প্রতিদিনই ট্রেণে, বাসে, পদব্রজে শিবব্রতধারী সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনীদের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটে এবং ১লা বৈশাখ আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। তারকেশ্বরের **গাজন-উৎসব** বাংলা দেশের সর্বাপেক্ষা বড় গাজন উৎসব। এই মহোৎসবে তারকেশ্বরের গোপের কাহিনী ও বিবিধ লৌকিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। ইহা যে দশনামী শৈবদের দান নয় এবং মোহান্তদের আচারভুক্তও নয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মেলা সুরু হয় ২০শে চৈত্র। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে **দখ্নো মেলা** আখ্যা দিয়াছে। মেদিনীপুর, হাওড়া, বাগনান, আমতা শ্যামপুর, থানাকুল, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানের কৃচ্ছ্রব্রতধারী ভক্তের দল, গৈরিক ধারণ করিয়া বাঁকে করিয়া পবিত্র গঙ্গাজল বহন করিয়া তীর্থধামে উপস্থিত হইয়া পূজা দেয়। চৈত্র মাস ৩১ দিনে হইলে মেলা ২১শে চৈত্র হয়।

২৪শে চৈত্র হইতে আরম্ভ হয় **"পুবে মেলা।"** এই সময়টা খুলনা, যশোহর ও ২৪ পরগণা জেলার (ডায়মণ্ডহারবার বাদে) লোকেরা পূজা দিতে আসে।

২৬শে চৈত্র সংক্রান্তির পাঁচ দিন পূর্বে মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ঐ দিনটিকে বলে **মহাবিষ্যি** অর্থাৎ মহাহবিষ্যি। উপবাসী ব্রতধারীরা সেই দিন দিনান্তে হবিষান্ন আহার করে।

২৭শে চৈত্র **ফল উৎসব।** এই দিন ফল ছোড়া কাটা ঝাঁপ - রামনগরের গাজন হইয়া থাকে। গাজন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ২৫২-২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

২৮শে চৈত্র নীল। এই উপলক্ষে মন্দিরে শিবের বিবাহ বার্ষিকী পালিত হয়। "বাবা" এইদিন মাথায় টোপর ও পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া দিব্য জামাই সাজেন। মন্দিরে সেইদিন দলে দলে ভক্তেরা নীলের বাড়ি পালায়। বাদ্যভাণ্ড, আতসবাজিতে সমস্ত উৎসব ক্ষেত্রটি

এক অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠে। নীলাবতীর বিবাহোপলক্ষে এইদিন হাতীসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা হয়। চড়কের সময় মুকুন্দ ঘোষের দৌহিত্র বংশ গাজনের মূল সন্ন্যাসী হন।

২৯শে চৈত্র। চড়ক উৎসবের ঝাঁপ খেলা হইয়া থাকে। এই দিন কাঁটা-ঝাঁপ একটি দর্শনীয় অনুষ্ঠান। মেলায় বিভিন্ন অঞ্চলের নরনারীর নৃত্য হয়।

৩০শে চৈত্র গৈরিক বস্ত্র ত্যাগ ও **ব্রত সমাপন**।

এই পাঁচ দিনের অনুষ্ঠানের প্রত্যহই মন্দিরে পূজা, অর্চনা, মন্দিরের প্রাঙ্গণে দণ্ডী করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ, বাবার মাথায় গঙ্গাজল "বর্ষণ প্রভৃতি থাকার প্রতিপালিত হয়।"

ব্রতধারণের ও নিয়ম পালনের ধরা ধাধা কোনও রীতি অধুনা প্রচলিত না থাকিলেও সাধারণতঃ একমাস, ঊনত্রিশ দিন, বা আরো অল্প দিনের জন্য কৃচ্ছ্র সাধনের ব্রত গ্রহন করা হয়। ব্রতী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী তখন এই মন্ত্র শ্রবণপূর্বক গৈরিক ধারণ করেন ঃ

"আত্ম গোত্রং পরিত্যজ্যং শিব গোত্রে প্রবিশতু"

গৈরিক ধারণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ এক গোত্র হইয়া যান। আত্মিক সমন্বয় সাধনের ইহা এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। তখন এখানে আর কোন ভেদাভেদ থাকে না। আবার ব্রত উদযাপনের শেষে শিবগোত্র পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত স্বীয় গোত্রে প্রত্যাবর্তন করেন। ওম্যালী সাহেব গেজেটিয়ারে কেবল শূদ্রগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের রমজানের ন্যায় এক মাস দিবাভাগে উপবাস করিয়া সূর্যাস্তের পর আহারাদি করেন বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক নয়। সর্ববর্ণের নরনারী এই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; তখন কোন ভেদাভেদ থাকে না। এখনও বহু মুসলমান রোগমুক্তির জন্য ধর্ণা দেন এবং তাহাদের থাকিবার জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে।

এই মেলা ও জনসমাবেশকে কেন্দ্র করিয়া কৃষি মেলা, কুটির শিল্প প্রদর্শনী, লোক-সঙ্গীত ও নাটকের আসর অনায়াসেই বসানো যায়। নানারূপ সরকারী তথ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রাচীরপত্র প্রদর্শন করিয়া জনসাধারণকে বুঝানোর এইরূপ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। গণ-সংযোগের এই সুন্দর সুযোগটি হারানো কখনও উচিত নয়।

ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ **তারকেশ্বরধাম** শিবরাত্রি মেলা উপলক্ষে অগণিত তীর্থযাত্রীদের কল-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। সুদূর পল্লীবাংলার প্রতিটি জেলা হইতেই হাজার হাজার পুণ্যলোভাতুর নরনারী শিবক্ষেত্রে মিলিত হইয়া বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মাদির মাধ্যমে ব্রত উদ্‌যাপন করেন। দোকানপাটের ভীড় এবং বহু লোকের আনাগোনায় এখানকার নাগরিক জীবন কর্মচঞ্চল হইয়া উঠে। মেলা দুইদিন ধরিয়া চলে। মেলার সময় তারকেশ্বর এষ্টেট কর্তৃক স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়।

এই যে বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা, ইহার মূলে বৈজ্ঞানিক সত্যতা কতটুকু আছে তা লইয়া হয়তো মতভেদের অবকাশ থাকিতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ নরনারীর মতে তারকনাথ **কলির জাগ্রত দেবতা**। এই দেবতা কলিযুগে 'পাপী-তাপী উদ্ধারিতে তারকেশ্বর নাম' লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। তারকনাথের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে তাপদগ্ধ মানুষের বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার জন্য বহুপ্রচলিত এই গানগুলিও যে তাহাদের মনে প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়া থাকে তাহার কিয়দংশ পর পৃষ্ঠায় উদ্ধার করিলেই পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

"তারকনাথের চরণে যার মতি না জন্মিল।
নিশ্চয় জানিবে তার বিধি বাম হইল॥
একবার বাবার নাম করে যেই জন।
সর্বপাপে মুক্ত হয় ব্যাসের বচন॥

তারকনাথ কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। তাই বলা হইয়াছেঃ

"বাবা মক্কায় মক্কেশ্বর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর।
কলিযুগে জীব তরাতে নাম তারকেশ্বর॥

তারকনাথ সর্বত্যাগী শংকর—ভোলানাথ। ভক্তের জন্য তিনি কৈলাসধামও পরিত্যাগ করিতে পারেন তাই বলা হয়ঃ

"বাবা শ্মশানে থাকে গায়ে ভস্ম যে মাখে।
দিবানিশি নয়ন মুদে রাম বলে ডাকে॥
ভক্তের জন্য কৈলাস শূন্য করে থাকেন সর্বক্ষণ।
তারকব্রহ্ম তারকনাথে ডাকলে আমার মন॥"

তারকনাথ আশুতোষ। ভক্তদের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেনঃ

"ভক্তিভাবে দিবে মোরে এক বিল্বদল।
অন্তিমকালে চরণ-কমলে পাইবে স্থল॥"

কিন্তু ঠাকুরের এই উপদেশ কেই বা মানে? শুধু একটি বেলপাতা ও একটুখানি গংগাজল দিলে কি ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়? সেইজন্য তাহারা সর্বত্যাগী ঐ শিবের মাথায় টাকা-পয়সা, সোনা-দানার বোঝা চাপাইয়া দিয়া হৃদয়ের কামনা-বাসনা পূরণ করিবার জন্য দাবি-দাওয়া পেশ করে।

তারকেশ্বরে দোলোৎসব॥ স্মরণাতীত কাল হইতে তারকনাথের ধামে বিশেষ উৎসবের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর দোলযাত্রা উৎসব এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করে। দোলের পূর্বদিন সন্ধ্যায় শাস্ত্রীয় বিধিমতে চাঁচড় উৎসবও তারকেশ্বরের এক আকর্ষণীয় বস্তু। মন্দির হইতে অর্ধমাইল দূরে অবস্থিত সাহাপুরের চাঁচড়তলা হইতে মন্দির পর্যন্ত ছড়া দেওয়া হয়, তারপর তারকনাথের ও লক্ষ্মীনারায়ণজীউর সন্ধ্যারতি শেষ হইলে স্থানীয় গোপগণ পূর্বপ্রথানুযায়ী লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ কীর্তন বাদ্যভান্ড ও নানাবিধ জয়ধ্বনি সহকারে বাবা তারকনাথের মন্দিরে লইয়া আসে। এই হরিহর-মিলনের অপূর্ব দৃশ্য একটি দেখিবার জিনীষ। মন্দিরে পূজার পর লক্ষ্মীনারায়ণজীউ পূর্ববৎ গোপস্কন্ধে সাহাপুরের চাঁচড়তলায় যান এবং এবং তথায় পূজা ও হোম যজ্ঞাদির পর চিরপ্রথানুযায়ী চাঁচড়গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয়। অগ্নিশিখার লেলিহান রূপ দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাবেশ হয়। পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে পূজার পর এষ্টেটের দোলমঞ্চে বিগ্রহ দোলনায় তোলা হয় এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে আবীর ও রঙ-এর দ্বারা সমস্ত তারকেশ্বরকে লাল করিয়া দেয়। মোহান্ত মহারাজের বাড়ির সামনে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর দোলমঞ্চ আছে। এবং বাড়ির মধ্যে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের সুন্দর বিগ্রহ একটি দর্শনীয় বস্তু।

শ্রাবণোৎসব॥ তারকেশ্বরে শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

তিথি অনুসারে কোন কোন বৎসর আষাঢ় মাসের শেষ সোমবার হইতে উৎসব আরম্ভ হয়। প্রতি সোমবার মাড়োয়ারী সম্প্রদায় এই উৎসবে যোগদান করেন। তাঁহারা শেওড়াফুলি হইতে পদব্রজে গঙ্গাজল লইয়া বাবা তারকনাথের অর্চনা করিয়া থাকেন।

ভারামল্ল স্মৃতিস্তম্ভ ॥ তারকেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গনে ১৯ বৈশাখ ১৩৬৪ সালে মোহান্ত শ্রীমদ্দণ্ডী হৃষিকেশ আশ্রম ভারামল্ল স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন। উহাতে লিখিত আছে :

শ্রীশ্রীতারকেশ্বরো বিজয়তে
বাবা তারকনাথজীউর আদি মন্দির নির্মিতা
ও আদি সম্পত্তি দাতা ভক্তপ্রবর রাজা
ভারামল্ল স্মৃতিস্তম্ভ
স্থাপিত অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৬৪

স্বামী বিষ্ণুশিবানন্দ গিরি লিখিত "তারকেশ্বরের মঠ ও সাধু ভারামল্ল" নামক পুস্তকে অনেক ঘটনা লিখিত আছে।

॥ তারকেশ্বর বন্দনা ॥

কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে দ্বিজ সহদেব রচিত "তারকেশ্বর বন্দনা"* নামক একটি হস্তলিখিত পুঁথি আছে গ্রন্থশেষে ইহা ১২৪৪ সালে রচিত বলিয়া লেখা আছে। **দ্বিজ সহদেব** তারকেশ্বরের নিকট নন্দনবাটী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া তিনি সেই পুঁথিতে লিখিয়াছেন। তাঁহার উক্তি ঃ

গান দ্বিজ সহদেব শঙ্কর ভাবনা।
নিবাসী নন্দনবাটী বালগড়ে পরগণা ॥

তারকেশ্বর সম্বন্ধে প্রাচীন কোন ভাল গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সেই হিসাবে এই পুঁথিটি তারকেশ্বর মঠ হইতে প্রকাশ করিলে ভাল হয়। লেখকের রচনার নিদর্শন এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া উদ্ধারযোগ্য ঃ

বন্দিব বনেব মধ্যে খেপা পশুপতি।
চারিদিকে উলুখাগড়া বেনার বসতি ॥
চৌদিকে জঙ্গল জলা গহন কানন।
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি রম্য বন ॥
কপিলা দিছেন দুগ্ধ একচিত্ত হইয়্যা।
দেখিল মুকুন্দ ঘোষ কাননে বসিয়া ॥
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
মৃত্তীকা খুলিযা দেখে অপূর্ব পাথর ॥
মদ্ধ্যখানে তারকেশ্বর চৌদিগেতে জোলা।

* A descriptive Catalogue of the Vernacular Maunscripts in the Collections of The Royal Asiatic Society of Bengal—Vol. IX. By Haraprasad Shastri.

ভক্তগণ পুজো দেয় টালা ফুলের মালা॥
বালিগড়ে পরগণা তার বিলেতে বিস্বাম।
পাতকী তরাতে প্রভু তারেশ্বর নাম॥
মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় একচল্লিস সালে।
বিস্বর্ধ বসেছিল শ্রীফলের মূলে॥

॥ তারকেশ্বরের মৃৎশিল্প ॥

তারকেশ্বরে প্রত্যহ ভারতের নানা অঞ্চল হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর তীর্থযাত্রীরা পুণ্য লাভের আশায় আসেন এবং প্রথা হিসাবে এইসব যাত্রীরা প্রত্যেকেই বাবা তারকনাথের উপর গঙ্গাজল ঢালেন। এই গঙ্গাজল ঢালিবার জন্য ঘটের মত একপ্রকার মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হয়। তারকেশ্বরের কুম্ভকারগণ এই মৃৎপাত্র শিল্পের শিল্পী এবং কুটিরশিল্প হিসাবেও ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এই ঘট ছাড়া কুম্ভকারগণ মাটির গেলাস ও ধুনুচিও তৈয়ারী করে।

তারকেশ্বরে কুম্ভকারের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও তাহারা সারা বছর ধরিয়া পরিবারের সকল লোকের সহায়তায় এই কাজে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া উৎপাদন যাহা হয় তাহাতে চাহিদা মোটামুটি মিটিয়া যায়। ইহা তৈয়ারী করা খুব জটিল ব্যাপার না হইলেও ইহাতে নৈপুণ্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ এই শিল্পের উপযুক্ত বেলেমাটি ও এ'টেল মাটি একত্রে মিশাইয়া বিশেষ দ্রব্যের জন্য বিশেষভাবে মাটির পাট করিতে হয়। তীর্থযাত্রীদের উপর নির্ভরশীল বলিয়া তীর্থযাত্রী সমাগমের তারতম্যের উপর এই শিল্পের বাজার নির্ভর করে। মাটির ঘটের দিক হইতে তারকেশ্বরের কুম্ভকারদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে শেওড়াফুলির কুম্ভকারগণ। প্রথা হিসাবে তীর্থযাত্রীরা অনেকে শেওড়াফুলির গঙ্গায় স্নান করিয়া সেখান হইতেই মাটির ঘটে গঙ্গাজল ভরিয়া পদব্রজে তারকেশ্বরে যায়। তারকেশ্বরের মৃৎশিল্পীরা তাহাদের প্রস্তুত ঘট স্থানীয় পান্ডাদের নিকট পাইকারী হারে সরবরাহ করে। খুচরা বিক্রয় তাহারা করে না। ইহারা পান্ডাদের নিকট হইতে জিনিস বিক্রয় হইলে তবে দাম পায়। ফলে ইহাদিগকে টাকা আদায় করিবার জন্য অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তারকেশ্বরের এই কুটিরশিল্পটি সংরক্ষিত করিবার জন্য সমবায় বিক্রয় কেন্দ্র খুলিলে কুম্ভকারদের অসুবিধা ও পরমুখাপেক্ষিতা দূর হয় এবং তাহাদের লাভের পরিমাণও বেশী হয়।

তারকেশ্বরে হিমঘর

পশ্চিমবঙ্গের গুদামঘর কর্পোরেশন বার লক্ষ টাকা ব্যয়ে তারকেশ্বরে হিমঘর নির্মাণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে ইহাই বৃহত্তম হিমঘর। ভারতের পণ্যসংরক্ষণের ইতিহাসে ইহা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কারণ এ পর্যন্ত আর কোন পণ্যসংরক্ষণ কর্পোরেশন ভারতের কোন জায়গায় এরূপ হিমঘর নির্মাণ করিতে পারেন নাই।

সহজে পচনশীল পণ্যের বিপণনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ ঐসব পণ্য সংরক্ষণের ফলে উৎপাদকগণ বেশি লাভ পান। তাঁহারা সুপরিকল্পিতভাবে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া মরসুমের সময় যে প্রচুর পণ্য বাড়তি থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায় তাহা

জমা করিয়া রাখিতে পারেন। **পশ্চিমবঙ্গের হুগলীতে সবচেয়ে বেশি গোলআলু জন্মে।** এই অঞ্চলের চাষীদিগের সুবিধার্থে কর্পোরেশন তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রত্যেকটি হিমঘরে ৫০০ টন আলু রাখিবার উপযোগী ২টি হিমঘর সংস্থাপনের মনস্থ করেন। কিন্তু তাঁহারা ১৩২০ টন আলু রাখিবার উপযোগী একটি হিমঘর নির্মাণ করিয়া লক্ষ্য ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

আলু চাষীদের লাভ

হিমঘর হুগলী অঞ্চলের আলু চাষীদের পক্ষে খুব লাভের বিষয় হইয়া থাকে বলিয়া আলুচাষিগণের জন্য তাহা হইয়াছে। হিমঘরে আলু খুব ভাল বাজারে চড়াদামে বিক্রয় করিয়া বেশ লাভ পায়, প্রথম বৎসরে হিমঘরে যত আলু রাখা হইয়াছিল তাহার শতকরা ৮৫ ভাগের বেশি আলু হুগলী জেলার চাষীদের। মোট ৭৭৮ জন লোক হিমঘরে আলু রাখিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মাত্র নয় জন ব্যবসায়ী, বাকি সব চাষী। হুগলী জেলার কৃতি আলুচাষিগণের তালিকা ১৫১-১৫৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

পাট, ধান প্রভৃতি অন্যান্য কৃষিদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য এই হিমঘরের নিকটে আর একটি সংরক্ষণাগার নির্মাণের কথা বিবেচনা করা হইতেছে।

গোবর্ধন রক্ষিত ॥ ১০৯৮ সালে তাম্বুলীবংশে বর্ধমানের অন্তর্গত কর্জমা গ্রামে গোবর্ধন জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃহীন এই দরিদ্রের সন্তান বার বৎসর বয়সে এক আত্মীয়ের কারবারে সামান্য বেতনে প্রবেশ করেন। পরে তিনি সন্ধীপুর গ্রামে স্বয়ং সুপারীর ব্যবসা আরম্ভ করিয়া এই গ্রামে বাস করেন এবং ব্যবসায়ে সততা ও সাধুতার জন্য প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। সন্ধীপুর গ্রামে পূর্বে তাঁহার একটি অতিথিশালা ছিল। বাবা তারকনাথের স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি তারকনাথের মন্দির নির্মাণ ও দুইটি পুস্করিণী খনন করিয়া দেন। ইহা ছাড়া হুগলী ও বর্ধমান জেলায় জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি বহু পুস্করিণী খনন করাইয়া দেন। যে জন্য বর্ধমানের মহারাজাকে একবার তাঁহাকে অর্থ-দণ্ড দিতে হইয়াছিল। তারকেশ্বরের নিকট গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে মল্লাসিমলা পর্যন্ত তিনি একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়া দেন। উহা এখন রক্ষিতের জাঙ্গাল বলিয়া কথিত। তাঁহার ন্যায় দানশীল ব্যক্তির জন্মে তাম্বুলী সমাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল বলিয়া আজও কোন স্থানে যাত্রা করিবার সময় তাঁহার স্বজাতিগণ গোবর্ধনের নাম উচ্চারণ করিয়া তবে যাত্রা করে। ১১৮৭ সালে এই মাহাত্মা পরলোকগমন করেন। তাঁহার চার পুত্রের নাম রামনিধি, কালিচরণ, দাতারাম ও ভক্তরাম। শ্রীবিভূতিভূষণ রক্ষিত এই বংশের সন্তান।

চন্দননগর মহকুমায একটিমাত্র কলেজ আছে। সম্প্রতি হরিপালে একটি কলেজ করিবার জন্য সকলে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তারকেশ্বরে কলেজ করিবার জন্য ২৮শে এপ্রিল ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে এস্টেট কমিটির অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় কিন্তু তৎকালীন স্কুল কর্তৃপক্ষের দ্বারা উহা কার্যকরী হয় নাই। এই অঞ্চলের ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য সত্বর তারকেশ্বর এস্টেট কর্তৃক একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত।

তারকেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় ভবন তারকেশ্বর এষ্টেট হইতে নির্মিত হয় এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভবন বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। **শ্রীজগন্নাথ আশ্রম সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়** তারকেশ্বর এস্টেট পরিচালিত একটি উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠান।

সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র রূপে তারকেশ্বর চতুষ্পাঠিও এষ্টেট কর্তৃক পরিচালিত হয়। ইহাতে কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতি শিক্ষা দেওয়া হয় এবং জগন্নাথ আশ্রম সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে বেদ, ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন স্মৃতি, বেদান্ত, সাংখ্য ও মীমাংসা পড়িবার সুব্যবস্থা আছে। এই দুইটিই আবাসিক শিক্ষালয়। এষ্টেট কর্তৃক এ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করা হয়।

তারকেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের সময় বৈদ্যপুর নিবাসী রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পিতা সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃত্যর্থে পাচ াজার টাকা দান করেন। ইহা ছাড়া জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি কয়েকটি টিউবওয়েল নির্মাণ করিয়া দেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে একটি পাথরে এই কথাগুলি আছেঃ

The Tarakeswar High English School
Established 1925
during the administration of
Amulya Chandra Bhaduri M. A.
Receiver Tarakeswar Estate
Built in1927.

॥ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব ॥

তারকেশ্বর মঠে বৈশাখ মাসে জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্যদেবের আবির্ভাব উৎসব প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

শঙ্করাচার্যের জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে তাহা ১১০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি। জহরলাল নেহেরু লিখিয়াছেন যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিনি প্রকট ছিলেন। কাহারও মতে তিনি অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু বাঙ্গালোর হইতে মিঃ বি, ভি, রমণ শঙ্করাচার্যের যে কুষ্ঠির ছক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি '২৫ মার্চ খৃষ্টপূর্ব ৪৪ অব্দের মধ্যাহ্নে শঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করেন' বলিয়া লিখিয়াছেন। সুতরাং এই মতে তাঁহার জন্মকাল প্রায় সাত আট শত বৎসর পিছাইয়া যায়। এই মহাপুরুষের সঠিক জন্ম কোন শতাব্দীতে হইয়াছিল তাহা এখন নির্ণয় করা অবশ্য কর্তব্য। তাঁহার উক্তি উল্লেখ্যঃ

Born on 25th March 44 B. C. at about noon. (Notable Horoscopes By B. V. Raman.)

তারকেশ্বরের **ইউনিয়ন ক্লাব** একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ইহার নিজস্ব ভবন আছে। তারকেশ্বর এস্টেটের সাহায্যে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাবের গ্রন্থাগারে অনেক প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষিত আছে। বঙ্গীয় সারস্বত সম্মেলনের মূল প্রতিষ্ঠানও তারকেশ্বর মঠে প্রতিষ্ঠিত আছে।

সত্যাগ্রহের পর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার পক্ষ হইতে তারকেশ্বরের সম্পত্তি সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া যে মামলা হয় উহার ব্যয় নির্বাহের জন্য গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এক লক্ষ টাকা দান করেন। পরে তারকেশ্বর এষ্টেট দেবোত্তর ও পাবলিক

এনডাউমেণ্ট বলিয়া সাব্যস্ত হয়।* এখন মোহান্ত মহারাজের সভাপতিত্বে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইয়াছে। দৈনন্দিন কার্য সমস্ত মোহান্তই করেন এবং তাঁহার নির্দেশে এই বিরাট এষ্টেট পরিচালিত হইতেছে।

তারকেশ্বর এষ্টেটের দেবোত্তর জমিদারীর অধীনে পূর্বে তারকেশ্বর, সাহাপুর, ভাটা ও নস্করপুর মৌজার কিয়দংশ ছিল। ১৩৬২ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী দখল বা মধ্যস্বত্ব বিলোপের সঙ্গে উক্ত মৌজাগুলি সরাসরি সরকারী কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া যায়। তারকেশ্বর দেবোত্তর সম্পত্তির বিনিময়ে এখন সরকার হইতে বাৎসরিক বৃত্তি পাওয়া যায়।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ প্রসিদ্ধ তারকেশ্বর মামলায় বাদী হিসাবে মামলা পরিচালনা করেন। প্রধানতঃ তাঁহার কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে তারকেশ্বর এস্টেট দেবোত্তর ও পাবলিক এনডাউমেন্ট বলিয়া সাব্যস্ত হয়। তিনি অসাধারণ মেধাবী পণ্ডিত ছিলেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। তিনি তারকেশ্বর এস্টেট ম্যানেজিং কমিটির বহু বৎসর সদস্য ছিলেন। ২১শে শ্রাবণ ১৩৬৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। গড়বাটী নিবাসী রঞ্জনলাল সিংহরায় তারকেশ্বর মোকদ্দমার অন্যতম বাদী এখনও জীবিত আছেন।

হরিনাম প্রদায়িনী সভা ১৩৬০ সালে তারকেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নিজস্ব মনোরম ভবনে প্রত্যহ রাধাকৃষ্ণের পূজা ও কীর্তনাদির অনুষ্ঠান হয়। ৫ই আশ্বিন ১৩৬৫ সালে হরিনাম প্রদায়িনী সভার ধর্মীয় পাঠাগার তারকেশ্বরের মোহান্ত হৃষিকেশ আশ্রম উদ্বোধন করেন। এইরূপ ধর্মীয় পাঠাগার গ্রামাঞ্চলে সাধারণতঃ দেখা যায় না।

তারকনাথের মন্দিরে একটি পাথরে **'শুভমস্তু শকাব্দ ১৫৪৩'** বলিয়া লেখা আছে। মন্দিরের মধ্যে বাবা তারকনাথের পূর্বদিকে বাসুদেবের একটি সুন্দর মূর্তি আছে। বাবা তারকনাথের পূজার সহিত প্রত্যহ তাঁহারও সাড়ম্বরে পূজা হয়।

তারকনাথের মন্দিরের উত্তরে দামোদর শিলা আছেন। উহার মন্দিরকে বদ্রীনারায়ণের মন্দির বলে। উক্ত মন্দিরের মধ্যে একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি আছে। উহা লোকনাথ অঞ্চলের একটি পরিত্যক্ত মন্দির হইতে পাওয়া যায়। উহারও প্রত্যহ পূজা হয়। ধর্ম্না-যাত্রীর জন্য এই মন্দিরের সামনে হরিলাল বসাক ষোড়শীবালা বসাকের স্মৃতি রক্ষাকল্পে একটি চাঁদনি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তারকনাথের মন্দিরের পূর্বদিকে দুইটি শিব-মন্দির আছে। সরকার ১৩৬২ সালে জমিদারী লইবার পর বাবা তারকনাথের সম্পত্তির বিনিময়ে তাঁহার পূজোর ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক ৭৫ হাজার টাকা নির্দিষ্ট বৃত্তি সরকার কর্তৃক প্রদান করা হয়।

চতুর্ভুজ গঙ্গোপাধ্যায় বাবা তারকনাথের প্রথম পুরোহিত হন। তিনি অন্ধ ছিলেন, বাবার আদেশে তিনি দুধপুকুরে স্নান করিয়া পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পান।

---

* ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত তারকেশ্বর মামলা বিলাতের প্রিভিকাউন্সিল হইতে নিষ্পত্তি হইয়াছিল। সেই মোকদ্দমা সংক্রান্ত 'পেপার-বুক' কলিকাতা হাইকোর্টে রক্ষিত আছে।

প্রাচীন নৌকা ও হাঁড়ি আবিস্কার

তারকেশ্বর থানার অধীন বালীগড়ি গ্রামে ১৩৬৮ সালে মাটি খনন কালে প্রায় ২২ ফুট নীচে ১টি দুই হাত চওড়া ঊনিশ হাত লম্বা নৌকা ও ১টি ঢাকাযুক্ত হাঁড়ি পাওয়া গিয়াছে। হাঁড়িটি নিখুঁতভাবে পাওয়া যায়, কিন্তু নৌকাখানি কোদালের ঘায়ে টুকরা টুকরা হইয়া যায়। এই প্রত্নদ্রব্যগুলি মুসলমান আমলের বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। উক্ত দ্রব্যগুলি মালিকের নিকট আছে।

॥ মোহান্তদের কুরসিনামা ॥

তারকেশ্বরের মোহান্তদের পারস্পরিক তালিকা সঠিক পাওয়া যায় না। মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরি লিখিত 'তারকেশ্বর-শিবতত্ত্ব' গ্রন্থে মোহান্তদের নিম্নোক্ত **কুরসিনামা** আছে। তিনি লিখিয়াছেনঃ প্রাচীন বেতাল বংশীয় বহি অপ্রাপ্ত হেতু মোহান্তগণের পরম্পরায় কুরসিনামা যাহা চলিয়া আসিতেছিল তাহাতে প্রাচীন ভট্টগ্রন্থে তারকেশ্বর মোহান্তগণের কুরসিনামা যথাযথ ছিল না, যাহা ছিল তাহা ভুল ছিল। নিম্নে নামের ফিরিস্তী দেওয়া যায়। এক্ষণে ভট্টদের বহি প্রাপ্ত হওনের পর বুঝা যায় যে, যাহা পূর্বে ইংরাজি ইতিহাসে পাওয়া যায় তাহা অশুদ্ধ। তাহার শুদ্ধির জন্য ধারাবাহিক কুরসিনামা দেওয়া গেল। যুদ্ধের সময় যাহাদের স্থিতিকাল পাওয়া যায় নাই এবং অস্থায়ীভাবে যাঁহারা মোহান্ত ছিলেন (মোহান্ত কার্য নির্বাহের জন্য) তাহারা সামান্য দিন ছিলেন, তাহাদেরও নাম দেওয়া হইল।

ইংরাজি ইতিহাসে প্রাপ্ত মোহান্তদের নাম (অশুদ্ধ)

১। ধূম্রপান গিরি; ২। কমলনাথ গিরি; ৩। মুক্তেশ্বর গিরি; ৪। যোগেশ্বর গিরি; ৫। গৌরনাথ গিরি; ৬। নির্মলনাথ গিরি; ৭। শিবনাথ গিরি; ৮। সমুদ্রনাথ গিরি; ৯। বিলাস গিরি; ১০। অরুণাচল গিরি: ১১। বলভদ্র গিরি; ১২। প্রসাদ গিরি; ১৩। জগন্নাথ গিরি; ১৪। পরশুরাম গিরি; ১৫। মোহনচন্দ্র গিরি; ১৬। রঘুচন্দ্র গিরি; ১৭। মাধবচন্দ্র গিরি; ১৮। শ্যামচন্দ্র গিরি; ১৯। সতীশচন্দ্র গিরি।

অস্থায়ী মোহান্ত—১। শিবনাথ গিরি; ২। মাহেন্দ্রনাথ গিরি; ৩। বিলাস গিরি; ৪। জগন্নাথ গিরি; ৫। শ্যামচন্দ্র গিরি।

ভট্টগ্রন্থে প্রাপ্ত মোহান্তদের নাম (শুদ্ধ)

১। মায়াগিরি ধূম্রপান; ২। কমলনাথ গিরি; ৩। বালগিরি বালখণ্ডী; ৪। অমরনাথ গিরি; ৫। কেশবনাথ গিরি; ৬। গোলাপ গিরি; ৭। জওয়াহীরনাথ গিরি; ৮। রাজেন্দ্র-নাথ গিরি; ৯। সুরতনাথ গিরি; ১০। কুমুদনাথ গিরি; ১১। বালকৃষ্ণ গিরি; ১২। গৌর-নাথ গিরি; ১৩। নির্মলনাথ গিরি; ১৪। মুক্তেশ্বরনাথ গিরি; ১৫। বলভদ্রনাথ গিরি; ১৬। বীরভদ্রনাথ গিরি; ১৭। মহেন্দ্রনাথ গিরি; ১৮। সমুদ্রনাথ গিরি; ১৯। অরুণাচল গিরি; ২০। প্রসাদ গিরি; ২১। পরসুরাম গিরি; ২২। মোহনচন্দ্র গিরি; ২৩। রঘুচন্দ্র গিরি; ২৪। মাধবচন্দ্র গিরি; ২৫। সতীশচন্দ্র গিরি (১২৯৯ সালে ইনি মোহান্ত হন)।

মোহান্তদের যে কুরসিনামা "তারকেশ্বর-শিবতত্ত্ব" গ্রন্থে কবিতাকারে লিখিত আছে, তাহার অংশবিশেষ পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে পর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইল।

বিংশতি বরষ হয় **মায়াগিরি** স্থিতি।
রায়ভট্ট গ্রন্থ করে এরূপ উকতি॥
সম্বৎ ৮৫৫ বর্ষে দৈববশে।
বঙ্গভূমে আগমন ধর্মের উদ্দেশে॥
তৎপবে **কমলগিরি** করে মঠে স্থিতি।
ষষ্ঠি বর্ষ ধর্মকর্ম যোগে সদা মতি॥
কমলের অবসরে বর্ষ সাতাইশ।
বালগিরি শ্রীমোহান্ত শিবদ্বার দেশ॥
ক্রমেতে **অমরনাথ মঠে** তারেশ্বরে।
মোহান্ত সংপ্রাপ্ত হয় **কেশব** তৎপরে॥
অশীতি বরষকাল অন্যরের স্থিতি।
কেশব সত্তর বর্ষ রাজ্য করে ইতি॥
গোলাপ ৯০ বর্ষ শ্রীমোহান্ত হয়।
জওয়াহীর এইরূপ ৩৫ নিশ্চয়॥
রাজেন্দ্র নামক গিরি ৩০ বর্ষ সীমা।
মোহান্ত হইয়ে মঠে রাখে গুণ ক্ষমা॥
তৎপরে **সুব্রত** নামে গিরির উদয়।
সূর্যসম ক্ষয়োদয় ক্রমবিপর্যয়॥
৪০ বরষ কাল মঠে শ্রীমোহান্ত।
ন্যূনাধিক হইবেক সাধক বৃত্তান্ত॥
দ্বিতীয় **কুমদ** নামে গিরি মঠে হয়।
দশম সংখ্যক এই মোহান্ত নিশ্চয়॥
ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ বর্ষ করে স্থিতি।
কালচক্র ঘূর্ণমানে স্বাধীন সমাপ্তি॥
পাঠান প্রেরিত হয় কালধর্ম বলে।
ধর্মের দুর্দশা তদা অধর্ম কবলে॥
পাণ্ডুয়া নামক গ্রাম হয় আক্রমণ।
পাঠান দুর্জয় হয় সন্ন্যাসী পতন॥
সপ্তগ্রাম সুনির্মূল পাঠানের হস্তে।
দেবালয় সাধুমঠ ধ্বংস যুদ্ধক্ষেত্রে॥
তারেশ্বর মন্দিরের অবস্থা তখন।
বর্ণনীয় নাহি হয় এরূপ ঘটন॥
ধর্মের ধিৎকার দিয়া যদা সাধুদল।
দেশান্তরে পলায়িত হোয়ে নিরাকুল॥
দেবালয় বনভূমি সম সেই কালে।
সংস্কার মার্জনাশূন্য নাহি দীপ জ্বলে॥
নাহি হয় প্রাভাতিক মঙ্গল আরতি।
ঘড়ি ঘণ্টা বাদ্য শব্দে শূন্য শিব ক্ষিতি॥
বিল্বপত্র গঙ্গোদকে শিবের পূজন।
নাহি হয় সেই কালে শৃঙ্গার শোভন॥
সান্ধ্য আরত্রিক বিধি শূন্য দেবালয়ে।
ভোগ পূজা নিত্যকর্ম লোপ কাল পেয়ে॥
এইরূপ শোচনীয় অবস্থা যখন।
ব্যবসায়ী সন্ন্যাসীর অত্র আগমন॥
ধর্মমঠ নষ্ট ভ্রষ্ট বিপন্ন দশায়।
দেখিয়া সকলে তদা করে হায় হায়॥
প্রতিকার চেষ্টা পায় সকলে মিলিয়া।
মুর্শিদার নবাবের সকাশেতে গিয়া॥
এইরূপে জ্ঞাত যদা নবাব সম্রাট।
বালিগড়ী বনভূমি সংপ্রাপ্ত আদিষ্ট॥
সন্ন্যাসীর মনোভীষ্ট হইল পূরণ।
তারেশ্বর মন্দিরের হয় সংস্করণ॥
কালিকা শক্তি মন্দির নির্মাণে যত্ন তৎপর
মোহন ধার্মিকবর অর্থের নিয়োগ করে।
এদিকে নাট্য মন্দির তারেশ্বর পুরঃস্বর
গদিঘর স্থিরতর সম্পন্ন মোহন করে॥
সাহাপুরে জলাশয় প্রকাণ্ড খনন হয়
মোহনের অর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠা শাস্ত্র উপরে।
ইত্যাদি কার্যসমূহ করে চিন্তা অহরহ
তৎকালে অপর কেঃ এতাদৃশ নাহি করে
এইরূপে বহুদিন অতীত করে জীবন
উন্নতি করে সাধন মোহন নামক গিরি।
বহু চেলা তদা করে চেলা মধ্যে **রঘু** করে
মোহন্তী কার্য উপরে অভিষিক্ত অধিকারী॥

॥ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে ॥

হুগলীর অন্যতম সুসন্তান সিতিপলাশী নিবাসী **অন্নদাপ্রসাদ সিংহ** ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভূপালের ‘ইন্ডিয়ান মিডল্যান্ড রেলওয়ে’ প্রোজেক্টের ভারপ্রাপ্ত হন। সেই সময় দেশে আসিবার সময় তারকেশ্বরে একরাত্রি তাঁহাকে বিশ্রামাগারে কাটাইতে হইয়াছিল। কারণ বৃষ্টি হওয়ায় কর্দমাক্ত পথে অন্ধকারে দশ মাইল পথ হাঁটিয়া সেই রাত্রে তাঁহার বাড়ি যাওয়া সম্ভব হয় নাই। মশার কামড়জনিত অনিদ্রা হইতে সেই রাত্রেই তারকেশ্বর হইতে একটি লঘু রেলওয়ে স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় আসে এবং বলা বাহুল্য সম্পূর্ণ ভারতীয় মূলধনে, ভারতীয় শ্রম ও ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি ‘হোপ’ নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক অমৃতলাল রায় ও শ্রীরামচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় ভারতে প্রথম স্বদেশী রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। তারকেশ্বরে ইহার প্রধান কার্যালয় হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন এই রেলওয়ে লাইন খুলিবার প্রস্তাবক অন্নদাপ্রসাদ রায় ও এজেন্ট অমৃতলাল রায়ের স্বাক্ষরে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছিল তাহার দশম অনুচ্ছেদটি নিম্নে উদ্ধারযোগ্য ঃ

রেলওয়ে বিস্তারের পক্ষে আমাদের দেশের লোকের এই প্রথম উদ্যম। বিলাতের লোকে টাকা তুলিয়া এখানে আসিয়া রেলওয়ে করিয়া অনেক লাভ করিতেছেন। আমরা যদি টাকা তুলিয়া আমাদের দেশে রেলওয়ে করি, তহা হইলে আমাদেরও ঐরূপ লাভ হইতে পারে। এতদ্বারা বাণিজ্য বৃদ্ধি ও দেশের অর্থ বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যাঁহারা প্রস্তাবিত রেলওয়ের অংশ কিনিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতা ৬৫নং অখিল মিস্ত্রীর লেনে ‘হোপ’ নামক ইংরাজী পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায়ের নিকট আবেদন করিবেন।

ভারতের সমস্ত সংবাদপত্র মহলে ইহা তখন একটি আলোচনার বিষয় হয়। কয়েকখানি ইংরাজ পরিচালিত সংবাদপত্র ও একমাত্র বাঙ্গালী পরিচালিত ‘সঞ্জীবনী’ এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও ইংরাজ পরিচালিত “ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ” পত্রে এই পরিকল্পনা-কারীকে উৎসাহিত করিয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশ করেনঃ

We are pleased to hear that Baboo A. P. Roy's project for forming a native company to construct right feeder lines of Railway in Bengal, connecting prosperous districts with the main arterial lines, is receiving a fair amount of support, from his fellow countrymen. Some apprehension seems to be entertained that the Government will refuse sanction to the scheme. We cannot believe there is any ground for such a fear. Instead of snubbing the promoters, we should fancy the Government would rather welcome their efforts, and give the project every encouragement in its power.

বাঙগলা দেশের যে সব গন্যমান্য ব্যক্তি এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়া প্রথমে শেয়ার কিনিয়া সাহায্য করেন তাহাদের মধ্যে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (৬০০ শেয়ার), নন্দলাল গোস্বামী (৫০০ শেয়ার), চন্ডীলাল সিংহ (৫০০ শেয়ার), ঈশানচন্দ্র মিত্র (২৫০ শেয়ার), কানাইলাল খাঁন (২৫০ শেয়ার), এবং বজ্রনাথ সেন (১৫৭ শেয়ার),

মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হুগলী জেলা বোর্ড ও বি, পি, রেলওয়ের সহিত একটি চুক্তি করেন। দশটাকা করিয়া আশি হাজার শেয়ারের মধ্যে একাত্তর হাজার শেয়ার একবৎসরের মধ্যে বিক্রয় হইয়া যায়। উদ্যোক্তাগণ ছাড়া ত্রিহুত স্টেট রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার রায়বাহাদুর রামগতি মুখোপাধ্যায় (২৫০ শেয়ার), নগেন্দ্রনাথ বসু (৫০০ শেয়ার) এবং চক্রধরপুরের কর্ণাক্টর কেশবলাল (১৮০ শেয়ার) পরে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। বসুয়ার শ্রীরাম বসু, ভাস্তাড়ার যজ্ঞেশ্বর সিংহ এবং চর্কাদিঘির বিধুভূষণ সিংহরায় এই প্রতিষ্ঠানে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারকেশ্বর হইতে বসুয়া পর্যন্ত এই বার মাইল পথে প্রথম স্বদেশী রেলগাড়ি চলে। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাতায়াত ব্যবস্থা প্রসঙ্গে ৩২৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ বসুয়া হইতে মগরা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় এবং ছোট লাট স্যার চার্লস ইলিয়ট আনুষ্ঠানিকভাবে এই কোম্পানীর তারকেশ্বর-মগরা শাখার ২রা এপ্রিল ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উদ্বোধন করেন। এই লাইন করিতে কানা নদী, কানা দামোদর, ঘিয়ানদী ও কুন্তীনদীর উপর চারটি পুল নির্মাণ করিতে হয়। প্রথম তিনটি নদীর উপরে চল্লিশ ফুট লম্বা ও কুন্তী নদীর উপর আশিফুট লম্বা সেতু নির্মিত হয়। এই লাইন নির্মাণ করিতে প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। প্রথমে তিন খানি ইঞ্জিন ও ষাট খানি বগি লইয়া প্রত্যহ ৬ বার গাড়ি যাতায়াত করিত। প্রতি মাইল লাইন তৈয়ারী করিতে গড়ে ২৯ হাজার টাকা করিয়া খরচা পড়িয়াছিল। ৭ই এপ্রিল ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" পত্রে এই রেলওয়ের উদ্বোধনের সংবাদটি উল্লেখ্যঃ

On Tuesday last the 2nd instant before a large and respectable gathering the Lieutenant Governor formally declared open the Tarakeswar Magra line of the Bengal Provincial Railway Company, the first railway in India which has been entirely financed and constructed by the sole agency of the natives of this country......

The railway was constructed by Babu Annada Prosad Roy, a passed student of the Rurki Thomson Civil Engineering College, and a young Engineer of exceptionally high abilities who with Mr. Amrita Lall Roy of 'Hope' projected and planned the line. We are much pained to notice that while encomiums were lavished in the Lieutenant Gevernor's speech, on the occassion of the opening ceremony on Rai Ram Gati Mukherjee Bahadur who did next to nothing in constructing the line, the name of Babu Annada Prosad Roy who not only planned but really constructed the first native railway was not even incidently mentioned. (Indian Messenger)

এই কোম্পানী বাঙালী তথা ভারতবাসীর একটি গৌরবের বস্তু ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হুগলী জেলার ৩৩ মাইল জুড়িয়া এই রেলপথ বিস্তৃত থাকিলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আশানুরূপ লাভ হয় না বলিয়া কর্তৃপক্ষ এই রেলপথটি বন্ধ করিয়া দেন। ইহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সদর মহকুমার অধিবাসিদের ন্যূনতম ব্যয়ে অল্পসময়ের মধ্যে মালপত্র সরবরাহের ও যাতায়াতের যে খুব দুরাবস্থা হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। সরকার এই

রেলওয়েকে জাতীয়করণ করিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্মৃতির স্মারক হিসাবে ইহাকে সংরক্ষিত করিলে একটি ভাল কাজ করিতেন। কারণ ভারতে ভারতবাসী কর্তৃক ইহা ছাড়া যখন আর কোন রেলপথ হয় নাই। অগম্য স্থানে নূতন করিয়া যখন লাইন খুলিবার প্রস্তাব হইতেছে, তখন একটি স্থায়ী চালু লাইনকে বন্ধ করিয়া দিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ যে বুদ্ধিমানের কার্য করেন নাই তাহা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়। সম্ভব হইলে এখনও এই স্থানে পূর্বোক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্তকল্পে নূতন ব্রডগেজ লাইন দিয়া পুনরায় আর একটি রেলওয়ে করা উচিত। অন্নদাপ্রসাদ সিংহরায়ের বিষয় সিতিপলাশীর মধ্যে লিখিত আছে।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা **অমৃতলাল রায়** ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত গরিফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মধুসূদন রায় হুগলী কলেজের ছাত্র এবং সেকালের সিনিয়ার স্কলারসিপ প্রাপ্ত ছিলেন। অমৃতলাল প্রবেশিকা ও এল, এ, পাস করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন এবং সেই সময় বার্লো কোম্পানীর বেনিয়ান গুপ্তিপাড়ার উমানারায়ণ সেনের কন্যা হেমন্তকুমারী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অমৃতলালের ভাগিনী শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত।

চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা যান। তথা হইতে তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা চলিয়া যান। তথায় "সান" পত্রিকায় ভারতে খৃষ্টান মিসনারীদের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি পচিশ ডলার পারিশ্রমিক পান। ইহার পর তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ভারতের সম্বন্ধে অনেক বিষয় লিখিয়া সুনাম অর্জন করেন। আমেরিকা থাকাকালীন কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ অনুরোধে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে **"হোপ"** নামে ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এই সময় তরুণ ইঞ্জিনিয়ার অন্নদাপ্রসাদ রায়ের রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা তাঁহার খুব ভাল লাগে এবং তিনিও তাঁহার সহিত এজেণ্ট হিসাবে যোগ দেন। তাই তাঁহার কাগজের কলিকাতা কার্যালয়ে বহু বৎসর এই রেলওয়ের কলিকাতা অফিস ছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকায় (১১ ডিসেম্বর ১৯৫৫) তাঁহার জীবনের অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা লিখিয়াছেন।

॥ তারকেশ্বর-আরামবাগ রেলওয়ে ॥

তারকেশ্বর হইতে আরামবাগের দূরত্ব মাত্র চৌদ্দ-পনের মাইলের বেশী নয়। আরামবাগ অঞ্চলে রেলপথের কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। তারকেশ্বর হইতে এই স্বল্প দূরত্ববিশিষ্ট স্থানটিতে রেলপথের অভাবে দরিদ্র ব্যক্তিগণকে যে কি পরিমাণ কষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহা অবর্ণনীয়। যাতায়াতের অব্যবস্থায় আরামবাগ মহকুমার অভ্যন্তরস্থ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলি এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে। নূতন কিছু পিচের রাস্তা বা দু-একটি ভাল সেতু হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে যাঁহাদের মোটরগাড়ি নাই, তাহাদের পদদ্বয়ের সদ্ব্যবহার ছাড়া আর কোন উপায় নাই। সুতরাং তারকেশ্বর হইতে আরামবাগ পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণ করিলে দরিদ্র জনসাধারণের যে সব সুবিধা হইবে তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

১। শাসন বিভাগীয় প্রয়োজনে মহকুমা সদর হইতে হুগলী জেলা সদরে অবস্থিত জেলা

হেডকোয়াটার্স, বর্ধমান বিভাগীয় কমিশানার অফিস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিদ্যালয়, জেলা বোর্ড অফিস, জেলা হাসপাতাল ও তারকেশ্বর তীর্থে আসিবার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হইবে। তারকেশ্বর-আরামবাগ রেলপথ পরিকল্পনা ও তারকেশ্বর-আরামবামের দূরত্ব এইস্থানে প্রকাশিত হইল।
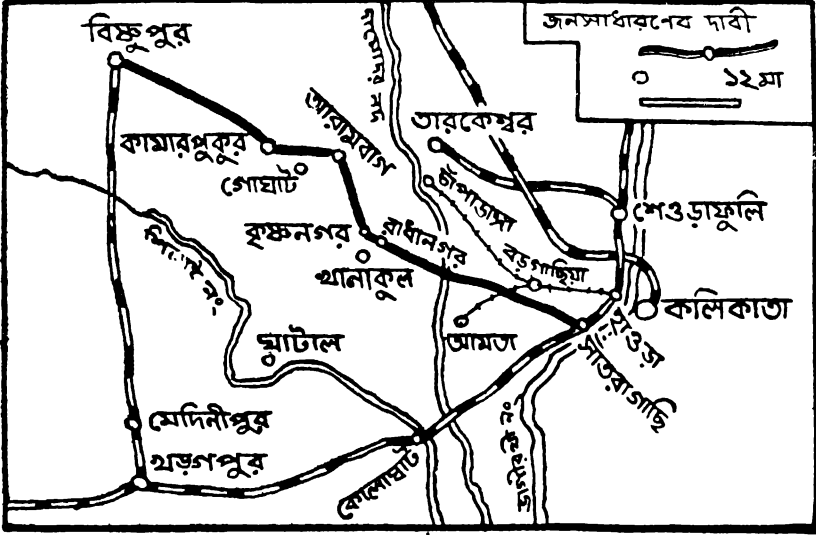
তারকেশ্বর-আরামবাগের দূরত্ব ও রেলপথ পরিকল্পনা

২। উচ্চ শিক্ষা বিস্তারকল্পে উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হরিপাল, চুঁচুড়া প্রভৃতি কলেজগুলিতে ঐ অঞ্চলের ছাত্রদের যাতায়াতের সুবিধা হইবে।

৩। ধনিয়াখালি, ব্যাণ্ডেল, চন্দননগর, বৈদ্যবাটী চাঁপদানি, শ্রীরামপুর, বালী, বেলুড়, লিলুয়া প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলির সংগে সরাসরি যোগাযোগ হইবে।

৪। কালকা, সিমলা, রুপার প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানীকৃত আলুবীজ এই বিরাট অঞ্চলের কৃষিজীবীদের সস্তায় সরবরাহের সুযোগ পাওয়া যাইবে।

৫। আরামবাগ মহকুমার পল্লীঅঞ্চল হইতে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য পাট, আলু, গুড় ইত্যাদি কলিকাতা অঞ্চলে সরবরাহের সুবিধা হইবে।

৬। ঐ বিস্তীর্ণ অনুন্নত অঞ্চলের জনসাধারণ অল্প সময়ে, অল্প য়ে কলিকাতা অঞ্চলে যাতায়াত করিতে পারিবে।

৭। রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগর প্রভৃতি জাতীয়-তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিবার সকলের বিশেষ সুবিধা হইবে।

মোটকথা, এই নূতন রেলপথ নির্মিত হইলে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল হইতে কাঁচাফসল, অর্থকরীফসল ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও লক্ষ লক্ষ মানুষের যাতায়াতের সুবিধায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে। অন্ততঃ

ঐ অঞ্চলের দশ লক্ষ লোকের নিত্য-নৈমিত্তিক যাতায়াত কষ্ট লাঘব হইবে। জগৎপুর-ধর্মপোতা রাস্তা তৈয়ারী শেষ হইয়াছে। এই রাস্তাই হইল এখন ঘাটাল মহকুমার সঙ্গে আরামবাগ সহরের যোগাযোগের পথ। এই রাস্তার কাছাকাছি কোন রেলওয়ে ষ্টেশন থাকিলে ট্রেণ হইতে নামিয়া ঘাটাল যাইবারও বিশেষ সুবিধা হইবে।

এই রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব সাম্প্রতিক কালের নয়। ইতিপূর্বে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে পরিকল্পিত বিষ্ণুপুর-সাঁতরাগাছি রেলপথ বিস্তারের কথা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানীর ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার মিঃ টুলোক 'সার্ভে' করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে ইহাতে মোট খরচ হইবে ১,৮১,০৩,১০২৲ টাকা এবং টুলোক-রিপোর্ট অনুযায়ী সমস্ত খরচ বাদ দিয়া ইহা হইতে লাভ হইবে বৎসরে ১০,৮৭৫৮০৲ টাকা। বর্তমানে খরচ বাড়িলেও লাভও বাড়িবে। এই রেলপথ সম্বন্ধে ৩২৫ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এই স্থানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

চাঁপাডাঙ্গা তারকেশ্বর থানার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র বলিয়া খ্যাত। কলিকাতা হইতে বত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব সুন্দর। দামোদর নদের তীরে অবস্থিত বলিয়া ব্যবসা বাণিজ্য এই স্থানে খুব ভাল হয়। ধান, চাল, পাট, আলু, শাকসব্জী ও তরিতরকারী প্রচুর পরিমাণে এই স্থান হইতে রপ্তানী হয়। হাওড়া-শিয়াখালা লাইট রেলওয়ের ইহা শেষ ষ্টেশন। এই গ্রামে উচ্চবিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, পোষ্ট অফিস, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হরিসভা আছে। গ্রামের স্থায়ী লোক-সংখ্যা ৩,৯০৮ জন বলিয়া আদমসুমারির তালিকায় লেখা থাকিলেও এখন এই স্থানের জনসংখ্যা দশ হাজারের উপর। চাপাডাঙ্গার কাছে দামোদর নদের উপর **"বিদ্যাসাগর সেতু"** নির্মিত হওয়ায় এখন আরামবাগ যাইবার খুব সুবিধা হইয়াছে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই সেতুর উদ্বোধন করেন। চাঁপাডাঙ্গা ও পুড়শুড়ার মধ্যবর্তী স্থানে, যেখানে অহল্যাবাঈ রোড দামোদর নদের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে, সেই স্থানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষার জন্য এই সেতু নির্মিত হইয়াছে। এই স্থানে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এক সময় বর্ষাবিক্ষুব্ধ রাত্রিকালে উত্তাল তরঙ্গসমাকুল দামোদব সন্তরণ কবিযা অচলা মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার মাতৃ-ভক্তির পুণ্য প্রতীকস্বরূপ এই সেতুর "বিদ্যাসাগর সেতু" নামকরণ হইয়াছে।

তারকেশ্বর থানার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের জনসংখ্যা

নাম	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
তারকেশ্বর	১৭,৮৭৮	৯,৪৩৮	৮,৪৪০
তালপুর	১২,৫৩৩	৬,৫৪০	৫,৯৯৩
বালিগড়ি	৮,৩০৯	৪,৩৩১	৩,৯৭৮
রামনগর	১০,৪০৪	৫,২৪৫	৫,১৫৯
চাঁপাডাঙ্গা	১৩,০৩৬	৭,০২৩	৬,০১৩

॥ হুগলী জেলার প্রাচীন মন্দির ॥

সারা পশ্চিমবঙ্গে কত মন্দির আছে তাহা বর্তমান লেখকের জানা নাই, তবে হুগলী জেলার দু'হাজার গ্রামে ৪৭৮টি ছোট বড় মাঝারি রকমের যে সব মন্দির আছে সেগুলি দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে বলিয়া সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইল।

বাঙ্গালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজস্ব রূপটিকে দেখিতে হইলে এইসব প্রাচীন মন্দিরগুলি দেখা আবশ্যক। হুগলীতে খুব প্রাচীন মন্দির না থাকিলেও, এই সব মন্দির দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, হুগলী জেলার গ্রামগুলি এক সময় কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল।

পাথর এ দেশে দুর্লভ বলিয়া হুগলী জেলাতে পাথরের মন্দির এক রকম নাই বলিলেই চলে। সাধারণত ইঁটের দ্বারাই হুগলী জেলার সমস্ত মন্দির নির্মিত। ইঁটের আয়ু খুব বেশী দিন নয় বলিয়া খুব প্রাচীন মন্দির এখানে নাই।

হুগলীতে চালা মন্দির, রত্ন মন্দির ও বাংলা মন্দির অনেকগুলি আছে। চালা মন্দির আবার দু'শ্রেণীর, চৌচালা ও আটচালা। গ্রামের খোড়োঘরের অনুকরণে নির্মিত মন্দিরকে চালা মন্দির বলে। বাংলা মন্দিরও দু'শ্রেণীর এক বাংলা ও জোড়-বাংলা। সেনেটের **বিশালাক্ষী মন্দির** ও গুপ্তিপাড়ার **শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির** জোড়বাংলা মন্দিরের সুন্দর নিদর্শন।

বাঁশবেড়িয়াতে রাণী শংকরী প্রতিষ্ঠিত তেরচুড়া বিশিষ্ট রথ সদৃশ **হংসেশ্বরী মন্দির** বাংলাদেশে স্থাপত্যশিল্পে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই মন্দির পাথর ও ইঁট দিয়া তৈরি। এই ধরণের মন্দির কেবল হুগলী জেলায় নয়, সারা বাংলা দেশে আর নাই। হংসেশ্বরী মন্দিরের পাশে **অনন্তদেবের মন্দিরও** একটি সুবিখ্যাত দেবালয়। এই মন্দির ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির ইঁটের উপর দেবদেবীর অনেক মূর্তি খোদিত আছে। বাঙ্গালী শিল্পী তাঁদের শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব স্বাক্ষর এই সব মন্দিরে রাখিয়া গিয়াছেন। এই ধরণের বিরাট মন্দির হুগলী জেলায় আর যে স্থানে আছে, তার মধ্যে বল্লভপুরে **বল্লভজীউর মন্দির**, গুড়াপে ও চন্দননগরে **নন্দদুলালের মন্দির**, আঁটপুরে **রাধাগোবিন্দজীউর মন্দির**, খানাকুলে **রাধাবল্লভজীউর মন্দির** ও গুপ্তিপাড়ায় **বৃন্দাবনজীউর মন্দির** উল্লেখযোগ্য। এই সব মন্দিরগাত্রের অপরূপ কারুকার্য অতি সুন্দর।

অলংকারবহুল পোড়ামাটির প্রতিকৃতি, চিত্রফলক প্রভৃতি মন্দিরে বর্তমান আছে। কিন্তু অযত্নে অবহেলায় এই ধরণের মন্দির রাজবলহাট, হরিপাল, বৈঁচি প্রভৃতি স্থানে অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের দ্বারা যেভাবে সমাচ্ছন্ন ও লোনা লাগিয়া ইঁটগুলি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে এই সব মন্দিরের শিল্পকাজগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিলে প্রাচীন শিল্পকলার এই সব সুন্দর নিদর্শন শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

শিবমন্দিরের সংখ্যাই হুগলী জেলায় সর্বাধিক। **তারকেশ্বরে** জাগ্রত বাবা তারকনাথের মন্দিরের কথা সকলেই জানেন। কিন্তু একসঙ্গে দ্বাদশ শিব মন্দির, ঠিক দক্ষিণেশ্বরের অনুরূপ, হুগলী জেলার একাধিক স্থানে বিদ্যমান আছে। তার মধ্যে উল্লেখ্য ঃ **বাক্‌সা, কোন্নগর, গোপীনগর, মাকালপুর ও বেলমুড়ি।** এ ছাড়া সিঙ্গুরের **সপ্তশিব মন্দির** ও ভগবতীপুরের **পঞ্চশিব মন্দির** এবং **সোমসপুর, খানাকুল, জনাই, রাজবলহাট ভাণ্ডারহাটি, পানসেওলা, হরিপাল, কাঁকড়াকুলি, জয়নগর, পুইনান, শ্যামপুর, বোড়াগড়ি ও ভাস্তাড়া** গ্রামের জোড়া শিব মন্দিরও দ্রষ্টব্য। বাকসা গ্রামের **রঘুনাথের নবরত্ন মন্দির** হুগলীর একটি দর্শনীয় মন্দির বলিয়া হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন। কিন্তু এই মন্দিরের কারুকার্য খচিত ইঁটের চিত্রগুলি সম্প্রতি সংস্কারের সময় চুন-বালি দিয়া ঢাকিয়া সাদা রং করিয়া একেবারে নষ্ট করা হইয়াছে। **রাজবলহাট, গোপীনগর ও আলা** গ্রামেও এই রকম মন্দিরের শিল্প-সম্ভার নষ্ট করা হইয়াছে। চন্দননগরের **দশভুজা মন্দিরও** দর্শনযোগ্য।

খানাকুলে কানা দারকেশ্বর নদীর তীরে শ্মশান-ভূমিতে নির্মিত প্রসিদ্ধ **ঘন্টেশ্বর** শিবের বিশাল মন্দির উল্লেখযোগ্য। শ্মশানে এইরূপ মন্দির হুগলীর আর কোথাও দেখা যায় না।

হুগলী জেলায় রত্নমন্দির অসংখ্য আছে। মহানাদের ন'চুড়া বেষ্ঠিত **ব্রহ্মময়ী দেবীর** বিরাট মন্দির ১২৩৬ সালে নির্মিত হয়। মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মময়ী কালিকা দেবী ও চারকোণে চারটি শিবলিঙ্গ ও তিনতলার সুবৃহৎ চূড়ায় হংসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়গণের **অন্নপূর্ণার মন্দিরও** ঠিক এই ধরণের বলা যায়। বহু শিখরযুক্ত রত্নমন্দির প্রধানত পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন এই দুশ্রেণীতে বিভক্ত। বর্গাকার নক্‌শার ভিত্তিতে নির্মিত এই ধরণের মন্দিরের কার্নিশ বক্রাকৃতি হয়। নবরত্ন মন্দির দ্বিতল হয়। একতলার চারকোণে চারটি শিখর ও দোতলার মূলে শিখরকে ঘিরে থাকে চারটি ছোট ছোট শিখর। **কৃষ্ণনগরের** গোপীনাথের নবরত্ন মন্দির একটি উল্লেখ্য মন্দির।

কাঁকুড়াকুলির **সীতারাম ও লক্ষ্মীজনার্দনের** নবরত্ন মন্দির এবং **বোড়াগড়ি, সোমড়ার পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দিরদ্বয়** স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে একটা বিশেষ স্থানের দাবী রাখে। মন্দিরের গৃহ চতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্র বিশিষ্ট। এই গর্ভগৃহের চাল ক্রমহ্রস্বমান আকৃতিতে ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠিয়াছে। **দিগসুই, বাক্‌সা, খামারপাড়া, ক্ষীরকুণ্ড ও গোপী-নগর** গ্রামের নবরত্ন মন্দির এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সোমড়া ও ইলছোবা-মণ্ডলাই গ্রামের অষ্টকোণাকৃতি **আটচালা ও ষোলচালা মন্দির** হুগলীতে আর কোথাও দেখা যায় না।

শ্রীপুরে **গোবিন্দজীউর** একচুড় বিশিষ্ট মন্দির ও তাহার সামনে দুর্গা দালানের মত প্রশস্ত চাতাল একটি দর্শনীয় বস্তু। অভিনবাকৃতি মন্দিরের একটিমাত্র নিদর্শন মহানাদের একচুড় বিশিষ্ট সুউচ্চ **লালজীউর মন্দির।** এরকম মনুমেন্টের মতন মন্দির হুগলীর আর

কোথাও নাই। ১৭৭৩ শকাব্দে মন্দিরটি তৈরি হইলেও, ভূমিকম্পে এই মন্দির ফাটিয়া গিয়াছে বলিয়া বিগ্রহকে পর্যন্ত অন্যত্র স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছে (প্লেট নং ৪৭)।

মাহেশের **জগন্নাথের মন্দির** ও মহানাদের **জটেশ্বরনাথের মন্দির** দেখিতে প্রায় এক রকম। এই রেখ-দেউল মন্দিরের গঠনরীতি সুষমা ও সৌন্দর্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

হুগলী জেলার মন্দিরগুলি শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র অবিভক্ত বাংলাদেশের যাবতীয় মন্দিরগুলির মধ্যেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। মন্দির নির্মাণ-শৈলীর এত বিভিন্ন ও বিচিত্র সমাবেশ বাংলা দেশে অন্য কোথাও আর দেখা যায় না। চত্বর বা অঙ্গন, ভিত্তি এবং মন্দিরতল (Floor) বিগ্রহ স্থাপনা, প্রাচীর অলঙ্করণ ও ছাদ এবং চূড়া নির্মাণে হুগলী জেলার মন্দিরগুলি মন্দির-শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন।

॥ মন্দিরে পোড়ামাটির অলঙ্করণ ॥

হুগলী জেলার মত ইঁটের কারুকার্যখচিত এত মন্দির পশ্চিমা বাঙ্গলায় আর কোথাও নাই। এই সব মন্দিরের মোটা মোটা থাম ও পল্ তোলার কাজ করা খিলানগুলি দিল্লী, আগ্রা, ফতেহপুরসিক্রি ও সাসারামের পাঠান-মোগল-রাজপুত স্থাপত্য শিল্প-শৈলীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু একথা এখানে বিশেষভাবে বলার প্রয়োজন এই যে, হুগলী জেলার এই সমস্ত মন্দির তাদের সাদাসিধা স্থাপত্যরীতি অপেক্ষা মন্দিরগাত্রের ভাস্কয্য-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ যা ভারতের অন্যত্র বিরল। সাধারণ মানুষের সাধারণ ঘটনাবলী এই শিল্পের প্রধান উপজীব্য। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর হুগলী তথা বাংলার লোকায়ত্ত সমাজ-জীবনের যে আলেখ্য আমরা পোড়ামাটির এই সব ফলকগুলিতে দেখিতে পাই, অন্যত্র ততটা কিছুতেই পাওয়া যায় না। দেশী ও বিদেশী অভিজাতচক্রের পরিধি হইতে দূরে সাধারণ ব্যক্তি ও সামাজিক মানুষের কি ছিল প্রকৃতি তাহার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞান এই সব মৃৎফলকগুলি হইতে পাওয়া যায়। একটি ক্ষুদ্র ইঁটের মধ্যে যে অপূর্ব ভাস্কর্য লক্ষ্য করা যায়, তাহা বর্তমানকালের বহু বৈচিত্র্যময় একটি প্রাসাদের গোটা অবয়বেও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কেবল হাতের সাহায্যে এমন নিপুণ ও বিস্ময়কর ভাস্কর্যের সৃষ্টি যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা যে কত প্রতিভাধর শিল্পী ছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে আমাদের বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলে, সংস্কৃতি ও সাধনার যথার্থ ঐতিহ্য ও ধারাটি সম্যক অনুধাবন করিতে হইলে গ্রাম-বাংলার এই মন্দিরগুলি দেখিতে হইবে, তাহা না হইলে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজস্ব রূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে না।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার Prof. David McCuchion হুগলী জেলার মন্দিরে পোড়ামাটির চিত্র সম্বন্ধে আদমসুমারির ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে লিখিয়াছেনঃ

To my knowledge Hooghly has the largest number of extent temples decorated with terracottas. These range from large imposing structures to insignificant hut-like shrines. The larger ones have a porch supported on two columns with three entrance archways with

a single entrance in the rear wall opening into the shrine; the small ones have a single entrance and no proch. . The style of the terracottas develops from a vigorous early style with sharply incised limbs to a flaccid doll-like style in the nineteenth century.

সেকালে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এমন কি তাহাদের পিতামাতার নাম, প্রতিষ্ঠার সাল তারিখ প্রধান প্রবেশদ্বারের উপর দেওয়ালে শিলালিপিতে উৎকীর্ণ করিবার যে সাধারণ রীতি ছিল, হুগলী জেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অনুসরণ করা হয় নাই। হুগলী জেলার মন্দিরগুলি বাংলার নিজস্ব রীতি অনুযায়ী অধিকাংশই চালাঘরের অনুকরণে নির্মিত। এই 'চালাস্থাপত্য' হুগলী জেলায় বহুল ব্যবহৃত খড়ের কুঁড়েঘর হইতে উদ্ভূত।

বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামের মত হুগলী জেলার যে সব গ্রামে প্রাচীন মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে, সেই সব গ্রামগুলি তখন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা ছিল একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। উত্থান পতন, উন্নতি অবনতি নশ্বর জগতের স্বাভাবিক ধর্ম। তাই যে সব প্রাচীন বনিয়াদি বংশের সুসন্তানগণ এক সময় এই সব মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের জমিদারী বিলোপ হইয়া যাওয়ায় এই দেবদেউলগুলি রক্ষা করা তাঁহাদের বংশধরদের পক্ষে এখন অসম্ভব। ভারতীয় পুরাকীর্তি আইন অনুসারে এই সব সম্পদ রক্ষার দায়ীত্ব তাই এখন সরকারের। লোকচক্ষুর অন্তরালে আজও হুগলী জেলার যে সব মন্দির শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় লইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের বিষয় গ্রন্থমধ্যে আলোচনা করিলেও কয়েকটি মন্দিরের মৃৎফলকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে উদ্ধার করছি।

আঁটপুরের **রাধাগোবিন্দজীউর আটচালা মন্দিরগাত্রের** শিল্পকলা পশ্চিম বাংলার লৌকিক জীবনযাত্রার একটি বিচিত্র শোভাযাত্রার অংশমাত্র। এই মন্দিরের পোড়ামাটির সুক্ষ্ম কার্যের জন্য ইহা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের প্রবেশপথের থামে ও দেওয়ালে রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, পুরাণ ও তৎকালীন জীবনযাত্রা হইতে আহরণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—ভীষ্মের শরশয্যা, রাধাকৃষ্ণের ভোজন দৃশ্য, লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাসলীলা, পুতনা বধ, রক্তবীজের সহিত চণ্ডীর যুদ্ধ, ননীচোরা কৃষ্ণ ও করালবদনী কালী। কালী মূর্তিটির বৈশিষ্ট্য এই যে শিল্পী কঠোরভাবে বেদীমূর্তি প্রকরণ অনুসরণ করিয়াছেন। তথাপি ইহার ফাঁকে শিল্পী তাহার নিজস্ব অভিব্যক্তি প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাই করালবদনী ভীষণাদর্শনা কালী হইয়াছেন স্নেহশীলা জননী। ইহা ছাড়া প্রত্যেকটি প্যানেলে মূর্তিগুলির প্রকাশভঙ্গীতে যে সজীবতা, সাবলীল গতি, হস্ত পদ ও দেহের গড়ন ও ডৌল ও মণ্ডপের ব্যঞ্জনা পাহাড়পুর ও ময়নামতী এবং সুদূর জাভা দ্বীপের দিয়েং উপত্যকার মৃৎশিল্পের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মন্দিরের উত্তরদিকের চিত্রগুলি ছেতা পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

রাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরের ভাস্কর্য-প্যানেলের একখানি চিত্র ৯৩ নং প্লেটে এবং মন্দিরের অন্যান্য কারুকার্যের নমুনা ৯৬ নং প্লেটে প্রদত্ত হইল।

শ্রীরামপুরে **পুরানো রাধাবল্লভজীউর মন্দির** গঙ্গার ধারে অবস্থিত। ইহাই পরে 'হেনরী মার্টিনস প্যাগোডা' বলিয়া খ্যাত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে চালা-

স্থাপত্যের মন্দির কি ধরণের হইত, ইহাই তাহার একমাত্র নিদর্শন। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়। ইহা একটি আট-চালা মন্দির। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রলয়ংকর ঝড়ে মন্দিরের সম্মুখস্থ বারান্দা ও চাতাল গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া যায়। মন্দিরের থামের উপর পোড়ামাটির পদ্মফুলের অলংকরণ সামান্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। হাওড়া কর্পোরেশনের জলসরবরাহ করিবার জন্য যে জমি দখল করা হয়, তাহার মধ্যে এখন এই মন্দিরটি অবস্থিত। লর্ড কার্জন ভারতীয় পুরাকীর্তি আইনে ইহা সংরক্ষণ করিলেও গঙ্গার ভাঙ্গন হইতে এই প্রাচীন মন্দিরকে সরকারের সর্বতোভাবে এখন রক্ষা করা উচিৎ। এই মন্দিরের গায়ে লেখা আছে ঃ This building was occupied by the Missionary Henry Martyn, 1806. জর্জ স্মিথ এই মন্দির সম্বন্ধে বলেন ঃ

It is now a picturesque ruin which the peepul tree that is entoined among its fine brick masonry and the crumbling riverbank may soon cause to disappear for ever. The exquisite tracery of the moulded bricks may be seen, but not the few figures that are left of the popular Hindu idols just where the two still perfect arches begin to spring.

গুপ্তিপাড়ার **শ্রীরামচন্দ্রের শিখরবিশিষ্ট 'চার-চালা' মন্দির** ছয় ফুট উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের সামনের ও দক্ষিণের দেওয়ালে এবং অষ্ট কোন শিখরের সর্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির অলংকরণের যে বিপুল সমাবেশ করা হইয়াছে—হুগলী জেলায় কোন মন্দিরে এইরূপ আর দেখা যায় না। বাংলা দেশে ভদ্রেশ্বর ও গুপ্তিপাড়া ব্যতীত রামসীতার মন্দির আর কোথাও নাই। মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ হইতেছেন—রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান। মূর্তিগুলি সমস্তই দারুনির্মিত। এই মন্দিরের গায়ে অংকিত রাধাশ্যামের যুগল মূর্তি, গরুড়বাহন বিষ্ণু, রাবণের যুদ্ধ যাত্রা, কারিগরির মুন্সিয়ানা ও চিত্রকল্পের বৈচিত্র্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মন্দিরের প্রবেশপথের উপরে তিনটি খিলানের উপর প্রার্থনার ভঙ্গীতে যুক্তকরে শত শত গোপিনী মূর্তি পোড়ামাটির অলঙ্করণের একটি সুন্দর নিদর্শন। দেওয়ালের উপরের দিকে পরিচ্ছন্ন ও বলিষ্ঠ ভাস্কর্যের দ্বারা রামায়ণের যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত আছে। নীচের দিকে লতাপাতা ও নক্সাকরা ফ্রেমের মধ্যে সাধারণ নরনারীর নানাভঙ্গীর চিত্র দেখা যায়। এইরূপ সূক্ষ্ম ও ছন্দোময় কারুকার্য হুগলী জেলার আর কোন মন্দিরে নাই। তাই রামচন্দ্রের মন্দির পরিচ্ছন্ন পোড়ামাটির সজ্জার জন্য পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেরাকোটা মন্দির বলিয়া পরিগণিত। মন্দিরের আলোকচিত্র ৪৬নং প্লেটে ও মন্দিরগাত্রে কারুকার্য ৫৪নং প্লেটে দেওয়া হইয়াছে

গুপ্তিপাড়ার **বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির** গুপ্তিপাড়ার মঠের বৃহত্তম কীর্তি। ইহা আটচালা মন্দির সম্পূর্ণ ইঁটের এবং একটি বড় চালাঘরের উপর স্থাপিত একটি ছোট চালাঘরের আকারে নির্মিত। মন্দিরটি আকারে বৃহত্তম হইলেও বহির্সজ্জা হিসাবে পোড়ামাটির ভাস্কর্য চোখে পড়ে না। পোড়ামাটির শিল্পকার্য না থাকিলেও ভিতরের বারান্দা ও বিগ্রহকক্ষের দেওয়ালে অংকিত সুন্দর সুন্দর চিত্রগুলি মন্দিরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

চিত্রাঙ্কনগুলি সমগ্র দেওয়ালব্যাপী ফ্রেস্কো ধরণের আর অন্যান্য চিত্র বর্গাকার প্যানেলে বিভক্ত। চিত্রগুলিতে শিল্পিগণ বিষয়বস্তু নির্বাচনে যে সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। চিত্রগুলি রাধা কৃষ্ণ, লক্ষ্মী সরস্বতী ও গোপী সংক্রান্ত। বাঙ্গলার মন্দিরে অঙ্গসজ্জা হিসাবে চিত্রাঙ্কন রীতি দেখা যায় না বলিয়া এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের কারুকার্যের চিত্র ৪৬নং প্লেটে আছে।

মঠের আর দুইটি মন্দির হইতেছে **কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির ও চৈতন্যদেবের মন্দির।** চৈতন্যদেবের মন্দির আকবরের রাজত্বকালে বিশ্বেশ্বর রায় কর্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে নির্মিত হয়। এই মন্দিরের স্থাপত্য রীতি জোড়-বাংলা ধরণের। এই মন্দির গাত্রের কারুকার্য সপ্তদশ শতাব্দীর বলিয়া খুব পরিছন্ন না হইলেও প্রথম পোড়ামাটির চিত্র কেমন হইত তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই মন্দিরের চিত্রগুলির অঙ্কনপদ্ধতি বৈঁচী গ্রামের দেউলের মত বলিয়া মনে হয়। মন্দিরে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের বিগ্রহ আছে। গুপ্তিপাড়ার মঠের চতুর্থ মন্দির হইতেছে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের 'মনসা-বিজয়' পুঁথিতে চাঁদসদাগরের বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে এই কয় লাইন দেখা যায় ঃ

বুহিত্র বাহিয়া সুখে চলিল প্রভাতে
ফুলিয়া বাহিয়া হাতিকান্দা উপনীতে।
গুপ্তিপাড়া বাহিয়া সিঙ্গারপুর আইসে
ত্রিবেণী লাগায় ডিঙ্গা বলে বিপ্রদাসে :

বৈঁচিগ্রামে ছোটবড় ষোলটি **প্রাচীন মন্দির** আছে। সমস্ত মন্দিরগুলিতে পোড়ামাটির কারুকার্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাঙ্গলাদেশে সাধারণতঃ রেখ-দেউলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইহা উড়িষ্যা মন্দির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ মন্দিরে প্রতিষ্ঠাফলক না থাকায় কোন্ সময় মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। দুইটি মন্দিরের ফলক হইতে ১৬৩৭ ও ১৬৪৯ শক পাওয়া যায়। ১৩৬৬ সালে উড়িষ্যার মন্দিরের অনুকরণে সপ্তরথ ও সপ্তাঙ্গের পরিকল্পনায় বাঙ্গালী শিল্পীদের দ্বারা রচিত মন্দিরটির সম্মুখভাগ পড়িয়া গিয়াছে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে **রাধামাধবের** রেখ-দেউলের পুরাতন মন্দিরটির এক-চতুর্থাংশ মাটির তলায় বসিয়া গিয়াছে। এই মন্দির ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে তৈয়ারী হইয়াছিল। কয়েকটি মন্দিরের ইঁটে কারুকার্য অল্প। কিন্তু অধিকাংশ মন্দিরের অলঙ্করন হইতেছে বর্গাকার প্যানেলের মধ্যে ফুলের চিত্র। দুইজন গোপীদের মধ্যে কৃষ্ণের চিত্র অপূর্ব বলা যায়। এই সব শিল্প-চাতুর্যের অভূতপূর্ব নিদর্শনগুলি আজ বিলুপ্তপ্রায়। রাধাবল্লভের মন্দিরের চিত্র ৭০ নং প্লেটে দেওয়া হইয়াছে।

ভদ্রেশ্বরে পাইকপাড়া অঞ্চলে **রামসীতার নবরত্ন মন্দির** একটি দর্শনীয় মন্দির। পোড়া-মাটিশিল্পে হুগলী জেলা যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য আজও বহন করিতেছে, এই মন্দির তাহার অন্যতম নিদর্শন। এই মন্দিরের বিভিন্ন দেওয়ালে সমগ্র কৃষ্ণলীলা অঙ্কিত আছে। এ ছাড়া রামসীতা এবং ইতিহাস বর্ণিত দৃশ্যগুলি শিল্পরসিক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পোড়ামাটিতে তৈয়ারী একখানি ইঁটের আলোকচিত্র (প্লেট নং ৮৫) গ্রন্থে

দেওয়া হইল। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষে উঠিয়া বংশীধ্বনী করিতেছেন এই চিত্রটি অঙ্কিত আছে। শিল্প-নৈপুণ্যের দিক হইতে ইহা অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। মন্দিরের গায়ে এই-রূপ অসংখ্য প্যানেলে সহস্রাধিক চিত্র ছিল। এখন সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই মন্দিরের আলোকচিত্র (প্লেট নং ৪৯) ও বিবরণ ১০৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই মন্দির ভারতীয় পুরাকীর্তি আইনে সংরক্ষিত না করিলে ইহার শিল্পনিদর্শন সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ইহা অন্যতর রামসীতার মন্দির।

পোলবা থানার মধ্যে কৃষ্ণপুর গ্রামের **'আট-চালা' মন্দির** ১৬৮৪ শকে নির্মিত হয়। মন্দিরে কোন দেবদেবীর বিগ্রহ না থাকিলেও মন্দিরের স্থাপত্যরীতি ও দেওয়ালের ভাস্কর্য-শিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হুগলী জেলার সমস্ত মন্দিরের মধ্যে ইহাই একমাত্র মন্দির যাহা আজও খুব ভালভাবে সংরক্ষণ করা হইতেছে। অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় ইহা অনাদরে ও হতাদরে পড়িয়া নাই, ইহাই আনন্দের বিষয়। বাংলার নিজস্ব ঢং-এ কেবল মাটি ও জলের সাহায্যে যে অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত মৃৎশিল্পীকুল অসাধারণ ধৈর্যের দ্বারা এই শিল্পসম্ভার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। মন্দিরগাত্রে লংকায় রামরাবণের যুদ্ধের দৃশ্যাবলী ছাড়া, ইউরোপীয় জাহাজ, সৈন্যদলের মার্চ, শোভাযাত্রা, বাজিকর, লম্ফনকারী অশ্ব প্রভৃতির চিত্রাবলী হুগলী জেলার লৌকিক জীবন-যাত্রার একটি বিচিত্র শোভাযাত্রার অংশমাত্র। এই সব চিত্র হইতে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের জীবনাদর্শ শিল্পীর দৃষ্টি যে এড়ায় নাই, তাহা বেশ বোঝা যায়। এই মন্দিরটি অচিরে সরকারের পুরাকীর্তি আইনে সংরক্ষিত করা উচিত। এই মন্দিরের নিকটে আর একটি **পঞ্চরত্ন** মন্দির আছে। উহার গায়েও পোড়ামাটির চিত্র অঙ্কিত আছে।

চণ্ডীতলা থানার ভগবতীপুর গ্রামে অবস্থিত **পাঁচটি শিবমন্দির** এক সময় পোড়ামাটির অলংকরনের জন্য খ্যাত থাকিলেও, মধ্যের মালাইচাঁদের মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই মন্দিরের প্রবেশ-পথের দুই ধারে দুইজন ভক্তের দুই হাত উচ্চ চিত্র একটি দর্শনীয় বস্তু। এইরূপ বৃহৎ মৃৎফলক একমাত্র চাঁদবাটি ছাড়া আর কোন মন্দিরে দেখা যায় না। মূর্তি-গুলির প্রকাশভঙ্গিতে যে সজীবতা, সাবলীল গতি, দেহ, হস্ত ও পদদ্বয়ের গড়ন ও ডৌল প্রকটিত হইয়াছে—তাহা এক কথায় অপূর্ব বলা যায়। ইহা ছাড়া দুইজন সৈনিকের একটি নারীর জন্য যুদ্ধ, মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের নারী, গ্রাম্য-পথে নরনারী প্রভৃতির দৃশ্যাবলী এবং বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর চিত্ররূপ মন্দিরগুলিতে অঙ্কিত। দুইটি মন্দির ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। একটি মন্দিরের প্রবেশ-পথেব উপবে অবস্থিত একটি বড় প্যানেলে অঙ্কিত চিত্র শিল্পবৈশিষ্ট্যের জন্য আশুতোষ মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ উহা লইয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকটি মন্দির 'আট-চালা' সাদাসিধা স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী নির্মিত হইলেও প্রত্যেকটি মন্দিবের দেওয়ালের ভাস্কর্যশিল্প দর্শনযোগ্য। চাঁদবাটি মন্দিরের চিত্র ১৩২ প্লেটে দ্রষ্টব্য।

তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত বালিগড়ি, জয়নগর ও শ্যামপুর গ্রামের অবহেলিত প্রাচীন **মন্দিরগুলিও** ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। বালিগড়ি গ্রামের 'আট-চালা' **শীতলা মন্দিরের** উপরিভাগে একটি বৃহৎ বটগাছ মন্দিরটিকে গ্রাস করিতেছে। এই মন্দিরের খিলানের উপর যুদ্ধের চিত্রাবলী অঙ্কিত আছে। এই চিত্রগুলির প্রকাশভঙ্গিমায়

একটি বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই বলিয়া মন্দিরটি এখন পরিত্যক্ত। জয়নগর গ্রামের দুইটি 'আট-চালা' শিবমন্দিরেও পোড়ামাটির অলঙ্করন উল্লেখ্য। একটি মন্দির ১৬৬২ শক ও আর একটি ১৬৬৫ শকে নির্মিত বলিয়া লেখা আছে। শেষোক্ত ছোট মন্দিরটিতে অসংখ্য চিত্র এখনও বিদ্যমান থাকিলেও বটগাছ ইহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। বড় মন্দিরের গায়ে অংকিত বহু চিত্র কুড়ুল দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে এবং বহু স্থান হইতে চিত্র সরান হইয়াছে। জয়নগরের এক মাইল দূরে শ্যামপুরে অনেকগুলি মন্দির এখনও আছে। ইহার মধ্যে দুইটি **শিবমন্দিরের** অলঙ্করন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই মন্দির দুইটির খিলানের উপর প্যানেলগুলিতে যে সব চিত্র ছিল, সেগুলি কোন ব্যক্তি খুলিয়া লইয়া গিয়াছেন। ইহাতে লৌকিক-জীবনের নানা ঘটনা অংকিত আছে। এই মন্দিরগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল।

পাণ্ডুয়া থানায় বোড়াগাড়ি গ্রামের 'আট-চালা' **গোপালজীউর মন্দির** ১৬০১ শকে নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরে কোন দৃশ্যাবলী অংকিত নাই। কিন্তু নর্তকী, সৈনিক, বাদ্যকর, জমিদারের দরবার, অশ্বারোহণ, হাতী, উট, মোষ প্রভৃতির চিত্রগুলির সুডৌল মন্ডনে, গড়নে, অংগপ্রত্যংগের আপেক্ষিক মসৃণতার সৌন্দর্যে দর্শককে মুগ্ধ করে। এই গ্রামে শিবের পঞ্চরত্ন জোড়ামন্দির (প্লেট নং ৬৫) ছাড়া ছোট ছোট মন্দিরেও পোড়ামাটির অলংকরণ দৃষ্ট হয়।

বাঁশবেড়িয়ার **অনন্ত বাসুদেবের মন্দির** সম্বন্ধে ৭০১-৭০২ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে। **শিল্পী নন্দলাল** বসু এই মন্দিরের প্রতিটি ফলকের চিত্র রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে আঁকিয়া লইয়া যান। ইহা ভারতীয় পুরাকীর্তি আইনে এখন সংরক্ষিত হইযাছে। ইহার সূক্ষ্ম ছন্দোময় কারুকার্য ও পোড়ামাটির সজ্জার জন্য ইহা হুগলী জেলার শ্রেষ্ঠ টেরাকাটা মন্দির বলিয়া পরিচিত। মন্দিরের আলোকচিত্র ৩৮ নং প্লেটে দ্রষ্টব্য। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারি গ্রন্থে এই মন্দির সম্বন্ধে লেখা আছে ঃ For both style and subject matter, the temple with the best terracottas in Hooghly District.

বাঁশবেড়িয়ার নিকট খামারপাড়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত **দুইটি নবরত্ন** ও একটি **'আটচালা' মন্দিরের** গায়ে পোড়ামাটির অলংকরণ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নবরত্ন মন্দিরের বহু চিত্র খোয়া গিয়াছে এবং অন্য মন্দিরটি বটগাছের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। তিনটিই শিবমন্দির। নবরত্ন মন্দির দুইটি সংরক্ষিত হইলে এই অঞ্চলের লুপ্তপ্রায় সামাজিক ইতিহাস যাহা নানা ফলকে উৎকীর্ণ আছে, তাহা রক্ষা পাইবে।

সাহাগঞ্জে অবস্থিত 'আটচালা' **শিবমন্দিরটি** ১৬৪৭ শকে নির্মিত। এই মন্দিরটিও ধ্বংসোন্মুখ। ইহার উত্তর ও পশ্চিম গায়ে অসংখ্য ফলকে রামরাবণের সমুদায় চিত্রাবলী অংকিত আছে। ইহা ছাড়া নৌকা, সওদাগর, জলদানব প্রভৃতির চিত্রগুলি, দীর্ঘদিনের উপেক্ষা ও অযত্নে প্রায় শেষ হইয়া আসিলেও, এখনও ইহার নিজস্ব ভংগী ও শিল্পচাতুর্য শিল্পমনা দর্শককে নিঃসন্দেহে মুগ্ধ করিবে। ইহা ডানলপ ফ্যাক্টরীর পশ্চাতে অবস্থিত।

দ্বারহাট্টা গ্রামের দ্বারিকাচণ্ডী ও রাজরাজেশ্বরের আটচালা মন্দির দুইটি পোড়ামাটির অলঙ্করণের জন্য বিখ্যাত। **দ্বারিকাচণ্ডীর মন্দির** ১৬৮৬ শকাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।

এই মন্দিরের মধ্যের দুইটি থাম ও পলতোলার কাজ করা তিনটি খিলান পড়িয়া যাওয়ায় বহু বর্গাকার প্যানেল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্তূপীকৃত ইঁটের মধ্য হইতে এই লেখক যে পোড়ামাটির একখানি চিত্র সংগ্রহ করেন তাহার আলোকচিত্র এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল (প্লেট নং ১৪০ দ্রষ্টব্য)। এই মন্দিরের শিল্পকলার নিদর্শন শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া যাইবে, ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়। এই মন্দিরের বিবরণ ১০৮৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। মন্দিরের আলোকচিত্র ১৩২ নং ও একখানি ইঁটের চিত্র ১৪০ নং প্লেটে দেওয়া হইল।

রাজরাজেশ্বরের মন্দিরে টেরাকোটা-চিত্র মন্দিরের থামে খিলানে ও সম্মুখে অঙ্কিত আছে। চিত্রগুলির মধ্যে রামরাবণের যুদ্ধ ও নৌকাবিলাস সূক্ষ্ম অলংকরণের জন্য প্রশংসার দাবী করিতে পারে। মন্দিরের সম্মুখের দুইটি থামের একটিতে দুর্গা, মহাবীর, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ও অন্যটিতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও পোর্তুগীজ সৈন্যদের চিত্র স্বাভাবিক গতিময়তার জন্য শিল্পরসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হুগলী জেলার লোকায়ত্ত সমাজ জীবনের আলেখ্য এই সব পোড়ামাটির ফলকগুলিতে দেখা যায়। মন্দিরের ও একটি থামের আলোক-চিত্র ১৩৮ নং প্লেটে দেওয়া হইল।

দ্বারহাট্টার পার্শ্ববর্তী **চাঁদবাটি গ্রামে** অবস্থিত **শিবমন্দিরে** বিলুপ্তপ্রায় শিল্পচাতুর্যের অভূতপূর্ব নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবতীপুরে মালাইচাঁদের মন্দিরের মত এই মন্দিরের প্রবেশ-পথের দুই দিকে দুইজন ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। মূর্তিগুলির উচ্চতা প্রায় চার ফুট। একজন ভক্ত করযোড়ে, আর একজন ভক্ত যেন কি শুনিতেছেন এইভাবে দণ্ডায়মান। মন্দিরটি আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও কারুকার্য ও অন্যান্য গঠন-সৌন্দর্যের দিক হইতে মোটেই নূ্যন নয়। মন্দিরের খিলানের উপর দেবদেবীর চিত্র ও দুই পাশে ফুল, লতাপাতা ও অসংখ্য নক্সা অঙ্কিত আছে। বহু প্যানেল অপসারিত হইয়াছে এবং মন্দিরের অমূল্য শিল্পকার্য বহু জায়গায় ভাঙ্গিয়া নষ্ট করা হইয়াছে। দীর্ঘদিনের উপেক্ষা ও অযত্নে মন্দিরের অবস্থা প্রায় শেষ হইয়া আসিলেও ইহার শিল্পকলা ও শিল্পচাতুর্য এখনও শিল্পমনা দর্শককে মুগ্ধ করিবে বলিয়া ভারতীয় পুরাকীর্তি আইনে এই মন্দিরকে সংরক্ষণ করা উচিত। মন্দিরের আলোকচিত্র ১৩২ নং প্লেটে দেওয়া হইল।

গুড়াপের **নন্দদুলালজীউর** 'আটচালা' মন্দির বর্ধমান মহারাজের ম্যানেজার রামদেব নাগ কর্তৃক ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এই মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের উপর বর্গাকার প্যানেলে ফুলের চিত্র ও থামের উপর দেবদেবী ও জীবজন্তুর চিত্রদ্বারা অলঙ্করণ করা হইয়াছিল। থামের কার্ণিসের নিম্নভাগের প্যানেলগুলি সংস্কারের অভাবে ক্রমশঃ এখন নষ্ট হইয়া যাইতেছে। মন্দিরের সামনে পরবর্তীকালে নাটমন্দির নির্মিত হওয়ায়, হরিপালের রাধাগোবিন্দের মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরের সৌন্দর্যও বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছে। একটি স্তম্ভের আলোকচিত্র এই গ্রন্থে (প্লেট নং ১৩৮) দেওয়া হইল। এই স্তম্ভটিতে একটি প্যানেলে দেবী দুর্গা ও তাঁহার দুই পাশে অন্যান্য প্যানেলে লক্ষ্মী সরস্বতী এবং কার্তিক গনেশ দণ্ডায়মান আছেন। শিল্পনৈপুণ্যের দিক হইতে এই সমস্ত চিত্রগুলি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। মন্দিরের চিত্র ৮৫ নম্বর প্লেটে দ্রষ্টব্য। এই গ্রামে চিত্রসমন্বিত আরও তিনটি মন্দির আছে, কিন্তু সংস্কারাভাবে উহাদের শিল্পসম্ভার সমস্ত নষ্ট হইতেছে।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের **রাধাবল্লভজীউর 'আটচালা' মন্দির** স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। বাঁশবেড়িয়ার অনন্তদেবের মন্দিরের চেয়ে লম্বায় ইহা দেড়গুণ হইলেও এইরূপ সুবৃহৎ ও মনোহর আটচালা মন্দির হুগলী জেলায় আর নাই। এই মন্দির চতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্রবিশিষ্ট; এই গর্ভগৃহের উপর আর একটি চৌচালা ছোট মন্দির ক্রমহ্রস্বমান আকৃতিতে উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠিয়াছে। মন্দিরের সামনে অঙ্গসজ্জা হিসাবে বর্গাকার প্যানেলে ছয়টি থাকে পোড়ামাটির শিল্পকার্য আছে। উপরের প্রথম থাকে বাইশটি প্যানেল, তার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় থাকে দুই ধারে ছয়টি করিয়া বারটি প্যানেল এবং চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ থাকে দুই ধারে পাঁচটি করিয়া দশটি প্যানেল আছে। অধিকাংশ প্যানেলেই ফুলের চিত্র অঙ্কিত আছে। মধ্যস্থলে প্রবেশ পথের উপর তিনটি খিলানে এবং মধ্যের স্তম্ভগুলিতেও বহু কারুকার্য সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দেয়। উপরের চৌচালা মন্দিরের গায়ে চতুর্দিকে পোড়ামাটির অলঙ্করণের চিত্রাবলী আছে। মন্দিরের চতুঃষ্কোণে ও কার্ণিসের চিত্রগুলি এখনও ভাল আছে, কিন্তু সামনে নীচেরদিকে অনেকগুলি চিত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের আলোকচিত্র ১০৯ নম্বর প্লেটে দেওয়া হইল।

দিগসুই গ্রামের **নবরত্ন মন্দির** ১১৯৯ সালে নির্মিত হয়। ইহারও সামনের দুইটি থাম পড়িয়া গিয়াছে। থাম দুইটি নূতন করিয়া গাঁথিয়া দিলে মন্দিরটি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়; কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে? মন্দিরের বিবরণ ৯২৫ পৃষ্ঠায় ও আলোকচিত্র ৪৫ নং প্লেটে দেওয়া হইয়াছে।

প্রাচীন মূর্তি দেশের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক অর্থের লোভে এই-সব পুরাবস্তু সংগ্রহ করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া দেন। এই দিকে সরকারের কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। হুগলী জেলার সংগৃহীত পুরাদ্রব্য জেলার মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয়। দিল্লীতে জাতীয় সংগ্রহশালা হইয়াছে বলিয়া সমস্ত দ্রব্য এখন দিল্লীতে পাঠাইবার যে কৌশল সরকার অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করি। পূর্বে কলিকাতা যাদুঘরে এই সমস্ত পুরাবস্তু সংরক্ষণ করা হইত, এবং ইচ্ছা করিলে যে কেহ যাইয়া তাহা দেখিতে পাইত। কিন্তু এখন কাহারও কোন জেলার জিনিস দেখিবার ইচ্ছা হইলে তাহার পক্ষে দিল্লী গিয়া উহা দেখা কেবল ব্যয়সাধ্য নয়, সময় ও সুবিধা সাপেক্ষ, তাহা বোধহয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। হুগলী জেলার সংগ্রহশালা সরকারী অর্থে চুঁচুড়ায় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হুগলী জেলার সংগৃহীত দ্রব্যাদি চুঁচুড়ায় না রাখিয়া উহা এখনও দিল্লীতে পাঠান হইতেছে। এই সম্বন্ধে হুগলীর জেলা-শাসকের নিকট সারদাচরণ মিউজিয়মের পক্ষ হইতে একটি মূর্তি অপসারণ করা যাহাতে না হয়, সে বিষয় পত্র লিখিলে তিনি পত্রোত্তরে জানান যে, "ভাল করে সংরক্ষণে"র জন্য মূর্তি দিল্লীতে পাঠান হইয়াছে। পত্রের অংশবিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া উদ্ধার করছি ঃ

"The image in question is reported to have already been despatched to Delhi for better preservation in the Museum there." (Letter no 11036 R. G. dated 29*th* November, 1955)

॥ হুগলী জেলার মূর্তিকলা ॥

বাঙগলার মূর্তিকলা ভারতের ভাস্কর্যশিল্পের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাংগলাদেশে অদ্যাবধি যে অসংখ্য মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙগলাদেশে ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেকার কোন মূর্তি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। পাথরের মূর্তির অস্তিত্ব ভারতবর্ষে তাম্রপ্রস্তর যুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বাংগলাদেশে মাটিতে গড়া মূর্তির প্রাধান্য প্রাচীন কালেও খুব বেশী ছিল। কাঠের কারু-কার্যখচিত মূর্তির উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা হইতে বাঙগলাদেশে সেকালে মাটির এবং কাঠের মূর্তির প্রচলনও খুব বেশী ছিল বলিয়া জানা যায়।

বহু প্রাচীনকাল হইতে হুগলী জেলায় যে শিল্পচর্চার অস্তিত্ব ছিল তাহার অনেক রকম প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। হিউয়েন সিয়াং তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে বাঙ্গলাদেশের বহু মন্দির চৈত্য ও সংঘারামের উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল ইতিহাসে নয়, হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে প্রাচীন মূর্তিকলার যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এই অঞ্চল যে সুদূর অতীতে শিল্পগৌরবে সুসমৃদ্ধ ছিল তাহাই প্রমাণিত হয়। হুগলী জেলার সর্বত্র প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় কত শত মূর্তি যে আত্মগোপন করিয়া আছে তাহার চাক্ষুষ প্রমাণের অভাব নাই।

প্রসংগত স্মরণ করি কেবল হুগলী জেলায় নয় সমগ্র বঙ্গদেশে মূর্তিকলার অস্তিত্ব থাকিলেও পাল-পূর্বযুগের প্রস্তরনির্মিত মূর্তি খুব অল্পই পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন মূর্তিগুলিতে কোন সাল অথবা তারিখ না থাকায় সেগুলির কাল নির্ণয়ের জন্য মূর্তি-গুলির গঠনপ্রণালীর বিভিন্ন ভঙ্গীর সাহায্যে উহাদের কাল নির্ণীত হইয়াছে। মূর্তির গড়নে যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহা হইতে সন-তারিখের কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও গঠনভংগীর বৈশিষ্ট্যগুলিই মূর্তির কাল নিরূপণে সহায়তা করে।

একাদশ শতাব্দীর দুইটি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি সারদাচরণ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। মাদড়া হইতে প্রাপ্ত প্রথম মূর্তিটির নিম্নাংশ নাই। যেটুকু আছে তাহার উচ্চতা পনের ইঞ্চি (চিত্র নং ৪) গঠন-সৌকর্যের দিক হইতে এইরূপ মূর্তি দুষ্প্রাপ্য বলা যায়। মূর্তির লালিত্যপূর্ণ ভঙ্গী ও চালচিত্রের অপরূপ কারুকার্য প্রচলিত কোন মূর্তিতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। দ্বিতীয় মূর্তিটি দ্বারবাসিনী হইতে সংগৃহীত; ইহার নিম্নাংশ কেবল আছে (চিত্র নং ৫) যতটুকু দেখা যায়, তাহা হইতে মূর্তির কমনীয়তা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দুটি মূর্তির আলোকচিত্র ১৪২ নং প্লেটে দেওয়া হইল।

পাণ্ডুয়ার শাহসুফি সুলতানের আস্তানায় রক্ষিত দ্বিখণ্ডিত সূর্যমূর্তি ও তাহার পশ্চাতে আরবীলিপি শ্রীসুধীরকুমার মিত্র আবিষ্কার করেন। উহার আলোকচিত্র ৬৬ নং প্লেটে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীপাল পাণ্ডুয়া হইতে তিন মাইল দূরবর্তী সিমলাগড় নামক স্থানে এক অভগ্ন সূর্যমূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মূর্তিটি নয়াদিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত "ভারতীয় জাতীয় সংহশালায়" সংরক্ষিত হইয়াছে। দুইটি মূর্তিই একাদশ শতাব্দীর।

পাণ্ডুয়া বক্ষে শ্রী পাল কর্তৃক সেন যুগের তিনটি প্রস্তরময় বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়; তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট মূর্তিটি দিল্লী পলিটেকনিকে সংরক্ষিত হইয়াছে।

কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়মে বাঙগলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত অসংখ্য মূর্তি সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে হুগলীর কয়েকটি মূতির বিবরণ উদ্ধারযোগ্যঃ

সপ্তম শতাব্দীর মহানাদ হইতে প্রাপ্ত এক পাদ ভৈরব এবং দ্বারবাসিনী হইতে সংগৃহীত বিষ্ণুমূর্তি বৈচিত্র্যে শিল্পজগতে একটি বৈশিষ্ট্যময় স্থান অধিকার করিয়াছে।

নবম ও দশম শতাব্দীর পারাম্বুয়া হইতে বিষ্ণুমূর্তি, নরীগ্রাম হইতে সূর্যমূর্তি এবং মহানাদ হইতে প্রাপ্ত একটি নারী মূর্তির গঠনভংগী ও অলংকরণ শিল্পজগতে স্বকীয় প্রতিভায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

দশম শতাব্দীর যে সব মূর্তি এই চিত্রশালায় সংরক্ষিত হইয়াছে তাহার মধ্যে পরিকল্পনা ও গঠনসৌকর্যের দিক হইতে ভাণ্ডারহাটি হইতে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বর মূর্তি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দুঃষ্প্রাপ্য বলিয়া বাংলার ভাস্কর্য নামক গ্রন্থে শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, পট সংস্থানের যে রীতি সাধারণতঃ অন্যান্য প্রচলিত মূর্তিতে অনুসরণ করা হইযাছে হুগলীর লোকেশ্বর মূর্তিতে সেই রীতির কিছু বৈলক্ষণ দেখা যায়। প্রায় চতুষ্কোণ একখানি ফলকের উপর বিনাস্ত মূর্তির বংকিম দাঁড়াবার ভংগীটি অত্যন্ত লালিত্যপূর্ণ। মূর্তির মাথায় জটা মুকুট, দেহে বিবিধ অলংকার। বাম করে লীলাপদ্ম দক্ষিণ কর বরদমুদ্রায় ধরা ছিল। পৃষ্ঠপটের বাঁদিকে একটি চিত্রিত ঘটের মুখ থেকে একটি বক্ষ নির্গত হয়ে মূল মূর্তিকে আবেষ্টন করে পটের দক্ষিণপ্রান্ত ঘেঁষে একটি বিচিত্র নক্সার সৃষ্টি করেছে। খর্বাকৃতি সুস্থ দেহ এক বামন বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করে আছে। তারই কিছু উপরে বক্ষ সংশ্লিষ্ট চারিটি অনুচ্চ পদকে হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি চকবর্তিত্বের কয়েকটি লক্ষণ উৎকীর্ণ। মূর্তির দক্ষিণে ক্ষুদ্রাকৃতি সূচীমুখ ও দুইটি অপ্রাচীন মূর্তি। পরিধেয় এবং অলঙ্কারের গভীর রেখাগুলি মূর্তির কমনীয় দেহের সংগে পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রাখতে না পারলেও দেহের তারুণ্য ও নমনীয়তা ও দাঁড়াবার লীলায়িত ভংগী এবং পট সংস্থানের বৈচিত্র্যে মূর্তিটি তার বৈশিষ্ট্য সূচিত করেছে। বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বর মূর্তির আলোকচিত্র ১৩৯ নং প্লেটে দেওয়া হইল।

একাদশ শতাব্দীর ভদ্রকালী হইতে প্রাপ্ত এক দিকে সূর্য ও অন্য দিকে ব্রহ্মার মূর্তি উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মার মুখমণ্ডল সুগোল, চক্ষু বাদামী এবং দেহ মাংসল। ভাণ্ডারহাটি হইতে প্রাপ্ত আর একটি বিষ্ণুমূর্তির নত্যের লীলাচঞ্চল ভঙ্গিমাটি এক কথায় অপূর্ব।

একাদশ শতাব্দীর পাণ্ডুয়া হইতে সংগৃহীত চারটি মূর্তিও জানলার কারুকার্যখচিত ঝাপরি (Perforated window) এবং সপ্তগ্রামের মসজিদ হইতে প্রাপ্ত বরফির আকারে

সজ্জিত বৃহৎ প্রস্তর ও জানলার একটি ঝাপরি ভাস্কর্যে এক কল্পজগতের সৃষ্টি করিয়াছিল বলিতে পারা যায়। পাণ্ডুয়ার পূর্বোক্ত চারিটি মূর্তির ন্যায় আর কোন মূর্তি অদ্যাপি আবিস্কৃত হয় নাই। ত্রিবেণীতে গঙ্গার ঘাটে একটি সূর্যমূর্তি (১১শ শতাব্দী) আছে।

হরিপাল থানার অন্তর্গত কৈঁকালা গ্রামে প্রাপ্ত চতুর্ভুজ দত্তাত্রেয় বিষ্ণুমূর্তিটির কমনীয় শিল্পশৈলী, অগ্নিশিখার ন্যায় ক্রমসূচ্যগ্র পশ্চাদপট ও মণ্ডনশিল্পের বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্বে আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। এ পর্যন্ত যে অগনিত বিষ্ণুমূর্তি বাংলা-দেশে পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিতে বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মা ও শিবের মূর্তি একসঙ্গে নাই। সেই দিক দিয়া কৈঁকালার এই মূর্তিটি অনন্যসাধারণ। মূর্তিটির বিষয় ১১০৩ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে এবং উহার আলোকচিত্র ৬২ নং প্লেটে দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ শতাব্দীর কুলগাড়িয়া ও হুগলী হইতে প্রাপ্ত বিষ্ণু মূর্তি দুইটির দেহ বেশ শক্তিপূর্ণ, হাতপায়ের ভঙ্গী গতিশীলতাগুণে সমৃদ্ধ ও মূর্তিগুলির মুখমণ্ডল শ্রীমণ্ডিত।

ষোড়শ শতাব্দীর কামারপুকুর হইতে সংগৃহীত দুইটি গজসিংহ মূর্তি, ও ভদ্রকালী হইতে প্রাপ্ত ধর্মঠাকুরের মূর্তিও উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তিগুলির প্রান্তরেখা তীক্ষ্ম কিন্তু মূর্তিগুলির দেহের মধ্যে একটি পেলবতার ভাব দেখা যায়। সেই জন্য মূর্তিগুলি কোমল ও মাধুর্যপূর্ণ। অমূল্য প্রত্নশালায় সংরক্ষিত সাটিখান গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির চিত্র ৮৮ নং প্লেটে দেওয়া হইয়াছে। মূর্তির ভঙ্গিমা খুব সুন্দর।

সপ্তদশ শতাব্দীর বালী ও জগৎবল্লভপুর হইতে প্রাপ্ত দুইটি মহীষমর্দিণী মূর্তি ইটের উপর অংকিত হইলেও কলাচাতুর্যের দিক হইতে মূর্তিগুলি এক নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পোড়ামাটি বা টেরাকোটার মধ্যে ত্রিবেণী হইতে প্রাপ্ত রামলীলা, বজনা হইতে প্রাপ্ত রামসীতার মূর্তি পাতুল হইতে সংগৃহীত হনুমান ও একটি নারীমূর্তি এবং খানাকুল কৃষ্ণনগর হইতে প্রাপ্ত নৌকায় করিয়া হাতী লইয়া যাওয়া হইতেছে, পর্তুগীজদের জাহাজ, আরামবাগ হইতে সংগৃহীত (১৭শ শতাব্দী) বালকগণের বিদ্যালয় যাত্রা এবং জগৎবল্লভপুর হইতে প্রাপ্ত রামলীলার দৃশ্য অতিমাধুর্যযুক্ত হওয়ায় শিল্পের বিচারে আকর্ষণীয় বলিতে পারা যায়। কৃষ্ণপুর হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর (লেখক কর্তৃক আবিস্কৃত) ইঁটের বিষয় ৭৫৯ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে।

সপ্তগ্রাম হইতে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত অনেকগুলি কারুকার্যখচিত ইঁট সংগ্রহ করেন। উহা এখন বংগীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত হইয়াছে। কয়েকখানি ইঁটের বিবরণ ৭৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত ও দুইখানি ইঁটের অলংকরণের চিত্র ৯০ নং প্লেটে দেওয়া হইয়াছে। হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে যে সকল মন্দিরের কারুকার্য-সমন্বিত ইঁট সংগৃহীত হইয়াছে তাহা অমূল্য প্রত্নশালা, সারদাচরণ মিউজিয়াম, ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং সুধীর-কুমার মিত্রের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। ৮৮ নং প্লেটে অমূল্য প্রত্নশালা এবং ১৩৫ নং ও ১৪০ নং প্লেটে সারদাচরণ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ইষ্টকে ভাস্কর্যশিল্পের নমুনা হিসাবে উহাদের কয়েকটির আলোকচিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।

নবম শতাব্দীর মহানাদ হইতে প্রাপ্ত সিংহের মস্তক এবং দশম শতাব্দীর ভাণ্ডারহাটি হইতে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি শিল্পীর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পরিণতি বলা যায়। বুদ্ধমূর্তির

দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ মুখমণ্ডল, কোমল দেহ দেহের ডৌলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজির দরগা একাধিক বিধ্বস্ত হিন্দু মন্দিরের উপাদানে গড়া, না একটি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরের ভিতের উপর নির্মিত—সঠিকভাবে সেই তথ্য নির্ণয়ের জন্য কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ ঐ দরগার ভিতের চারিপাশে সম্প্রতি খননকার্য সুরু করিয়াছেন। কিছুটা খোঁড়ার পরই দরগার ভিতে হিন্দু স্থাপত্যের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ভিতের গায়ে বহু বিষ্ণুমূর্তি খোদিত। মূর্তিগুলির ভঙ্গিমা বিভিন্ন। তবে, এই স্থাপত্য ঠিক কোন্ যুগের এখনও তাহা পরিষ্কার জানা যায় নাই।

দরগার উপরের ভাগে হিন্দু স্থাপত্যের অনেক চিহ্ন দেখা যায়। প্রত্যেক দুয়ারের উপরের খিলানে অর্ধচন্দ্রাকারে বহু কারুকার্য খোদিত এবং ইহার মধ্যে অনেকগুলিই হিন্দুমূর্তি। সমাধিকক্ষেও কতকগুলি সংস্কৃত শিলালিপি আছে। দরগায় গদাধারী বিষ্ণুমূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। দেয়ালে চারিটি সাধুমূর্তি আছে। এই সব মূর্তির অনেকগুলিই অবশ্য অংগহীন–দেখিলেই বুঝা যায়, বহু চেষ্টা করিয়া ভাংগা হইয়াছে।

দরগার প্রাচীরগাত্রে জমি হইতে প্রায় আট ফুট উঁচুতে দুইটি লৌহদণ্ড–"নড়ে-চড়ে, কিন্তু পড়ে না।" মুসলমানরা বলেন, ইহা জাফর খাঁর যুদ্ধাস্ত্রের হাতলঃ হিন্দুর প্রবাদ, ইহা বিশ্বকর্মার যন্ত্র। বিশ্বকর্মা এক রাত্রের মধ্যে ত্রিবেণীতে দ্বিতীয় কাশী নির্মাণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কাজও সুরু হইয়াছিল। কিন্তু স্বয়ং মহাদেব বাধা দেন। মাঝরাতেই তিনি একটি কোকিল পাঠাইয়া দেন। হঠাৎ সেই কোকিল কুহু কুহু ডাকিয়া ওঠে। ভোর হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া অসমাপ্ত কাজ ফেলিয়া বিশ্বকর্মা সরিয়া পড়েন। তাড়াহুড়ায় তিনি দুইটি যন্ত্র ফেলিয়া যান। ঐ দুই লৌহখণ্ড সেই যন্ত্র দুইটির হাতল।

আরবী শিলালিপি—পিছনে হিন্দুমূর্তি

দরগার একটু পিছনে একটি পঞ্চগম্বুজাবৃত মসজিদ আছে। এই মসজিদে আরবী ভাষায় লেখা কয়েকখানি শিলালিপি আছে। এই শিলালিপিগুলি খুলিয়া দেখা গিয়াছে, পিছনে হিন্দু দেবদেবীব মূর্তি। জাফর খাঁ গাজীর দরগার চিত্র ৬৭ নং প্লেটে দেওয়া হইয়াছে। আরবী শিলালিপির আলোকচিত্র ৭৯ নং প্লেটে দ্রষ্টব্য।

১২৯৮ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ এই মসজিদ ও দরগা নির্মাণ করিয়াছিলেন। অনেকের অনুমান, ১৪৯৩ এবং ১৫১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময় সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন সাহের রাজত্বকালে দুইটিই পুনর্নির্মিত। এই সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ ৭৭৫ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে। স্যার যদুনাথ সরকার এই সমস্ত সৌধ দেখিয়া বলেন ঃ A museum of Muslim Epigraphy.

॥ সপ্তগ্রামের সূর্যমূর্তি ॥

ব্যাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মরত মাটিকাটা মজুরদের কোদালের ফালে হঠাৎই কোন একটি কঠিন বস্তুর সংঘর্ষ অনুভূত হয়। সতর্কতার সহিত চারিপাশের মাটি সরাইলে চার ফুট লম্বা ও দেড় ফুট প্রস্থ অপূর্ব কারুকার্যখচিত একটি সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। মাত্র এক কষ্টিপাথর কুঁদিয়া তৈয়ার করা এই বিরাট মূর্তিটি প্রায় সাড়ে তিন ফুট মাটির

নীচে কাতভাবে পড়িয়াছিল। এই সূর্যমূর্তির সচিত্র বিবরণ ৫ ফাল্গুন ১৩৭০ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলাম নিম্নে তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল ঃ

সপ্তাশ্ববাহিত রথে অরুণ সারথি। পদতলে সালঙ্কারা উষা। তদুপরি চতুর্হস্তসমন্বিত অ-ভঙ্গিম ঋজুসূর্যমূর্তি। মাথায় টোপরের আকৃতিবিশিষ্ট চূড়াসজ্জি, মুকুট। বক্ষে উপবীত। কবচকুণ্ডল ও নানা অলঙ্কারধারী। দুই পার্শ্বে চামর ব্যজনরত ছায়া সংজ্ঞা দুই স্ত্রী এবং প্রায় এক ফুট উচ্চ অজ্ঞাতপরিচয় দুই দেবমূর্তি উপবিষ্ট। ইহা ছাড়া আছে অন্ধকার হননোদ্যত ধনুর্ধারী দুই আলোক-কিরাত মূর্তি। মাথার উপরে এবং দুই পাশের চালচিত্রে খোদিত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পলায়নপর অন্ধকারস্বরূপ মেঘকুল এবং পদতলে মহাশূন্যে সঞ্চারী বলিষ্ঠ সপ্তাশ্বের উদ্দাম গতিবেগ। সব মিলাইয়া উদয়দিগন্তের স্বর্ণতোরণ উদ্ঘাটিত করিয়া অন্ধকার ভূখণ্ড প্লাবিত করিয়া লহরে লহরে আলোর জোয়ার বহাইয়া দেওয়া উদার বিপুল মহিমাময় সূর্যোদয়ের মূল ভাবস্বরূপটিকে শিল্পী যেন আমূল ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন এই প্রতিমাখানির মধ্যে।

সহসাপ্রাপ্ত এই মূর্তিটির নানাস্থানে কুঠারাঘাতের সুস্পষ্ট চিহ্ন আছে এবং চারিখানি হাতই কনুই হইতে খণ্ডিত। সহজেই অনুমান করা যায় ইহা কোন হিন্দুধর্মবিদ্বেষী মুসলমান দিগ্বিজয়ীর অত্যাচারের চিহ্নই হইবে। মূর্তিটিকে লইয়া স্থানীয় জনসাধারণের ইতিমধ্যেই নানা সম্ভবঅসম্ভব জল্পনাকল্পনা সুরু হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে পাল যুগের শিল্পনিদর্শন বলিয়া মনে করিতেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই মূর্তির পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা বুট জুতা আছে। এটি নিঃসন্দেহে মূর্তিশিল্পে কুষাণ বা শক পদ্ধতির প্রভাবের ফল।

পাণ্ডুয়া থানার কানুর গ্রামে কনকশিব নামক পুষ্করিণীর তীব খননকালে একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দিরের নিদর্শন এবং তথায় তিনটি অভগ্ন ও একটি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি শ্রীদুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তিনি শ্রী পি সি পালের নির্দেশে ঐগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে প্রদান করেন। শ্রীযুত পাল এই-রূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, মন্দিরটি প্রায় ৭ শত বৎসরের প্রাচীন। সর্বপ্রথম মন্দিরটিতে "কনকশিব" নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কালক্রমে পাণ্ডুয়া যুদ্ধের সময়ে পাণ্ডুয়া বিহার হইতে বিষ্ণুমূর্তিগুলি কানুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। মূর্তিগুলির আকার-প্রকার একই রকম। ইহাতে বেশ প্রমাণিত হয় পাণ্ডুয়ায় মূর্তিশিল্পের কারখানায় একই শিল্পীর দ্বারা মূর্তিগুলি নির্মিত হইয়াছিল। বিষ্ণুমূর্তির তিনটির প্রত্যেকটি ১ ফুট ৪ ইঞ্চি করিয়া দীর্ঘ ও ইহাদের সবগুলিই আংশিক পরিমাণে অসম্পূর্ণ। ইহা হইতে নিশ্চিত অনুমান করা যায় যে মূর্তিগুলির প্রাপ্তিস্থানে বা নিকটবর্তী কোন অঞ্চলে সম্ভবতঃ মূর্তি নির্মাণেব কারখানা ছিল। তথায় একই কারিগর কর্তৃক এগুলি তৈয়ারী করা হয়। ইহাদের শিল্প ও মূর্তিতত্ত্ববিষয়ক বৈশিষ্ট্য দেখিয়া এগুলি 'সেন যুগের' মনে হয়। তিনি পাণ্ডুয়ায় একটি প্রস্তর-স্তম্ভ আবিষ্কার করেন। স্তম্ভটি প্রায় ৩ হাত দীর্ঘ এবং গ্রাণাইট্ পাথরে নির্মিত। যে স্থানে উহা পাওয়া যায় সেই স্থান জঙ্গলে আবৃত ছিল। কলোনি স্থাপনের সময় জঙ্গল কাটা হইলে উহা বাহির হয়। উহাতে একটি গণেশের

মূর্তি ক্ষোদিত আছে। উহা এক্ষণে আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। ইহার সম্বন্ধে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল তাহা এই ঃ

Another piece, a stone door lintel of about 13th century A.D. a carved image of Ganesh in the centre was found in Pundua, Hughly and points to the existence of a large medieval Hindu temple there. The ruins formed the base of a mosque after the temple was destroyed.

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীদুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী সরাই গ্রামে একটি মহিষমর্দ্দিণী মূর্তি আবিষ্কার করেন। ঐ মূর্তিটি একটি পুষ্করিণীর মধ্যে বহু বৎসর নিমজ্জিত ছিল। আশুতোষ মিউজিয়মে মহিষমর্দিণী মূর্তি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। মূর্তিটি দৈর্ঘে প্রায় ৩ ফুট এবং কারুকার্য অতুলনীয়। কথিত আছে যিনি মূর্তিটি আনয়ন করেন উহার অংগহানি হওয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন নাই। উহা সেই অবধি পুষ্করিণীর জলে নিমজ্জিত ছিল। তিনটি অভগ্ন বিষ্ণুমূর্তির চিত্র ৫১ নং প্লেটে দ্রষ্টব্য। গণেশের মূর্তিসহ স্তম্ভটির আলোকচিত্র ৭০ নং প্লেটে দেওয়া হইয়াছে।

সারদাচরণ মিউজিয়ামে সংগৃহীত (প্লেট নং ১৪৪) মাদড়া হইতে প্রাপ্ত সপ্তদশ শতাব্দীর নৃত্যরত ভৈরব (চিত্র নং ১) এবং সেন রাজত্বকালে পাণ্ডুয়া হইতে প্রাপ্ত বিষ্ণু-মূর্তি (চিত্র নং ৩) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নৃত্যরত এইরূপ ভৈরবের মূর্তি বাংলাদেশে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা ছাড়া ১৪১ নং প্লেটে মহানাদ হইতে সংগৃহীত বিষ্ণু-মূর্তি (চিত্র নং ৩) ও পাণ্ডুয়া হইতে প্রাপ্ত পার্শ্বনাথের মূর্তি দাঁড়াইবার লীলায়িত ভঙ্গীমার জন্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। বিষ্ণুমূর্তির নিম্নাংশ ভগ্ন। এখন যাহা আছে, তাহার উচ্চতা সাড়ে চার ইঞ্চি। মূর্তির দাঁড়াইবার ভঙ্গী চমৎকার। পরিধেয় এবং অলংকারের সূক্ষ্ম রেখাগুলি মূর্তির দেহের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। এই মূর্তি পালযুগের এক অপূর্ব নিদর্শন। ইহা ছাড়া পুনাজগড় হইতে আর একটি বিষ্ণুমূর্তির (চিত্র নং ৫) নিম্নাংশ কেবল পাওয়া যায়। এই মূর্তিটিরও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। হুগলী হইতে শ্রী পি, সি, পাল আবিষ্কৃত নিম্নোক্ত দ্রব্যাদি দিল্লীতে ভারতের জাতীয় সংগ্রহশালায় "ভাল করে সংরক্ষণে"র জন্য রক্ষিত আছেঃ

মুদ্রা ও গুঞ্জমালা ঃ মোগল আমলের রৌপ্য মুদ্রা—২ এবং তাম্রমুদ্রা—৫ পাঠান আমলের তাম্রমুদ্রা -১ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের তাম্রমুদ্রা—২ বিদেশী মেডেল—১ মোগল আমলের বিবিধ আকারের ও বর্ণের গুঞ্জমালা—৭

পাণ্ডুয়া ঃ পালযুগের একটি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি—পাণ্ডুয়া থানার যমুনাদীঘির তীরে ও সেন যুগের একটি বিষ্ণুমূর্তি—পাণ্ডুয়া সহরে আবিষ্কৃত। মহানাদ হইতে প্রাপ্ত ঃ

গুপ্তযুগের মৃণ্ময় জলপাত্র—১ কটরা—১ ঢাকণী—৫ প্রদীপ—৪ পুতুল—২ গুলি—৩ টাকু (চক্রাকৃতি)—২ টাক (সাধারণ)—৮০ মাকু—২ বোতাম—৫ বাটখারা—৮ এবং প্রস্তরময় বাটখারা—৮। **পালযুগের**—মৃণ্ময় কৃষ্ণমূর্তি—৫ রাধামূর্তি—২ এবং নক্সাদার গুলি—৮।

শ্রীরামপুর মহকুমা

ভাগীরথী তীরবর্তী পৌরসংস্থাসমূহ

ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত শ্রীরামপুর মহকুমার প্রধান নগরী **শ্রীরামপুর।** ইহা কলিকাতা ও হুগলী হইতে সমদূরবর্তী বার মাইল দূরে অবস্থিত। আয়তন সাড়ে তিন মাইল। শ্রীরামপুরের উত্তরে ভাগীরথী, দক্ষিণে রিষড়া, পূর্বে ভাগীরথী ও পশ্চিমে ইস্টার্ন রেলওয়ের লাইন। বলয়াকারে ভাগীরথী উত্তরে ও পূর্বে শ্রীরামপুরকে ঘিরিয়া আছে বলিয়া ইহার প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম।

শ্রীরামপুর বলিয়া আগে কোন মহকুমা ছিল না। ইহা ছিল দিনেমার অধিকৃত একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী ডেনমার্কের রাজার সহিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে এক বন্দোবস্তের ফলে ফ্রেডারিক্স নগর অর্থাৎ শ্রীরামপুর শহর এবং ডিহি শ্রীরামপুর, আকনা ও পিয়ারাপুর বাংলাদেশে ফোর্ট উইলিয়মের রাজধানীর অধীন হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দ্বারহাট্টা বলিয়া একটি নূতন মহকুমা গঠন করা হয় এবং এই মহকুমা শাসন করিবার জন্য মিঃ লুইস জ্যাকসনকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন। এই নূতন মহকুমা সম্বন্ধে টয়েনবি সাহেব লিখিয়াছেনঃ

> In 1845 a sub-division of the Hooghly District had been started, with head quarter at Dwarhatta, Mr. L. S. Jackson afterwards Sir L. S. Jackson of the High Court of Calcutta being the first sub-divisional officer. On the acquisition of Serampore, the head quarter of the sub-division were moved to that place.

সেই সময় হুগলী জেলা তিনটি মহকুমায় বিভক্ত ছিল—হুগলী সদর, দ্বারহাট্টা ও ক্ষীরপাই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক শ্রীরামপুর ক্রীত হইবার পর ইহা হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর গভর্নমেণ্টের "শ্রীরামপুর ঘটিত বিজ্ঞাপন" হইতেও নিম্নোক্ত সংবাদ জানা যায়।

"ইহাতে হুকুম হইল যে. জেলা হুগলী সীমার মতান্তর হয় এবং ফ্রিড্রিক্স নগর অর্থাৎ শ্রীরামপুর শহর এবং ডিহি শ্রীরামপুর ও আকনা ও পিযারাপুর জেলা হুগলীর সামিল হয়।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ মহামতী মিশনারীগণ রাজা রামমোহন রায়ের সমকালীন যুগে আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের পত্তন করেন বলিয়া এই ক্ষুদ্র শহরকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জন্মভূমি তথা সমগ্র দেশের তীর্থভূমি বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া সেই যুগবিপ্লবে দুইটি ধর্ম—হিন্দু ও খৃষ্টধর্মের মধ্যে যে প্রচণ্ড সংঘাত দেখা দিয়াছিল, তাহার প্রবল ঢেউ শ্রীরামপুরের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। তারপর বহু বর্ষ মহাকালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। পল্লী শ্রীরামপুর ক্রমশ রূপান্তরিত হইয়াছে শহরে—আর কৃষির স্থান লইয়াছে শিল্প। তাই এই শহরকে কেন্দ্র করিয়া এখন এক বিরাট শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে আধুনিক সভ্যতার বিষ ও অমৃত দুই এই শহরকে স্পর্শ করিয়াছে বলা যায়।

শ্রীরামপুর হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হইবার পর দ্বারহাট্টা হইতে মহকুমার প্রধান শহর শ্রীরামপুরে আনা হয় এবং ক্ষীরপাই মহকুমা পরিবর্তন করিয়া জাহানাবাদ মহকুমা করা

হয়। তখন হইতে ডেনিশ-শ্রীরামপুর বৃটিশ-শ্রীরামপুরে পরিণত হয়। এই বিষয়ে ক্রফোর্ড সাহেবের উক্তি উদ্ধারযোগ্যঃ

In 1845 the Hooghly District was divided into three Sub-divisions the Sadar, Dwarhatta and Khirpai. Dwarhatta Sub-division correspond to the modern Serampore and the head quarters were removed to that town on its purchase from the Danes, later in the same year Khirpai corresponded to the modern Jahanabad.

শ্রীরামপুর মহকুমা তখন আটটি থানা লইয়া গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে চন্দননগর মহকুমা গঠিত হওয়ায় ভদ্রেশ্বর, হরিপাল- তারকেশ্বর ও সিংগুর এই চারটি থানা শ্রীরামপুর মহকুমার বাহিরে চলিয়া যায়। বর্তমানে শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, চণ্ডীতলা ও জাংগীপাড়া এই চারটি থানা লইয়া শ্রীরামপুর মহকুমার অবস্থিতি। শ্রীরামপুর মহকুমার সহিত বাংগলার তথা ভারতের ও সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশের বহু ঘটনারাজির স্মৃতি বিজড়িত।

শ্রীরামপুর শহরের আদি পৌরসভার আয়তন বর্তমানের সংগে অভিন্ন নয়, কারণ তখনকার তুলনায় এখন ইহার যে রূপ আমরা দেখিতে পাই তাহা কর্তিত ও ভগ্নাংশ মাত্র। তখন শ্রীরামপুরের আয়তন ছিল বৈদ্যবাটী হইতে কোন্নগর পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু আজ সেখানে তিনটি পৌরসভার জন্ম হইয়াছে। ফলে শহরের আয়তন কমিয়া গিয়া ২·২৭ বর্গমাইলে দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীরামপুর থানার মধ্যে রাজ্যধরপুর ও পিয়ারাপুর এই দুইটি ইউনিয়ন বোর্ড ও শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী ও রিষড়া এই তিনটি পৌরসভা আছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মিউনিসিপ্যাল বোর্ড প্রবর্তিত হয়। তখন রিষড়া ও কোন্নগর শ্রীবামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এই দুইটি পল্লীতে স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি হয়।

উত্তরপাড়া থানার মধ্যে মাকলা-নপাড়া নামে একটি ইউনিযন বোর্ড ও উত্তরপাড়া, কোন্নগর ও কোতরং এই তিনটি পৌরসভা আছে। মাকলা-নপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের জনসংখ্যা ১৪,১৯১ জন আদমসুমারির তালিকায় থাকিলেও ইহার জনসংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

রাজ্যধরপুব ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৯,৪৫৩ ও পিয়ারাপুরের জনসংখ্যা ৪,২২৪ জন লিখিত থাকিলেও বর্তমানে এই দুই ইউনিয়নের লোকসংখ্যা কুড়ি হাজারের উপর।

চণ্ডীতলা ও জাংগীপাড়া থানার মধ্যে আটটি করিয়া ইউনিযন বোর্ড আছে। চণ্ডীতলার থানার ইউনিয়ন বোর্ডের নামঃ শিয়াখালা, আকুনি-ইছাপসার, নবাবপুর-কুমিরমোড়া, জনাই, বেগমপুর, চণ্ডীতলা, মনোহরপুর ও কৃষ্টরামপুর। এবং জাংগীপাড়া থানার ইউনিয়ন বোর্ডের নামঃ রাজবলহাট, রসিদপুর, দিলাকাস, আঁটপুর-জাংগীপাড়া, মাণ্ডলিকা, রাধানগর, ফুরফুরা ও কোটালপুর।

দিনেমার কোম্পানী লুপ্ত হইয়াছে অনেকদিন। তবু সেই আমলের অনেক চিহ্ন এখনও শ্রীরামপুরের নানান স্থানে পড়িযা আছে। যে বাড়িতে একদিন ডেনিশ গভর্নর বাস করিতেন আজ সেই বাড়ি হইয়াছে মহকুমা হাকিমের এজলাস। শ্রীরামপুরের অতীত ও নূতনের পরিচয় পরে বিবৃত হইল।

॥ শ্রীরামপুর ॥

শ্রীরামপুর হুগলী জেলার একটি মহকুমা এবং শ্রীরামপুর শহর উক্ত মহকুমার প্রধান নগর; অক্ষাঃ ২২°৪৫´২৬´´ উত্তর এবং দ্রাঘিঃ ৮৮°২৩´১০´´ পূর্বে অবস্থিত। ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত এই স্থানটির প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধির বিষয়, বৈদেশিক শাসনাধিকারের পূর্বের ঘটনা অবশ্য বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে মগধাধিপতি বৈজাল রাজের সভাপণ্ডিত 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক প্রাচীন সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থের কিলকিলা বিবরণে শ্রীরামপুরের সম্বন্ধে উল্লিখিত আছেঃ "শিবপুরং সমারভ্য বালুকো হি দ্বিজাপদঃ শ্রীরামাদিপুরং দিব্যং ভদ্রেশ্বরস্য সন্নিধৌ॥ ৬৬৯"; এবং বিপ্রদাসকৃত 'মনসা-মঙ্গলে'ও এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রাচীনকালে কিরূপ ছিল; তাহা ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার দিন-পঞ্জিকায় লিপিবন্ধ করিয়াছেন। ওয়ার্ড সাহেবের বিবরণী অংশবিশেষ উদ্ধারযোগ্যঃ

প্রকৃতি এখানে সহজ সাজে সজ্জিত; তাঁহার সম্পদের মধ্যে কুটীর ও কুঞ্জোদ্যানগুলি। নদীতরঙ্গে তিনি খেলা করেন, জীবধাত্রী হইয়া এখানে বিরাজ করেন। এখানে সবকিছুর উপর কে যেন মায়ার পরশ বুলাইয়াছে; হিন্দুর ধর্ম অবলম্বন করিতে ইতিমধ্যেই আমার বাসনা জন্মিয়াছে; এই সুন্দর নদীর তীরে কুটীর এবং কুঞ্জকানন মধ্যে আমি থাকিতে চাই। এই ভদ্র এবং শান্ত হিন্দুদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিব; এই চিন্তায় আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই নদীতীরস্থ সামান্য কুটীরগুলির যে সৌন্দর্য, ইংলণ্ডের পরম রমণীয় উদ্যানের সৌন্দর্য তাহার অর্ধেকও নহে। স্থানীয় অধিবাসীরা উচ্চতায় নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, তাম্রবর্ণ এবং অনেকে দেখিতে সুন্দর। সম্পূর্ণ সমতল এই দেশ, স্থানে স্থানে অরণ্যসংকুল, মাঝে মাঝে জানালাবিহীন খড়ের ছাউনি দেওয়া কাদায়-গাঁথা কুঁড়েগুলি; গৃহপালিত পশুর প্রাচুর্য—দলে দলে চরমান তাহাদের দেখিলে চোখ জুড়ায়। মাথায় এবং কোমরে জড়ান এক এক টুকরো কাপড় ইহাদের পরিধেয়; ফলমূল, মৎস্য ও অন্ন ইহাদের প্রধান আহার্য এবং ধূমপান প্রধান বিলাস......এই দেশ এবং ইহার অধিবাসীদের দেখিয়া আমরা সত্যই আনন্দ পাইতেছি; নয়নমনোহর মূর্তির সংখ্যা ইংরেজদের অপেক্ষা ইহাদের মধ্যে অধিক...।

১৬১২ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কে যখন চতুর্থ খৃশ্চিয়ান সম্রাট ছিলেন তখন ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য দিনেমার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। ভারতবর্ষে কোন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা তাহাদের না থাকিলেও কার্যগতিকে দিনেমারগণ এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং ৯০ বৎসর এই উপনিবেশ তাহাদের দখলে ছিল।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে গোন্দলপাড়া হইতে দিনেমারগণ ব্যবসা করিবার জন্য শ্রীরামপুরে প্রথম আগমন করে বলিয়া জানা যায়। তাহাদের ব্যবসার সুবিধার জন্য চন্দননগরের গভর্নর রেনল্ড এবং ফরাসী এজেন্ট মঁসিয়ে ল'র চেষ্টায় নবাবের নিকট হইতে তাহারা শ্রীরামপুরে

ষাট বিঘা জমি প্রাপ্ত হইয়াছিল। -বাংলার নবাবের নিকট হইতে জমি সংগ্রহ করিতে ও ফরমান পাইতে তাহাদের ষোল হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। 'ডেনস ইন বেঙ্গলে' আছেঃ

The total expenditure of the Danes in obtaining the *firman* amounted to more than Rs. 150.000/- including a Nazar of Rs. 50,000/- to the Nawab and presents to the value of Rs. 50,000/- to Rs. 40,000/- among the favourites and officials of the court.
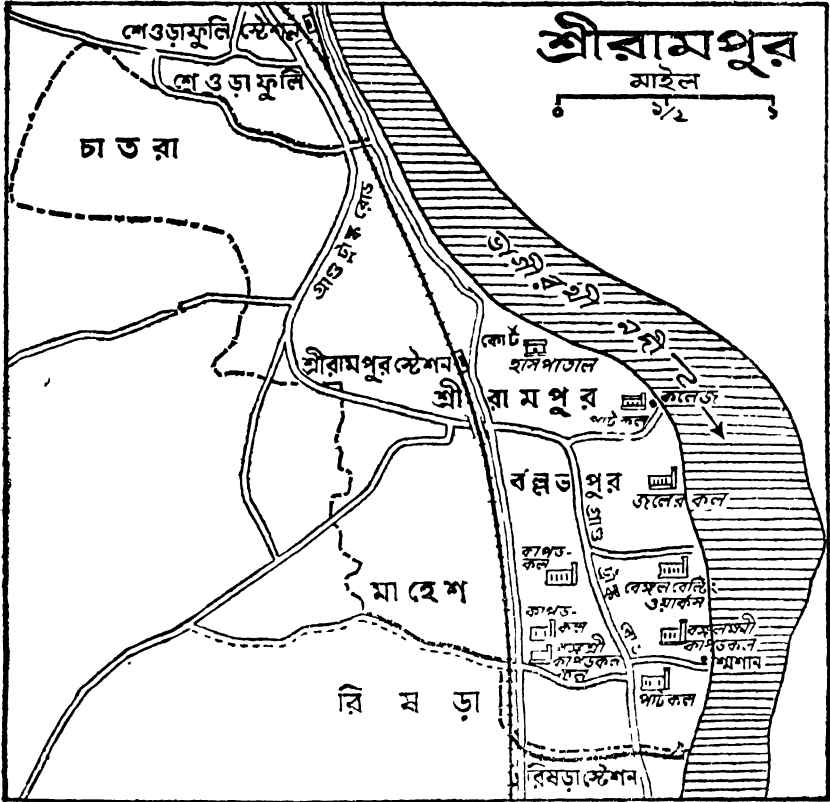
১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তারিখে এই স্থানে দিনেমারদিগের পতাকা প্রথম উড্ডীন হয় এবং উক্ত পতাকা রক্ষা করিবার জন্য ডেনিশ গবর্ণমেণ্ট চারজন পাইক নিযুক্ত করিয়াছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা ইহাদিগকে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিয়া যে বহু অর্থ পাইয়াছিলেন তাহাও জানিতে পারা যায়।

It is recorded that the previous year had brought Siraj-ud-Dowlah a good deal of money owing to the business of establishing the Danes in Bengal.

ডেনমার্কের তৎকালীন রাজা পঞ্চম ফ্রেডরিকের নামানুসারে তাহারা 'ফ্রেডরিক-নগর' বলিয়া শ্রীরামপুরের নূতন নামকরণ করে। শ্রীপুর, আকনা, গোপীনাথপুর, মোহনপুর

ও পেয়ারাপুর এই স্থানগুলি লইয়াই ফ্রেডরিকনগর গঠিত হইয়াছিল। বাঙলা দেশে ব্যবসায় করিবার অনুমতি পাইলেও তাহারা দুর্গ নির্মাণ অথবা সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা পান নাই।

Though liberty was granted the Danes of trading in Bengal and of establishing a settlement there they were not allowed to build or keep garisons. (Bengal in 1756-57 Vol. II P-17.)

দিনেমারগণ শ্রীরামপুরে ব্যবসা আরম্ভ করিবার অল্পদিন পরে নবাব সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন এবং আক্রমণ করিবার পূর্বে, তিনি দিনেমারদিগের নিকট হইতে কয়েকখানি জাহাজ চাহিয়া পাঠান; কিন্তু জাহাজ তাহারা না দেওয়ায় নবাব বিশেষ ক্রুদ্ধ হন এবং কলিকাতা আক্রমণ সমাধা করিয়া, তিনি দিনেমার ব্যবসায়ীদিগকে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

The remaining nations carrying on business here have, as well as the French, had to make a free offering according to the degree of each ones ability.

The Danes	Rs. 25,000/-
The Portuguese	„ 5.000/-
The Emdeners	„ 5.000/-

—Translation of a letter from the Dutch Council at Hooghly to the Supreme Council at Batavia, dated Fort Gustavas, 24th November 1756. (Bengal in 1756-57 Vol. I,)

ভারতে তিনটি স্থানে দিনেমারগণের কুঠী ছিল। দক্ষিণ-ভারতে তাঞ্জোরের নিকট ট্রানকোয়েবারে উড়িষ্যার বালেশ্বরে এবং বঙ্গদেশে হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরে। শ্রীরামপুরে একখানি চালাঘরে তাহারা প্রথমে কার্যারম্ভ করে। তাহাদের শ্রীরামপুরের কুঠির অধ্যক্ষ ছিল মিঃ সোয়েটম্যান; তাহারা এই স্থানে কারবার চালাইয়া সবিশেষ উন্নতি সাধন করে। কেবলমাত্র ব্যবসা করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হন নাই—শ্রীরামপুরের বহু জনহিতকর কার্য করিয়া তাহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গংগার তীরে এই সুন্দর শহরটি তৎকালে ইউরোপীয়দের একটি বিশেষ বিহার-ক্ষেত্র ছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে কর্নেল বাই-এর (Colonel Bie) চেষ্টায় তাহারা সেন্ট ওলাফস্ গীর্জা নির্মাণ করে। বিশপ হেবার শ্রীরামপুরকে একটি ইউরোপীয় শহরের মত দেখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন:

It looked more of a European town than Calcutta.

সেন্ট ওলাফ গীর্জা এখন রুদ্ধ উপাসনালয়। ইহার খিলানে এখন ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা বাসা বাঁধিয়া জটলা করে। গীর্জার সামনে ত্রিকোণ জমিতে দিনেমারদের ১৫টি কামান সাজান আছে। এই কামানের বিবরণ ১১৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

খৃষ্টধর্ম ভারতে প্রচার করিবার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বহু সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ফ্রেডরিক কর্তৃক ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতে প্রোটেষ্টান্ট মিশনারী প্রেরিত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম আসিয়াছিলেন তাঁহার নাম জিগেনবাল্‌গ। তিনি একজন ভারতীয়কে খৃষ্টান করিয়া ১৭১৪

খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ফিরিয়া যান। প্রথম প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারী জন কির্নণ্ডার ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে সরকারী ধর্মযাজকরূপে বঙ্গদেশে আগমন করেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মার্শম্যান ও ওয়ার্ড এবং তাঁহাদের দুইজন বন্ধু খৃষ্টধর্ম প্রচার করিবার জন্য শ্রীরামপুরে আগমন করেন। তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড ওয়েলেসলী তাঁহাদিগকে ফরাসী গুপ্তচর ভাবিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করেন, কিন্তু রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউনের চেষ্টায় ওয়েলেসলীর ভ্রম দূরীভূত হয় এবং মিশনারীগণ বঙ্গদেশে বসবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ডাঃ কেরী ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাংলায় আসিয়াছিলেন; সেই সময় তিনি মালদহে অবস্থান করিতেছিলেন। বন্ধুগণসহ মার্শম্যান ডাঃ কেরীর নিকট যাইবার চেষ্টা করিলে ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন এবং সেইজন্য তাঁহারা শ্রীরামপুরে বসবাস করিতে বাধ্য হন। তারপর ডাঃ কেরী আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন এবং এই তিনজনে মিলিয়া পরে শ্রীরামপুর-মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের জীবনী নামক গ্রন্থে এই তিনজন লোকহিতৈষী ধর্মপ্রচারকের কার্যাবলীর বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে। ওয়ার্ড সাহেব শ্রীরামপুরে ভারতবর্ষের প্রথম কাগজ প্রস্তুতের কলও স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুর মিশনের অধ্যক্ষ কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবের প্রযত্নে এই স্থানে গীর্জা প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে স্কুল, কলেজ, পুস্তকালয় ও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের আগ্রহে ও উৎসাহে শ্রীরামপুর হইতে প্রথম মুদ্রিত 'সাময়িক দিগদর্শন' ও সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' এবং 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' বাহির হইয়াছিল। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ও বংগসাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁহারা যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন সেজন্য শ্রীরামপুরের সহিত তাঁহাদের নাম বংগ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

সাময়িক সাহিত্য প্রসংগে তাঁহাদের সম্বন্ধে ও শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত যাবতীয় পত্র-পত্রিকার বিষয় ৪৯৪—৫০৭ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এই স্থানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না। দীনবন্ধু মিত্র সুরধুনী কাব্যে শ্রীরামপুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

সুধাম শ্রীরামপুর শোভা অভিরাম,
হাতে ঝুলী, নামাবলী, মুখে হরিনাম।
এই স্থানে আদি মিশনারী-নিকেতন,
দিনামর-নরপতি-সদনে স্থাপন।
কিবা কালেজের বাড়ী দেখিতে সুন্দর,
অগণন বাতায়ন, দীর্ঘ কলেবর।
পিতলের রেল সহ ললিত সোপান,
অপূর্ব প্রান্তরপথ, সুরম্য উদ্যান।
সর্ব অগ্রে ছাপাখানা এই স্থলে হয়,
মুদ্রিত হইল যাতে বংগ-গ্রন্থচয়।
কাগজের কল হেথা অতি চমৎকার
জন্মিছে কাগজ তায় বিবিধ প্রকার।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ শ্রীরামপুর কলেজের জন্য জমি কেনেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজকীয় সনদ অনুযায়ী কলেজ তৈয়ারী হয়। সমগ্র এসিয়ার মধ্যে ইহা প্রথম ডিগ্রি কলেজ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আটটি কলেজের মধ্যে শ্রীরামপুর কলেজ অন্যতম। দিনেমার শিক্ষাবিদদের কীর্তিস্তম্ভ শ্রীরামপুরের কলেজ ভবনের পরিবেশ এখনো সেই গত শতাব্দীর কথা মনে করাইয়া দেয়। মফঃস্বলে এই রকম কলেজ ভবন ভারতবর্ষে একমাত্র চুঁচুড়া ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। ইহার তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষার লেবরেটরি বিভাগটি রীতিমত সুসমৃদ্ধ বলিয়া খ্যাত। কলেজের পাঠাগারও ঐশ্বর্যে ভরপুর। প্রায় তিরিশ হাজার বই পাঠাগারের সম্পদ। ইহাতে অনেক মূল পাণ্ডুলিপি, হাতে লেখা নানান পত্র ও সনদ এবং প্রথম প্রকাশিত পত্র পত্রিকাগুলি সযত্নে সংরক্ষিত আছে। কলেজের বিবরণ ৩৫১-৩৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

॥ প্রথম বাঙ্গালী খৃষ্টান ॥

শ্রীরামপুর মিশনের চেষ্টায় **কৃষ্ণদাস পাল** নামক শ্রীরামপুরের জনৈক সূত্রধর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে পীতাম্বর সিংহ নামক কায়স্থ জাতীয় এক ব্যক্তিকে তাঁহারা সর্বপ্রথমে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন বলিয়া রামতনু লাহিড়ী ও তৎ-কালীন বঙ্গসমাজ পুস্তকে লিখিত আছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে শ্রীরামপুরের দিনেমার গবর্ণরের এবং বহু হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের সমক্ষে গঙ্গাতীরে এই ধর্মান্তর গ্রহণ সম্পন্ন হয়। কেরী সাহেব এই কার্যের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। গঙ্গা-তীরে এই দীক্ষাকার্য সাধিত হওয়ায় পাছে কেহ মনে করনে যে, গঙ্গার পবিত্রতার জন্য এই স্থান মনোনীত হইয়াছে, সেইজন্য কেরী সাহেব জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া-ছিলেন, "গঙ্গার পবিত্রতা তাঁহারা স্বীকার করেন না, উহার জলকে সাধারণ জল বলিয়াই জানেন।" উক্ত দিবস অপরাহ্নে অভিষেক-কার্য সম্পন্ন হয় এবং বঙ্গভাষায় যাবতীয় কার্য সম্পন্ন হয়। বঙ্গভাষায় এইরূপ অনুষ্ঠান ইতিপূর্বে হয় নাই। খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্তৃক দেশীয়দের ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে, বঙ্গভাষার ব্যবহার ইহাই প্রথম। কৃষ্ণদাসের স্ত্রী, কন্যা এবং গোলক নামক আর এক ব্যক্তিও এই সঙ্গে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহা-দের খৃষ্টধর্মাবলম্বনে শ্রীরামপুরে হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং পরদিন প্রাতে দুই সহস্র ব্যক্তি উহাদিগকে নিজ নিজ বাটি হইতে ধরিয়া বিচারকের নিকট লইয়া যায়। দিনেমার বিচারক ধর্মান্তর গ্রহণকারীদের কার্যের প্রশংসা করিয়া জনতাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন এবং পাছে জনসাধারণ উহাদের কোনপ্রকার অনিষ্ট করে সেইজন্য কৃষ্ণ, গোলক ও মিশনারীদের বাটিতে দিনেমার গবর্ণর সশস্ত্র পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর কৃষ্ণ পালের স্ত্রী রাসমণি, তাহার শ্যালিকা জয়মণি ও তাহার কন্যাগণ এবং তাঁহার অন্ন নাম্নী এক বিধবা আত্মীয়া খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতা হন। ইহারা পরে নারী প্রচারকের কার্য করেন। এতগুলি হিন্দুকে খৃষ্টান করায় ম্যার্শমান সাহেব আনন্দে বলিয়াছিলেনঃ এই ছয়জন খৃষ্টানকে আমরা ছয়টি রত্ন অপেক্ষাও মূল্যবান জ্ঞান করি। এখন এই ছয়জন খৃষ্টানকে সদুপদেশ ও সৎ শিক্ষা প্রদান কর এবং যাহাতে তাঁহারা ত্রাতা যীশুখৃষ্টের প্রতি অনুরক্ত হয় তাহা করিতে আমরা বাধ্য।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পিরু নামক একজন মুসলমান স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণপ্রসাদ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে স্বীয় যজ্ঞসূত্র ওয়ার্ড সাহেবের হাতে দেন। তিনি উক্ত উপবীত গ্রহণপূর্বক সহযোগীগণকে বলেন, "এই উপবীত রোম রাজ্যেরও কোন ভজনালয়ে নাই।" এই বলিয়া তিনি সেই উপবীত সযত্নে রাখিয়া দেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে **দেশীয় খৃষ্টানদের প্রথম বিবাহ** ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। **কৃষ্ণপ্রসাদ** নামক খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত কৃষ্ণের কন্যার বিবাহ বাংলায় প্রথম খৃষ্টীয় ধর্মমতে পরিণয় এবং এই বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি বঙ্গভাষায় সম্পন্ন হইয়াছিল। বর ও কন্যা উভয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ পাদ্রীগণ সাক্ষীস্বরূপ উক্ত পত্রে সহি করেন। বিবাহের পর তথায় একটি ভোজ হয়; সেই ভোজে মিশনারিগণ ও বাঙ্গালী খৃষ্টানগণ একত্রে ভোজন করেন। ইংরাজদের সহিত বাঙ্গালীদের এই প্রথম ভোজন হয়।

দেশীয় খৃষ্টানদের **সমাধি নির্মাণও** প্রথম শ্রীরামপুরে হয়। গোকুল দাস নামক জনৈক ব্যক্তি, মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্বে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সমাধিই বঙ্গদেশে দেশীয় খৃষ্টানদের সর্বপ্রথম সমাধি; গোকুল দাসের মৃত্যুর চারদিন পূর্বেই তাঁহার সমাধির জন্য মিশনারীগণ জমি ক্রয় করেন। প্রথম দেশীয় খৃষ্টান কৃষ্ণ পাল নিজ ব্যয়ে গোকুলের শবাধার মসলিনে আবৃত করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারে বিশেষ সফলতা দেখিয়া পাদ্রীগণ কালীঘাটে লোক পাঠাইয়া পাঁচশত টাকার পূজা দিয়াছিলেন। মুসলমানগণও খৃষ্টান হইবার জন্য শ্রীরামপুরে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে উক্ত মিশনের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে একখানি বাড়ী ক্রয় করা হয় এবং তথায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। কাষ্ঠে খোদাই করা **বাংলা অক্ষর** সর্বপ্রথম শ্রীরামপুরে তৈয়ার করা হয় এবং উক্ত অক্ষরে বাইবেলের বঙ্গানুবাদ এই স্থান হইতে তাঁহারা প্রথম প্রকাশ করেন। দুই হাজার খণ্ড বাইবেল বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৬১২ পাউণ্ড; কেরী সাহেবের বাঙ্গলা ব্যাকরণ উক্ত বৎসরে প্রথম মুদ্রিত হয় এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ব্যাকরণের চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী রচিত বাংলা ভাষায় ইংরাজী ব্যাকরণ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে ১০৭১ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে।

রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র এবং খৃষ্টচরিত ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়; রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র বঙ্গভাষায় প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ কি না, সেই সম্বন্ধে ৪৭১-৪৮৪ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

রামরাম বসু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বঙ্গজ কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। ২৪ পরগণার অন্তর্গত নিমতা গ্রামে তাঁহার বাল্যশিক্ষা সমাধা হয়। বাল্যকালে ইনি আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। কেরী সাহেবের লিখিত কাগজপত্রাদি হইতে জানা যায় যে, ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বেই তিনি উপরিউক্ত ভাষা দুইটিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম

কলেজ স্থাপিত হইবার পর, তিনি উক্ত কলেজে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিতেন। তিনি অতিশয় শিকারপ্রিয় ছিলেন এবং কেরী সাহেব লিখিয়াছেন যে বসু মহাশয়ের ন্যায় প্রগাঢ় অধ্যয়ন-পটু লোক তিনি আর কখনও দেখেন নাই।

শ্রীরামপুরে দিনেমারগণ ব্যবসায় চালাইয়া বেশ লাভবান হইতেছিলেন, সেই সময় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত ডেনমার্কের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পাছে এতদ্দেশস্থ দিনেমারগণও ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করেন সেইজন্য ব্যারাকপুর হইতে একদল সৈন্য আসিয়া শ্রীরামপুর দখল করে এবং উক্ত স্থান ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। অল্পদিন পরে এই শহর দিনেমারদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ এই শহর আবার দখল করেন এবং সাত বৎসর ইহা তাঁহাদের অধীনে থাকে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে এই উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধবিরতি হইলে পুনরায় ইহা দিনেমারদের প্রত্যর্পিত হয়। কিন্তু এই সময়ে দিনেমারদিগের ব্যবসায়ের বাজার মন্দা হওয়ায় দিনেমার সরকারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য ডেনমার্কের রাজা শ্রীরামপুর বিক্রয়ের সংকল্প করেন। হরিনারায়ণ গোস্বামী দিনেমার কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন, তাঁহার পিতা রঘুনাথ গোস্বামী কোম্পানীর মুৎসুদ্দি হইয়া ব্যবসায়াদির দ্বারা প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ডেনমার্কের অধিপতি যখন শ্রীরামপুর বিক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন গোস্বামী ভ্রাতৃগণ দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রায় শ্রীরামপুর খরিদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিবন্ধকতায় তাহা হইয়া উঠে নাই।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে ডেনমার্কের রাজা শ্রীরামপুর, ট্রানকোয়েবার ও বালেশ্বর সাড়ে বার লক্ষ টাকায় ইংরেজ গবর্ণমেন্টের নিকট বিক্রয় করেন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে দিনেমারদের সম্পর্ক চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়। শ্রীরামপুর হইতে দিনেমারগণ চলিয়া গেলেও তাঁহাদের নির্মিত গঙ্গাতীরস্থ সুরম্য অট্টালিকাসমূহ আজও তাঁহাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীরামপুরের যে ভবনটি বর্ত্তমানে আদালত-গৃহরূপে ব্যবহৃত হইতেছে উহা পূর্বে দিনেমার গবর্ণরের আবাসস্থল ছিল। এতদ্ব্যতীত কোর্ট লেন, চার্চ স্ট্রীট প্রভৃতি কয়েকটি রাস্তারও তাঁহারা নামকরণ করিয়াছিলেন। এই রাস্তাগুলি অদ্যাপি বর্তমান আছে। রোমান ক্যাথলিক গির্জা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৩,৩৮৬৲ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়। কনভেণ্টটি অপেক্ষাকৃত নূতন, সম্ভবতঃ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পর ইহার নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়। সরকারী গ্রন্থে এই সম্বন্ধে লিখিত আছেঃ

Serampore was a Danish settlement from 1756 to 1845 when it was taken over by the English. The Roman Catholic Chapel in Serampore was originally erected in 1764 but it was found too small for the increasing community. It was therefore taken down in 1776 when the present edifice was erected in its state at the expense of Rs. 13,306, under the auspicious of the Baretto family. Serampore is best known as the residence of the 3 celebrated Baptist Missionaries Carey, Marshman and Ward.

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী

দিনেমারগণের ব্যবহৃত পনরটি কামান একত্রে সেন্ট ওলাফস্ গীর্জার সম্মুখে স্থাপন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া একটি প্রস্তরফলকে শ্রীরামপুরের সহিত দিনেমারদিগের সম্পর্কের বিষয় সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। উহাতে উৎকীর্ণ কথাগুলি যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইল:

"This tablet has been erected to commemorate the connexion with Serampore of the Danes who after acquiring 60 bighas of land as a basis for their trading activities in Bengal governed this town and district then called Fraderecknagore, from 1755 to 1845 when they sold this property to the British. In spite of the poverty of the colony it had a reputation for great charm and cleanliness.

The cannons were employed for the fixing of salutes when no longer required for this purpose, they were for many years scattered round the town and used as lamp-posts until they were reassembled and set up in the neighbourhood of the old Danish Government House and of St. Olaf in the year 1940."

॥ শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী ॥

বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে একটা অধ্যায়ে বিদেশী পাদ্রীদের দান যথেষ্ট। কেরী মার্শম্যানের শ্রীরামপুর জাতীয় জীবনের সে অধ্যায়ে একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করেছে। শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীর ইতিহাসও আসলে সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংগেই জড়িয়ে আছে একেবারে ওতঃপ্রোতভাবে। বহু স্মৃতি বিজড়িত বহু প্রাচীন এ লাইব্রেরীর ইতিহাস সত্যি বিচিত্র। এরি সংগে মিশে আছে সে সময়ের ইতিহাসও নানাভাবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের ইউরোপীয় বণিককুলের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। শতাব্দীর শেষার্ধে দিনেমাররা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেন শ্রীরামপুর সহরে। জনহিতকর কার্যকলাপে স্থানীয় লোকদের সংগে এদের ছিল সাহায্য সহযোগিতার সম্পর্ক। কর্ণেল ক্রেগ ছিলেন তখন গভর্ণর। যে-কোন কারণেই হোক ইংরেজেরা নিজেদের এলাকায় বিখ্যাত কেরী মাশম্যান প্রমুখ পাদ্রীদের বসবাস করতে দিতে অসম্মত হন। তখন কর্ণেল ক্রেগ শ্রীরামপুরের ভূস্বামী সেওড়াফুলির রাজা হরিশ্চন্দ্র রায়ের ও শ্রীরামপুরের অন্যতম জমিদার রামচন্দ্র দে চৌধুরীদের সম্মতি নিয়ে সেই বিতাড়িত পাদ্রীদের শ্রীরামপুরে আশ্রয় প্রদান করেন। এই পাদ্রীদের সহযোগিতায় সে সময়ে গড়ে উঠেছিল বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। পাদ্রী কেরীর সহকর্মী জন মার্সম্যান স্থানীয় শাসনকর্তার সভাপতিত্বে ১৮০৬ সালে "ওয়েলফেয়ার কমিটি" নামে এক সমিতি স্থাপন করেন স্থানীয় লোকদের সহযোগিতার। এই "ওয়েলফেয়ার কমিটি"র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে পুস্তক ও পুঁথি পাঠের সুযোগ দেওয়া ও তাদের শিক্ষিত ক'রে তোলা। সমিতির বইপত্র রাখবার জন্যও সভ্যদের ও সাধারণের ব্যবহারের জন্য গভর্ণর নিজ বাড়ীর একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন। কালিদাস মৈত্র, মনোহর কর্মকার, শ্রীনাথ বিদ্যালঙ্কার, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, মৌলবী সৈয়দ হসেন ও জনমার্সম্যান ছিলেন "ওয়েলফেয়ার কমিটি"র প্রাথমিক সভ্য।

দিনেমারগণ ১৮৪৫ সালে চিরদিনের জন্য শ্রীরামপুর ছেড়ে চলে যান ও "ওয়েলফেয়ার কমিটি" "শ্রীরামপুর হিতকারিণী সভা" নাম দিয়ে সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। সমিতির নাম পরিবর্তিত হলেও এর উদ্দেশ্যের কোন পরিবর্তন সে সময়ে করা হয়নি। দিনেমারগণ চলে যাওয়ার পর সমিতির কার্যালয় ও পুস্তকাদি কয়েক বৎসর ডাঃ গ্রীণ সাহেবের সদরে রক্ষিত ছিল। তারপর সেখান থেকে উঠে আসে সেণ্ট ওলফ গির্জার দক্ষিণ দিকের বাড়ীতে ও শেখ অবস্থার ইহা স্থানান্তরিত হয় গ্যাঞ্জার সাহেবের বাড়ীতে। দিনেমারদের অধিকার সময়ের বহু ইউরোপীয় বাসিন্দা সমিতির সভ্য থেকে শ্রীরামপুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতায় সমিতির উন্নতির জন্য রীতিমতো চেষ্টা করতেন। দিনেমার সরকারের পরবর্তী সময়ে সমিতির অন্যান্য কার্যকলাপ ক্রমে বন্ধ হয়ে যায় ও ইহা একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগারে পরিণত হয়। ১৮৭১ সালে স্থানীয় অধিবাসীদের এক সাধারণ সভার প্রস্তাব মতে "শ্রীরামপুর হিতকারিণী সভা"র নাম বদলে "শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী" নাম রাখা হল। এটাকেই এ লাইব্রেরীর আরম্ভের ইতিহাস বলা চলে।

ইতিমধ্যে ১৮৬১ সালে শ্রীরামপুর "মিউচুয়েল ইমপ্রুভমেণ্ট এসোসিয়েশন" নামে স্থানীয় যুবকবৃন্দের এক আলোচনা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতির আলোচনা সভার অধিবেশন বসতো প্রত্যেক শনি ও রবিবারে নিয়মিতভাবে। এই এসোসিয়েশনের লাইব্রেরীতে বহু পুস্তক ও পত্রিকাদি রক্ষিত ছিল। এর নিয়মিত সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় ব্রহ্মমোহন মল্লিক, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীরা সভাপতিত্ব করতেন। এর কার্যালয় ছিল শ্রীরামপুরের ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউশন নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় বর্তমানে যে ভবনে অবস্থিত সেই বাড়ীতে। পোষ্ট অফিসের কার্যালয়ও ছিল সেই বাড়ীতেই অবস্থিত। দীনবন্ধু মিত্র শ্রীরামপুরে পোষ্টমাষ্টার থাকাকালীন এই ইমপ্রুভমেণ্ট এসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু বিদ্যালয় ছিল এই এসোসিয়েশনের পরিচালনাধীনে। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের কার্যকরী সভার হাতে সেগুলির পরিচালনাভার ছেড়ে দিয়ে মিউচুয়েল ইমপ্রুভমেণ্ট এসোসিয়েশন কার্যতঃ একটি আলোচনা সভায় পরিণত হয়। অবশেষে ১৮৮৫ সালে শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী ও মিউচুয়েল ইমপ্রুভমেণ্ট এসোসিয়েশন সংযুক্ত হয়ে এক সম্মিলিত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে পরিণত হয় ও ১৯০০ সালে প্রতিষ্ঠানকে রেজিষ্টারী করা হয় শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী ও মিউচুয়েল ইমপ্রুভমেণ্ট এসোসিয়েশন নামে। ১৮৮৫ সালের পর থেকে এই সংযুক্ত নামেই লাইব্রেরীর কার্যকলাপ চলছে।

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীর প্রথম সম্পাদক মিঃ জে সি প্লাউডেন। ১৯০০ সালের পর থেকে লাইব্রেরী সভ্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত শ্রীরামপুরের সাব-ডিভিশনাল অফিসারগণই পর পর লাইব্রেরীর কার্য নির্বাহক সমিতির সভাপতিত্ব করতেন, ১৯২৯ সালে সে নিয়ম বাতিল ক'রে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে গ্রন্থাগারের কলেবর ও কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহের অভাব অনুভূত হতে থাকে। লাইব্রেরীর আবাল্যকর্মী বিদ্যোৎ-সাহী রাজা ৺কিশোরীলাল গোস্বামী এ বিষয়ে বাকদান করে মারা গেলে তাঁহার পুত্র

শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী অর্ধলক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে **"কিশোরীলাল মেমোরিয়েল হল"** প্রতিষ্ঠিত করেন ও তাহার একাংশে শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী সংস্থাপিত করেন। লাইব্রেরী সেই সুদৃশ্য বিরাট ভবনে উঠে আসে ১৯২৮ সালে। অল্প দিনের ভেতরেই লাইব্রেরীর সম্প্রসারণের প্রয়োজন হওয়ায় শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অর্থ সাহায্যে ও লাইব্রেরীর নিজস্ব অর্থে গ্রন্থাগার সংলগ্ন একটি সুবৃহৎ হল নির্মিত হয়েছে।

লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে। তারপর ১৯৩১ সালে তিনদিনব্যাপী উৎসব ও পক্ষকালব্যাপী কৃষ্টি প্রদর্শনীর ভেতর দিয়ে উদযাপিত হয় লাই-ব্রেরীর হীরক জয়ন্তী উৎসব। জয়ন্তী উৎসবে লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ বহু ব্যয়ে রবীন্দ্র-নাথের বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ের এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ১৯৩৩ সালে এই লাইব্রেরীতেই "এশিয়ান লাইব্রেরী কনফারেন্সের" অধিবেশন বসেছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এ লাইব্রেরীতে সভাপতিত্ব করেছেন কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়, নিউটন মোহন দত্ত, আচার্য হেরম্বনাথ মৈত্র, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ, অধ্যাপক খোদাবক্স, ডাঃ হাওয়েলস্ প্রমুখ মনীষিবৃন্দ।

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালকগণের মধ্যে ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ, অধ্যক্ষ উপেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যক্ষ ডাঃ হাওয়েল, আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেওযোগ্য। এঁদের চেষ্টায় লাইব্রেরী থেকেই ভারত ও বঙ্গীয় সরকারের পুস্তকপত্রাদি বিনামূল্যে পেতে থাকে ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও অন্যত্র দুর্লভ দলিলপত্র (রিপোর্টস্, গেজেটিয়ার্স ইত্যাদি) এ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। বাঙলার গভর্ণর কারমাইকেল সাহেব গোপনে এ লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন ও এর ভারতীয় ইতিহাসের গ্রন্থ সংগ্রহ দেখে প্রীত হয়ে 'দি ইম্পিরিয়েল গেজেট' গ্রন্থগুলি গ্রন্থাগারে দান করেন।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর চেষ্টায় বহু দুষ্প্রাপ্য বইপত্র দান হিসেবে লাইব্রেরীতে পাওয়া গেছে। বর্তমানে এ লাইব্রেরীর গ্রন্থ-সংখ্যা এগারো হাজারেরও বেশী। শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী একটি প্রথম শ্রেণীর গবেষণা গ্রন্থাগার, বহু মনীষী গবেষণা কার্যের জন্য এ লাইব্রেরীর সাহায্য নিয়েছেন। (কৃষ্ণময় ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ, বসুমতী ৯ই বৈশাখ ১৩৬০)

॥ শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ ॥

বল্লভপুর গ্রামের উত্তরে এবং শ্রীরামপুর সহরের পূর্ব প্রান্তে, বর্তমানে যে অঞ্চলটি চৌধুরীপাড়া নামে পরিচিত পূর্বে তাহা আক্না সাবেক-পাড়া নামে অভিহিত হইত। ন্যূনাধিক দেড় শতাব্দী পূর্বে এই আক্না সাবেক-পাড়ায় পুণ্যশ্লোক গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজ অধ্যবসায়বলে প্রচুর বিত্তশালী এবং প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া উঠেন। গোপালচন্দ্র দিনেমার সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কালক্রমে শ্রীরামপুর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে, গোপালচন্দ্র নিজ ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতাবলে সরকারী মহলে বিশেষ সুনাম ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ক্রমে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ লাভ করেন। প্রচুর বিত্তশালী হইলেও

তাঁহার কোন পুত্রসন্তান জীবিত না থাকায় তিনি বিশেষ মনোবেদনায় ছিলেন। পুত্রলাভ-মানসে তিনি চারিবার দারপরিগ্রহ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার মনস্কাম পূর্ণ হয় নাই।

তৎকালে এতদ্ অঞ্চলের ভাগীরথী তীরবর্তী স্থান জনবিরল ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। অনতিদূরে গঙ্গাতীরে এক নির্জন স্থানে অজ্ঞাত-পরিচয় একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল যাবৎ একটি ক্ষুদ্র কুটিরমধ্যে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার কুটিরে একটি প্রস্তর নির্মিত অতি মনোরম কৃষ্ণমূর্তি ছিলেন। ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা তিনি নিত্য দেবসেবা করিতেন এবং সাধারণতঃ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বিগ্রহের পূজা-অর্চ্চনা করিতেন।

গোপালচন্দ্র বিশেষ নিষ্ঠাবান্ ও ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানের অভ্যাস তাঁহার ছিল। একদা ব্রাহ্ম মুহূর্তে গোপালচন্দ্র গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া গৃহাভিমুখ হইবেন, এমন সময়ে দৈবক্রমে তাঁহার সহিত সেই সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ ঘটিল। সন্ন্যাসী তাঁহাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া কুটীরে আসিলেন। গোপালচন্দ্র কুটীরমধ্যে কৃষ্ণমূর্তির সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। পুনরায় সন্ন্যাসী কহিলেন, "গোপালচন্দ্র, এই কারণেই তোমাকে এইস্থানে আনয়ন করিয়াছি। এই 'মদনমোহন' মূর্তি একটি সিদ্ধ বিগ্রহ। বহুকালের কামনায় এবং বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া আমি এই বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি জানি, তুমি অতীব নিষ্ঠাবান্ এবং বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি এই বিগ্রহ সেবার যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তি। সন্ন্যাসী কহিতে লাগিলেন,—"অদ্য অত্যন্ত শুভদিন, এই শুভদিনটিরই অপেক্ষায় আমি কিছুকাল হইতে ব্যাকুল হৃদয়ে এইস্থানে অবস্থান করিতেছি। তুমি ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে এই সিদ্ধ বিগ্রহ 'মদনমোহন' মূর্ত্তি স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিভরে পূজার্চ্চনার আয়োজন কর। তোমার মঙ্গল হইবে।" সেই শুভদিন হইতেই "মদনমোহন" শ্রীকৃষ্ণ গোপালচন্দ্রের গৃহে পূজিত হইতে লাগিলেন।

গোপালচন্দ্র পুরুষানুক্রমে শালগ্রামে "শ্রীমধুসূদনের" পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। বিগ্রহ প্রাপ্তির কিয়ৎদিন পরে তিনি শ্রীরাধারাণীর অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি এবং শ্রীগোপালের প্রস্তর মূর্তি শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আহরণ করেন। এই তিনটি বিগ্রহ এবং তাঁহার শ্রীমধুসূদনের একত্র প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে তিনি বহু অর্থব্যয়ে একটি সুন্দর এবং সু-উচ্চ মন্দির নির্মাণে ব্রতী হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গোপালচন্দ্রের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি মরলোক ত্যাগ করেন।

গোপালচন্দ্রের প্রথমা পত্নী তাঁহার জীবদ্দশায়ই পরলোকগমন করেন। গোপালচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী তাঁহার অনুসরণ করেন। তাঁহার তৃতীয়া ও চতুর্থী পত্নীদ্বয় তাঁহার আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করেন। মন্দির নির্মাণের কার্য সমাধা করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের স্বর্গতঃ স্বামীর সংকল্প অনুযায়ী 'শ্রীমধুসূদন' 'শ্রীমদনমোহন' 'শ্রীরাধারাণী' ও 'শ্রীগোপালকে' নবনির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশেষ সমারোহে দেবসেবার ব্যবস্থা করেন।

গোপালচন্দ্রের এই (কনিষ্ঠা) দুই পত্নীর মৃত্যুর পর গোপালচন্দ্রের বসতবাটী, মন্দির এবং যে যৎসামান্য ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা লইয়া নানা আত্মীয়ের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ ও

মামলা-মোকদ্দমা সুরু হয়। বিবাদের নিষ্পত্তি হইলে, তাঁহার সম্পত্তির যাহা অবশিষ্ট ছিল, যাঁহারা তাহার প্রকৃত অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন তাঁহাদের মন্দির বা বসতবাটী সংস্কারের সামর্থ্য ছিল না। তাঁহারা কোনক্রমে বিগ্রহগুলির নিত্য পূজা ও সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় মন্দির সংস্কারের জন্য পরে সেবা সমিতি গঠিত হয়।

শ্রীরামপুরের কালিনাথ পণ্ডিত লেন নিবাসী পঞ্চানন ভড় মহাশয় মদনমোহন জীউর মন্দির সংস্কার করিয়া দেন। শ্রীরামপুরের পণ্ডিত কালিনাথ ভট্টাচার্য লেন নিবাসী সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শশী ঘোষ লেন নিবাসী হরিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে উক্ত মন্দির বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা সজ্জিত করিয়া দেন।

॥ দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥

প্রসিদ্ধ দার্শনিক আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ উমাকান্ত তর্কালংকার তদানীন্তন মিশনারী মার্শম্যান সাহেবের গৃহশিক্ষক ছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউশন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশীর্ষ স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজী, দর্শন ও সংস্কৃত এই তিন বিষয়ে 'অনার্স' লইয়া বি, এ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ এম, এ পরীক্ষায় দর্শন বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও পরে 'প্রেমচাঁদ' বৃত্তি লাভ করেন। ৩২ বৎসর যাবত শিক্ষকতার কার্য করিয়া পরিশেষে হুগলী কলেজে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন ও সরকার হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য 'রায়-বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। দার্শনিক প্রতিভার জন্য সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি কখনও অন্য কোন দার্শনিকের কথার প্রতিধ্বনি করিতেন না। তাঁহাব সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিচার ও গভীর চিন্তার ফলে যে সত্য তিনি সুস্পষ্ট অনুভূতিতে পাইতেন তাহাই ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার "স্টাডিস্-ইন বেদান্তিসিম্" ও "দি সাবযেক্ট এ্যান্ড ফ্রিডম" নামক দুইখানি পুস্তক ও এগারটি মূল্যবান প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তির কথা যাহা অনেকের নিকট আপাতদৃষ্টিতে অসংবদ্ধ ও দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়, তাহাকে তিনি সুসংবদ্ধ ও সুখবোধ্য করিয়া দিয়াছেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী আশুতোষ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ শ্রীরামপুবে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অনুশীলন সমিতিব প্রতিষ্ঠাতা, সদস্য ও ব্যারিষ্টার পি মিত্রের সহযোগিতায় গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন এবং শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মনীষিগণের সহিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ইনি ৩২ বৎসর আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষপদে ব্রতী ছিলেন। ইনি লাতিন ঐতিহাসিক প্লুট্রাকের প্রায় ৪০০০ পৃষ্ঠাব বঙ্গানুবাদ করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। এতদব্যতীত, শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয, শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউশন, করদাতা সমিতি প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। ৯ই ডিসেম্বর ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সেকালের সংবাদপত্রে শ্রীরামপুরের অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা লিখিত আছে। ৩০ চৈত্র ১২৬০ সালে **"সম্বাদ ভাস্করে"** "দশে মিলি করি কাজ" এই শিরোনামায় যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা বিবাহ" শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ বলিয়া আইন পাস হইবার পর শ্রীরামপুরের যে প্রথম বিধবা বিবাহ হয়, সেই সংবাদটি ২৯ চৈত্র ১২৭৯ সালের **"অমৃতবাজার পত্রিকা"** বাংলা সংস্করণ হইতে এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।

"দশে মিলি করি কায—"

শ্রীরামপুর আকনা বল্লভপুরের কতকগুলিন সূত্রধারি গণের আচরণ অবলোকন করিয়া অস্মদের হৃৎকম্প ভুজ স্তম্ভ হইয়াছে,...(এ) স্থানে এক ঘর কায়স্থ পিরালি ছিল তাহার জলস্পর্শ কিম্বা তৎসহ একাসনে ইতর জনেও উপবেশন করিত না...সেই দর্প আশ পাশ ফলারের গন্ডা চয়েক লুচি মোন্ডার পিরালিকে শুচি করিয়া খর্ব্ব করিয়া ফেলিল সুতরাং সে বড়াই যেন প্রবাদে বলে "মেগের কাছে পেকের বড়াই", এখন যে শ্রীরামপুর আকনা বল্লভপুর নিবাসি একশত ঘর ব্রাহ্মণ মুলোদি সিদ্ধ কায়স্থ প্রভৃতি...পিরালির গৃহে চব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় রূপে ফলার মারিলেন এরা কি পিরালি হইলেন ইঁহা দিগের সহিত কি অপরে আহার ব্যবহার করিতে পারে, না এঁদের সহিত কেহ আদান প্রদান করিতে পারিবে. যদি ইহা হয় তবে অপর সমস্ত ঐ দোষে দোষী তাহারই বা কেন না গৃহীতা হয়, যে সমস্ত ভূদেবেরা ফলারের লোভে জাতিকে ভূদে খাইয়াছেন তাঁহারা কহেন "দশে মিলি করি কায হারি জিতি নাহি লাজ।"—**'সম্বাদ ভাস্কর' (৩০ চৈত্র ১২৬০ সাল)**

বিধবা বিবাহ

গত ৬ই এপ্রেল, রবিবার বাবু হরিশচন্দ্র শর্ম্মার বিডন ষ্ট্রীট নং ৯৬ বাটীতে আর একটি হিন্দু মতে বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহটী আমাদের নিরতিশয় আনন্দ-বর্ধন করিয়াছে. এইরূপ সুদৃষ্টান্ত যতই অধিক হইবে, ততই আমাদের দেশের মঙ্গল। বর ও কন্যা উভয়ই সম্ভ্রান্ত বংশীয় বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ। বরের নাম ভুবনচন্দ্র আচার্য, নিবাস ফরিদপুরের অধীন রুকিণী নামক গ্রাম, বয়স ২২ বৎসর। ইনি মেডিক্যাল কলেজের ১ম বৎসরের শ্রেণীতে পড়েন। কন্যার নাম শ্রীমতী রামদাসী দেবী। ইনি শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী চাতরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নিমচাঁদ লাহিড়ী মহাশয়ের জেষ্ঠা পুত্রী, শ্রীরামপুরের গোস্বামী বংশের দৌহিত্রী, ইহার বয়স ১৩ বৎসর। এই বিবাহটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে। এরূপ বিবাহের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইবার আশা হইবে। —**অমৃতবাজার পত্রিকা (২৯ চৈত্র ১২৭৯)**

বহু সমাজকর্মী, সংস্কারক, রাজপরিবারের স্মৃতি আজও এই স্থানে উজ্জ্বল হইয়া আছে। বর্তমানে সে সব রাজপরিবার না থাকিলেও তাঁহাদের প্রাসাদোপম বিরাট ভবন এখনও তাঁহাদের সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোন কোন ভবনে সবকারী অফিস হইয়াছে। এই ভবনগুলিও দর্শনীয় বস্তু হিসাবে গণ্য। মিঃ হেনরি কটন, মিঃ জর্জ ভ্যালেন্টিয়া প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকগণ এবং ভোলানাথ চন্দ্র শ্রীরামপুরের এই ভবনগুলি যে শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছিল তাহা বিস্তারিতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন।

॥ চাতরা ॥

উত্তরে **চাতরা** ও দক্ষিণে **মাহেশ-বল্লভপুর** নামক স্থানগুলি শ্রীরামপুরের চৌহদ্দির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এই দুইটি জায়গা শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন। **চাতরা** একটি প্রাচীন স্থান, **শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মন্দিরের** জন্য এই স্থান বিখ্যাত। এই মন্দির কাশীশ্বর পণ্ডিতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের একজন পার্শ্ব-চর ছিলেন। এই মন্দিরের এক দিকে গৌরচন্দ্র ও অন্য দিকে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিমূর্তি বিদ্যমান। কাশীশ্বর পণ্ডিতের বংশ চৌধুরী বংশ বলিয়া খ্যাত। তাঁহার তিরোভাব উপলক্ষে এই স্থানে অদ্যাপি উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চাতরার শীতলা দেবীরও জাগ্রতা দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই স্থানে বৈশাখ মাসের প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে বহু ভক্ত সমাগম হইয়া থাকে। দেওয়ান ঘাট নামে এই স্থানে গঙ্গার প্রসিদ্ধ ঘাট আছে; রংপুরের দেওয়ান রামহরি চক্রবর্তী এই ঘাটটির প্রতিষ্ঠা করেন, ইহার সোপানাবলীর নির্মাণকৌশল চমৎকার। বহুকাল যাবৎ চাতরা বাণিজ্যপ্রধান স্থান বলিয়া বিখ্যাত এবং এই স্থানের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ও বহু প্রাচীন। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত ও ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার এই বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। দশম শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাস কৃত মনসা-মঙ্গলে চাতরার উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

চাতরার **শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির** হুগলী জেলার অন্যতম প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। বিরাট মন্দিরের দুই পাশে দুইটি শয়ন-ঘর। মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া দুইটি সিংহাসনে পাশাপাশি বিরাজিত আছেন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গেব বিগ্রহ একমাত্র নবদ্বীপ ব্যতীত আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। দুই পার্শ্বের দুইটি শয়ন-ঘর একটি শ্রীকৃষ্ণের ও অন্যটি শ্রীগৌরাঙ্গের শয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই মন্দিবে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শুভাগমন হইয়াছিল* এবং এই স্থানে তাঁহার আসিবার পূর্বেই তাঁহার লীলাসহচর কাশীশ্বব পণ্ডিতের দ্বারা মন্দির নির্মিত হইয়া-ছিল এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মূর্তিও শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে প্রত্যহ পূজিত হইতেছিল। মন্দিরে তাঁহার মূর্তি দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিশেষ ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের পাশে তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করায় তাঁহাকে অপরাধী করা হইয়াছে। সেইজন্য তিনি তাঁহার বিগ্রহ গঙ্গায় বিসর্জন দিবার নির্দেশ দেন। বলা বাহুল্য, মহাপ্রভুর নির্দেশানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গের পুরাতন বিগ্রহটি গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিগ্রহ সিংহাসনে একাই বহু বৎসর যাবৎ থাকেন। পরে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর কাশীশ্বর পণ্ডিতের পৌত্র পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দিরের মধ্যে একখানি পাথরে এই কথাগুলি লিখিত আছেঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

---

* গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরী যাত্রার সময় বৈদ্যবাটী নিমাইতীর্থের ঘাট হইতে চাতরার এই মন্দিরে আসিয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলা সহচর
শ্রীশ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত কর্তৃক
মন্দির স্থাপিত

১৩৪৮ সালে মন্দিরের পাথরের মেঝে "স্বর্গীয় গোপীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা স্বর্গীয়া যোগমায়া দেবীর স্মরণার্থে" নির্মিত হয় বলিয়া আর একখানি পাথরে লেখা আছে। মন্দিরের সম্মুখস্থ বিরাট প্রাঙ্গণের সামনে দুইটি প্রাচীন দোলমঞ্চ ভগ্ন হইলে উহা ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার জায়গায় আধুনিক ফ্যাশানের দুইটি নূতন দোলমঞ্চ সম্প্রতি নির্মিত হইয়াছে দেখা যায়। এই প্রাচীন মন্দির সম্বন্ধে **শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-তীর্থ** নামক গ্রন্থে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিত আছে ঃ

চাতরা—শ্রীরামপুর স্টেশন হইতে দেড় মাইল, শ্রীমন্দির চৌধুরীপাড়ায় অবস্থিত। শ্রীশ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের শ্রীপাঠ ও দেবালয়, ইহা শ্রীশঙ্করারণ্য পণ্ডিতেরও শ্রীপাট। শ্রীনিতাই-গৌর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, সূর্যদেব ও একটি কুণ্ড আছে। বারুণীর সময়ে ও দোলযাত্রায় এ স্থানে উৎসবাদি হইয়া থাকে।

এই গ্রন্থে অন্যত্র আরও লিখিত আছে ঃ হুগলী জেলার চাতরা গ্রামে মহাপ্রভুর সেবায়েত শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের বংশধর চৌধুরীগণ পূর্বে শ্রীমদনমোহনের সেবক ছিলেন। রাজা বীর-হাম্বীর তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীমদনমোহনকে প্রাপ্ত হয়েন। পরে বীর হাম্বীরেব অধস্তন কোন রাজার নিকট হইতে গোকুল মিত্র ঐ বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন।

চাতরায় যোগদা-সৎসঙ্গের একটি শাখা আছে। প্রত্যহ সৎসঙ্গের মন্দিরে পূজা পাঠ ও কীর্তনাদির অনুষ্ঠান হয়। শ্রীগুরুধাম বলিয়া মন্দিরের খ্যাতি। এই মন্দির শ্যামাচরণ লাহিড়ী, যুক্তেশ্বর গিরি ও মতিলাল ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া একটি পাথরে লেখা আছে। লাহিড়ী মহাশয় বহুদিনের অনভ্যস্ত যোগসাধনাকে পুনর্বার ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এবং ১৩২৫ সালে চাতরায় **"শ্রীগুরুধাম"** স্থাপিত হয়। মতিলাল ঠাকুরের সংসারাশ্রমের নাম মতিলাল মুখোপাধ্যায়। ১৩০৯ সালে তিনি শ্রীরামপুরের **"ভক্তাশ্রম"** স্থাপন করেন। তাঁহার 'শ্রীগুরুতত্ত্ব' এবং 'যুগ পরিবর্তন ও জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব' নামক দুইখানি পুস্তক আছে। শ্রীগুরুধামের অসংখ্য শাখা আছে। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে বলিয়া ইহাদের বাণীগুলি আমেরিকায় বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। ইহাদের বাণী ঃ বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে, মনে প্রাণে, জ্ঞান বিজ্ঞানে, কৃষিশিল্পে প্রত্যেক বিভাগেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন হইলে প্রকৃত শান্তি স্থাপন হইবে।

সংগীতচর্চায় চাতরার **'পাঁচালীগান'** বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত শ্রীকৃষ্ণলীলা-অবলম্বনে লিখিত ছড়া ও গান সেকালে অত্যন্ত আদরের সামগ্রী ছিল। অর্ধশতাব্দী পূর্বে কলিকাতায় জোড়াসাঁকোতে যে পাঁচালী গানের প্রতিযোগিতা হইত তাহাতে প্রায় প্রতিবারই চাতরার দল বিজয়ী হইত। চাতরার রামচন্দ্র দত্ত, শ্রীরামপুরের খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামদাস গোস্বামী, বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, হরিহর রায় উচ্চাঙ্গ

সংগীতচর্চা করিয়া গুণী সমাজে আদৃত হন। প্রসিদ্ধ খেয়ালী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের নামও হুগলী জেলার লোক বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি।

॥ বল্লভপুর ॥

মাহেশের নিকট **বল্লভপুর** শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের বিগ্রহের জন্য প্রসিদ্ধ এবং রাধাবল্লভের নামানুসারেই এই স্থানের নাম বল্লভপুর হইয়াছে। কথিত আছে যে, চাতরার রুদ্র পণ্ডিত দেববিগ্রহ নির্মাণের প্রত্যাদেশ লাভ করেন এবং সেই অনুযায়ী গৌড়ের রাজপ্রতিনিধির ভগ্ন প্রাসাদ হইতে আনিত প্রস্তর দ্বারা তৎকর্তৃক বল্লভজীউ ও রাধিকার যুগলমূর্তি গঠিত হয়। আবার কাহারও মতে খড়দহের বীরভদ্র গোস্বামী এই যুগলমূর্তি নির্মাণ করেন কিন্তু বিগ্রহ তাঁহার মনোমত না হওয়ায়, তিনি উক্ত বিগ্রহ স্থানীয় লোকেদের হস্তে দিয়া দেন। কাল কষ্টিপাথরে নির্মিত যুগলমূর্তি এবং বল্লভজীউর বিরাট মন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। আবার এরূপও শোনা যায় যে, প্রস্তরখানি গঙ্গার উপর দিয়া ভাসিয়া বল্লভপুরের ঘাটে আসিয়া উঠে এবং বিগ্রহও নাকি ঘাটের ধারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে পূর্বোক্ত নিমাইচরণ মল্লিকের পিতা নয়নচাঁদ মল্লিক বর্তমান সুন্দর মন্দিরটি নির্মাণ করিয়া গঙ্গার ধার হইতে বল্লভজীউ ও রাধিকার যুগলমূর্তি স্থানান্তরিত করেন। মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট, দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট এবং প্রস্থ ৪০ ফুট; মন্দিরের প্রবেশপথ দক্ষিণ মুখে এবং ইহার সম্মুখে একটি সুবৃহৎ নাটমন্দির আছে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর রাধাবল্লভজীউর একজন ভক্ত ছিলেন এবং দেবসেবাদির জন্য তিনিও বহু অর্থ ব্যয় করেন। মন্দিরগাত্রে দাতা ও শিল্পীর নাম এবং মন্দির নির্মাণের সময় নিম্নোক্তভাবে উৎকীর্ণ আছেঃ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণার্থ | শুভমস্তু শকাব্দ ১৬৮৬ | দাতা—নয়ন মল্লিক | শিল্পকার—শ্রীকৃষ্ণ দাস |

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে গঙ্গার ধারে বল্লভজীউর মন্দির ছিল; উক্ত মন্দির ভগ্ন হওয়ায় ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে নয়নচাঁদ মল্লিক বর্তমান মন্দিরটি করিয়া দেন। মন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থে বাৎসরিক ৮৩৬৲ আয়ের ব্যবস্থা আছে, এতদ্ভিন্ন নিমাইচরণ মল্লিকও নিত্য সেবার জন্য ৩৬৲ আয়ের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, নয়নচাঁদ বল্লভজীও রাধিকার যুগল মূর্তি নির্মাণ করেন লিখিয়াছেন কিন্তু মূর্তি বহু প্রাচীন কাল হইতেই ছিল, (প্রায় পাঁচশত বৎসর) নয়নচাঁদ কেবল বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়া দেন।

রাধাবল্লভের পুরাতন মন্দিরের নিকট ১২২৯ সালে শ্রীমতী টুনুমনী দাসী দ্বাদশ মন্দির ও গঙ্গারঘাট নির্মাণ করিয়া দেন॥ এই সম্বন্ধে ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণের' নিম্নোক্ত সংবাদ উল্লিখিত হইলঃ

মোকাম বল্লভপুরে রাধাবল্লভ ঠাকুরের পুরাতন মন্দিরের নিকট পুরাতন এক ঘাট ছিল। সে ঘাট ভগ্ন হইয়াছে। তাহাতে কলিকাতার গৌর শেঠের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী টুনুমনী সেই ভগ্ন ঘাটের নিকট দক্ষিণে অতি উত্তম এক ঘাট বাঁধিয়াছেন। সে ঘাট দীর্ঘে ও প্রস্থে বড় এবং শক্ত ও সুদৃশ্য হইয়াছে এবং সেই ঘাটে উপযুক্তমত দ্বাদশ মন্দির হইয়াছে।

"রাধাবল্লভের মন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থ দুই দফার ৮৩৬৲ পাওয়া যায়, এতদ্ভিন্ন নিমাইচরণ বিগ্রহের নিত্য সেবার জন্য ৩৬৲ আয়ের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।"

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা "হুগলী জেলার বল্লভপুরে নয়ানচাঁদ 'বল্লভজী ও রাধিকা'র যুগল-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন" বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিগ্রহ বহু প্রাচীনকাল হইতেই ছিল; নয়নচাঁদ কেবল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

বল্লভপুরের মন্দির সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উল্লেখ্য:

"Vallabhpur—Temple of Radhavallabha—The temple of Radhavallabha is situated in the village of Vallabhpur, about a mile and a half from Serampore Station, in the sub-division of Serampore.

There is a tradition that Virbhadra Goswami of Khardah brought a piece of stone from the Nawab of Gaur. Out of this stone, the first image that was hewn was not to his liking, he made it over to the people of Vallabhpur. According to this tradition. Radhavallbha must be more than 350 years old. But its present temple is comparatively of very recent date. Some say that it is only some 70 or 80 years old. The ruins of the old temple on the side of the river Hooghly are visible even at the present day. Of the festivals performed in honour of this deity, Snanjatra and the Car festival are very famous. Formerly on the occasions of these festivals, the idol of Jagannath of Mahesh used to come here but owing to dispute, that practice has been discontinued a new Jagannath made by the order of late Siva Krishna Datta is exhibited at time of its own to meet its expenses. The temple of Radhavallabha is of an ordinary character, having only one steeple in it."

শ্রীরামপুর রেলওয়ে স্টেশনের অনতিদূরে গোরস্থানে ডাক্তার উইলিয়াম কেরী, জন মার্শম্যান ও জন ওয়ার্ড এই তিনজন লোকহিতৈষী মহাত্মার সমাধি বিদ্যমান। এই স্থানে শ্রীরামপুরের সেণ্ট ওলাফ গির্জায় একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরফলকেও উঁহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে:

"In addition to their many other labours in the cause of religion and humanity from the opening of the church in 1805 to the end of their lives gave their faithful and gratuitous ministrations to the congregation here assembled."

কেরী সাহেবের সমাধিস্তম্ভে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে:

William Carey
Born 17th August 1761, died 9th June 1834
"A wretched poor and helpless worm
on thy kind arms I fall."

উক্ত সমাধিক্ষেত্রে আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাধি আছে। তিনি হইতেছেন দিনেমার গবর্নমেণ্টের বিচারক এবং তৎকালীন শ্রীরামপুরের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি জে এস হলেনবার্গ। তিনি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোপেনহেগেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার সমাধি-গাত্রে এই কথা লিখিত আছে:

"Chief of Dainsh Majesty's Settlement of Fredericknagore. It was erected by a number of European and Native inhabitants in

commemoration of his singular worth both public and private...... He was distinguished for every virtue which belongs to a good Magistrate."

॥ দিনেমারদের বিচার পদ্ধতি ॥

শ্রীরামপুরে দিনেমারগণের বিচারপদ্ধতি একটু অদ্ভুত রকমের ছিল; বিচারপতিকে মুখে গিয়া বলিলেই দিনেমার জজ বিচার করিতেন এবং বিচারের সময় বাদী বা প্রতিবাদীর জবানবন্দী লওয়া হইত না বা কোন কোর্ট-ফীর প্রয়োজন হইত না। বিচারপতি উভয়-পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। এই সম্বন্ধে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দিনেমার-জজের বিচার সম্বন্ধে একটি গল্প "বঙ্গীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে" হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

কোন সময়ে শ্রীরামপুরের গোস্বামী মহাশয়দিগের সহিত একটি লোকের বিবাদ হইয়াছিল; সেই লোকটি বিচারকের নিকট গিয়া নালিশ করিলেন এবং নালিশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিচারককে বিলক্ষণ উপহার সামগ্রীও দিলেন। তৎকালে তাহার গাত্রে একখানি লাল রঙের শাল ছিল। জজ-সাহেব উপহার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন 'মিন্তে তুমি ঘরে জেতে কর।' গোস্বামী মহাশয় এই সন্ধান পাইয়া জজসাহেবকে অধিকতর উপহার সামগ্রী দেওয়ায় তিনি কহিলেন 'বাবা তোর ডব নাই, তোর ডিক্রী তোর লাকে (Luck) ঝুলিতেছে।' পরদিন বাদী গঙ্গাজলী সাদা শাল এবং প্রতিবাদী লাল শাল গায়ে দিয়া জজ-সাহেবের নিকটে গিয়া হাজির হইল।

জজ-সাহেব দেখিলেন বাদীর গায়ে সাদা শাল ও প্রতিবাদীব গায়ে লাল শাল; বিশেষতঃ প্রতিবাদী (গোস্বামী মহাশয়) তাহাকে অধিকতর উপহার-সামগ্রী দিয়াছেন। ইহা চিন্তা করিয়া তিনি মাটির দিকে চাহিয়া রায় দিলেন যে. 'রাঙা শাল ডিক্রী।' তখন বাদী জজ-সাহেবের নিকট গিয়া দুঃখ জানাইয়া কহিলেন, 'হুজুর কি হইল?' তাহাতে হাকিম কহিলেন, 'বাবা আমি কি করিতে পারি; তুমি পূর্ব দিন লাল শাল গায়ে দিয়া আসিয়াছিলে, তাহাতে তোমাকে বাদী মনে করিয়া লাল শাল ডিক্রী দিয়াছি। এখন হাকিম লড়ে ত হুকুম লড়ে না—আমি কি করিব, তুমি নিজের দোষে লজ্জা পাইলা।

শ্রীরামপুরের গোস্বামী-বংশ, সাহা-বংশ ও দে-বংশ বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ। গোস্বামী-বংশের আদি নিবাস পাটুলি গ্রাম, সেওড়াফুলি রাজার নিকট হইতে জমি লাভ করিয়া তাঁহারা এই স্থানে বসবাস করেন এবং বিষ্ণুপুরের রাজার অনুগ্রহে শ্রীশ্রীরাধা-মোহন, গোপালজীউ ও শ্রীরাধিকা এই তিন দেববিগ্রহের সেবাতে নিযুক্ত হইয়া বহু নিষ্কর দেবোত্তর জমি প্রাপ্ত হন; ইঁহাদের কৌলিক উপাধি চক্রবর্তী। এই বংশে রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে তুলসীচন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক "রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী মেমোরিয়াল হল" নির্মিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত ভবনে মিউনিসিপ্যালিটির আপিস ও শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী অবস্থিত। শ্রীরামপুরের সাহাবংশও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও দানধ্যানের জন্য বিখ্যাত; এই বংশের ক্ষেত্রমোহন সাহা শিবরাত্রি উপলক্ষে মেলার অনুষ্ঠান ও অনাথদিগের সেবার জন্য ট্রাস্ট করিয়া বহু

অর্থ দান করিয়া যান। **শ্রীরামপুরের দে-বংশও সঙ্গতিপন্ন** এবং ধার্মিক বলিয়া **প্রসিদ্ধ।** **শ্রীরামপুরের** যাবতীয় জনহিতকর কার্যে ইঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা তিলি বংশোদ্ভব। এই **বংশের রামচন্দ্র** দে ১২৩০ সলের আষাঢ় মাসে পরলোকগমন **করিলে** তাঁহার সাধ্বী **স্ত্রী** স্বামীর সহিত অনুমৃতা হন। ইহাই সম্ভবতঃ **শ্রীরামপুরের শেষ** সহমরণ। আর একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির নামোল্লেখ না করিলে শ্রীরামপুরের **কাহিনী** অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে, তিনি হইতেছেন স্বর্গীয় মাণিকলাল দত্ত; ১৩৩৪ সালে তিনি **পরলোকগমন** করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকার যাবতীয় **স্থাবর** ও অস্থাবর **সম্পত্তি** দেবসেবায় ও শ্রীরামপুরের বহু জনহিতকর কার্যের জন্য দান করেন।

কিশোরীলাল পরমভাগবত গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীর তৃতীয় পুত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন **পরে বঙ্গীয়** সরকারের মন্ত্রনা সভার সদস্য হন। তাঁহার বিচক্ষণতা ও দানশীলতার জন্য **সরকার** তাঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি তৎকালে একত্রে ভারত **সম্রাটের সহিত** ভোজন করিয়াছিলেন। তৎকালীন সরকার তাঁহাকে বিশেষ **শ্রদ্ধার চক্ষে** দেখিতেন।

বাঙ্গলার বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্লামেণ্টারিয়ান **তুলসীচন্দ্র গোস্বামী** রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর পুত্র। তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অক্সফোর্ডে যান এবং তথা হইতে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশবন্ধু গঠিত সরাজ্য দলে যোগদান করিয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩০ পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও বিরোধী দলের চিফ হুইপ ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য তিনি ভারতে সুনাম অর্জন করেন। তিনি যে সব বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন তাহা পার্লামেণ্টারী ইতিহাসে **অক্ষয় হইয়া** আছে। রাজনীতিতে তাঁহার সুগভীর জ্ঞান তাঁহার প্রগাঢ় দেশপ্রেম তাঁহাকে **সুধীসমাজে** বরণীয় করিয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়া ব্যবস্থা **পরিষদের** তৎকালীন স্পীকার স্যার ফ্রেডারিক হোয়াইটস মুগ্ধ ও বিস্মিত হন। ১৯২৭ **হইতে** ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। **দেশবন্ধুর** "ফরওয়ার্ড পত্রের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং অমায়িক, সদালাপী ও **মার্জিত** রুচিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন তাঁহার **মৃত্যু হয়।**

এই রাজ-বংশে বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। পরে আলিপুরের **প্রসিদ্ধ** বোমার মামলায় তিনি রাজসাক্ষী হওয়ায় বহু নির্দোষী ব্যক্তির ধৃত হইবার **সম্ভাবনা হয়।** তাহার এই দেশদ্রোহীতার জন্য জেলের মধ্যে মৃত্যুজয়ী বীর কানাইলাল **দত্ত** ও **সত্যেন্দ্রনাথ** বসু তাহাকে রিভলবারের গুলীতে হত্যা করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে **এই ঘটনায়** বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলন হয়। নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ **সুধীর-কুমার** মিত্র রচিত "মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে।

কানাইলালের **স্মৃতি রক্ষার্থে চন্দননগরে** তাঁহার একটি আবক্ষ **মর্মর মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে** এবং তিনি যে বিদ্যালয়ে পড়িতেন, **তাহার নামও কানাইলাল বিদ্যামন্দির হইয়াছে।**

॥ গোপীনাথ সাহা ॥

চৌরঙ্গীতে হুলুস্থুল শিরোনামায় ১৩ই জানুয়ারী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের আনন্দবাজার পত্রিকায় গোপীনাথ সম্পর্কে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়ঃ

গতকল্য সকাল বেলা পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী রোডের মোড়ে একজন বাঙ্গালী যুবক জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও তিনজন মোটর-চালককে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে। যুবকটির নাম এখনও জানা যায় নাই। যুবকটিকে গ্রেপ্তার করিয়াই পুলিশ তাহার পকেট খানাতল্লাস করিয়া একটি পিস্তল ও কিছু অব্যবহৃত টোটা বাহির করে।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, মিঃ ডে লোয়ার সার্কুলার রোডে থাকেন এবং প্রাতঃ-ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়া মেসার্স হল অ্যান্ড অ্যান্ডর্সনের দোকানের নিকট আসিলে তাঁহাকে গুলী করা হয়। তাঁহাকে আলীপুরে প্রেসিডেন্সী হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। দুইজন মোটরচালক সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে। হাসপাতালে তাহাদের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে এবং মিঃ ডে'র মৃত্যু হইয়াছে।

শ্রীরামপুরের বিজয়কৃষ্ণ সাহার পুত্র গোপীনাথ সাহা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে, তৎকালীন কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট ভ্রমে, মিঃ ডে নামক জনৈক সাহেবকে হত্যা করেন বলিয়া গোপীনাথের প্রাণদন্ড হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে বাঙ্গলাদেশে শাসননীতির নিষ্ঠুর পীড়নে বহু ব্যক্তি কারাবাস করেন। ইহাদের বিনা বিচারে কারাবাস লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে একদফা বাক্‌যুদ্ধ হয় এবং দেবন্ধু জয়ী হন। পরে সিরাজগঞ্জে জাতীয় সম্মেলনে দেশবন্ধু গোপীনাথের দেশপ্রেমের উল্লেখ করিয়া একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার জবানবন্দির সংক্ষিপ্ত মর্মঃ—"আজ বড় শুভদিন। মা তাঁহার বক্ষে চিরদিনের তরে বিশ্রাম লাভের জন্য আমাকে ডাকিতেছেন, তাই আমি যাইতে চাই। মায়ের কাজে জীবন উৎসর্গ মানসেই আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বাঙ্গালার বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। আমি গত বৎসর সংবাদপত্র পড়িয়া জানিতে পারি, মিঃ টেগার্ট নামক জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রভূত অভিনব জ্ঞান অর্জন করিয়া আমাদের প্রচেষ্টার বাধা দিবার জন্যই ভারতে ফিরিয়া আসিতেছেন। সেই সময় হইতেই আমাদের স্বাধীনতা ও তাহার প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা আমাকে উত্তেজিত করে; এই চিন্তার মাঝে মাঝে আমার মাথা এরূপ গরম হইয়া থাকিত যে, আমার আহার নিদ্রা পর্যন্ত বন্ধ হইবার উপক্রম হইত। রাত্রিতে আমি ছাদের উপর পাইচারি করিতাম, ঘুম আসিত না। আমার যখন এই অবস্থা তখন আমি মায়ের ডাক শুনিতে পাই; আদেশ হইল, "উহাকে অনুসরণ কর, ছাড়িস্ না।"

সেই সময় হইতে আমি টেগার্ট সাহেবের সম্বন্ধে যথাসাধ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গেলাম। ক্রমে জানিতে পারিলাম, তিনি বাংলার স্বদেশীযুগে কলিকাতায় পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। সেই সময় তিনি যে ভীষণ অত্যাচার ও নির্যাতন চালাইয়া ছিলেন, তাহা হইতে কি দেশ-সেবক কি নিরপরাধ কাহারও নিস্তার ছিল না। বহুলোক বিনা বিচারে অন্তরীণে প্রেরিত হইয়াছিল, এমন কি রাজনীতির সহিত ঘুণাক্ষরেও সম্বন্ধ

ছিল না, এমন লোকেরও নির্বাসনের ব্যবস্থা স্বয়ং টেগার্ট করিয়াছিলেন। অতঃপর আরও অনুসন্ধানের পর জানিতে পারি যে, টেগার্ট—যিনি বালেশ্বরে পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে যে স্মরণীয় সংঘর্ষ হয়, তাহাতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অতএব আমার শ্রদ্ধাস্পদ, পূজনীয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিতও তাঁহার একটি বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাইলাম। আরও জানিতে পারিলাম, টেগার্ট একজন সিনফিন আয়র্লণ্ড নিবাসী। তিনি স্বদেশ-বাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামেও বাধা দিতে ত্রুটি করেন নাই, যদিও তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

এই সমস্ত প্রায়ই যখন গভীরভাবে চিন্তা করিতাম তখন যেন মায়ের ডাক শুনিতাম, —মা যেন বলিতেছেন, "লোকটাকে জগৎ থেকে সরিয়ে দে।" টেগার্টকে আমার প্রথম দেখা লালবাজারে পুলিশদিগকে রাজকীয় পুলিশ মেডেল বিতরণ অবস্থায়। তারপর নিউ মার্কেটে ফুলের স্টলের নিকট বহুবার দেখি। অনেকবার আমি আগ্নেয় অস্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া ইডেন ও অন্যান্য অনেক স্থান পর্যন্ত উহার অনুসরণ করি, বহুবার লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়িতেও উদ্যত হইয়াছি, কিন্তু মায়ের নিকট হইতে শেষ আদেশ না পাওয়ায়, এই কার্য হইতে বিরত হইতে বাধ্য হই। আমি প্রায়ই চিন্তা করিতাম, লোকটাকে খুন করিব কি না। গ্রেপ্তার হইবার দুই-তিন দিন পূর্বে আমার আবার পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসিল। মাথা আবার গরম হইয়া উঠিতে লাগিল—না পারি নিদ্রা যাইতে, না থাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা। মাত্র ঐ এক চিন্তা। কিছুতেই যেন স্বস্তি পাই না। মনে হয় আমার ঘরের মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে, দৌড়াইয়া ছাদের উপর যাই, ও বহুক্ষণ পায়চারী করি। আমি যেদিন ধৃত হই, সেইদিন অতি প্রত্যূষে গৃহত্যাগ করিয়া অন্যমনস্কভাবে ময়দানে আসিয়া পড়ি। মনে হইল এই মিঃ টেগার্ট এবং তখনই গুলী চালাই। কতবার গুলী ছুঁড়িয়াছিলাম ঠিক স্মরণ নাই, কিন্তু বহুবার যে ছুঁড়িয়াছি, তাহা আমার বেশ মনে আছে। বড় আশঙ্কা ছিল, পাছে লোকটি আবার বাঁচিয়া উঠে। গুলী করিবার পূর্বে বা পরে আমি বাঁচিব কি মরিব, এ চিন্তা আমার আদৌ আসে নাই। তারপর ডাকাত, ডাকাত, হত্যা, হত্যা, পাকড়ো পাকড়ো ইত্যাদি বলিয়া যখন জনস্রোত চিৎকার করিয়া উঠিল, তখন আমি দৌড় দিতে আরম্ভ করি। মনে হইতে লাগিল, যেন রাস্তাগুলি আমার চারিদিকে ঝুলিতেছে। লোক-জনের চিৎকারে ক্রমেই আমি যেন অতিষ্ঠ হইয়া পড়ি, আমার জিহ্বা শুকাইয়া যায়, আর দৌড়ান অসম্ভব হইয়া পড়ে। এমন সময় একখানি টমটম দেখিতে পাইয়া টমটমওয়ালাকে দ্রুতবেগে চালাইতে অনুরোধ করি, চিৎকার করিয়া বলি "হাঁকাও, আমি দেশের কাজ করিয়াছি, বেশ ভাল কাজ করিয়াছি; ইহাতে আমার কিছুমাত্র অন্যায় হয় নাই।" আমি টমটমের পাদানিতে দাঁড়াইয়া গাড়োয়ানের সহিত কথা বলিতেছি, এমন সময় জনতা আসিয়া আমাকে গ্রাস করে। আমি ধৃত হইলাম। অতঃপর এই সমস্ত ব্যাপারে যাহা হয় তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না—বেশ উত্তমমধ্যম খাইলাম। তাহাতেই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। তারপর যখন চৈতন্য ফিরিয়া পাইলাম—তখন আমি থানায়।

থানা এবং মেডিকেল কলেজের সমস্ত বৃত্তান্ত শেষ করিয়া গোপীনাথ বলে, "ইহার পর আমাকে লালবাজার পুলিশ কমিশনারের কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। আমার তখনও

ধারণা, পুলিশ কমিশনার আর ইহলোকে নাই। কিন্তু তাঁহাকে যখন আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলাম, হতভম্ব হইলাম, কি করিতে কি করিয়াছি ভাবিয়া আকুল হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ভুল করিয়াছ নয় কি?" আমি জবাব দিলাম, "কি করিয়া এটি সম্ভব হইতে পারে, আমার এখনও মনে হয় যে, আমি সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল গুলী ছুঁড়ি সে গুলী একটি প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া মিঃ টেগার্টের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। আমার নাম জিজ্ঞাসা করাতে আমি কিছুই জবাব দিলাম না। ইহার পরে ইলিসিয়াম রোডে কলিকাতা পুলিসের প্রধান আড্ডাতে নীত হইলাম, সেখানে একটি রথযাত্রা উৎসবে বহু সাহেব ও বাঙ্গালী পুলিশ কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। আমি ভুপেন চট্টোপাধ্যায়কে বলিলাম যে, "এখন আমাকে বিরক্ত করিবেন না, আমার শরীর তত সুস্থ নয়। যাহা বক্তব্য তাহা কাল ১২টা কি ১২॥টার সময় বলিব। এখন বিরক্ত করলে কিছুই ফল পাবেন না।"

সেদিন রাত্রি আট ঘটিকার সময় স্বয়ং টেগার্ট সাহেব আসিয়া হাজির। এবারও ঐ প্রশ্ন—"কেমন ভুল করিয়াছ কিনা?" তখন ভাবিলাম। "কথা না বলিয়া আর লাভ কি!" বলিলাম, "হাঁ, আপনাকে হত্যা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ভগবানের অশেষ করুণায় আপনি এ যাত্রায় রক্ষা পাইলেন।" পরদিন বেলা বারটা বা একটার সময় গোয়েন্দা পুলিশের আড্ডায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে আমি ভূপেন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বর্ণনা করিবার পূর্বে বলিলাম, "দেখুন বর্ণনা করিবার পূর্বে আপনাকে একটি প্রতিশ্রুতি দান করিতে হইবে—আমার বক্তব্য বলিবার পর, কেহ যেন আসিয়া এবং প্রশ্ন করিয়া বিব্রত না করে।" আমি বলিলাম, "নাম গোপীনাথ সাহা, বাড়ী শ্রীরামপুর ক্ষেত্রমোহন স্ট্রীটে, যে রাস্তার ভূতপূর্ব নাম ছিল অক্সফোর্ড স্ট্রীট, আমার পিতার নাম স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ সাহা।" পরদিন পুনরায় টেগার্টের নিকট আসি। সেখান হইতে আমাকে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট পুলিশ আদালতে ও পরে প্রেসিডেন্সি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

আমার সম্বন্ধে বক্তব্য ইতি। জনৈক নির্দোষ সাহেবকে যে খুন করিয়াছি, সেজন্য যার পর নাই মর্মাহত, সাহেব হইলেই যে আমার শত্রু হইবে তাহা আমি মনে করি না। যাহারা এই ব্যাপারে আহত তাহাদের জন্যও আমি বিশেষ দুঃখিত। কোন কাজ করিবার সময় দেশীয় হোক আর বিদেশীই হোক যেই বাধা দিতে আসে, সেই শত্রুর চেয়ে বেশী। মৃত সাহেবের আত্মার মুক্তির জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি। এখন আমার ইহার অতিরিক্ত বলিবার কিছুই নাই তবে বিচার শেষ হইয়া গেলে, দণ্ডাঘাত পাতিয়া লইবার পূর্বে আমি দেশবাসীকে সামান্য কিছু বলিবার ইচ্ছা করি। আশা করি, প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে। ইহার জন্য অধিক সময়েরও প্রয়োজন বোধ করি না, পাঁচ মিনিটেই যথেষ্ট। আমি জেল হইতে মায়ের নিকট একখানা চিঠি লিখিতে চাই। আশা করি, এই অনুমতি আমাকে দেওয়া হইবে।

আমি দেশমাতৃক্রোড়ে আশ্রয় ভিক্ষা করি, এই কথা স্মরণ রাখিয়া দণ্ডের বিধান দিলে ভাল হয়, "আমি কিছুতেই জেলে থাকিতে পারিব না। আমি মায়ের নিকট যাইতে চাই।"

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের আনন্দবাজার পত্রিকায় গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল তাহা উল্লেখ্য ঃ

হাইকোর্ট সেসনে বিচারপতি মিঃ পিয়ার্সনের এজলাসে চৌরঙ্গী হত্যাকাণ্ডের অপরাধে অভিযুক্ত আসামী গোপীনাথ সাহার বিচার সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। জুরীরা সর্বসম্মতিক্রমে আসামীকে অপরাধী নির্ধারিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে সাতজন স্থির করিয়াছেন যে আসামী সজ্ঞানে এই কাজ করিয়াছে। বিচারপতি মিঃ পিয়ার্সন জুরীদের মত গ্রহণ করিয়া আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইউরোপীয়।

জজ জুরীদিগকে চার্জ বুঝাইয়া দিতে যাইয়া বলেন, আসামীর বিরুদ্ধে মিঃ ডে'কে হত্যা করার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। এখন জুরীদের কর্তব্য হইতেছে এই যে, তাঁহারা সমস্ত সাক্ষ্য বিবেচনা করিয়া অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে কিনা বিবেচনা করিবেন।

বিচারকের কথা শেষ হইতে না হইতেই আসামী বাঙ্গলায় বলিয়া উঠিল যে, যে পর্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগ, চাঁদপুর ইত্যাদি স্থানের মত অত্যাচার চলিবে সে পর্যন্ত এইরূপই হইবে। এমন একদিন আসিবে, যেদিন গবর্নমেণ্ট ইহার ফল ভোগ করিবেন। জুরীরা তখন তাঁহাদের কামরায় প্রস্থান করেন। প্রায় ৪০ মিনিট পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের মত ব্যক্ত করেন। নয়জন জুরীর সকলেই আসামীকে মিঃ ডে'র হত্যাপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করেন: কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সাতজন স্থির করেন যে, আসামী যখন এই কাজ করে, তখন তাহার কাজের গুরুত্ব বুঝিতে সে অক্ষম ছিল না।

বিচারক জুরীদের মত গ্রহণ করিয়া আসামীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। আসামী শান্তভাবে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করে। তাহাকে যখন কাঠগড়া হইতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে—"আমার প্রত্যেক রক্তবিন্দু যেন ভারতের গৃহে গৃহে স্বাধীনতার বীজ বপন করে।"

আকাশবাণী কলিকাতাকেন্দ্রের প্রথম বাঙ্গালী মহিলা ঘোষিকা ইন্দিরা দেবী, বনফুল সাহিত্য সমিতির পরিচালক ও অহল্যা, বিচিত্রকথা প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক অমিয়কুমার গাঙ্গুলী, প্রবীন শিক্ষাবিদ পণ্ডিত বগলাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, চুনীপান্নার কান্না, তিমিরাভিসার, পৌত্তলিক প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের লেখক অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্মী ও জনসেবক পত্রের বার্তা সম্পাদক শান্তি মিত্র, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ হরলাল দত্ত ও তাঁহার পুত্র ডাঃ শ্রীশচন্দ্র দত্ত সুচিকিৎসা ও জনসেবা করিয়া শ্রীরামপুরে খ্যাতি অর্জন করেন। শ্রীশবাবুর পুত্র প্রসিদ্ধ কংগ্রেস সেবক ও "বসুধারা" মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রীসুকুমার দত্ত শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং 'নবজীবন' বার্ষিকী প্রকাশ করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। জনহিতকর সাংগঠনিক কার্যের প্রতি তাঁহার উৎসাহ আছে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডেভালপমেণ্ট কর্পোরেশনের তিনি পরিচালক।

॥ মাহেশ ॥

হুগলী জেলার মধ্যে **মাহেশ** একটি প্রাচীন স্থান; বিশেষ করিয়া এই স্থানের জগন্নাথ-দেবের রথের খ্যাতি দূর-দূরান্তরে প্রচারিত। কোন্ সুদূর অতীতকাল হইতে যে, এই রথযাত্রা উৎসব মহাসমারোহের সহিত হইতেছে, বর্তমানে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, প্রাচীনকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীক্ষেত্র হইতে গঙ্গাস্থান করিতে আসিয়া এইস্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া, মাহেশে মন্দিব নির্মাণ এবং দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত ঘটনার স্মরণার্থে সেইজন্য অদ্যাবধি জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রা উৎসব মহা ধূমধামের সহিত প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব, তাঁহার গ্রন্থে, মাহেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া লিখিয়াছেন। এই সম্বন্ধে জনশ্রুতি যে, ধ্রুবানন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী গঙ্গাতীরে বালুকার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি প্রাপ্ত হন এবং তিনিই উক্ত মূর্তিগুলি জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ পাইয়া মাহেশে প্রতিষ্ঠা করেন। হুগলী কালেক্টরী হইতে গৃহীত একখানি দেবোত্তর সম্পত্তির তায়দাদের নকলে সেওড়াফুলি রাজবংশের ষাট দফায় দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বিবরণী মধ্যে জগন্নাথপুর নামক পল্লী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার জন্য দান করা হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। সেওড়াফুলি রাজবংশের রাজা মনোহর রায়, মাহেশে জগন্নাথদেবের মন্দির প্রথম নির্মাণ করিয়া দেন বলিয়া স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (৩য় খণ্ড) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিযাছেন।

জগন্নাথদেবের মন্দির সম্বন্ধে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সরকারী গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ

> *Mahesh—Temple of Jagannath—It is said that the Jagannath of Mahesh is about the same date with the Radhaballabh of Vallabhpur, i.e. more than 350 years old. The idol Jagannath. along with Subhadra and Valarama is made of neem wood. It has a little zamindary to meet its expenses. On the occasion of Snanjatra and Car festivals, much numbers of people gather here. On the Sunday intervening between the Rathjatra and the Ultarath, this place is crowded annually by the Babus of Calcutta. This occasion is ordinarily called the Dvadasa Gopal Festival of Mahesh.*

শত বৎসরের পূর্বেও স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রা উপলক্ষে এই স্থানে তিন লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল বলিয়া ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখের 'সমাচার সর্পণে' দেখিতে পাওয়া যায়। পুরীর পর রথযাত্রা উপলক্ষে এইরূপ জনসমাগম ভারতবর্ষে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। ১২২৫ সালে রথযাত্রা উপলক্ষে রথের চাকা রাস্তায় বসিয়া যাওয়ায় রথ আর যাইতে পারে নাই; এই সম্বন্ধে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ

২২ রবিবার রথযাত্রা হইল তাহাতে মাহেশের রথ অতি বড এত বড় রথ এতদ্দেশে নাই লোক যাত্রাও অতি বড় হয় এইরূপ প্রতি বৎসর রথ চলিতেছে কিন্তু এ বৎসর রথ

চলন স্থানে নূতন রাস্তা হওনে অধিক মৃত্তিকা উঠিয়াছে এবং অতিশয় বৃষ্টি প্রযুক্ত কর্দম হইয়াছে তাহাতে রথ কতক দূর আসিয়া রথের চক্র কর্দমে মগ্ন হইল কোন প্রকারেও লোকেরা উঠাইতে পারিল না শেষে লোকযাত্রা ভঙ্গ হইল ইহাতে রথ চলিল না। তাহাতে লোকেরা আপন বুদ্ধি মত নানা প্রকার কহিতে লাগিল—কেহ কেহ ঠাকুরের প্রতিবর্ষ সোনার হাত আসিত এ বৎসর রূপার হাত আসিয়াছে। আর কেহ কহিল যে উড়িষ্যাতে রথ চলে নাই অতএব এখানেও চলিল না। রথ না চলাতে অনেকের অনেক ক্ষতি হইল।

বহুদিন অবধি জগন্নাথদেব মাহেশ হইতে রথে করিয়া বল্লভপুরে যাইয়া নয়দিন যাবৎ রাধাবল্লভের মন্দিরে থাকিতেন; যে স্থানে থাকিতেন তাহার নাম গুঞ্জবাড়ী। কিন্তু কোন কারণে জগন্নাথদেবের সেবায়েতগণের সহিত বল্লভজীউর সেবায়েতগণের ঝগড়া হয় এবং পূর্ব প্রথানুযায়ী জগন্নাথের বল্লভজীউর মন্দিরে থাকা বন্ধ হয়।

স্বর্গীয় শিবকৃষ্ণ দত্ত বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আর একটি জগন্নাথ তৈয়ারী করিয়া দেন এবং উক্ত মূর্তি সেবধি রথযাত্রার হইতে উল্টারথ পর্যন্ত রাধাবল্লভের মন্দিরে প্রদর্শিত হয়।

॥ জগন্নাথদেবের মন্দির ॥

মাহেশে **জগন্নাথদেবের মন্দির** প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। কলিকাতার বড়-বাজারের মল্লিক-বংশোদ্ভব নিমাইচরণ মল্লিক (ইহাদের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামে ছিল) পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের অনুকরণে ১২৬৫ সালে সত্তর ফুট উচ্চ এই সুন্দর মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়া দেন। নিমাইচরণ মল্লিক প্রভৃত বিত্তশালী, দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি চল্লিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন এবং উইল করিয়া বত্রিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে ও দেবসেবায় ব্যয় করিবার জন্য নির্দেশ দিয়া যান।

রথযাত্রা ॥ শাস্ত্রে আছে, রথস্থ বামনদেবকে দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না অর্থাৎ মোক্ষ হয়। রথ দেহেরই প্রতিরূপ। উপনিষৎ দেহকেই রথরূপে কল্পনা করিয়াছেন। বামন শব্দের অর্থ পরমাত্মা। যাঁহারা সেই পরমাত্মাকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা সম্মৎসরে একদিনের জন্যও সেইরূপ দর্শনের চেষ্টা করিবেন। আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া সেই নির্দ্দিষ্ট দিন। এই তিথিতে জগন্নাথ মূর্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। এই তিথিরও এমন একটি অপূর্ব মহিমা আছে যে, পরমাত্মা সাক্ষাৎকার বিষয়ে উহা বিশেষ অনুকূল।

পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনিই সমুদ্রতটে শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহরূপে বিরাজিত। সৎস্বরূপ জগন্নাথ, চিৎস্বরূপ সুভদ্রা এবং আনন্দস্বরূপ বলরাম মূর্তি মায়া জলধিতটে অবস্থিত। জ্ঞানের সপ্তম ভূমীতে এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপলব্ধি হয় তাই মন্দিরের সপ্তমধারে এই মূর্তি বিরাজিত। ইনি সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত অথচ সর্বেন্দ্রিয়ের ধর্মসমন্বিত তাই জগন্নাথ বিগ্রহের চক্ষু কর্ণ নাসিকা হস্ত পদ প্রভৃতি অবয়বগুলির আভাসমাত্র আছে। "অপানি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্ত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি উপনিষৎ প্রতিপাদ্য বাক্যমনের অতীত স্বরূপকে যদি স্থূলরূপে পরিকল্পিত করিতে হয় উহা জগন্নাথ মূর্তি

ব্যতীত অন্য কোনরূপে সম্ভব হয় না। যিনি বামন তিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপে অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মরূপে সমস্ত জীবের অন্তরে নিয়ত অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন "রথস্থং বামনং দৃষ্টবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"—ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব।

কঠোপনিষৎ বলিতেছেন ঃ

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুর্বিষয়াং স্তেষু গোচবান।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥

অর্থাৎ শরীর অধিষ্ঠাতা আত্মাকে রথী বা রথের মালিক বলিয়া জানিবে; জীবাধিষ্ঠিত শরীরকে রথ বলিয়া, বুদ্ধিকে সারথী বলিয়া এবং মনকে লাগাম বলিয়া জানিবে।

মনীষিগণ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকে হয় অর্থাৎ শরীররূপ রথের চালক অশ্ব বলিয়া থাকেন; শব্দাদি বিষয়সমূহকে সেই ইন্দ্রিয়াশ্বগণের গোচর অর্থাৎ বিচরণ স্থান বলিয়া থাকেন এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে (সুখ-দুঃখাদির) ভোক্তা বা অনুভবিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে **রথযাত্রা** একটি প্রাচীন উৎসব। নানা সময়ে সমস্ত দেশ জুড়িয়া বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। কালক্রমে পূর্ব ভারতের উড়িষ্যা ও বাংলায় ইহা বৈষ্ণবদের উৎসবরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এইভাবে ইহা ঠিক কত প্রাচীন তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে তিন-চারি শত বৎসরের পুরাতন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলার প্রসিদ্ধ ধর্ম-ব্যবস্থাপক রঘুনন্দন তাঁহার "তীর্থতত্ত্বে" সাধারণভাবে রথযাত্রার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। রঘুনন্দনের নামযুক্ত "যাত্রাতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যায়। তবে রঘুনন্দনের সমসাময়িক গোবিন্দানন্দের "বর্ষক্রিয়া কৌমুদী" গ্রন্থে ইহার কোনই উল্লেখ নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে চৈতন্য সম্প্রদাযের প্রামাণিক ও বিশেষ সম্মানিত গ্রন্থ "হরিভক্তিবিলাস"-এও ইহার সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায় না।

মাহেশের জগন্নাথদেবের মন্দির সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, পুরী হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া এখানে মন্দির নির্মাণ এবং তন্মধ্যে দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং উপরি-উক্ত দেব-ঘটনার স্মরণার্থেই প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রা উৎসব মহা ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। আবার ভিন্ন জনশ্রুতি এই যে, ধ্রুবানন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী পুরী তীর্থে গমন করিলে, তিনি স্বপ্নে মাহেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য আদিষ্ট হন। মাহেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি গঙ্গাতীরে বালুকার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি প্রাপ্ত হন এবং তিনিই উক্ত মূর্তিগুলির প্রতিষ্ঠা করেন।

জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহের বেদীতে নিম্নলিখিত লেখাগুলি উৎকীর্ণ আছে ঃ

• রামতনু মল্লিক ও | শ্রীমতি পার্বতী দাসী | ১২৬৫

মাহেশের প্রকাণ্ড রথটি হুগলী জেলার তড়া নিবাসী **দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু** প্রথমে নির্মাণ করিয়া দেন; পরে পুরাতন রথ জরাজীর্ণ হইলে তাঁহার পুত্র দেওয়ান গুরুচরণ বসু আর একটি নূতন রথ তৈয়ারী করিয়া দেন। দৈবক্রমে কয়েক বৎসর পর নবনির্মিত রথ আগুনে পুড়িয়া যায়। অতঃপর গুরুচরণ বসুর পুত্র রায়বাহাদুর কালাচাঁদ বসু আবার একখানি নূতন রথ নির্মাণ করিয়া দেন। কালক্রমে উহাও ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িলে তাঁহার পুত্র বিশ্বম্ভর বসু নূতন রথ নির্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু ১২৯২ সালে রথখানি পুনরায় আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। তখন বিশ্বম্ভব বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র বসু কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে বৃহৎ লৌহ নির্মিত রথ প্রস্তুত করিয়া দেন। এই রথের সম্বন্ধে বিবরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট প্রণীত 'দ্বাদশ গোপাল' পুস্তকে পাইবেন।

১৩৪০ সালে প্রথম জগন্নাথদেবের মন্দিরে ইলেকট্রিক আলো হয়। এই সম্বন্ধে শ্বেত-পাথরে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে তাহা এইঃ

মাহেশ নিবাসী ঁভোলানাথ মাইতির
স্মৃতিরক্ষার্থে
তস্য পত্নী শ্রীমত্যা সিদ্ধেশ্বরী দাসী কর্তৃক ইলেকট্রিক আলো প্রদত্ত হইল।
সন ১৩৪০ সাল, ১লা শ্রাবণ

প্রথম সেবায়েৎ শ্রীমৎ মহাপ্রভুর অন্যতম পার্শ্বদ শ্রীকমলাকর পিপলাই। তাঁহার সম্বন্ধে মন্দিরগাত্রে শ্বেত প্রস্তরে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত হইলঃ

"শ্রীপাট মাহেশের শ্রীশ্রীঁজগন্নাথদেবের প্রথম সেবায়েৎ, দ্বাপর যুগের ব্রজধামের ৫ম গোপাল এবং শ্রীমৎ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল শ্রীকমলাকর পিপলাই চক্রবর্তীর স্মৃতি-ফলক।

আবির্ভাব ১৪১৪ শকাব্দে ৮৯৯ সালে। মাহেশে আগমন ও শ্রীশ্রীঁজগন্নাথদেবের সেবায় নিযুক্ত ১৪৫৫ শকাব্দে। তিরোভাব ১৪৮৫ শকাব্দে চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে ৯৭০ সালে (শ্রীবৃন্দাবনধামে)।"

জগন্নাথদেবের মন্দিরের সেবায়েতগণের বর্তমান উপাধি 'অধিকারী'। মাহেশের প্রথম রথখানি এক মোদক নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা লিখিয়াছেন যে, জগন্নাথের নিত্য ভোগের জন্য নিমাই মল্লিকের দান বার্ষিক ১৯২, ও রামমোহন মল্লিকের ট্রাস্ট ফাণ্ডের দান ১৫০, খিচুড়ী ভোগের জন্য নিমাই মল্লিকের স্বতন্ত্র দান বার্ষিক ৪৩৬,। নিমাইচরণের কনিষ্ঠ পুত্র মতিলাল মল্লিক গঙ্গার ধারে সুদৃশ্য রাসমঞ্চ করিয়া দেন। তাঁহার পৌত্রের পৌত্র রাসবিহারী মল্লিক ৬৭, পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রীটে বাস করেন।

জগন্নাথের মন্দিরের পাশে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে কিন্তু এখন উক্ত মন্দির হইতে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ জগন্নাথের মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ কাল কষ্ঠিপাথরের ও শ্রীরাধার বিগ্রহ আট ধাতু দ্বারা নির্মিত। বিগ্রহ দেখিতে খুব সুন্দর। মন্দিরের বাহিরে রাধাকৃষ্ণের দোলমঞ্চ আছে। প্রত্যহ ঠাকুরের পাঁচটি করিয়া ভোগ হয়। একটি ভোগ শ্রীশ্রীদামোদরজীউর, তিনটি ভোগ যথাক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার ও একটি ভোগ শ্রীরাধাকৃষ্ণের।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে নবাব খাঁন আলি গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিবার সময় ভীষণ ঝড়ে আক্রান্ত হইয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্দিরের সেবায়েত রাজীব অধিকারী নবাবকে আদর আপ্যায়ন করায় তিনি বিশেষ প্রীত হন এবং সেবায়েতগণকে "অধিকারী" উপাধি দেন। জগন্নাথপুর নামক পল্লী জগন্নাথদেবের সেবার জন্য সেওড়াফুলি রাজ-বংশের মনোহর রায় দান করিয়া যান, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। নবাব বাহাদুর সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা জগন্নাথপুবেব রাজস্ব রহিত করিয়া উক্ত মহাল নিষ্কব দেবোত্তর করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। জগন্নাথপুরের রাজস্ব রহিত করিয়া "দেবোত্তর" করিয়া
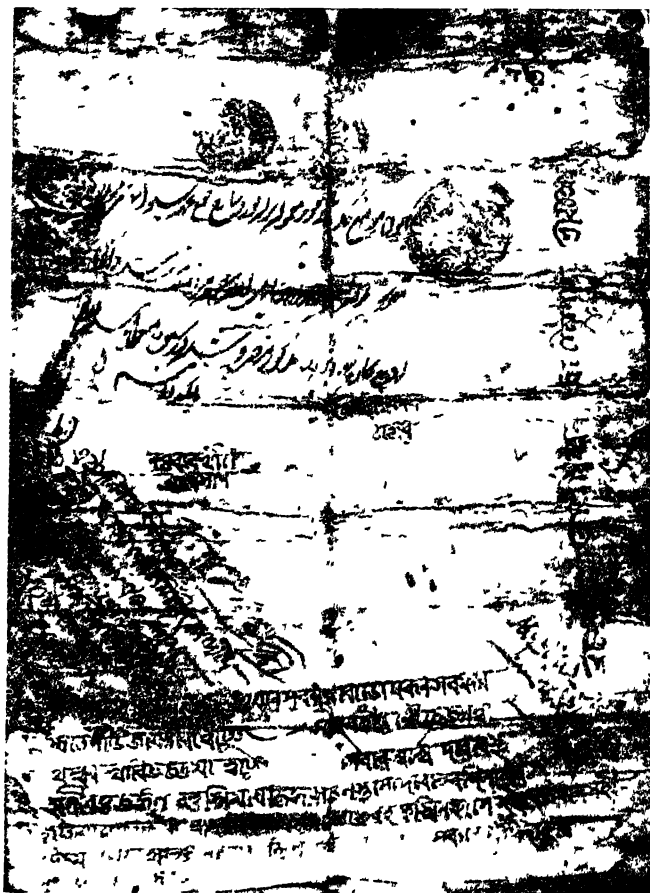
১৬৫০ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথদেবের সেবার
জন্য প্রদত্ত প্রাচীন দলিল

দেওয়ায়, এই মহালের যে রাজস্ব কমিয়া গেল, তাহা আর্ষা পরগণা হইতে আদায় করা হইবে বলিয়াও এই দলিলে লেখা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, নবাবের এই দানের পর হইতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের এবং রথযাত্রার খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হইয়া যায়।

সপ্তগ্রামের অধীনস্থ বোড়ো পরগণার জায়গীদার নবাব খাঁন আলি খাঁন ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথের সেবার জন্য জগন্নাথপুর মহালের রাজস্ব মঞ্জুব করিয়া যে ছাড়পত্র দেন উক্ত দলিলখানির প্রতিলিপি এইস্থানে প্রদত্ত হইল। দলিলখানি বঙ্গভাষায় লিখিত এবং শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নিকট ইহা রক্ষিত আছে। এই প্রাচীন দলিলে যাহা লিখিত আছে নিম্নে তাহা পাঠোদ্ধার করিয়া উদ্ধৃত হইলঃ

"৺জগন্নাথদেব ঠাকুর

নওবাব খাঁনে আলি খাঁন—

লিখিতং চৌধুরিয়াং ও কানগুয়ানপরগণা বোড়ো দরুন সরকার যাতগাউ যায়গীরী শ্রীযুত ৺সাহেবজীউ মৌজে জগন্নাথপুর খারিজ জমা শ্রীযুত ৺সেবার অর্থে দরোবস্থ (১) হাসীল ও জঙ্গল বত্তসীমা (২) বছিপু (৩) সজলস্থলে দেবোত্তর দিলাম জুতিয়া জোতাইয়া শ্রীরাজীব অধিকারী সেবা করহ কস্মিনকালে ইহার জমার সহিত দায় নাঞি হাত সনে জমা ছিল তাহা আসরা (৪) পরগণায় দিলা ইতি—১০৬০ হাজার ষাট্টি ১৯ রমজান।

[সাক্ষী]—অস্পষ্ট, শ্রীপ্রানকৃষ্ণ সেন, শ্রীসেবারাম রায়, শ্রীরাঘব দত্ত"*

(১) 'দরোবস্থ' অর্থাৎ সমস্ত (taking as a whole)

(২) 'বত্তসীমা' অর্থাৎ চৌহদ্দী বা সীমানাগুলি ঠিক রাখিয়া ব্যবস্থা করা (preserving the boundry in tact)

(৩) 'বছিপু' অর্থাৎ ঠিক করিয়া রাখা (keeping in tact)

(৪) 'আসরা' অর্থাৎ আর্যা পরগণা।

দলিলের শীর্ষে তিনটি শীলমোহর দেওয়া আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই দেশের দেওয়ানী ভার গ্রহণ করিলে ইহা তাহাদের নিকট দাখিল করা হয় এবং তাহারা জগন্নাথপুর মহাল নিষ্কর বলিয়া মঞ্জুর করেন ও দলিলের উপর তাহা বাঙলায় লিখিয়া দেন। দলিলের পশ্চাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শীলমোহর এবং মেজর কোর্টের সাক্ষর আছে।

রাজা মনোহর রায় কর্তৃক নির্মিত জগন্নাথের মন্দির ভগ্ন হইয়া যাইলে ১২৬৫ সালে সপ্তগ্রামের মল্লিক বংশোদ্ভব নিমাইচরণ মল্লিকের নির্দেশানুযায়ী পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের অনুকরণে সত্তর ফুট উচ্চ বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়। তিনি ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে বড়বাজারে জন্মগ্রহণ করেন এবং নানা সৎকার্য ও তীর্থস্থানাদিতে ধর্মশালা, স্নানের ঘাট, দেবমন্দিরাদি নির্মাণ প্রভৃতি হিন্দু-ধর্মোক্ত বিবিধ কার্যের জন্য বত্রিশ লক্ষ টাকা তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টে গচ্ছিত রাখিয়া ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন। কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ দান করিবার ন্যস্ত অর্থ লইয়া বিবাদ

---

*শ্রীরাঘব দত্ত বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ রাঘব মজুমদার; তাঁহার রাজত্বকাল—১৬২৯—১৬৭৪ খৃষ্টাব্দ।

করিলে পরিশেষে মামলা হয় এবং তাঁহার পঞ্চম পুত্র রামমোহনের হস্তে যাবতীয় ব্যয়ভার বিচারপতি অর্পণ করেন। এই সম্বন্ধে ১২৬৩ সালের ২২শে ফাল্গুন তারিখের "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়" পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

"স্বর্গবাসী পুণ্যবাসী নিমাইচরণ,
মল্লিক আখ্যাতে যে খ্যাত ত্রিভুবন।
পুণ্যশীল দানশীল যার সম নাই,
পৃথিবী মধ্যেতে যার তুলনা না পাই॥
অপ্রমিত দান করি যেই মহাজন,
তথাপি না হৈল তার চিত্ত বিনোদন।
এ কারণে মহামতি থাকিতে জীবন,
রাজহস্তে বহু ধন কৈলা সমর্পণ॥
ন্যস্তধন সূত্রে কৈলা বিবাদ ঘটন,
স্বর্গ গমন পরে তাঁর পুত্র-পৌত্রগণ॥
এইরূপ বিবাদেতে বহুদিন গেল,
তথাপি সে ন্যস্তধন সদ্গতি না হৈল।
পরে বিচারকগণ করিয়া বিচার,
শ্রীরামমোহন হস্তে দিল ব্যয়ভার॥"

মাহেশে ভাগীরথী তীরের ঘাট "জগন্নাথ ঘাট" বলিয়া পরিচিত। এই মনোরম ঘাটের প্রশস্ত চাঁদনীর দুই ধারে দুইটি শিবমন্দির। উত্তরের শিবমন্দিরের গায়ে পাথরে উৎকীর্ণ লিপি এইরূপঃ শ্রীশ্রীদুর্গা। সন ১২৭১ সাল॥ ৺বিজয়া দাসী। সাং আরপুলি।

দক্ষিণের শিবমন্দিরের ফলকে আছেঃ শ্রীশ্রীদুর্গা। সন ১২৭১ সাল। ৺রামচন্দ্র দত্ত। সাং আরপুলি॥

মাহেশে জগন্নাথ ঘাটের অনেক সিঁড়ি আছে। এখন ঘাট হইতে গঙ্গা প্রায় আধমাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং তথায় ইটখোলা হইযাছে। চাঁদনি নির্মাতার নাম শ্বেতপাথরে এইভাবে লেখা আছে ঃ

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থে
কলিকাতা আরপুলি নিবাসী
রামচন্দ্র দত্তের স্বর্গার্থে
তদ সম্ভক বিনির্মিত এই ঘট্ট
শকাব্দ ১৭৮৫

মাহেশে স্নানযাত্রা উপলক্ষে তৎকালীন ধনী ব্যক্তিগণ এইস্থানে আসিয়া কিরূপ আমোদ-আহ্লাদ করিতেন, তাহার একটি বিবরণ 'সমাচার দর্পণ' হইতে উল্লিখিত হইলঃ

শৌকীন বাবু নগরবাসি অনেক ভাগ্যবান লোক ও বাবু লোক অনেকে দর্শন সুখার্থী অল্প পারমার্থিক স্নানযাত্রা দেখিতে কেহবা দেখাইতে বৎসর ২ গিয়া থাকেন এবং এ বৎসরও গিয়াছিলেন যাঁহার যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তিনি তাহার মত দ্রব্যাদি এবং লোক

লইয়া যান কেহ ২ গায়ক গুণী কেহবা বেশ্যা কেহবা ভাঁড় কেহবা বাই লইয়া বজরা অথবা পিনীষ কিম্বা কয়াটর পানসী ডিঙ্গী এবং জেলে ডিঙ্গী প্রভৃতি যাহার যেমন শক্তি তাহাই ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন। ঐ প্রতি বৎসর দেখিয়া শুনিয়া এ বৎসর এক নূতন শৌকীন বাবু শৌক করিয়া আপন স্ত্রীকে লইয়া এক হাপ বজরা ভাড়া করিয়া যখন নৌকায় আরোহণ করেন তখন মাজিরা কহিলেক যে বাবুজী নৌকায় যাইতে বড় কাদা অতএব বিবি ঠাকুরাণীকে আমরা দুজন মাজি লইয়া নৌকারোহণ করাই পরে আর ২ বিবিরদিগকে যে প্রকার করিয়া লইয়া যায় এ বিবিকেও সেই প্রকার না করিলে যাইবেক কেনো।

অনন্তর নৌকার উপরে গিয়া বাবু চতুর্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে সকল বজরা প্রভৃতির উপরে আর ২ যত অপ্সরারা আছেন সর্কলি প্রায় নৃত্য করিতেছেন কেহবা গান কেহবা পান কেহবা মান ইত্যাদি করিতেছেন। এ সুন্দরী তাহার কিছুই জানেন না ইহাতে বাবু খেদান্বিত হইয়া কহিলেন তুমি এক কর্ম কর কেবল শোজা খেঁউড় গীত গাও আমি খেমটা বাদ্য বাজাই আর সেই তালে নৃত্য কর। তিনি সাধ্বী স্ত্রী বাবুর শৌক অনুযায়ি তাবৎ কর্ম সমস্ত রাত্রি করিলেন কোন প্রকারে বাবুর খেদ রাখিলেন না।

প্রভাতে মাহেশের ঘাটে যখন নৌকা লাগিল গুণনিধি বাবু স্নান দর্শনার্থে চলিলেন সেই সময় তাহার মনোরমা নৌকা হইতে নামিয়া পুর্ণিমার মধ্যে গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে ভগবান জোয়াররূপ হইয়া আইলেন পরে অনেক নৌকার ভিড় হওয়ায় বড় গোল হইল। গুণবতী আপন নৌকা চিনিতে না পারিয়া অন্য কোন পুণ্যবানের নৌকাতে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করিলেন কিম্বা কাহারো সহিত সংকেতইবা ছিল কিছু বুঝা গেল না কিন্তু পুনরায় গুণনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না সেই স্নানযাত্রায় শুভ যাত্রা করিয়াছেন মনে করি হতভাগার ভাগ্যে আর দেখা হয় কি না হয় কিন্তু বাবু সেই ঘাটে ২ মঙ্গল গাইয়া বেড়াইলেন এবং ঐ নগরের মধ্যে দ্বারে দ্বারে অন্বেষণ করিলেন সাক্ষাৎ হইল না।

এতএব নিবেদন হে শৌকীন মহাশয়েরা এই মত শৌক শুনিয়া বমি উঠে সাবধান ২ এমত কর্ম আর কেহ না করেন। অজ্ঞাত কুলশীল নামক এক ব্যক্তি পরোপদেশার্থ এই কথা পাঠাইয়াছিলেন তন্নিমিত্ত ছাপান গেল। [২৩ জুন ১৮২১]

রথের কথা উঠিলেই মাহেশের কথা মনে পড়ে। আর মাহেশের কথা উঠিলেই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী'র **মাহেশে** রথযাত্রার দুর্ভোগের কথা মনে পড়ে।

"রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্বে ভাল ছিল—বড়মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই। তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়, সর্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িত হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনাতিপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল; কিন্তু পথ্য কোথা? কে দিবে?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই-একটি পয়সা পাইবে, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতেই ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোকসকল ভাঙিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল- ব অন্ধকার হইল, অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার- পথ কর্দমময়—পিচ্ছিল—কিছু দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষু বারিবর্ষণ করিতেছিল।"

নিমাইচরণ মল্লিকের অর্থে বর্তমান মন্দির নির্মিত হইলে, বিগ্রহের বেদীতে তাঁহার তৃতীয় পুত্র এবং তাঁহার সহধর্মিণীর নাম উৎকীর্ণ আছে। নিমাইচরণের কনিষ্ঠ পুত্র মতিলাল মল্লিক গঙ্গার ধারে সুদৃশ্য রাসমঞ্চ নির্মাণ করিয়া দেন।

রথযাত্রা উপলক্ষে এই স্থানে মেলা বসিয়া থাকে এবং সেইজন্য মাসাধিক কাল যাবৎ দেশ-দেশান্তর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। পূর্বে এই স্থানের মেলায় নর-নারী পর্যন্ত বিক্রয় হইত; ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রা উপলক্ষে জনৈক ব্যক্তি জুয়াখেলার জন্য মেলায় তাহার স্ত্রী বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া ১২২৬ সালের ৬ই আষাঢ় তারিখের "সমাচার দর্পণ" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে উক্ত সংবাদটি উদ্ধৃত হইলঃ

"১১ই আষাঢ় (২৪শে জুন) বৃহস্পতিবার রথযাত্রা হইবেক। অনেক অনেক স্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রে রথযাত্রাতে যেরূপ সমারোহ ও লোকযাত্রা হয় মোং মাহেশের রথযাত্রাতে তাহার ন্যূন নহে। এখানে প্রথম দিনে অনুমান এক-দুই লক্ষ দর্শনার্থে আইসে এবং প্রথম রথ অবধি শেষ রথ পর্যন্ত নয়দিন জগন্নাথের মোং বল্লভপুরে রাধাবল্লভের ঘরে থাকেন, তাহার নাম গুঞ্জবাড়ী। ঐ নয়দিন মাহেশ গ্রামাবধি বল্লভপুর পর্যন্ত নানাপ্রকার দোকান-পসার বসে এবং সেখানে বিস্তর বিস্তর ক্রয়-বিক্রয় হয়। ইহার বিশেষ বিশেষ কত লিখা যাইবেক। এমত রথযাত্রার সমারোহ জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতিরিক্ত অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

এই যাত্রার সময় অনেক স্থান হইতে অনেক অনেক লোক আসিয়া জুয়াখেলা করে ইহাতে কাহারো কাহারো সর্বস্ব নাশ হয়। এইবার স্নানযাত্রার সময়ে দুইজন জুয়া খেলাতে আপন যথাসর্বস্ব হারিয়া পরে অন্য উপায় না দেখিয়া আপন যুবতী স্ত্রী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে একজন খানকীর নিকটে দশ টাকাতে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল। অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মতা হইল না তৎপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি খেলায় দেনার কারণ কএদ হইল।"

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোম প্যাঁচার নকশায় রথযাত্রা দেখিয়া জনৈক মদ্যপায়ী

দর্শকের বিষয় লিখিয়াছেন ঃ দর্শকদের ভিড়ের ভিতর একটা মাতাল ছিল, সে রথদর্শন করে ভক্তিভরে মাতলামো সুরে ঃ

কে মা রথ এলি ?
সর্বাঙ্গে পেরেকমারা চাকা ঘুর ঘুরালি।
মা তোর সামনে দুটো ক্যেটো ঘোড়া.
চুড়োর উপর মুকপোড়া,
চাঁদ চামুরে ঘণ্টা নাড়া
মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা,
লোকের টানে চলছে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাখা
বেহদ্দ ছেনালি।

গান্‌টি গেয়ে 'মা রথ ! প্রণাম হই মা !' বলে প্রণাম কল্লে।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাহেশের 'স্নানযাত্রা' সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করেন; এই হইতে তৎকালে স্নানযাত্রায় কিরূপ লোকসমাগম হইত এবং বঙ্গবাসী তদুপলক্ষে কি ভাবের আমোদ-প্রমোদ করিত, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কবিতাটির স্থানে স্থানে অশ্লীলতা থাকিলেও, তৎকালীন সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইলঃ

বৃষপূর্ণিমার দিবা, অপার আনন্দ কিবা
মাহেশে সুখের মহামেলা
স্নানযাত্রা প্রতি বর্ষে, এই দিন মহা হর্ষে,
মেলা পেয়ে করে সবে খেলা॥
হাড়ি মুচি যুগী জোলা, কত বা সেখের জোলা
জাঁকে জাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।
ঠেলাঠেলি চুলো চুলি, কাঁকে কাঁকে ঝুলোঝুলি
লোকারণ্য জলে আর স্থলে॥
আগে পাছে পাকাপাকি আঁকা আঁকি তাকা তাকি
ঝাঁকা-ঝাঁকি স্থান নাহি পায়।
এসে বাড়ী যত রাঢ়ী কাঁকে ক'রে কেলে হাঁড়ি
হাতে পাখা কটুটাল মাথায়॥
ভদ্র যত মন শাদা পরস্পর করি চাঁদা,
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া।
যাহাতে আসক্তি যাঁর, সেই শক্তি সঙ্গে তার,
গরবেতে গোঁপে দেয় চাড়া॥
* * গায়ে বাটি তবলার মুখে চাঁটী,
পরিবাটী খান কসে কসে।
পূর্ণ হ'লে ইচ্ছা যেটা, স্নান আর দেখে কেটা
স্নান পান এক ঠাঁই বসে॥
লম্পট যুবক যারা বাচ করে ফেরে তারা
ধীরে ধীরে তীরে চালে ডিঙ্গে।

যেখানে * * সেইখানে গায় সারি
কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙেগ॥

॥ ডাঃ আশুতোষ দাস ॥

১২৯৫ সালে ডাঃ আশুতোষ দাস শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আই-এম-এস হন, কিন্তু পরে সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া বহু ছাত্রকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিয়া হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই নিরহংকার চিরকুমার দেশসেবক ১৩৪৮ সালে পরলোকগমন করেন হরিপাল তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল।

হুগলী জেলার কংগ্রেস নেতা ও আজীবন সেবাব্রতী ডাঃ আশুতোষ দাস সম্বন্ধে কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের শ্রদ্ধাঞ্জলী এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য ঃ

অন্ধজনে দিলে আলো শল্যবিদ্ নেত্রচ্ছদ তুলি
চক্ষুস্মান অন্ধজনে জ্ঞানাঞ্জনে দিলে চক্ষুদান
আকুমার ব্রহ্মচারী সেবাব্রতে আত্মপর ভুলি
দেহাত্ম বুদ্ধিরে তুমি দেশাত্ম করিলে মতিমান।
হরিপাল পরিপালি, স্নেহ শৌর্য, জ্যোৎস্না রৌদ্রদিয়া
একাধারে স্নিগ্ধা দীপ্ত বাঙালীরে বীর্যবান রূপ
'বিভক্তে ও অবিভক্ত' ভারতের আরতি করিয়া
পল্লীরে মল্লিকা-মধু পান ধন্য হে মৌন মধুপ।
সম্পন্ন বিপন্ন দীনে সুস্থ দুঃস্থ কুষ্ঠী হরিজন
সর্ব পরিজনে ধরি সংঘবন্ধ পাতিলে সংসার।
পঙ্গুরে ধরিলে তুলি, মুমূর্ষুরে করি প্রাণপণ,
আপন প্রাণের অংশে প্রাণশক্তি করিলে সঞ্চার।
আধি ব্যাধি পাপ শাপ গ্রস্থ দেশে ভগীরথসম
কল্যাণের পুরোহিত হে বীর! প্রণতি লহ মম।

শ্রীরামপুরের চক্রবর্তী বংশ একটী প্রাচীন বংশ। এই চক্রবর্তী বংশের স্বর্গীয় নন্দদুলাল চক্রবর্তী দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠিরের দেওয়ান হওয়ায়. তদবধি এই চৎবর্তী বংশ দেওয়ান চৎবর্তীর বংশ নামে অভিহিত হয়। দেওয়ান নন্দদুলাল চক্রবর্তীর পূর্বপুরুষগণ পুরুষানুক্রমে সেওড়াফুলির রাজা মহাশর্যদিগের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমীর উপসত্ত্ব হইতে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শ্রীরামপুর নগবীতে বাণিজ্যকঠি স্থাপন করিবার পর এদেশীয় পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য করা তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসুবিধা হওয়ায়, তাঁহারা উক্ত চক্রবর্তী বংশের নন্দদুলাল চক্রবর্তীকে কুঠির দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহারই সাহায্যে, এদেশীয় পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য করিয়া তিনি সাফল্য লাভ করেন।

তিনি স্বকৃতবলে যেমন বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তেমনি পরদুঃখ মোচনার্থে অকাতরে তাহা ব্যয় করিতেন। নন্দদুলাল পদস্থ হইবার পর প্রথমে সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করান

এবং দেশবাসীর অভাব মোচনার্থে ভাগীরথী তীরে একটী ঘাট এবং গঙ্গাযাত্রীদিগের থাকিবার গৃহ ও শ্রীরামপুরে শ্মশান নির্মাণ করাইয়া দেন।

নন্দদুলাল চারিপুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠ আনন্দমোহন, মধ্যম হরকুমার: তৃতীয় মৃত্যুঞ্জয়, চতুর্থ শ্রীরাম।

দিনামার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শ্রীরামপুর নগরীতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিবার পর, কোতলপুর নিবাসী **পাঁচকড়ি রায়** নামক জনৈক ব্যক্তি কার্য অন্বেষণে শ্রীরামপুর নগরীতে আগমন করতঃ দিনামার কোম্পানীর তদানীন্তন দেওয়ান নন্দদুলাল চক্রবর্তীর নিকট কার্য প্রার্থনা করায়, নন্দদুলাল তাঁহাকে আপনার গোমস্থার পদে নিযুক্ত করেন। পাঁচকড়ি রায় একজন তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে অত্যল্পকালের মধ্যেই নন্দদুলাল চক্রবর্তীর প্রিয়পাত্র হন। নন্দদুলাল তাঁহার কার্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে কুঠীর প্রধান সরকারের পদে নিয়োজিত করনে। পাঁচকড়ি রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম ছিল গোলকচন্দ্র। পাঁচকড়ি রায় পরলোকে গমন করিলে পর, গোলোকচন্দ্র দিনামার বণিকগণের নিকট পিতৃব্যের পদ পদ প্রার্থনা করায়, তাঁহারা তাঁহাকে পাঁচকড়ি রায়ের পদে নিযুক্ত করেন। কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি সুচারুরূপে কুঠির কার্য নির্বাহ করিতে থাকায়, দিনামার বণিকগণ তাঁহার বুদ্ধি নিপুনতা ও কার্যকুশলতা দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং পরে দেওয়ান নন্দদুলাল পরলোকে গমন করিলে পর, তাঁহাকে দেওয়ানের পদ প্রদান করেন। গোলোকচন্দ্র দেওয়ানের পদপ্রাপ্ত হইবার পর, দিনামার বণিকগণের সহিত বস্ত্র, নীল ও সমলার কারবার করেন। এবং ঐ কার্যে ব্রতী হইবার পর তাঁহার অদৃষ্টও সুপ্রসন্ন হয়, তিনি বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকেন। অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভূসম্পত্তি ক্রয়, প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করান অতিথিশালা স্থাপন করেন এবং ক্রিয়াকলাপ ব্রাহ্মণ ভোজন ও সুপণ্ডিত শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণগণকে অর্থদান করতঃ সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করেন। চাতরার চৌধুরী বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের তদানীন্তন রক্ষক রামনারায়ণ গোস্বামী পরলোকে গমন করিলে পর, গোলোকচন্দ্র শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণ সমাজের গোষ্ঠীপতি হন।

মাহেশ-বল্লভপুরের দেবসেবা ও নিমাইচরণ মল্লিক সম্বন্ধে "সংবাদ-প্রভাকরে" (১৭ই ফাল্গুন ১২৬৪) যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল:

"প্রাতঃস্মরণীয় সমূহ সংক্রিয়ান্বিত বিপুল বিভবশালী ৺নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয় ইংরাজী ১৮০৬ সালে ধর্মকর্মের জন্য ৩২০০০০০০ বত্রিশ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করিয়া পুত্রগণের প্রতি ভারার্পণ করত আপামর উইলে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, বাল্মীকি পুরাণ প্রদান এবং অম্বিকায় মহাপ্রভুর মন্দির, কলিকাতার গঙ্গাতীরে কয়টি বৃন্দাবনে দুইটা কুঞ্জ, জগন্নাথক্ষেত্রে মঠ স্থাপন আর মাহেশ, বল্লভপুর কাঁচড়াপাড়ায় দেবসেবা প্রভৃতি কর্ম নির্বাহ করণে অনুমতি করেন। এই স্থলে ৺নিমাইচরণ মল্লিকের নামোল্লেখপূর্বক এই মাত্র কহিতেছি, তিনি যখন যথার্থ মানব-দেহ ধারণ করতঃ মানবজন্মের ও ধনের সার্থকতা করিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণেরাও পৃথিবীব্যাপিনী কীর্তি স্থাপনে অনুরত হইয়া কুলের ধনের, মানের এবং জীবনের সার্থকতা করিতেছেন।"

॥ ডঃ শিশিরকুমার মৈত্র ॥

শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম ভক্ত, বিশিষ্ট দার্শনিক ও অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের বিখ্যাত মৈত্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম শিক্ষাজীবন তাঁর অতিবাহিত হয় কটকে। সেখানকার বিখ্যাত র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে বি-এ পাশ করিবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম-এ পাশ করেন। এই সময়েই তিনি জার্মাণ ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। এম-এ পাশের পর প্রথমে ময়মনসিংহ কলেজ ও তারপরে কিছুদিন কলিকাতার রিপণ কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি "The Neo-Romantic Movement in Contemporary Philosophy" নামক গবেষণা প্রবন্ধের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পি, এইচ, ডি উপাধিতে ভূষিত হন। স্যর্ আশুতোষ মুখার্জি এই পুস্তক প্রকাশের জন্য তাঁকে নানাভাবে উৎসাহিত করেন ও আরও জ্ঞানার্জনের প্রেরণা দেন। ডক্টরেট হওয়ার কিছুদিন পর তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে সেখানকার দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত মালব্য আজীবন এই আচার্যপ্রতিম দার্শনিককে বিশেষ শ্রদ্ধার সংগে দেখিয়াছিলেন।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন এবং সেইজন্য বিদ্বৎ সমাজে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। এই লেখার মধ্য দিয়াই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর পরিচয় নিবিড়তর হইয়া ওঠে। কবিগুরু এই দার্শনিক পণ্ডিত ব্যক্তিটিকে বিশেষ শ্রদ্ধার সংগে চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছেন। "বিশ্ব-ভারতী" প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শান্তি-নিকেতনে যে অনুষ্ঠান হয়—সেই সভাতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ মনীষীদের সংগে ডক্টর মৈত্রও ছিলেন একজন অন্যতম বক্তা। কিন্তু সবচেয়ে বেশী যে দার্শনিক তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তিনি হইলেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর জীবনের শেষের দিকটা তিনি অরবিন্দ-দর্শন চর্চা ও প্রচারের মধ্য দিয়াই অতিবাহিত করেন। অরবিন্দ-দর্শন শিক্ষা লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণকে অবশ্যই তাঁর লেখার সাহায্য লইতে হইবে। An Introduction to Sri Aurobindo's Philosophy, Studies in Sri Aurobindo's Phiiosophy, The Meeting of the East & West. ইত্যাদি—তাঁর শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থাবলী। কাশীতে শ্রীঅরবিন্দ পাঠকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। ইহা ছাড়া তিনি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে বম্বেতে নিখিল ভারত দর্শন কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ও ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে কটকে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনেরও দর্শন শাখার সভাপতিত্ব করেন।

এত গেল ডক্টর মৈত্রের জ্ঞান-সাধক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অমায়িক, নিরহংকার, উদার হৃদয় ও পরদুঃখকাতর। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সংগে শিশুর মত সরলতার সংমিশ্রণও তাঁর চরিত্রকে দিয়েছিল এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর তাঁর দেহান্ত হয়।

"বিশ্বকোষ" সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নিবাস শ্রীরামপুর।

॥ মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী ॥

মাহেশ হুগলী জেলার প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রাম। "মাহেশের রথ" এ গ্রামকে প্রাচীন কাল থেকে তীর্থে পরিণত করেছে। চারদিক থেকে জনসমাগমের ফলে একটা সাংস্কৃতিক আব-হাওয়া এখানে সবসময়েই প্রবাহিত ছিল। কাজেই ১৮৬৯ সালে "মাহেশ পাবলিক লাই-ব্রেরী"র প্রতিষ্ঠা একটা খাপছাড়া বা বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজন তখনকার বিদ্যোৎসাহী সাহিত্য-রসিকেরা অনুভব করেছিলেন। মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের প্রথম উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন, ৺আদিত্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৺ক্ষেত্রনাথ মোহন ঘটক, ৺ভগবানদাস বসু, ৺মধুসূদন রুদ্র, ৺পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, ৺পূর্ণচন্দ্র দাস, ৺নকুড়চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি গ্রামের একদল বিদ্যোৎসাহী যুবক কর্মী। এঁদের অগ্রণী আদিত্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়ে একাদিক্রমে পাঁচ-ছয় বছর চলতে থাকে। তারপর সেখান থেকে লাইব্রেরী উঠে যায় নকুড় ভট্টাচার্যের বৈঠকখানায়। এর পর দীর্ঘদিনের বহু অবস্থা বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত লাইব্রেরী চালাতে হয়। এ সময়ে ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনের ফলে লাইব্রেরীর বইপত্র খোয়া যায় ও শেষ দিকে ১৮৯৭ সালে স্থানীয় মাইনর স্কুলের (বর্তমান উচ্চ প্রাইমারী বঙ্গ বিদ্যালয়, উত্তর দিকের ঘরে উঠে আসার পর থেকে লাইব্রেরীর কার্যকলাপ একেবারেই বন্ধ হযে যায়। এখানেই ১৯০৪ সালে শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায, ক্ষেত্র সেন, শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায, মণি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি একদল উৎসাহী নবীন কর্মীর চেষ্টায় মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। আগের লাইব্রেরীর নাম ছাড়া পুনঃ প্রতিষ্ঠাকালে আর কিছুই পাওয়া যায় নি।

এর পর থেকে লাইব্রেরীর কার্যকলাপ, সভ্য-সংখ্যা ও পুস্তক-সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলে। উন্নতি হতে থাকলেও লাইব্রেরীর যাযাবর জীবন এর পরেও অনেকদিন ধরেই চলেছে। দু-তিন জায়গা ঘুরে ১৯১১ সালে লাইব্রেরীর সভাপতি শরৎ রুদ্রের বৈঠকখানায় স্থানা-ন্তরিত হয়। সে সময়ের সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত আর গ্রন্থাগারিক ছিলেন শিবরাম বনন্দ্যাপাধ্যায় মহাশয়। এখানে থাকাকালীন নানা বিভাগে লাইব্রেরীর উন্নতি হতে থাকে ও কর্মতৎপরতা বেড়ে চলে। রবি ও কানাই গঙ্গুলীর উদ্যোগে তর্ক সভার আয়োজন করা হয এই বৈঠকখানা গৃহেই। তা ছাড়া শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে প্রথমে 'আর্য' ও পরে 'বিকাশ' নামক হাতে লেখা পত্রিকা বের করা হত। আসলে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীর কার্যকলাপ এবার বিশেষভাবে জনসাধারণের সঙ্গে যোগ রেখে চলতে থাকে ও ক্রমে মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী জনসাধারণের প্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

লাইব্রেরীকে আবাব এখান থেকে সরিয়ে নিতে হল কবিরাজ মশায়ের দোকানে। কিছু-দিন ধরেই লাইব্রেবী কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন, কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কিরূপ সাড়া পাওয়া যাবে ভেবে পাচ্ছিলেন না। প্রথম মহাযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে এসেছে। ১৯১৯ সালের ২৫শে অক্টোবরে

কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রস্তাব করা হল। এ প্রস্তাবে একবাক্যে সকলেই সম্মতি দিলেন। এ ব্যাপারে আশাতীত সাড়া পাওয়া গেল সকলের কাছ থেকেই। আসলে এ সাধারণ সম্পত্তিকে গ্রামের শোভা ও অলঙ্কারস্বরূপ করে তোলবার বাসনা বরাবরই গ্রামবাসীদের মনে গোপন ছিল। এবার আরম্ভ হল সেটাকেই কাজে পরিণত করবার রীতিমতো চেষ্টা ও উদ্যোগ-আয়োজন।

লাইব্রেরী গৃহের জায়গা যোগাড় করার চেষ্টা আরম্ভ হল। দু-এক জায়গায় বিফল হওয়ার পর ২৭০, টাকা সেলামী ও বার্ষিক ৬, টাকা খাজানায় তিন কাঠা জমি বন্দোবস্ত হল স্থানীয় ৺জগন্নাথ দেবের মন্দিরের কিছু উত্তরে গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোডের পূর্বধারে। এবার গৃহনির্মাণ কার্য আরম্ভ হল জনসাধারণের অকুণ্ঠ বদান্যতায়। দাতাদের ভেতর শ্রীরামপুরের গোস্বামী বংশের মাননীয় রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাহেশের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার, মাহেশের শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় (চীফ একজিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন) মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী, হরিদাস অধিকারী, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত ও গ্রামের আরো অনেকেরই দান বিশেষ স্মরণীয় সন্দেহ নাই। টাকা দিয়ে, দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে, যে যেমনভাবে পেরেছেন এ কাজে সাহায্য করেছেন। একটা কাজের সাফল্যের জন্য সকলের সমবেত চেষ্টায় ও সহযোগিতায় এ এক ইতিহাস। দাতাদের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে "কৃতজ্ঞতার ইতিহাস" নামক পুস্তিকায়। সর্বশেষ দাতা প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত ১৯৫০ সালে লাইব্রেরীকে ৫০০, টাকা দান করেছেন আসবাবপত্রাদির জন্য। যা হোক, ঠাকুরের কৃপায় ১৯২১ সালেই ৫৪২৭৸৶৹ ব্যয়ে ও নক্সাকারক ক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে লাইব্রেরীর বর্তমান সুন্দর ভবন ও অভ্যন্তরস্থ পাঠাগারের বিস্তৃত হল নির্মিত হল। তারপর মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরীর গৃহপ্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হল ১৯২২ সালের ১৯শে মার্চ, রবিবার দিবস মহাসমারোহে। সে উৎসবে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস মহাশয়। লাইব্রেরীর গোড়ার দিকে নিত্যগোপাল সেনগুপ্ত এর উন্নতির জন্য নিস্বার্থ সেবা করে গেছেন আর পববর্তীকালে শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত প্রভৃতি সম্পাদকদের সুযোগ্য পরিচালনা মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরীর ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কয়েকটি শ্রেণীর পড়াশোনা এই লাইব্রেরী-গৃহেই চলতো। এ ছাড়া, প্রসিদ্ধ বিগ্রহাবতার জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রার মেলায় প্রতি বৎসর লাইব্রেরী ভবন সেবাকেন্দ্রে পরিণত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের সমাবেশে অপূর্ব হয়ে উঠে লাইব্রেরী ভবন। এ ছাড়া এখানে সাহিত্য-সভা, ধর্মসভা, কিশোর সম্মেলন, স্মৃতিবার্ষিকী সভা প্রভৃতি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। রবিবার ছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য লাইব্রেরী ভবন খোলা রাখা হয়। আর রবিবার দিন সকাল ৮টা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত লাইব্রেরী খোলা রাখবার নিয়ম আছে।

বর্তমানে দুটি বিভাগে লাইব্রেরীর দৈনন্দিন কার্যকলাপ বিভক্ত। প্রথমতঃ সভ্যদের চাহিদা মেটানো আর দ্বিতীয়তঃ অবৈতনিক নিয়মিত পাঠকদের পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক দিয়ে সাহায্য করা। মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরীর পুস্তক-সংখ্যা বর্তমানে পাঁচ হাজারেরও বেশী।

পুস্তকগুলি সুনির্বাচিত ও বিষয় হিসেবে সাজানো রয়েছে। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত—এই তিন ভাষার এরূপ সংগ্রহ সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। দুষ্প্রাপ্য সাময়িক পত্রিকার সংগ্রহ এ লাইব্রেরীর মূল্যবান সম্পদ, অন্যত্র দুর্লভ প্রাচীন পত্রিকাগুলির সমস্তই লাইব্রেরীত সংগৃহীত হয়েছে। (কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য, দৈনিক বসুমতী ২৯ বৈশাখ ১৩৬০)

॥ শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি ॥

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মফঃস্বলে অবস্থিত পৌরসংস্থাগুলির মধ্যে শ্রীরামপুর পৌর প্রতিষ্ঠানকেই সর্বপ্রথম নির্বাচন ক্ষমতা দেওয়া হয়। আদি পৌরসভার আয়তন বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। কারণ প্রাক্তন শ্রীরামপুর পৌরসভার মধ্য হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনটি পৌরসভার জন্ম হয়। শ্রীরামপুর পৌরসভার উত্তরে বৈদ্যবাটী দক্ষিণে রিষড়া, পূর্বে ভাগীরথী এবং উত্তর-পশ্চিমে ইষ্টার্ণ রেলওয়ের লাইন ও দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজ্যধরপুর ইউনিয়ন বোর্ড। শহরের আয়তন মাত্র ২·২৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা এক লক্ষের উপর। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে চল্লিশ হাজার।

শ্রীরামপুর শহরে নর্দামার দৈর্ঘ্য হইল ৬৬ মাইল। ইহার মধ্যে পাকা নর্দামা ১৯ মাইল ও কাঁচা নর্দামা ৪৭ মাইল। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীরামপুরে ভূগর্ভস্থ নর্দামা তৈয়ারী করা হয়, কিন্তু তাহা এখন অকেজো হইয়া গিয়াছে। শহরের প্রধান রাস্তা নিউগেট ষ্ট্রীটের সমস্ত অংশ বসিয়া যাওয়ায় এক সময় এই রাস্তাটি অব্যবহার্য হইয়া যায়।

শিল্পের দিক দিয়া শ্রীরামপুর ঐতিহ্যশালী এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কারণ জুট মিল, কটন মিল, ডিষ্টিলারি কেমিক্যাল, গ্লাস, মিল্ক, রোলিং, বেল্টিং প্রভৃতিতে প্রায় পঁচিশ হাজার শ্রমজীবী এখানে কাজ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাহেশ, বল্লভপুর আর শ্রীরামপুরের আংশিক লইয়া যে শিল্পাঞ্চল গঠিত, সেইখানে এই সমস্ত শ্রমজীবীদের জন্য নির্মিত বস্তিগুলির উন্নতি না করিলে শহরের উন্নতি করা কখনও সম্ভব নয়। সরকার শিল্প শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু তথায় আঠার কুড়ি টাকা ভাড়া দেওয়ার সাধ্য সত্তর টাকা আয়ের শ্রমজীবীর পক্ষে কেবল অসম্ভব নয় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই সরকারী ভবনের অনেক ঘর প্রায়ই খালি পড়িয়া থাকে দেখা যায়।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর নগরী ইংরাজের অধীন হইবার পর এই স্থানের গণ্যমান্য অধিবাসীগণ এক সভায় মিলিত হইয়া সরকারের নিকট ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের দশম আইন শ্রীরামপুরে প্রবর্তনের জন্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে শ্রীরামপুরে মিউনিসিপ্যাল কমিটি স্থাপিত হয় এবং তদানীন্তন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন সভাপতি, মিঃ জন ক্লার্ক

মার্শম্যান, ডাঃ জে, এবট, হরচন্দ্র লাহিড়ী, গঙ্গাপ্রসাদ গোস্বামী ও রাজকৃষ্ণ দে কমিটির সদস্য হন। এই সম্বন্ধে টয়েনবি সাহেবের উক্তি উল্লেখযোগ্যঃ

The town of Serampore was not long behind hand in the matter of Municipal administration. The inhabitants held a meeting in the cold weather of 1845-46 and requested the introduction of the new act (Act X of 1842). The members of the first Municipal Committee of Serampore were Messrs L. S. Jackson, J. C. Marshman, J. Abott M. D., and Babus Ganga Prosad Gossain, Rajkristo Dey and Hurro Chunder Lahiry.

মিউনিসিপ্যাল কমিটি স্থাপিত হইবার পর গোস্বামী বংশের অন্যতম জমিদার কমললোচন গোস্বামীর বাড়ির টেক্স লইয়া মতান্তর হওয়ায় কমিটির চেয়ারম্যান জ্যাকসন সাহেবের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। জ্যাকসন সাহেব নগরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য রাত্রে ধুতিচাদর পরিয়া ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করিতেন। তাঁহার নির্দেশে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যাল কমিটি নগরীর বহু উপকার করেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল বোর্ড প্রবর্তিত হইলে শ্রীরামপুর পৌর সভা সর্বপ্রথম সদস্য নির্বাচন করিবার অধিকার লাভ করে এবং তদনুসারে ১৮ জন সদস্য লইয়া সভা সংঘটিত হয়। উক্ত ১৮ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন করদাতৃগণের দ্বারা নির্বাচিত ও ৬ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। বর্তমানে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি চাতরা, পশ্চিম শ্রীরামপুর, পূর্ব শ্রীরামপুর, বাহির শ্রীরামপুর ও মাহেশ এই পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত এবং ১১ জন করদাতৃগণের দ্বারা নির্বাচিত ৫ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যের দ্বারা পরিচালিত হয়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের জনসংখ্যা ছিল ২৪,৪৪০ জন, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ২৫,৫৫৯ জন ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৩৫,৯৩২ জন। ১৯০১ হইতে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যার বিবরণ ৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে বলিয়া আর এখানে দেওয়া হইল না।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর দামোদরের প্রবল বন্যায় শ্রীরামপুর নগরী জলমগ্ন হয় এবং পাঁচফুট জল সমভাবে তিনদিন যাবত শহরের সর্বত্র ছিল। বন্যায় নিমজ্জিত থাকায় শহরের বহু গৃহ ও কুটির পড়িয়া যায় এবং অনেক জীবজন্তু ও বৃক্ষ বিনষ্ট হয় বলিয়া শহরটি শ্রীহীন হইয়া যায়। এই দিনের বন্যায় চুঁচুড়া শহরও ভাসিয়া যায়। তাহার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয়ে "কলিকাতা গেজেটের" সংবাদটি উল্লেখ্যঃ

"The banks of Damonooda (Damodar) have given way and the whole of the plain is under water. Dingeys are plying in the streets of Serampore, and the mud habitations of the natives are falling in every direction."

॥ শ্রীরামপুরের দিনেমার শাসনকর্তাদের নাম ॥

নাম		কার্যকাল
জে, এস, সোয়েটম্যান	—	৮ই অক্টোবর ১৭৫৫ হইতে ১০ই জানুয়ারী ১৭৫৮
বি, এল, জিগেনবাগ	—	১০ই জানুয়ারী ১৭৫৮ হইতে ২রা অক্টোবর ১৭৬০
টি উইণ্ডেলকাইড	—	২রা অক্টোবর ১৭৬০ হইতে ১৪ই আগষ্ট ১৭৬২
ডিমারচেস	—	১৪ই আগষ্ট ১৭৬২ হইতে ৩রা অক্টোবর ১৭৬৫
এম. টায়ারহোম	—	৩রা অক্টোবর ১৭৬৫ হইতে ২০শে জানুয়ারী ১৭৬৭
এম, এফ থেডি	—	২২শে জানুয়ারী ১৭৬৭ হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী ১৭৬৮
চার্লস্‌ ক্যাজেনোভ	—	১লা ফেব্রুয়ারী ১৭৬৮ হইতে ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৭৭০
জেমস ব্রাউন	—	১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৭৭০ হইতে ২৯শে আগষ্ট ১৭৭০
এইচ, এফ, হিনকেল	—	২৯শে আগষ্ট ১৭৭০ হইতে ১১ই সেপ্টেম্বর ১৭৭০
জে, এল, ফিক্স	—	১৪ই সেপ্টেম্বর ১৭৭০ হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৭৭২
ওলি বাই	—	৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৭৭২ হইতে ২৮শে ডিসেম্বর ১৭৭২
জে এল, ফিক্স	—	২৮শে ডিসেম্বর ১৭৭২ হইতে ২৭শে আগষ্ট ১৭৭৩
এ্যাণ্ড্রিয়েস হিয়ারনক	—	২৭শে আগষ্ট ১৭৭৩ হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৭৭৬
ওলি বাই	—	২৬শে সেপ্টেম্বর ১৭৭৬ হইতে ৩০শে জানুয়ারী ১৭৮৫
এফ, এল, ফিব্রী	—	৩০শে জানুয়ারী ১৭৮৫ হইতে ২৮শে জুলাই ১৭৮৮
ওলি বাই	—	২৮শে জুলাই ১৭৮৮ হইতে ৭ এপ্রিল ১৭৯৭
পিটার হারমন্স	—	৭ই এপ্রিল ১৭৯৭ হইতে ১৮ই জানুয়ারী ১৭৯৯
জেকব ক্রাফটিং	—	১৮ই জানুয়ারী ১৭৯৯ হইতে ১ জুন ১৭৯৯
ওলি বাই	—	১লা জুন ১৭৯৯ হইতে ১৮ই মে ১৮০৫
জেক্‌ব ক্রাফটিং	—	১৮ই মে ১৮০৫ হইতে ৭ই অক্টোবর ১৮২৫
জে, এস, হলেনব্রীস	—	৭ই অক্টোবর ১৮২৫ হইতে ১১ই মে ১৮৩৩
জে, সি, বেয়েক	—	১২ই মে ১৮৩৩ হইতে ১লা নভেম্বর ১৮৩৫
জে, রেখলিং	—	১লা নভেম্বর ১৮৩৫ হইতে ১লা মে ১৮৩৮
পিটার হ্যানসেন	—	১লা মে ১৮৩৮ হইতে ১০ই অক্টোবর ১৮৪৫

শ্রীরামপুরে বর্গীর আগমন আশঙ্কা ॥ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বর্গীগণ হুগলীর সান্নিধ্যে আসিয়া ভীষণ উপদ্রব করে। দিনেমার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বর্গীদের আগমন আশঙ্কায় ভীত হইয়া ইংরাজ কাউন্সিলের নিকট কামান ও গোলাবারুদ প্রার্থনা করিয়া পত্র দেন। পত্রখানির মর্ম এইরূপ ঃ

ফ্রেড্রিক্স নগরস্থ ভদ্রলোকগণ বর্গীর আগমন আশঙ্কায় ভীত হইয়াছেন। বর্গীর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার নিমিত্ত চারটি কামান ও তদুপযুক্ত গোলাবারুদ ও অস্ত্র পাইলে অনুগৃহীত হইব। (প্রসিডিংস নং ৪৪৫, ১১ ফেব্রুয়ারী ১৭৬০)

কাউন্সিলের উত্তরঃ আপনাদের প্রার্থিত কামান ও গোলাবারুদ এবং অস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করা কাউন্সিলের সাধ্যাতীত। তবে কাউন্সিল অনুমান করেন যে ক্যাপ্টেন পিয়ার্স যতদিন ফ্রেড্রিক্সনগরের সান্নিধ্যে বাস করিবেন, ততদিন দিনেমারগণের ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

॥ বৈদ্যবাটী ॥

বৈদ্যবাটী শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান; অক্ষাঃ ২২° ২৭´ ২৫˝ উত্তর এবং ৮৮° ২২´ ২০˝ পূর্বে অবস্থিত। বৈদ্যবাটী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্বে এই স্থানে বহু চিকিৎসক বা বৈদ্য বাস করিতেন বলিয়া এই স্থান বৈদ্যবাটী বলিয়া খ্যাত হয়। ভাগীরথী তীরবর্তী এই প্রাচীন স্থানটি কলিকাতা হইতে মাত্র চৌদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত

বৈদ্যবাটী নামটি খুব প্রাচীন না হইলেও এই স্থানটি খুব প্রাচীন কারণ এই স্থানের প্রসিদ্ধ নিমাই-তীর্থের ঘাট সম্বন্ধে বঙ্গের প্রাচীন কবিরা সকলেই কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানের নিম গাছে জবা ফুল ফুটিয়াছিল বলিয়া, এই স্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করিবার জন্য যখন গিয়াছিলেন, সেই সময় ভাগীরথী তীরের এই ঘাটে কিছুদিন তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন সেইজন্য তাঁহার অন্য নাম 'নিমাই' হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার জীবনচরিতে লিখিত আছে।

চারশত বৎসর পূর্বে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার চণ্ডীকাব্যে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ত্রিবেণী এবং নিমাই তীর্থের ঘাটের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর প্রভৃতির কোন কথা নাই। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে একমাত্র **ত্রিবেণী** ও **নিমাইতীর্থ** ব্যতীত এই অঞ্চলে অন্য কোন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল না। শ্রীচৈতন্যের জীবনী, ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, অযোধ্যা রামের সত্যনারায়ণের পাঁচালী কাব্য, দেবগণের মর্ত্যে আগমন গ্রন্থে নিমাইতীর্থের নাম আছে। কবিকঙ্কনের চণ্ডী কাব্য হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি এই স্থানে উদ্ধৃত হইলঃ

"বামদিকে হালিসহর, দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দুকূলে যাত্রীর রবে কিছুই না শুনি॥
গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে ভাগীরথী।
কপোত এড়ায়ে সাধু পাইল সরস্বতী॥
উপনীত হইল সাধু নিমাই তীর্থের ঘাটে।
নিমের বৃক্ষেতে যথা ওর ফুল ফুটে॥"

দীনবন্ধু মিত্র সুরধুনী কাব্যে বৈদ্যবাটী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও উল্লেখ্যঃ

ভদ্রপল্লী বৈদ্যবাটী পণ্ডিতের বাস
শাস্ত্র-আলাপন যথা হয় বারমাস।

বৈদ্যবাটী ও সেওড়াফুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং একটি মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত; কেবল ডানকুনীর খাল পূর্বোক্ত স্থান দুইটিকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। এই স্থানের ইতিহাস প্রসিদ্ধ **সেওড়াফুলি রাজবংশ** অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত এবং

ইহাদের গৌরবে বৈদ্যবাটি গৌরবান্বিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা মনোহর রায় এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের আদি নিবাস ছিল কাটোয়ার অনতিদূরে পাটুলি নামক গ্রামে; পৈত্রিক সম্পত্তি বণ্টনানুসারে ইনি সেওড়াফুলিতে বাস করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ বংশবাটী, শিবপুর, রাজহাট প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

হান্টার সাহেব "ইম্পিরিয়্যাল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ

Baidyabati Municipality an important market town on the Hugli river, Hugli district, Bengal and a station on the East Indian Railway, 15 miles from Calcutta. A market said to be the largest in Bengal, is held here twice a week.

দিনেমারগণ প্রথমে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে গোন্দলপাড়ায় বাস করেন; পরে ফরাসী এজেন্ট মাসিয়ে ল'র চেষ্টায় নবাবের অনুমতিক্রমে রাজা মনোহর রায়ের নিকট হইতে আকনা ও পেয়ারাপুর গ্রাম বন্দোবস্ত করিয়া শ্রীরামপুরে বাস করেন। অতঃপর ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তাহার পুত্র রাজচন্দ্রের নিকট হইতে ষাট বিঘা জমি বার্ষিক ১৬০১৲ টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া কুঠি নির্মাণ পূর্বক ব্যবসা আরম্ভ করেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারগণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সাড়ে বার লক্ষ টাকায় তাহাদের ভারতীয় অধিকার বিক্রয় করেন; বিক্রয়ের সন্ধিপত্রের ৬ষ্ঠ দফায় ভারতীয় সম্পত্তির মধ্যে তাঞ্জোরের রাজাকে বার্ষিক এক শত ষাট সিক্কা (কোম্পানির ১৭০৮৲ টাকা) রাজস্ব দেওয়া ব্যতীত ইংরাজদের আর কোন দায়িত্ব রহিল না বলিয়া লিখিত আছে।

বর্তমানে শ্রীরামপুরের বিচারালয় ও তৎপার্শ্বস্থিত সামান্য কিছু স্থান ব্যতীত ইহাদের হস্তে আর অন্য স্থানগুলি নাই বলিয়া ইহারা অদ্যাপি পূর্বোক্ত সর্তানুযায়ী সরকারের নিকট হইতে বার্ষিক ৪৮।১০ টাকা রাজস্ব পাইয়া থাকেন।

সেওড়াফুলি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মনোহর রায়, দান ও বহু দেব-দেবীর বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১১৪১ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তিনি রাজবাটীতে **শ্রীশ্রীসর্বমঙ্গলা দেবীর** সেবা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার পূজা নির্বাহের জন্য শ্রীরামপুরের বহু সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দেন; বর্তমান শ্রীরামপুর কোর্ট প্রভৃতি উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার পিতা বাসুদেব রায়ের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি **বাসুদেবপুর** নামে একটি গ্রাম তাহার পিতার নামে স্থাপন পূর্বক তথায় একটি মন্দিরে স্বীয় পিতার একটি প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেবা ও পূজাদির জন্য এক শত কুড়ি বিঘা ভূমি দান করেন। ইহা ছাড়া তাঁহার পিতামহ রাজা রাঘবেন্দ্র রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে বৈদ্যবাটিতে রাঘবেশ্বরের শিব মন্দির স্থাপন করেন। বর্তমানে ইহার চূড়াটি ভাঙ্গিয়া যাইলেও, এই সমস্ত প্রাচীন মন্দিরগুলি অদ্যাপি তাহার পুণ্যকীর্তির সাক্ষ্য দান করিতেছে।

মাহেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা পরিচালনের জন্য রাজা মনোহর রায় জগন্নাথপুর নামক পল্লী দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দেশ করিয়া দেন। সেই জন্য স্নানযাত্রা উপলক্ষে সেওড়াফুলি রাজাদের অনুমতি ব্যতীত অদ্যাপি ঠাকুরের স্নান আরম্ভ হয় না।

এতদ্ভিন্ন গুপ্তিপাড়ায় **শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির** তিনি নির্মাণ করিয়া দেন। ১১৫০ সালে তিনি পরলোকগমন করিলে শুকদেব সিংহ একটি "মনোহরাষ্টক" রচনা করেন; উহা হইতে জানা যায় যে, তিনি প্রত্যহ ভূমি দান করিতেন এবং এইরূপ ভূমি দান করিতে করিতে শেষ জীবনে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তাঁহার রাজ্যে এমন কোন গ্রাম ছিল না, যাহার অর্ধেক ভূমি তিনি নিষ্কর দান করেন নাই।

রাজা মনোহরের পুত্র রাজা রাজচন্দ্র রায় পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক বহু দেব কীর্তি স্থাপন করেন। দিনেমারদের ফেড্রিকনগরে তিনি 'শ্রীরামসীতার' সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়া তিন শত বিঘা দেবোত্তর ভূমি প্রদান করায় এই স্থান শ্রীরামপুর নামে প্রখ্যাত হয়। ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন যে, শ্রীপুর, মোহনপুর এবং গোপীনাথপুর শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহের সেবায় দেবোত্তর করিয়াছিলেন বলিয়াই গঙ্গাতীরস্থ শ্রীরামপুর তীর্থস্থান। **কলিকাতায়ও উনি শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দির** নির্মাণ ও তজ্জন্য বহু জমি দান করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গলার দেওয়ানী ভার গ্রহণ করিবার পর ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে, সম্রাট ২য় সাজাহানের মোহরাঙ্কিত এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি বাদশাহী সনন্দ তিনি প্রাপ্ত হন। এই সনন্দে তাঁহাকে তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের ন্যায় রাজস্ব আদায় করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। মূল সনন্দখানি শ্রীরামপুরের উকীল শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নিকট আছে। সনন্দখানি পাঠোদ্ধার করিয়া নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইলঃ

"উত্তরাধিকার ক্রমে দশ আনার সরিক রাজচন্দ্র চৌধুরীকে জানান যাইতেছে, মহম্মদ আমীনপুর ও গয়রহ, মহালের তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত ও মালগুজারী যেরূপ ছিল, তদনুসারে তিনি কার্য করিবেন এবং প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিয়া মাস মাস নিজের স্বাক্ষরে বা তাঁহার মুন্সীর স্বাক্ষরে রাজস্ব পাঠাইবেন। তিনি অন্যায়রূপে এক হিমও কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। বাঙলা ১১৮৩ সন পর্যন্ত যে ভাবে কর আদায় হইয়া আসিয়াছে সেইভাবেই খাজনা আদায় করিতে পারিবেন। যে সকল জমি সলকর দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর মহত্তর আয়মা মদ্দমাস বা পীরোত্তর—এই সকল নিষ্করের উপর কোনও বন্দোবস্ত বা হুজুরের অনুমতি ভিন্ন কোনও প্রকার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন না। সীমা সহরন্দ ঠিক রাখিবেন এবং চোব ডাকাতেব হাত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন। প্রজারা কিস্তি কিস্তি যে সকল টাকা দিবে, তাহা বর্ষে বর্ষে রাজ কোষাগারে চালান দিতে হইবে। সেলামী, নজর বা তহরী লইতে পারিবেন না। রাজকর বাকী পড়িলে প্রাপ্য করের পরিমাণ জমি বিক্রয় করিয়া রাজ করলওয়া হইবে।"

সম্রাট সাজাহানের শিলমোহর (স্বাঃ) **ওয়ারেন হেষ্টিংস**
১১৮৫ সাল ২৭ অগ্রহায়ণ। ১০ই ডিসেম্বর ১৭৭৮

পরবর্তীকালে লর্ড ওয়ারেণ হেস্টিংসের বিরুদ্ধে যখন বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টে মোকদ্দমা চলিতেছিল, তখন হেষ্টিংসের স্বপক্ষে এই দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র লওয়া হইয়াছিল। উক্ত মোকদ্দমার 'পেপার বুকে' রাজচন্দ্র হেস্টিংসকে প্রশংসাপত্র দিয়াছেলেন।

॥ নিস্তারিণী কালী ॥

রাজচন্দ্রের পৌত্র হরিশচন্দ্র সেওড়াফুলিতে ভাগীরথী তীরে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী, সর্বমঙ্গলা দেবীর অপমৃত্যু হওয়ায় উক্ত পাপ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ১২৩৪ সালে পাষাণময়ী নিস্তারিণী নামক দক্ষিণ কালিকার মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেবা পরিচালনার্থে বহু দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া যান। মন্দিব গাত্রের শ্লোকটি এইঃ

"স্বীয়ে রাজ্যে ভুজঙ্গশ্রুতিশিখরি ধরা গণ্যমানে শকাব্দে।
কালী খাদাভিলাসী স্মরহরমহিষী মন্দিরং তৎপ্রতিষ্ঠাং॥
চক্রে গঙ্গা সমীপে বিগতভল ভয়ঃ শ্রীহরিশচন্দ্র দত্তঃ।
সম্মতির্যস্য রামেশবর ইতি নৃপস্মেন্ত্রী-যত্নেন সার্ধং॥"

নিস্তারিণী কালীমন্দিরের সুবৃহৎ চাতালে বহুদিন হইতে সপ্তাহে দুইদিন করিয়া পানের বাজার বসে। এই বাজার হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার পান সারা ভারতবর্ষে চালান যায়।

'বাংলার তীর্থ' নামক গ্রন্থে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখিয়াছেন ঃ অত্যাচারবিধ্বস্ত পাকিস্তানের এক মন্দির হইতে নিম্নোক্ত চারিটি বিগ্রহ নিস্তারিণীর মন্দিরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। (১) কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত বৃষবাহন ও দ্বিভুজা সুদৃশ্য ভৈরবমূর্তি, (২) বর-চক্র-গদা-অভয়ধরী তাম্রনির্মিত মহাবিষ্ণুমূর্তি. (৩) পিতল নির্মিতা চতুর্ভুজা মহালক্ষ্মী-মূর্তি, (৪) পিতল নির্মিতা দ্বিভুজা ও উপবিষ্টা অন্নপূর্ণামূর্তি—দেখিতে অনেকটা মঙ্গলচণ্ডীর মত। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। সেওড়াফুলি রাজবংশের আদি বাস পাটুলিতে ছিল. তথায় রাজবংশের কয়েকটি মন্দির ভগ্ন হইলে, রাজবংশের নির্মলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপরোক্ত বিগ্রহগুলি পাটুলি হইতে আনিয়া নিস্তারিণী মন্দিরে প্রাত্যহিক পূজার জন্য সংরক্ষণ করেন। **বিগ্রহগুলি পাকিস্তান হইতে কোন সময় আসে নাই।**

॥ বৈদ্যবাটীর হাট ॥

বৈদ্যবাটীর হাট বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ; এইরূপ হাট হইতে বহু অর্থ উপার্জ্জন হয় দেখিয়া ১২২৭ সালে মুন্সি গোলাম হোসেন নামক এক ধনী ব্যক্তি বৈদ্যবাটীর উত্তরে এক নূতন হাট বসান। হরিশচন্দ্র তাঁহার হাটটি বজায় রাখিবার যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু পরে উক্ত হাট রাখিতে অকৃতকার্য হওয়ায়, তিনি সেওড়াফুলিতে একটি নূতন হাট প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্বন্ধে ১২২৭ সালের ২২শে শ্রাবণ সমাচার দর্পণে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ

"শ্রীযুক্ত মুন্সী গোলাম হোসেন মোং বৈদ্যবাটীর উত্তরে কোম্পানীর বাঁধা রাস্তার পূর্বে গঙ্গার পশ্চিম তীরে নূতন গঞ্জ ও হাট বসাইতেছেন সেখানে দোকানঘর প্রায় দশবারখান প্রস্তুত হইতেছে আরও অনেক এমত উদ্যোগ অনেক হইতেছে এবং সেখানকার গঙ্গার পোস্তা বাধান যাইবে সেখানকার প্রজা লোকেরদিগকে আপন আপন ঘর বাড়ীর মূল্য দিয়া উঠাইয়া দিতেছেন তাহারা তাহার উত্তর চাপদানির মাঠে গিয়া বসতি করিতেছে এবং আপন

অধিকারস্থ প্রজাদিগকে এমত শাসন করিয়া দিয়াছেন যে তাহারা কোন প্রকারে বৈদ্যবাটীর পুরাণ হাটে না গিয়া ঐ নূতন হাটে যায় এবং আপনার নূতন হাটে যদি কাহারও দ্রব্যাদি বিক্রয় না হয়, তবে সে দ্রব্য আপনি মূল্য দিয়া লইবার স্বীকার করিয়াছেন এবং কলিকাতায় ব্যাপারী লোকেরা যে জিনিষ পুরাণ হাটে খরিদ করিয়া নৌকা বোঝাই করিত ও কলিকাতাতে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া মুনাফা করিত, তাহারা যদি পুরাণ হাটে না গিয়া নূতন হাটে যায় এবং সেরূপ জিনিষ না পায় তবে ঐ ব্যাপারিদের যে মুনাফা তাহাতে লইত তাহা আপন সরকার হইতে দিবেন। ইহার দুই ফল নূতন গঞ্জ বসান ও পুরাণ গঞ্জ নষ্ট করা এবং বৈদ্যবাটীর জমিদারও পুরাণ হাট বজায় রাখিবার কারণ অনেক চেষ্টা করিতেছেন।"

পূর্বে এইস্থানে দড়ির কারখানা ছিল, কিন্তু এখন তাহা লোপ পাইয়া গিয়াছে।

হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

Rope made of jute and hemp is manufactured in the town.

শুধু খণ্ডিত বা অখণ্ড বাঙলারই নয়, সমগ্র পূর্বভারতে যে কয়টি হাট বর্তমান তাহার মধ্যে বৈদ্যবাটী মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে **"সেওড়াফুলির হাট"** নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে, বিরাটত্বে ও বানিজ্যিক লেনদেনের হিসাবে বিখ্যাত হইয়া আছে। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এই হাটের জন্ম হয়। প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার এই হাটে দূরাগত বণিক ব্যবসায়ী ও কৃষককুলের আগমনের জন্য স্থানটির রূপান্তর ঘটে। পূর্বে নৌকা অথবা গরুর গাড়ীর সাহায্যে মালপত্র, হাটে আসিত কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তারকেশ্বর পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারিত হইবার পর এই হাটের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্বে শেওড়াফুলি হাটের কুমড়ো ছিল অতি প্রসিদ্ধ। এক একটির ওজন ছিল আধ মন। গল্প আছে ইংলণ্ডের ভোজ সভায় এই কুমড়ো আদরের সঙ্গে স্থান পাইত আর শ্বেতাঙ্গগণ "বৈদ্যবাটীর কুমড়ো" শুনিলে লোভার্ত হইয়া উঠিতেন। এই হাটে তিনশোর বেশী বাঁধা আড়ৎ আছে। তাহার বার্ষিক আয় ৬০ লক্ষ টাকা। পাট, আলু, ধান, চাল, খইল, ভূসি প্রভৃতির পাইকারী বিক্রয়কেন্দ্র হওয়ায় এই হাটের লেনদেন অত্যধিক। প্রতি হাটবারে ৫০।৬০ হাজার লোক এই স্থানে সমবেত হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় হাটের ভিতরের রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত ও অপরিচ্ছন্ন। এই হাটের অন্যান্য বিবরণ ২৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বৈদ্যবাটী বা সেওড়াফুলির হাট অভিন্ন।

দীনবন্ধু মিত্র সুরধুনী কাব্যে সেওড়াফুলির হাট সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

বাজারে বেগুন আলু পালমের ঝাড় সুপক্ক কদলী কত সংখ্যা নাহি তার,
গাদায় গাদায় করা হারায়ে পাহাড়; মাসাবধি খাদ্য চলে রামের সেনার।

সেওড়াফুলির হাট **রাজা হরিশ্চন্দ্র রায়** অনেকটা রেষারেষির জন্য প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে আরো দু-একটি বড় বড় হাট তখন বিদ্যমান ছিল। বহু মামলা-মোকদ্দমা ও ঝড়-ঝাপটা সত্বেও এই হাট আজও শিরস্ফীত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

১২৩৯ সালের ফাল্গুন মাসে হরিশ্চন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে তাঁহার দুই রাণী শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী ও শ্রীমতী রাজধন দেবী তাহার অনুমতি অনুসারে

দুইটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন; এই দুইজন হইতেই বড় তরফ ও ছোট তরফ হইয়াছে। ছোট তরফের সম্পত্তি বর্তমানে দৌহিত্রগণ ভোগ দখল করিতেছেন এবং এ্যাডভোকেট নির্মল-চন্দ্র ঘোষ এই রাজবংশের শেষ স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। কৃতবিদ্য এবং বঙ্গের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া তিনি বহু দিন বৈদ্যবাটী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার-ম্যান ছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে সেওড়াফুলিতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভাপতির পদও তিনি অলংকৃত করিয়াছিলেন।

বৈদ্যবাটীর হাট বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ হাট ছিল, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শত বৎসর পূর্বেও কলিকাতার যাবতীয় তরিতরকারী, পাট মাদুর, গুড়, নীল, আলু প্রভৃতি এই হাটে বিক্রয় হইত। পর্তুগীজ ব্যবসায়ীগণ এই স্থানকে দীর্ঘাঙ্গ বা দিগঙ্গ বলিত বলিয়া, পূর্বে এই স্থান উক্ত নামে পরিচিত ছিল বলিয়া মনে হয়। বৈদ্যবাটীর হাট সেওড়াফুলিতে রাজা হরিশচন্দ্র স্থানান্তরিত করেন; তিনি পরলোকগমন করিলে কলিকাতার আশুতোষ দেব (সাতুবাবু) সেওড়াফুলিতে দেবগঞ্জ নামে একটি হাট প্রতিষ্ঠা করেন। সাতুবাবু* উক্ত স্থানে হাট প্রতিষ্ঠা করায় বঙ্গদেশে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন হয়। আজও উক্ত গঞ্জ ছাতুগঞ্জের বাজার বলিয়া চলিতেছে। এই গঞ্জ প্রতিষ্ঠার সময় 'সমাচার দর্পণ' পত্রে (৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৪৫) যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল। এই সংবাদ পাঠে তৎকালীন বঙ্গের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ কিরূপ উৎপীড়ন করিতেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"জিলা হুগলীর সেওড়াফুলির জমিদার প্রাপ্ত হরিশ্চন্দ্র রাজা বৈদ্যবাটীর পুরাতন হাটের স্থান সংকীর্ণ প্রযুক্ত অথবা ঐ হাটে দুই তিন জমিদারের সম্পর্ক থাকাতে বা অন্য কোন কারণ প্রযুক্তই হউক অনেক ব্যয় ব্যসনপূর্বক দরবার করত আপনার জমিদারী সেওড়াফুলিতে ঐ পুরাণ হাট ভাঙ্গিয়া বসান। বিশেষত রাজা অনেক টাকা ব্যয় পূর্বক বহু সংখ্যক ঘর প্রস্তুত করিয়া ঐ সোনার হাট বসাইয়া মাত্র স্বর্গীয় হাট করিতে গেলেন। এইক্ষণে খেদের বিষয় যে এই হাটের উত্তরাধিকারিণী দুই রাজ মহিষী দুই পোষ্য পুত্র করিয়াছেন ঐ বালকেরা এইক্ষণে নাবালক এবং রাণীরাও অবলা জমিদারীও হস্তান্তর ইতিমধ্যে কলিকাতা নিবাসী অতি ধনাঢ্য বাবু শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহাশয় ঐ হাটের নিকটস্থ দেবগঞ্জ নামক এক গঞ্জ বসাইয়াছিলেন, কিন্তু অনেক টাকা ব্যয়ভূষণ করিয়াও তাহাতে প্রায় তাদৃশ্য কৃতকার্য না হওয়াতে এইক্ষণে ঐ নাবালক বালক ও ঐ অবলাদের হাটের উপর বলপ্রকাশ করত ঐ হাট ভাঙ্গিয়া আপনাদের ভগ্ন দেবগঞ্জ পূরণ করিতেছেন এবং শুনা গিয়াছে কলিকাতাস্থ ব্যাপারী লোকদিগকে অনেক টাকা দিয়া ঐ দেবগঞ্জের নীচে ভূরি নৌকা শনি মঙ্গলবারে বন্ধন করিয়া রাখেন যদ্যপি কলিকাতাস্থ ব্যাপারি লোক রাজার

---

*ইহারাই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে 'বাবু' বলিয়া অভিহিত হন; তৎকালে বাবু বলিলে কেবল সাতুবাবু, লাটুবাবু ইহাদের দুই ভাইকেই বুঝাইত।

হাটে না যায়, সুতরাং রাইয়ত লোকের দ্রব্যাদি বিক্রয় না হইলে দেববাবুর হাটে আসিতেই হইবেক। ইহাতে দেববাবুর কিছু পৌরুষ নাই উক্ত রাজা বর্তমান থাকিলে প্রশংসা হইত।"

১২৬২ সালে যদুনাথ সর্বাধিকারী ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থগুলি পরিভ্রমণ করিয়া "তীর্থ ভ্রমণ" শীর্ষক একখানি পুস্তক রচনা করেন, উক্ত পুস্তকে বৈদ্যবাটী সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

"এই চড়াতে আহারাদি করিয়া ১ ক্রোশ আসিয়া গরুটির বাগ, পূর্বপাড় নবাবগঞ্জ তাহার পর পান্ডার ঘাট, পরে এক ১ ক্রোশ বৈদ্যবাটী। এই স্থানে নিমাই তীর্থের ঘাট, ইহার পার্শ্বে দীর্ঘাঙ্গ বা দিগঙ্গ কহে। তরকারীর হাট—কলা, আলু, অধিক বিক্রয় হয়। পূর্বপাড় টিটাগড় বাগান, পশ্চিমপাড়ে সেওড়াফুলি, নিস্তারিণীর বাটী। তারপর দেবগঞ্জ সাতুবাবুর বাজার।"

॥ নিমাইতীর্থের ঘাট ॥

সুদূর অতীতকাল হইতে নিমাইতীর্থের ঘাটে স্নান করা এক মহাপুণ্যজনক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত। নিমাইতীর্থকে কেন্দ্র করিয়া এই স্থানে তিনটী মেলা প্রতি বৎসর হইয়া থাকে, তন্মধ্যে পৌষ সংক্রান্তি ও বারুণী উপলক্ষে একদিন এবং মাঘী পূর্ণিমায় এক সপ্তাহ যাবৎ মেলা বসিয়া থাকে। উক্ত মেলায় দ্রব্যাদি ক্রয় ও স্নান করিবার জন্য প্রতি বৎসর বিশ হাজারের অধিক যাত্রীর সমাগম হয়। পূর্বে যাত্রী সংখ্যা আরও অধিক হইত এবং একমাত্র উড়িষ্যা প্রদেশ হইতেই আট দশ হাজার যাত্রী আসিত। ১২২৭ সাল হইতে ১২৩০ সাল পর্যন্ত বারুণী উপলক্ষে কলেরায় উড়িষ্যার শত শত ব্যক্তি বৈদ্যবাটীতে পরলোকগমন করে; এই সম্বন্ধে ১২২৭ সালের ২৬শে চৈত্র তারিখে প্রকাশিত সমাচার দর্পণের একটী সংবাদ পাঠকগণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল ঃ

মহামহাবারুণী॥ "গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গংগাস্নানে অনেক ২ দেশীয় লোক আসিয়াছিল তাহারা অধিক পথ গমনেতে দুর্বল হইয়া অতিশয় প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তপ্ত জল পান করিয়া ওলাউঠা রোগে অনেক লোক পথে ও মোকাম বৈদ্যবাটিতে মরিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা অতিশয় নির্দ্দয় ঐ বৈদ্যবাটিতে যে ২ লোকের ওলাউঠা হইয়াছিল, তাহারা অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া পলাইল। ইহাতে গঙ্গার তীরে যে ২ অবসন্ন লোক ছিল, তাহার মধ্যে অনেকে জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা পাইয়াছে।"

নিমাইতীর্থের মাহাত্ম্য আজও বাংলাদেশের ভক্তজনের কাছে অক্ষুণ্ণ আছে এবং প্রতি-বৎসর হাজার হাজার পুণ্যলোভাতুর নরনারী বিভিন্ন পালাপার্বণে এইস্থানে পুণ্য অর্জন করিতে আসে। ইহা ছাড়া চৈত্র বৈশাখ শ্রাবণ মাসে ও শিবরাত্রির আগে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে বহু লোক নিমাইতীর্থ হইতে গঙ্গাজল লইয়া হাঁটাপথে তারকেশ্বরে গমন করে। এই ঘাটের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ **ওলাবিবিরতলা** ও পার্শ্ববর্তী ঘাটে বৈষ্ণবদের তীর্থভূমি **বক্কেশ্বরের মঠ** অবস্থিত।

নিমাইতীর্থের পুরাতন ঘাটটী ভগ্ন হইলে চন্দননগরের কাশীনাথ কুণ্ডু উক্ত ঘাটটি সংস্কার করিয়া ঘাটের উপর যাত্রিগণের সুবিধার্থে একটী সুবৃহৎ চাঁদনী নির্মাণ করিয়া দেন। কাশীনাথ কুণ্ডুর দলিলখানি ২৮শে বৈশাখ ১২৩২ সালে লিখিত হইয়াছিল। ১৩৪৮ সালে এই ঘাট হইতে দশম শতাব্দীর পাল রাজত্বকালের একটি অনাদৃত সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রস্তরের খোদিত সূর্যমূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় দুই হাত এবং সূর্য বা বিষ্ণু রথে আরোহণ করিয়াছেন এবং সপ্তাশ্ব রথখানি বহন করিতেছে, ইহাই মূর্তিটিতে প্রকটিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে বিষ্ণুই সূর্য দেবতারূপে ভারতে পূজিত হইতেন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে মাক্সমূলার সাহেব ঋগ্বেদের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন ঃ

The stepping of Vishnu is emblematic of the rising, the culminating and setting of the sun.

পাল রাজত্বকালের এই সূর্যমূর্তিটি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই স্থানে যে পূর্বে পাল রাজত্বে সমৃদ্ধ ছিল, তাহাই প্রমাণিত হয়। বর্তমানে এক সন্ন্যাসী উক্ত সূর্যমূর্তি প্রত্যহ পূজা করেন; বহুবার উহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু সন্ন্যাসী মূর্তিটিকে স্থানান্তরিত করিতে দেন নাই। সম্প্রতি এই মূর্তিটি অপহৃত হইয়াছে।

হুগলী জেলায় পূর্বে ডাকাতির প্রকোপ ছিল। এই প্রসঙ্গে পুরাতন সংবাদপত্র হইতে এই অঞ্চলের একটা ডাকাতির সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি ঃ

"চাতরা হইতে এক ক্রোশ ব্যবহিত পশ্চিমাংশে হরিপুর নামক গ্রামে ২০শে চৈত্র রবিবার রাত্রিযোগে কার্তিক পোদ্দারের বাড়িতে অতি নিদারুণ ডাকাইতি হইয়াছে। দস্যুরা তক্মাচাপরাশ বন্দুকাদি সহিত রাত্রি একাদশঘণ্টাকালে গ্রামের নিকট যাইয়া বন্দুকধ্বনী করিয়া চৌকিদার চৌকিদার বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে এবং কোম্পানী বাহাদুরের লোক বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাতেই চৌকিদার ও ফৌজ্‌দারী গোমস্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, দস্যুরা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কহিল কি করিস্ নানা স্থানে ডাকাইতি কেন হয়, দারোগা কোথায়, চৌকিদার কহিল এখান হইতে সিঙ্গুরথানা দেড় ক্রোশ ব্যবহিত...দস্যুরা চৌকিদারকে ও ফৌজদারী গোমস্তাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল।.........ফৌজদারী গোমস্তা চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল গ্রামস্থ লোকসকল বাহির হও আর কমলা পাইক আবাকি দেখিস ইহারা সরকারী লোক নহে। কমলা পাইক পূর্বে চাতরা নিবাসী গোস্বামী বাবুদিগের বাটীতে চাকর ছিল .দারোগা কমলা পাইক সহিত তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং ঐ গোলমালে দুই দস্যু বহুগুনা পরিপূর্ণ আভরণ লইয়া উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু শেওড়াফুলির দশ আনির জমিদার যোগীন্দ্রচন্দ্র রায়ের চৌকিদাররা তাহাদের ধৃত করিয়া দারোগার হস্তে দিয়াছে শুনিলাম দস্যুদলের মধ্যে কোম্পানী বাহাদুরের নামকাটা সিপাহি বিমা কোম্পানিদিগের এবং বৈকুণ্ঠবাসী ককরেল হৌসের চাপরাশধারি লোক।" (সংবাদ ভাস্কর ১লা চৈত্র ১২৫৫ সাল)।

এই স্থানের **শ্রীশ্রীভদ্রকালী অতি প্রাচীন ও জাগ্রত দেবতা।** পুষ্করিণী খননকালে এই মূর্তি আবিষ্কৃত হয় এবং এক সন্ন্যাসী উহাকে পূজা করিতেন। সন্ন্যাসী পরলোকগমন করিলে রাজা মনোহর রায় উক্ত স্থানে ভদ্রকালীর মন্দির নির্মাণ করিয়া তারকেশ্বরের মোহান্তের হস্তে ইহার পরিচালনার ভার দেন। তারকেশ্বরের খাতাপত্রে ইহা বৈদ্যবাটীর মঠ বলিয়া লিখিত আছে। পরিচালকদের অবহেলায় ইহার যাত্রীনিবাস ভাঙিগয়া গিয়াছে। ১১১০ সালে ভদ্রকালীর মন্দির নির্মিত হয়।

॥ মধুসূদন গুপ্ত ॥

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইলে সর্বপ্রথম যিনি শবব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন সেই **পণ্ডিত মধপ্রসূদন গুপ্ত** এই স্থানে বক্সী-বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আয়ুর্বেদ শিক্ষাকল্পে বৈদ্যক-শ্রেণী ছিল। পণ্ডিত মধুসূদন উক্ত বৈদ্যক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। পরে বৈদ্যক শ্রেণীর অধ্যাপক ক্ষুদিরাম কবিরাজ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিলে মধুসূদন গুপ্ত ৬০৲ বেতনে তাহার স্থলে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারী সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণী লোপ পায় এবং মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইলে, তিনি ইহার সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন মেডিক্যাল কলেজ খোলা হয় এবং যাহারা কলেজে ভর্তি হন, তাহারা মাসিক সাত টাকা হইতে বার টাকা পর্যন্ত বৃত্তি পান। বিদেশী চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে সর্বপ্রথম কেহই অগ্রসর হন নাই। সেইজন্য মাসিক বৃত্তি দিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং পঞ্চাশটি যুবক প্রথম কলেজে ভর্তি হন। যাঁহারা সর্বপ্রথম ভর্তি হন তাহাদিগকে ফাউণ্ডেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী মধুসূদন তাঁহার উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত; রাজকৃষ্ণ দেব* ও অন্য একজন ছাত্রকে লইয়া শবব্যবচ্ছেদ করেন। মেডিক্যাল কলেজে সেই-জন্য মধুসূদনের একটি তৈলচিত্র রক্ষিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে কলেজের শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত বিবরণী হইতে নিম্নোক্ত কথাগুলি জানা যায়ঃ

It was in commemoration of this act that Dr. Drinkwater Bethune, a member of the Supreme Council of India presented to the college in 1850, a potrait of Madhusudan painted by Mrs. Belnos.

তিনি যে দিন শবব্যবচ্ছেদ করেন, সেই দিন কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টের ১ম খণ্ডে এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে।

The teaching was given in English ; and the courage of Pandit

* ছাত্রদের মধ্যে প্রথম রাজকৃষ্ণ দেব শব ব্যবচ্ছেদ করেন।

Madhusudan Gupta in defying an ancient prejudice by beginning the dissection of the human body, marks in era in the history of Indian education almost as important as Macaulay's minute.

পণ্ডিত মধুসূদনের ছাত্রবন্ধু শ্রীনাথ চক্রবর্তী (শ্রীরামপুর) এবং তাঁহার পুত্র গোপাল-কৃষ্ণ গুপ্ত মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের ছাত্র ছিলেন এবং উভয়ে কলিকাতা হইতে পদব্রজে তিরিশ মাইল পথ হাঁটিয়া প্রত্যহ দেশে যাতায়াত করিতেন। তাঁহাদের একটি ডায়েরী শ্রীনাথ চক্রবর্তীর পৌত্র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নিকট আছে।

মধুসূদন হুপারের একখানি প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-গ্রন্থ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 'লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া' ও ১২৫৯ সালে এনাটোমির বঙ্গানুবাদ করিয়া শারীরবিদ্যা ১ম ভাগ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি গতায়ু হন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি বৈদ্যবাটিতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন।

দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধুনী কাব্যে' মধুসূদন গুপ্তের বিষয় এই লিখিয়াছিলেনঃ

দেয়ালে রয়েছে মধু ছবিতে চাহিয়ে,
শিখেছিল এনাটমি আগে জাত দিয়ে।

পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য বৈদ্যবাটী হইতে বিলাতে যান এবং ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় ব্যবসা করেন। তৎকালে কলিকাতার তিনি অন্যতম প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। অরিজিন্যাল অ্যাবোড অফ ইণ্ডো এরিয়ান রেসেস নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি পরলোকগমন করেন। ইহার পর ডাঃ শ্যামাপ্রসন্ন গুপ্তও বিলাত হইতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়া-ছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েব গৃহশিক্ষক সাব-জজ বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মনোহর মুখোপাধ্যায় (সিভিল-সার্জেন), কেশবচন্দ্র হাজরা (জামতাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক) ক্ষেত্রকুমার গুপ্ত, সূর্যকুমার আঢ্য, নিখিলেশ সেন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যবাটীতে পূর্বে মুন্সেফ কোর্ট ছিল এবং এই স্থানের পণ্ডিত অভয়চরণ তর্কপঞ্চানন ১৮৩১ হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৈদ্যবাটীতে মুন্সেফ ছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তিনি হুগলী কলেজের সুপারেণ্টেণ্ডিং পণ্ডিত নিযুক্ত হন এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বব তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি 'দায়-রত্নাবলী' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বাঙলার বাহিরে বৈদ্যবাটীর রায় সাহেব গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক অতুলচন্দ্র দত্ত রায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গিরিশ বাবু সিমলা কালীবাড়ি ও তত্রস্থ দুর্গাপূজাব প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। অতুলবাবু আগ্রা সেন্ট জন্স কলেজে অধ্যাপনা করিতেন এবং তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৈদ্যবাটীর অন্যতম দানশীল জমিদার **নৃসিংহচন্দ্র নন্দী** ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষাভাষী

অধ্যুষিত দেওঘরে বাঙালী বালিকাদের, শিক্ষার জন্য "নৃসিংহচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করিয়া দেন এবং পরিচালনার জন্য পৌরসভাকে অর্থ দান করেন। দেওঘরে ইহাই বালিকাদের একমাত্র বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে বিহার সরকার এই বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে একটি হিন্দী বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছে। সরকারী দখলে যাইবার পর নৃসিংহচন্দ্র নামটি এখন বিলুপ্ত হইয়া ইহার নূতন নাম হইয়াছে "সরকারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়"। দেওঘরে "কন্যা পাঠশালা" নামে একটি হিন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় আছে, কিন্তু সরকার তাহা গ্রহণ করেন নাই। দাতার নামটি পর্যন্ত বিলুপ্ত হওয়ায় আমরা বিশেষ দুঃখিত।

সেওড়াফুলিতে ১২ শ্রাবণ ১৩৫৭ সালে বজ্রাঘাতে একসঙ্গে পাঁচ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তাঁহারা একটি দড়ির কারখানায় কাজ করিবার সময় কারখানার নিকট বজ্রপতনের ফলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুর্ঘটনায় যাঁহারা মারা যান তাহাদের নাম ঃ কালীচরণ মালিক, সহদেব মালিক, বলাই মণ্ডল, গৌর মণ্ডল ও নিতাই মালিক।

॥ টেকচাঁদ ঠাকুর ॥

টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) নিবাস হুগলী জেলার পানিশেওলায় হইলেও, এই বৈদ্যবাটী গ্রামে বসিয়া তিনি বঙ্গভাষায় প্রথম উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করেন। আলালের ঘরের দুলাল সরল বাঙলা গদ্যের আদর্শ, ইহার ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এতই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে, উত্তরকালে তিনি লিখিয়াছিলেন—"যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।" দীনবন্ধু মিত্র টেকচাঁদ ঠাকুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

"সহজ ভাষার পাতা, পণ্ডিত বিশাল,
প্যারীচাঁদ 'আলালের' ঘরের দুলাল।"

টেকচাঁদ ঠাকুরের রচনার নিদর্শন নিম্নে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল ঃ

"কিয়ৎক্ষণ পরে বর মণিরামপুরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল—বর দেখতে রাস্তার দোধারি লোক ভেঙ্গে পড়িল—স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—ছেলেটির স্ত্রী আছে বটে—

"বৃষ্টি খুব এক পশলা হইয়া গিয়াছে, পথঘাট পেঁচ পেঁচ সেঁত সেঁত করিতেছে। আকাশ নীল মেঘে ভরা, মধ্যে হড় হড় শব্দ হইতেছে, বেঙগুলা আশেপাশে বাঁওকো বাঁওকো করিয়া ডাকিতেছে।" টেকচাঁদ ঠাকুরের বিষয় ৪৩৬ ও ১১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

॥ মাতঙ্গী পূজা ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া হইতে প্রথম বারোয়ারী বা সর্বজনীন পূজা আরম্ভ হয়। ১২২৮ সালের শ্রাবণ মাসে বৈদ্যবাটীতে সর্বজনীন মাতঙ্গী পূজার অনুষ্ঠান হয় এবং হাজার হাজার নরনারী বহু দূরদেশ হইতে উক্ত পূজা দেখিতে

আসেন। এই পূজার সম্বন্ধে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখের 'সমাচার-দর্পণে' যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

"বৈদ্যবাটীর বারএয়ারী মাতঙ্গী পূজা হইতেছে ২৩শে শ্রাবণ সোমবার। পূজা হইয়াছিল কিন্তু ২৬ রোজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রতিমা ছিলেন। তাহাতে প্রতিমার সৌন্দর্য্য অতি আশ্চর্য্য এবং পূজার পারিপাট্য বিত্তশাঠ্য ও চিত্তকাপট্য রহিত এবং গীতাবাদ্য প্রতিবাদ্যকরণ নিষ্প্রয়োজন, সেই ইহার আদ্য প্রয়োজন। এই পূজার পূর্বাপর পাঁচ-সাতদিন রথযাত্রার মত লোকযাত্রা হইয়াছিল বিশেষত ইহাতে আটপ্রকার সং হইয়াছিল। সে অতি অদ্ভুত তাহা দেখিলে কৃত্রিম জ্ঞান প্রায় হয় না।"

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যবাটী মিউনিসিপ্যালিটি প্রথম স্থাপিত হয় এবং শেওড়াফুলি রাজবংশের গিরীন্দ্রচন্দ্র রায় এই মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত অমর সেন মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান চেয়ারম্যান। মিউনিসিপ্যাল সীমাবেষ্টিত স্থানের পরিমাণ মাত্র সাড়ে তিন বর্গমাইল এবং ইহা চারিটি ওয়ার্ডে বিভক্ত। ইহার মধ্যে দশ মাইল পাকা রাস্তা ও কুড়ি মাইল কাঁচা রাস্তা আছে এবং চারি হাজার বাড়ি আছে। 'অকল্যাণ্ড-হাউস' নামক এক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভবন এই স্থানে আছে: নীলকর সাহেবগণ এই ভবন নির্মাণ করেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু বৎসর এই সুরম্য বাগান-বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক বিজলী বাতির প্রবর্তন হইলে ডক্টর মেঘনাদ সাহা সর্বপ্রথম এই স্থানের আলো জ্বালাইয়াছিলেন।

বৃহৎ শিল্প না থাকায় বৈদ্যবাটী পৌরসভার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ইস্টার্ন বেল্টিং ও কটন মিলস ছাড়া তিনটি হিমঘর ও কয়েকটি ইট ও টালির কারখানা এই স্থানের উল্লেখযোগ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান। কুটিরশিল্পের মধ্যে কুমোরপাড়ার মাটির দ্রব্যাদির সুনাম আছে। বৈদ্যবাটীর **রাঘবেশ্বর শিব** একটি দর্শনীয় বিগ্রহ।

সেওড়াফুলির হাটে বহু প্রাচীন কাল হইতে **ব্রহ্মা পূজা** অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। তদুপলক্ষে হাটে যাত্রা, পুতুল নাচ প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়।

সেওড়াফুলিতে নূতন বাজার

সেওড়াফুলি পাওয়ার হাউসের নিকট জি টি রোডের পার্শ্বে নবনির্মিত "ঘোষ মার্কেট" বলিয়া একটি নূতন বাজার হইয়াছে। সেওড়াফুলি চ্যাটার্জী পাড়া, পোটো-পুকুর, নেতাজী সুভাষ রোড প্রভৃতি অঞ্চলের জনসাধারণের দৈনিক বাজারের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য হুগলী জেলার খাতনামা শিল্পপতি শ্রীসুরেন্দ্র-নাথ ঘোষ বহু অর্থব্যয়ে আধুনিক ধরণের ঘর, রাস্তা, ড্রেন, আলো ও জলসরবরাহের ব্যবস্থাদিসহ উক্ত বাজার নির্মাণ করিয়া দেন।

১৩৬৫ সালের ২৭ ফাল্গুন মন্মথনাথ পাত্র সেওড়াফুলিতে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরগাত্রে একটি ফলকে লেখা আছেঃ

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিধু-জয়তু

পাত্রবংশ সমুদ্ভূত ভূতনাথ সুত।
ভূতমণি গর্ভজাত সেবক মন্মথ॥
শ্রীভগবান আচার্য প্রভু ইষ্টদেবে।
অনুক্ষণ স্মরি তাঁর সেবক সম্ভবে॥
তেরশত পঞ্চষষ্ঠি বঙ্গাব্দ ফাল্গুনে।
শ্রীমন্দির সহ সৌর সপ্তবিংশ দিনে॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ মূর্তি হৃদয়মোহন।
সেবা প্রকটন লাগি করিলা স্থাপিত॥

॥ বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি ॥

সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের পীঠস্থান বৈদ্যবাটীর গৌরবময় ঐতিহ্যের একনিষ্ঠ বাহক হিসাবে বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি বিদ্বৎ ও সুধী সমাজের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন স্থানীয় যুবকদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে ইহার নাম ছিল "ইয়ং মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন"। যুবক সমিতি কর্তৃক এখন একটি গ্রন্থাগার, শিশু বিভাগ ও মহিলা বিভাগ পরিচালিত হয়। ইহা ছাড়া সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র এবং সমাজশিক্ষা ও যুবসংগঠক প্রতিষ্ঠানরূপেও যুবক সমিতি এই অঞ্চলে বিশেষভাবে সমাদৃত। ডাঃ যতীন্দ্রনাথ সেন ও হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে পশুপতি বসু তাঁহার পিতা শরৎচন্দ্র বসুর স্মৃতিরক্ষার্থে প্রদত্ত অর্থে সমিতির সুপরিসর সভাগৃহ নির্মিত হয। ভবনের জন্য জমি দান করেন অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলাবতী দেবী। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় **"শরৎচন্দ্র বসু স্মৃতিমন্দির"** ও **"ভোলানাথ ঘোষ স্মৃতি পাঠকক্ষের"** উদ্বোধন করেন। বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিকের পদচিহ্ন এই সমিতি ধারণ করিয়াছে। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ঃ

There is a public Library & Hall and Reading Room which is a real credit to this place. It has about 10000 books. .the History section being really a good collection. (At the Cross Roads)

বৈদ্যবাটীতে ছেলেদের শিক্ষালাভের জন্য "বনমালী মুখার্জী ইনষ্টিটিউশন" নামে একটিমাত্র বিদ্যালয় ছিল এবং মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য শ্রীরামপুরে যাইতে হইত। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃকালে ছেলেদের বিদ্যালয় ভবনে বালিকা বিভাগের প্রথম উদ্বোধন হয়। **সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতন** সেওড়াফুলির শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষের চেষ্টায় ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী বর্ধমানের মহারাণী রাধারাণী মহাতাব কর্তৃক উদ্বোধন হয়। বালক বিভাগ, বালিকা বিভাগ ও প্রাথমিক বিভাগ এই শিক্ষালয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই বিদ্যালয়ের

"অনুশীলন হল" অনুশিলা ঘোষের নামে নির্মিত হইয়াছে। একটি ফলকে লেখা আছেঃ "আমাদের পরমাধ্যা মাতা শ্রীমতী অনুশিলা ঘোষের পুণ্যনামে এই ভবনটি উৎসগীকৃত হইল। শ্রীবিমলকুমার ঘোষ, শ্রীশ্যামলকুমার ঘোষ, শ্রীঅমলকুমার ঘোষ, শ্রীকমলকুমার ঘোষ ও শ্রীনিমাইকুমার ঘোষ।" **চারুশীলা বসু বালিকা বিদ্যালয়** ৫ পৌষ ১৩৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইহা ছাড়া বিহারী লাইব্রেরী, দেবীপ্রসাদ পাঠাগার, শুভতলা পাঠাগার প্রভৃতি গ্রন্থাগার এই অঞ্চলের শিক্ষাক্ষেত্রে গৌরবময় স্থান দখল করিয়া আছে। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানরূপে ভাগীরথী নাট্যসমাজ, সান্ধ্য সমিতি, হরিসাধন সমিতি, বান্ধব নাট্যসমাজ, ইন্দো-সোবিয়েত কালচার এ্যাসোসিয়েশন, শ্রীদুর্গা নাট্যসমাজের নাম উল্লেখ্য। সেবাপ্রতিষ্ঠানরূপে দাতব্য চিকিৎসালয়, অপরূপা মাতৃসদন, জনসঙ্ঘ ও কর্মীসঙ্ঘ বৈদ্যবাটীর উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

এতদ্ব্যতীত বৈদ্যবাটী ক্লাব, ইউনাইটেড রিক্রিয়েশন ক্লাব, তরুণ ব্যায়াম সঙ্ঘ, সেওড়াফুলি ক্লাব, নবারুণ সংঘ, প্রগতি সঙ্ঘ, সবুজ সঙ্ঘ, উদয়ন সঙ্ঘ, নবোদয় ক্লাব, মিলনী, উইক এন্ড ক্লাব যুবসংগঠক প্রতিষ্ঠানরূপে এই অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মুখপাত্ররূপে ডাঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিকপত্র "কেয়া" সুধী-সমাজের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ১৩৪৭ সালে কেয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। পল্লীডাক, নববিধান, ইঙ্গিত, স্ফুলিঙ্গ, পাঞ্চজন্য প্রভৃতি আরো কয়েকটি সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা এই স্থান হইতে প্রকাশিত হয়। সেওড়াফুলি রাজবংশ ও চাঁপদানীর জমিদার মুখোপাধ্যায় পরিবারের দান সেওড়াফুলি-বৈদ্যবাটীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। কর্মবীর ও দাতা হিসাবে শ্রীপশুপতি বসু, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীচণ্ডীচরণ কুণ্ডুর নাম এতদ্ অঞ্চলে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। শ্রীবসু বালিকা বিদ্যালয়ে ৩৫ হাজার টাকা দেন।

পূর্বে তারকেশ্বরের তীর্থযাত্রীদের জন্য এইস্থানে একটি ডাকবাংলো স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাই এই অঞ্চলের প্রাচীনতম বাংলো। এখন বহু যাত্রী পদব্রজে বৈদ্যবাটী হইতে গঙ্গাজল লইয়া তারকেশ্বরে যান। কোম্পানীর আমলে বৈদ্যবাটীতে থানা ছিল, কিন্তু শ্রীরামপুরে থানা স্থাপিত হইলে, এই স্থানের থানা সিঙ্গুরে চলিয়া যায়। এখন বৈদ্যবাটীতে পুলিশ ফাঁড়ি আছে।

বৈদ্যবাটীতে সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানরূপে মহামায়া সাহিত্য মন্দির ও মধুচক্র সাহিত্য সংসদের পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট সুনাম আছে। মহামায়া সাহিত্য মন্দিরের সহিত সংযুক্ত **সারদাচরণ মিউজিয়াম** বেসরকারী সংগ্রহশালারূপে এই অঞ্চলের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সংগ্রহশালায় পুরাবস্তু, খনিজ সম্পদ, ভূমিজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ, ভাস্কর্য, চিত্র, বর্ণনাত্মক চিত্র, চারুকলা, হস্তশিল্প, ললিতকলা, কুটিরশিল্পের নমুনা, মুদ্রা, অলংকার, অস্ত্র, শিলালিপি, তাম্রশাসন, দলিল, পরোয়ানা ও বাদ্যযন্ত্র সংগৃহীত আছে। ডঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী জেলার অন্যতম সুসন্তান ভারতবিখ্যাত বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে এই ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহশালা স্থাপন করেন। যাঁহারা

ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতির অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করেন এই গবেষণাগার তাঁহাদের নূতন পথের সন্ধান দিবে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মহামায়া সাহিত্য মন্দিরের অন্যতম শাখা হিসাবে এই সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণ ও সরকারের এই প্রতিষ্ঠানের যাহাতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহা দেখা উচিত। মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হুগলী জেলা হইতে প্রাপ্ত পুরবস্তুর আলোকচিত্র এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল।

সম্প্রতি বৈদ্যবাটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের একটি, কান, নাক ও গলা চিকিৎসা বিভাগের উদ্বোধন হয়। সেওড়াফুলির ব্যবসায়ী শ্রীবৈদ্যনাথ ভকত তাঁহার পরলোকগত পুত্র দুর্গাদাস ভকতের স্মৃতি রক্ষার্থে এই বিভাগটি নির্মাণ করিয়াছেন। এই দাতব্য চিকিৎসালয়টি একশত বৎসর ধরিয়া জনসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছে। ডাঃ এস কুণ্ডু এই বিভাগটি পরিচালনা করিতেছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যবাটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পাশে ১৩৫৯ সালে পঞ্চানন সাহা তাঁহার স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার্থে **অপরূপা মাতৃসদন** নাম দিয়া বৈদ্যবাটীতে মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল সমিতি স্থাপন করিয়াছেন।

॥ রিষড়া ॥

বর্তমানে রিষড়া শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত একটি তৃতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যাল শহর; হাওড় ষ্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র এগার মাইল। বা সতের কিলোমিটার। এই শহরের আয়তন ২·৪ বর্গমাইল ও ১৯৬২ সালের জনসংখ্যা ৩৮ হাজার ৫ শত ৮০ জন। বর্তমান জনসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের উপর। পূর্বে ইহা যখন একটি সুসমৃদ্ধ গণ্ডগ্রাম ছিল এখনকার তুলনায় তখন এই অঞ্চল অধিকতর সুসমৃদ্ধ ছিল। তখন দিনেমারদের জাহাজ পর্যন্ত এখানে লাগিত এবং রিষড়া তখন একটি ছোটখাট বন্দর বলিয়া প্রখ্যাত ছিল।

শতাধিক বৎসর পূর্বেও রিষড়াতে দিনেমারগণের ছাপা কাপড়ের একটি বড় কারখানা ছিল। কারখানাটি দীর্ঘকাল ধরিয়া একে একে বহু ইউরোপীয়দের হাতবদলী হওয়ার পর বিশ্বম্ভর সেন নামক এক বাংগালী ভদ্রলোকের হাতে আসে। তিনি উক্ত কারখানায় মাত্র দশ টাকা বেতনে কার্য আরম্ভ করিয়া শেষে কারখানার মালিক হইয়া লক্ষ্মীলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ষ্টীমযন্ত্রের আবিষ্কারের সংগে সংগে বিলাতী বস্ত্র প্রচলিত হওয়ায় বিশ্বম্ভর সেনের ব্যবসা লুপ্ত হয়। তাঁহার নামে "বিশু সেনের ঘাট" নামে একটি ঘাট রিষড়ায় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ছাপা কাপড়ের কাজ বন্ধ হইবার পরও, বহুদিন যাবৎ রেশমী রুমালে ছাপার কাজ এই স্থানে চলিয়াছিল।

নীলের চাষ পূর্বে এই স্থানে হইত। এখনও নীলকুঠির বাড়ি রিষড়ায় বিদ্যমান আছে। পূর্বে রিষড়ায় মদ (রাম) তৈয়ারী হইত। সস্তায় বিলাতী মদের আমদানী হওয়ায় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে উহা উঠিয়া যায়।

মিঃ প্রিনসেপ রিষড়ায় নানা রঙের ছাপা কাপড়ের কারখানা করিয়াছিলেন। উহার কারখানাকে Chintz Factory বলা হইত।

The manufacture of chintz which is said to have been introduced by Mr. Prinsep. was another industry which attracted European enterprise. (Hoogly District Gazetteer).

আধুনিক চটকলের প্রথম অংকুরোদগম এই রিষড়াতে হইয়াছিল এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থানেই ভারতের প্রথম চটকল জর্জ অক্‌ল্যাণ্ড নামক এক ইংরাজ বণিক কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। যদিও চাঁপদানি জুট মিলকে বাংলার প্রথম চটকল বলিয়া বলা হয়, কিন্তু উহ স্থাপিত হয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। প্রথম চটকল ওয়েলিংটন জুট মিল এখনও আছে।

হেষ্টিংসের বাগান বাড়ি

ওয়ারেন হেষ্টিংসের রিষড়া হাউস নামক সুরম্য ভবন ও তৎসংলগ্ন একটি সুন্দর উদ্যান তখন এই স্থানে ছিল। হেষ্টিংস রিষড়াতে প্রায়ই আসিতেন এবং তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী মাদাম গ্রাণ্ড এই স্থানে অবস্থানকালে স্বহস্তে বহু আমগাছ পুঁতিয়াছিলেন। এখনও 'হেষ্টিংস ঘাট' নামক ঘাট গঙ্গায় দেখা যায়। বর্তমানে এই ভবনে হেষ্টিংস জুট মিল হইয়াছে। হেষ্টিংস জুট মিল রিষড়ায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

হেষ্টিংস জুট মিলের মধ্যে একটি প্রস্তরে এই কথাগুলি লেখা আছে দেখা যায়ঃ

The house and the estate including originally 60 mere bighas of land to the north town as the Rishra Bagan or garden was from 1780-1784 the property of Sir Warren Hastings, Governor General of Fort William, Bengal.

হেষ্টিংসের 'রিষড়া হাউস' ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে নিলাম হয়। এই সম্বন্ধে ৫ই আগষ্ট ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের 'কলিকাতা গেজেটে' যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, তাহা উদ্ধারযোগ্যঃ

On Thursday, the 2nd September next, will sold by public outcry by Mr. Bonfield at his auction room, if not before sold by private sale that extensive piece of ground belonging to Warren Hastings Esq., called Rishra (Ishara) situated on the western bank of the river two miles below Serampore consisting of 136 Bighas, 18 of which are lakherage land or land paying no rent.

হেষ্টিংসের রিষড়ায় যে বাগানবাড়ি ছিল, তাহা ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে নিলামে বিক্রয় হয়। কিন্তু হেষ্টিংস জুট মিলের ক্ষোদিত ফলকে এই বাগান ১৭৮০—১৭৮৪ খৃষ্টাব্দেও হেষ্টিংসের সম্পত্তি ছিল বলিয়া যাহা লেখা আছে, তাহা ভ্রমাত্মক।

আজকের রিষড়া পলিথিন কারখানা ও চটকলের জন্য বিখ্যাত একটি শিল্পশহর; এই শহরের পৌরসভার আয় বাৎসরিক চার লক্ষ টাকার উপর। প্রায় পঞ্চাশ হাজার অধিবাসী

অধ্যুষিত এই অঞ্চলের পক্ষে আয় খুব বেশী বলিয়া মনে হয় না। সমগ্র রিষড়া জুড়িয়াই কলকারখানার আধিপত্য কিন্তু কারখানার মালিকগণ কর দেওয়া ব্যতীত রিষড়া যাহাতে সমৃদ্ধ হয় সেই দিকে বিশেষ কোন নজর দেন না। ফলে একমাত্র প্রাচীন গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ব্যতীত রিষড়ায় আর কোন ভাল রাস্তা নাই। একদিকে শিল্প প্রসার আর একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রিষড়া শহরকে তাই নানা সমস্যার সম্মুখিন করিয়াছে। এই স্থানে একটি মাতৃসেবা সদন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কালীকুমার দে রিষড়ায় প্রথম বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখন এই স্থানে পৌরসভার তত্ত্বাবধানে তিনটি ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় চলে। রিষড়ায় চারটি পাঠাগার আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গ বিভাগের পর জমি রিকুইজিশন করিয়া রিষড়ায় দুই শতের অধিক পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুর পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙ্গুর ব্রাদার্স হাসপাতালের জন্যও কিছু জমি দান করিয়ালেন। রিষড়া ষ্টেশনের ধারে চারুচন্দ্র নগরে কিছু নূতন বসতি হইয়াছে। হেষ্টিংস জুট মিলের একটি নিজস্ব দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। সরকারের সহযোগিতায় রিষড়ায় ৯ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা দিয়া পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য এখন ওয়াটার ওয়ার্কস হইয়াছে বলিয়া এখানে পানীয় জলের কোন সমস্যা নাই। এলকালি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

রিষড়ায় ভারতের সর্বপ্রথম পলিথিন প্রস্তুতের কারখানা চার কোটি টাকা ব্যয়ে এলকালি কেমিক্যাল কর্পোরেশন কর্তৃক ২রা মে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্লাষ্টিক প্রস্তুত করিতে যে সমস্ত কাঁচা মালের প্রয়োজন, পলিথিন তন্মধ্যে অন্যতম। এই কারখানা হইতে প্রতি বৎসর যে পলিথিন প্রস্তুত হয় তাহাতে ভারতের প্রায় দেড় কোটি টাকার মতন বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়া গিয়াছে এবং প্লাষ্টিক শিল্পেরও বহু কল্যাণ বর্তমানে সাধিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এই কারখানার উদ্বোধন করেন।

বিপ্রদাসের পুথিতে রিষড়ার নাম উল্লিখিত আছে। এই স্থানের গজা এক সময় খুব প্রসিদ্ধ ছিল। রিষড়ায় উচ্চ বিদ্যালয় নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত একটি ছেলেদের, একটি হিন্দী হাইস্কুল ও একটি মেয়েদের মোট চারটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং তিনটি প্রাইমারি শিক্ষালয়, বিধানচন্দ্র কলেজ ও পোষ্ট অফিস আছে। এই স্থানের মুখোপাধ্যায়, দাঁ, লাহা, কুমার ও বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের প্রসিদ্ধি আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু বৎসর যাবৎ রিষড়া মিউনিসিপালিটির সভাপতি ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার নামে রিষড়ায় একটি রাস্তা হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান সভাপতির নাম ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বে শ্রীসুশীলচন্দ্র আউন সভাপতি ছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের দশ আইনানুসারে শ্রীরামপুরে মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হইলে, রিষড়া ও কোন্নগর শ্রীরামপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে রিষড়ায় অনেকগুলি কলকারখানা স্থাপিত হইলে কার্যের সুবিধার জন্য ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের রিষড়ায় স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটি গঠিত হয়। রিষড়া মিউনিসিপালিটি ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত চারটি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। এখন রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চিমে মোড়পুকুরে পূর্ববঙ্গের

উদ্বাস্তুদের নূতন বসতি হওয়ায় আর একটি ওয়ার্ড হইয়াছে। কোন ওয়ার্ডে কত বাড়ি ছিল ও তাহার জনসংখ্যা এবং শিক্ষিতের হার কিরূপ ছিল, তাহা ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারির তালিকা হইতে উদ্ধৃত হইল। এই শহরে বর্তমানে করদাতার সংখ্যা মাত্র ২৯৭০ জন।

ওয়ার্ড	বাড়ির সংখ্যা	লোকসংখ্যা	শিক্ষিতের সংখ্যা
১ নং	১,০৫০	৬,৩৭২	১,৬৪৫
২ নং	২,১২৩	৬,২৫৫	১,৬৩০
৩ নং	১,৫৬০	৭,৭০১	২,১২৩
৪ নং	১,৮৫৫	৭,১৩০	১,৮৭৮
	৬,৫৮৮	২৭,৪৫৮	৭,২৭৬

রিষড়ায় রামকৃষ্ণ রোডে শ্রীরামপুর রোটারী ক্লাব বিগত ১৩ জুন ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে এশিয়ার প্রথম রোটারী ইন্টার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট শ্রীনিতীশ লাহিড়ীর নামে একটি 'চিলড্রেন পার্ক' তৈয়ারী করিয়া পৌরসভার উপর উহার পরিচালন ভার দিয়াছেন। শিল্প অঞ্চলের শিশুদের ইহাতে খুব উপকার হইয়াছে।

রিষড়া এলাকায় বর্তমানে কলকারখানার সংখ্যা আঠারটি। কলকারখানা বৃদ্ধির ফলে গ্যাসবাষ্পের দরুন এই অঞ্চলের নারিকেল গাছগুলি এখন ফলশূন্য হইয়া বন্ধ্যাত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। রিষড়ায় পলিথিন কারখানা স্থাপিত হইবার পর হইতেই গাছগুলি ডাবশূন্য হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় লোকেদের অভিযোগ। পলিথিন গ্যাস ডাব জন্মগ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছে কি না তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

॥ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালী ॥

রিষড়ায় গ্রাম্যদেবী হিসাবে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীর খ্যাতি বহু প্রাচীনকাল হইতে এই অঞ্চলে আছে। একখানি পাথরে "সন ৮১১ সালে জটাধর পাকড়াশী" কর্তৃক 'কালী-ঠাকুরাণী' প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লেখা আছে। পরে ১৩১২ সালে শ্রীতারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দশঘরা নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র সাহা মন্দির পুনর্নির্মাণ করিয়া দেন। এখন পাকড়াশী বংশের শ্রীকৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী ছাড়া আরও পাঁচঘর সেবায়েতের দ্বারা দেবীর পূজা আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হয়। রেজা খাঁ দেবীর নামে ১৮ বিঘা ব্রহ্মোত্র জমি ১১৭৭ সালে বলরাম পাকড়াশীকে দান করেন বলিয়া একখানি তায়দাতে উল্লেখ আছে। তায়দাতখানির ছবি অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

পূর্বে রিষড়ার যাবতীয় উন্নতির মূলে ছিলেন দাঁ-বংশের আদি তিলকরাম দাঁ। বাঁকুড়া জেলার কতুলপুর হইতে তিনি এইস্থানে আসিয়া বসবাস করেন এবং মসলার ব্যবসা করিয়া যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন তেমনি হিন্দুধর্মোক্ত বিবিধ ক্রিয়াকলাপাদি করিয়া

তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীমদনগোপাল জীউর রাস পূর্বে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইত। এখন রাসমঞ্চ আছে কিন্তু বিগ্রহ দাঁ-বংশের কোন সরিক কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিয়াছে বলিয়া আর রাস এখানে হয় না। দাঁয়েদের একটি শিবমন্দির গ্রামে আছে এবং প্রত্যহ তথায় শিবপূজা হয়।

রিষড়ায় স্নানের জন্য যে ঘাটটি এখনও বিদ্যমান আছে উহা ১১৭০ সালে তিলকরাম দাঁ প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া লেখা আছে। পরবর্তীকালে গোপালচন্দ্র দাঁ ১২৯৯ সালে উহা পুনঃনির্মাণ করেন। এইরূপ সুন্দর গঙ্গাস্নানের ঘাট মাহেশ ছাড়া খুব অল্পই দেখা যায়। ঘাটের দুইদিকে স্ত্রীলোকদের বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য দুইটি বড় ঘর দাঁ-বংশের শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাঁ ও কালিদাস দাঁ তাঁহাদের সহধর্মিণী সৈরিন্ধ্রবালা দাসী ও মনোমোহিনী দাসীর স্মরণার্থে ১লা মাঘ ১৩১০ সালে নির্মাণ করিয়া দেন।

॥ মোড়পুকুর ॥

বিশ বৎসর পূর্বে রিষড়া শুধু নিছক পল্লীগ্রাম নয়, এককথায় নীরব পল্লীগ্রাম ছিল। স্টেশনের পশ্চিমদিকে মোড়পুকুর গ্রামে শুধু বনজঙ্গল, পানের বরজ আর শাকসব্জির বাগান ছিল। এখন সে সমস্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এখন সেই জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পত্তন হইয়াছে বিরাট এক ইস্পাত কারখানা কাপড়ের কল, সুতার কল আর গ্লাস ফ্যাক্টরী। এখন চিমনির ধোঁয়া, ড্রিল মেশিনের শব্দ, আর ডিউটির বাঁশি ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। উঁচু-নীচু জলাজমির সংস্কার করিয়া এখন অনেক বড় বড় বাড়ির পত্তন হইয়াছে। রিষড়ার শিল্পাঞ্চলের একমাত্র শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যাই প্রায় ত্রিশ হাজার। এই শ্রমিককুলের মধ্যে আছে স্বল্পসংখ্যক বাঙালী আর আছে মান্দ্রাজ, গুজরাট, বিহার ও উড়িষ্যার অধিবাসী। চাকুরী লাভের ব্যাপারে স্থানীয় লোকেদের সুযোগ অনেক কম বলিয়া জনসাধারণ অভিযোগ করেন।

এই মোড়পুকুরে পূর্বে শ্রীরামপুরের গোস্বামীদের 'সাধন-কানন' নামে একটি সুরম্য বাগান ছিল। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের জন্য উহা ক্রয় করেন এবং তিনিও মধ্যে মধ্যে এই নির্জন কাননে আসিয়া বাস করিতেন। এখন বিপ্লবী শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী সাধন-কাননের স্বত্ব ক্রয় করিয়া তথায় ১৬ জানুয়ারী ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে একটি পার্থসারথির মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মন্দিরের উদ্বোধন করেন। ইহা ছাড়া রাধাগোবিন্দজীউর মন্দির ও গৌড়ীয় মঠও এই স্থানের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রূপে উল্লেখ্য।

মোড়পুকুর গ্রামের প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যে ঘোষ বংশ একসময় খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই বংশের রমাবল্লভ ঘোষ নবাব সরকারে দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া 'মজুমদার' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পরে কলিকাতায় কুমারটুলিতে বাস করেন। তাঁহার অধস্তন বংশধর নরহরি শোভাবাজার রাজবংশে বিবাহ করিয়া শোভাবাজারে বাস করেন। সাব-জজ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই বংশের সন্তান। ইঁহারা কম্বুলিয়াটোলার ঘোষ বলিয়া এখন পরিচিত।

রিষড়ায় শ্যামনগরের হাট পূর্বে পান ও গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গঙ্গার ধারে শরৎচন্দ্র বসুর বাগানবাড়ি ছিল। সপ্তাহান্তে তিনি দু-একদিন এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন বলিয়া শ্যামনগর লেনের নাম এখন শরৎচন্দ্র বসু লেন হইয়াছে। শরৎ বসুর বাগান বর্তমানে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

লৌকিক দেবতা হিসাবে রিষড়ায় কালু রায় ও দক্ষিণ রায়ের নাম উল্লেখ্য। অতুলচন্দ্র হড় দেবতার মন্দির করিয়া দেন। মুখোপাধ্যায় পরিবার এখন ইঁহাদের পূজা করেন।

কেরী সাহেবের পণ্ডিত রামরাম বসু চার-পাঁচ মাস রিষড়া শোন পরীক্ষাগার কেন্দ্রে চাকুরী করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার অন্যান্য বিবরণ ৪২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ডাঃ **শৈলধন বন্দ্যোপাধ্যায়** এই স্থানের একজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। সেনা বিভাগে ডাক্তারী করিতেন এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সিঙ্গাপুরে জাপানীদের হাতে বন্দী হন। পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন আই-এন-এ গঠন করেন তখন তিনি তাঁহার অন্যতম সহকর্মী হিসাবে আই-এন-এ'তে যোগদান করেন ও পরে কর্নেল হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যুদ্ধবন্ধী হিসাবে ইংরাজ সরকার যে সকল ভারতীয়দের লালকেল্লায় বিচার করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের জন্য তাঁহারা সকলে মুক্তি পান।

ডাঃ শৈলধন বন্দ্যোপাধ্যায় রিষড়ার একজন কৃতী ব্যক্তি ও সমাজসেবী হিসাবে খ্যাত। তিনি জার্ডিন হেন্ডারসন জুট মিল গ্রুপের মেডিকেল অফিসার হিসাবে কার্য করেন। তাঁহার পূর্বে কোন ভারতীয় এই পদ লাভ করেন নাই।

রিষড়ায় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী মার্শম্যান দুইটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন বলিয়া জানা যায়। প্রথমটির নাম ডানকানি লাইন স্কুল ও দ্বিতীয়টির নাম ষ্ট্যার্লিং স্কুল। ছাত্রীসংখ্যা যথাক্রমে ১৬ ও ২০। যোগেশচন্দ্র বাগলের 'বাংলার স্ত্রীশিক্ষা' পুস্তকে ইহাদের বিবরণ আছে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ৩৬৭-৩৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

পূর্বে ফিনলে কোম্পানীর ওয়েলিংটন জুট মিলের মধ্যে একটি গির্জা ছিল। কি কারণে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় তাহা জানা যায় না। এখন উহার কোন অস্তিত্ব নাই। উক্ত গির্জার একটি চিত্র শ্রীরামপুরের শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়িতে ছিল, পাঠকগণের অবগতির জন্য উহার আলোকচিত্র এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল।

হেষ্টিংসের বাগানবাড়ি সম্বন্ধে ১২১৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। উক্ত বাগানে একটি প্রাচীন অলিখিত কবর আছে। উহা যে কাহার সমাধি তাহা আজ পর্যন্ত স্থিরিকৃত হয় নাই। জনশ্রুতি, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির পর তাঁহার মৃতদেহ গোপনে এই স্থানে সমাহিত করা হয়।

কুসুম প্রোডাক্টস-এর কুসুম বনস্পতির কারখানা রিষড়ায় আছে। ইহা একটি মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠান।

ডাঃ চন্দ্রকুমার দে রিষড়ার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র অধ্যাপক নন্দলাল দে শিক্ষাব্রতী হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার বংশধর কলিকাতা আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে বাস করেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ভারতবাসী' পত্রিকার সম্পাদক হরিদাস গড়গড়ি এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। আগ্রা কলেজে বহু বৎসর তিনি গণিতের অধ্যাপনা করেন। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী রচিত 'স্মৃতিরেখা' গ্রন্থে ইহার বিষয় লিখিত আছে।

বিদ্যাসুন্দর খ্যাত গোপাল উড়ের শিষ্য কবিয়াল কৈলাস বারুই (কৈলাসচন্দ্র আশ) রিষড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়ের "টপ্পা" পুস্তকে তাঁহার বহু গান মুদ্রিত হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ইহার নামোল্লেখ আছে। কৈলাস বারুই-এর একটি প্রসিদ্ধ গানের লাইন "গা তোল রে নিশি হলো অবসান প্রাণ" এক সময় বাঙ্গলার পথে-ঘাটে গীত হইত। তাঁহার প্রপৌত্র মণীন্দ্রনাথ আশ রিষড়ায় বাস করেন।

রিষড়ার 'পথিকৃত' একটি সাংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান। ইঁহারা পাঠাগার, খেলাধূলো ও পত্রিকা পরিচালনা ব্যতীত দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পড়িবার জন্য একটি **'টেক্সট্ বুক লাইব্রেরী'** স্থাপন করিয়াছেন। পৌর-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ নারায়ণ ব্যানার্জির সভাপতিত্বে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর শ্রীসুধীরকুমার মিত্র উহার উদ্বোধন করেন। হারাধন চট্টোপাধ্যায় ও মধুসূদন লাহা ইহার সম্পাদক।

পৌর-প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলি সুপরিচালিত ও সুন্দর ভবনে অবস্থিত। তন্মধ্যে একটি ভবন ১৩৬৮ সালে ডাঃ প্রাণতোষ লাহা ও ডাঃ চণ্ডীচরণ লাহার ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে বলিয়া খোদিত আছে।

রিষড়ার যুবক সংগঠক প্রতিষ্ঠানরূপে নওজোয়ান সঙ্ঘ, রিষড়া ক্লাব, বান্ধব সমিতি, মোড়পুকুর সাধারণ পাঠাগার, রিষড়া স্পোর্টিং ক্লাব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রিষড়া সেবা সদন এই অঞ্চলের গৌরব। ১৯৫৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ সালে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ইহার উদ্বোধন করেন। সেবা সদনের পরিচালনায় চক্ষুচিকিৎসা, প্রসূতি বিভাগ ও শিশু বহির্বিভাগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটকের মাধ্যমে এই অঞ্চলের সমাজসেবামূলক কাজগুলি চলে।

সম্প্রতি বিদ্যানিকেতন নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় মোড়পুকুরে শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে। এখানে সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেন শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সেন। এখন ইহার সম্পাদক শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

রিষড়া পৌর সভা কর্তৃক একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এখন পরিচালিত হয়। ইহা ছাড়া রিপাবলিক নার্সিংহোমেও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পৌরসভার ভূতপূর্ব সভাপতি সুশীলচন্দ্র আওনের চেষ্টায় রিষড়ার অনেক উন্নতি হইয়াছে। ১৯শে ভাদ্র ১৩০৪ সালে তাঁহার জন্ম এবং ২৯শে মাঘ ১৩৬৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে পৌরকর্মচারীগণ যে শ্রদ্ধাঞ্জলী দেন, তাহার চার পঙক্তি এইরূপঃ

সেবাধর্ম পরহিতে উৎসর্গিলে বিধিমতে
স্বোপার্জিত অর্থ রাশি রাশি।
গোপনে সাধনপথে মগ্ন ছিলে আনন্দেতে
ছিলে তুমি মোক্ষ অভিলাষী॥

॥ কোন্নগর ॥

শ্রীরামপুর আর উত্তরপাড়ার মধ্যে কোন্নগর অবস্থিত। এই স্থান কলিকাতা হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। কোন্নগর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত হইলেও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাহার সুনাম যথেষ্ট আছে। একদিকে এই জায়গাটি শিল্পকে যেমন অঙ্গীভূত করিয়াছে, অন্যদিকে একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও তেমনি গড়িয়া তুলিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে যাঁহার মতভেদ ঘটে সেই পণ্ডিতপ্রবর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। এক সময় কায়স্থদের ইহা একটি সমাজ-স্থান ছিল এবং উত্তরপাড়া যেমন ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত স্থান, কোন্নগর তেমনি কায়স্থ অধ্যুষিত স্থান ছিল। বহু কৃতি ব্যক্তির জন্মে এই স্থান ধন্য হইয়াছে। আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠতম ঋষি ও দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (সুঁড়া), দাতা বিহারীলাল মিত্র (কুমারটুলি) প্রভৃতি স্বনামখ্যাত ব্যক্তিদের পিতৃভূমি হইতেছে কোন্নগর। ইহা ছাড়া রাজা দিগম্বর মিত্র, ডঃ ত্রৈলক্যনাথ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীগণ এই স্থানটিকে অলংকৃত করিয়াছেন। শিবচন্দ্র দেব শিক্ষার জন্য কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রসারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। অর্ধশতাব্দীর পূর্বে এই স্থানে ব্রাহ্মধর্মের প্রবল প্রতাপ ছিল। এখনও ব্রাহ্মমন্দির কোন্নগরে আছে।

বিজয়রাম সেনের "তীর্থমঙ্গল" গ্রন্থে কোন্নগর সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা এই:

ডাহিনেতে কোন্নগর বামে আগরপাড়া।
সুকচরে আসিয়া দামায় দিল সাড়া॥
দেওয়ানজির গ্রাম সেই অপূর্ব বসতি।
বালির ঘাটেতে নৌকা গেল শীঘ্রগতি॥

বালি একটি প্রাচীন স্থান: বর্তমানে ইহার কিয়দংশ হুগলী জেলা এবং কতকাংশ হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হইলেও প্রাচীন কালে ইহা কোতরং বালি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বালির উত্তরদিকে অবস্থিত উত্তরপাড়া ও কোন্নগর নামক প্রসিদ্ধ স্থানদ্বয়ও বালির মধ্যে ছিল বলিয়া জানা যায়। প্রাচীন 'গ্রন্থবিপ্রকুলবিচার' নামক কুলগ্রন্থে এই সম্বন্ধে লিখিত আছে

"কোতরঙ্গ-বালি আর কোট মৌড়েশ্বর।
ডাক পাল নবকুল ইহার ভিতর॥"

ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার "ট্রাভেলস অফ এ হিন্দু" নামক গ্রন্থে, এই স্থান অতি প্রাচীন এবং গোঁড়া ব্যক্তিগণের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া লিখিয়াছেন "It is a very old and orthodox place"? বর্তমানে বালিখালের দক্ষিণ দিকের মাত্র তিন বর্গ মাইল স্থান প্রাচীন বালির সাক্ষ্য দিতেছে এবং উত্তর দিকের উত্তরপাড়া ও কোন্নগর-হুগলী জেলার মধ্যে থাকায়, এই স্থান বর্তমানে ভিন্ন জেলা ও ভিন্ন মিউনিসিপালিটির মধ্যে অবস্থিত এবং বালি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বালিতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের একটি প্রাচীন সমাজ ছিল এবং এই স্থানের পণ্ডিত পঞ্চানন আচার্য সম্পাদিত 'পঞ্জিকা' বঙ্গের পণ্ডিত সমাজে বিশেষ আদৃত ছিল। শ্রীচরণ বিদ্যানিধি বালির শেষ পঞ্জিকা কারক।

পঞ্জিকা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ২৭৩—২৭৮ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। বালিতে **"কল্যাণেশ্বর"** নামে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে; এই শিবের মাহাত্ম্য এতদ্ অঞ্চলে সুপরিজ্ঞাত। পূর্বে এই স্থানে এক শ্রেণীর দেশীয় কাগজ প্রস্তুত হইত। উহা 'বালির কাগজ' বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

কোন্নগর একটি প্রাচীন স্থান; পূর্বে সামুদ্রিক জাহাজ নির্মাণের জন্য এই স্থান সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কোন্নগরের ডকে জাহাজ নির্মিত হইত দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার ক্রফোর্ড লিখিয়াছেন "Early in the 19th century there was a dock at Konnagar where ships were built" (Hooghly Medical Gazetteer) উক্ত স্থানে এণ্ডারসন রাইট এণ্ড কোম্পানীর হার্ডিফুল অয়েল মিল ও পরে বাটা কোম্পানীর জুতার কারখানা হইয়াছিল; বর্তমানে ফুলচাঁদ ভকতের ক্যানাল অয়েল মিল স্থাপিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে মিঃ জি, ম্যাকনেয়ার (Mr. G. Macnair) নামক এক সাহেব এই স্থানে মদের কারখানা স্থাপন করেন।

১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের কবিতায় কোন্নগরের নাম আছে। পূর্বে এই স্থানের লোকবসতি খুব ফাঁকা ফাঁকা ছিল কিন্তু ঊনিশ শতকে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণের জন্য এই অঞ্চলের যথেষ্ট উন্নতি হয়। রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ওয়াল্ডি এণ্ড কোম্পানী ও ত্রৈলক্যনাথ মিত্রের চেষ্টায় কোন্নগর খুব সমৃদ্ধিশালী গ্রামে পরিণত হয়। কোন্নগরে স্বাস্থ্যলাভের জন্য কলিকাতা হইতে তখন বহু লোক বেড়াইতে যাইত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কোন্নগর একটি জনবহুল ও ধনীব্যক্তিদের দ্বারা অধ্যুষিত গ্রাম ছিল। ওম্যালী সাহেব লিখিয়াছেনঃ In 1845 it was described as a populous and wealthy village, the residents of many natives who had amassed or were amassing wealth in Calcutta. It touched a suburban retreat for the well-to-do people of the metropolis.

কোন্নগর মিত্র-বংশীয় কায়স্থগণের একটি প্রসিদ্ধ সমাজ বলিয়া খ্যাত। রাজা দিগম্বর মিত্র, ডক্টর ত্রৈলক্যনাথ মিত্র প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বে কোন্নগরে কোন রেলওয়ে স্টেশন বা পোস্ট অফিস ছিল না; স্থানীয় ব্যক্তিগণকে তিন মাইল হাঁটিয়া বালি স্টেশনে ট্রেন ধরিতে হইত। কিন্তু সাধু শিবচন্দ্র দেব বহু চেষ্টা করিয়া এই স্থানে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কোন্নগর রেল ষ্টেশন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পোস্ট অফিস স্থাপিত করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারই চেষ্টায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মে কোন্নগর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; ইহা তৎকালে কলিকাতার হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের সমকক্ষ ছিল। কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্ব্যতীত পাঠাগার ও বালিকা বিদ্যালয়ও তিনি স্থাপন করেন। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন; তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় কোন্নগরের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা এই স্থানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কোন্নগর হাইস্কুলের অন্যান্য বিবরণ ৩৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বালিকা শিক্ষা সদন নামে একটি স্কুল এখন হইয়াছে।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার "সুরধুনী কাব্যে" কোন্নগর ও শিবচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

"কায়স্থ নিবাস কোন্নগর বিশাল
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল,
শিশুপালনের পিতা, প্রশান্ত স্বভাব,
সুশিক্ষিতা ছয় মেয়ে ভারতীর ভাব।"

১২১৮ সালের ৬ই শ্রাবণ শিবচন্দ্র কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা ব্রজকিশোর তৎকালে কোন্নগরের একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী ছিলেন এবং সৈন্য বিভাগে কার্য করিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থরূপে দিনাতিপাত করেন। তাঁহার ন্যায় চরিত্রবান ও স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু তৎকালে খুব অল্পই ছিল। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে শিবচন্দ্র সর্বকনিষ্ঠ; গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করেন, পরে কলিকাতায় আসিয়া হাটখোলায় রীড সাহেবের স্কুলে প্রবিষ্ট হন। অতঃপর তিনি হিন্দু কলেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। হিন্দু কলেজে পাঠদ্দশাতেই হুগলী জেলার অন্তর্গত গোপালনগর নিবাসী বৈদ্যনাথ ঘোষের কন্যা অম্বিকা দেবীর সহিত তাঁহার (বৈশাখ ১২৩৩) বিবাহ হয়।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর তিনি ত্রিকোণমিতিক জরীপের (Trigonometrical Survey) একজন গণনাকারী নিযুক্ত হন; পরে তিনি নিজ কর্মকুশলতায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বরের ডেপুটি কালেক্টার পদে উন্নীত হন এবং বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যোগ্যতার সহিত কার্য করিয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি কোন্নগর হিতৈষিণী সভা স্থাপন করিয়া পথ সংস্কার, পুল নির্মাণ, দরিদ্র ব্যক্তিগণকে সাহায্য দান প্রভৃতি বহু কল্যাণকার্য করেন। কোন্নগরের ব্রাহ্ম সমাজও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতৃব্য হরিমোহন সেনের সহিত মিলিত হইয়া আরব্য উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ এবং শিশুপালন বিষয়ক কোন পুস্তক এই দেশে না থাকায় 'শিশুপালন' শীর্ষক একখানি সুন্দর গ্রন্থ দুই খণ্ডে রচনা করেন। 'অধ্যাত্ম বিজ্ঞান' নামক প্রেততত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকও তিনি রচনা করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

বঙ্গের তৎকালীন প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী পণ্ডিতদেব মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার মতভেদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র কোন্নগর মন্দিরাবাটীর মিত্র বংশীয় রাজকৃষ্ণ মিত্রের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি আন্দোলন নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। সাহিত্য প্রসঙ্গে ৪৫৭ পৃষ্ঠায় তাঁহার সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

এই স্থান হইতে বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১ পৌষ ১২৬৩ সাল হইতে 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা' প্রকাশ করিতেন। তিনি এই পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী ছিলেন।

॥ রাজা দিগম্বর মিত্র ॥

রাজা দিগম্বর মিত্র এই স্থানে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; ইহার পিতামহ রামচন্দ্র মিত্র কলিকাতার তৎকালীন সওদাগর টয়লার কোম্পানীর খাজাঞ্চি ছিলেন এবং উক্ত কার্যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। দিগম্বরের পিতার নাম শিবচন্দ্র মিত্র। তিনি হেয়ার সাহেবের স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদ নিজামত স্কুলের শিক্ষকতা করেন এবং দুই বৎসর পর মুর্শিদাবাদের তহশীলদার ও আমীন নিযুক্ত হন· অতঃপর কাশীমবাজার রাজবংশের ম্যানেজার হইয়া তাঁহাদের জমিদারী বহু উন্নতি করিয়া দেন বলিয়া রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা দান করেন। উক্ত টাকা লইয়া তিনি কর্ম পরিত্যাগপূর্বক মুর্শিদাবাদে রেশম ও নীলের ব্যবসা করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন এবং বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপিত হইলে, তিনি উহার সভ্য হন, পরে উক্ত এসোসিয়েসনের সম্পাদক এবং সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে যে ম্যালেরিয়া মহামারী রূপে দেখা দেয়, তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য সরকার হইতে এক কমিশন (Fever Commission) গঠিত হয় এবং তিনি উক্ত কমিশনের অন্যতম সভ্য হিসাবে রেলপথ কর্তৃক মাঠের স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী অবরুদ্ধ হওয়ায় ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে তাঁহার অভিমত প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে বহু অর্থ সাহায্য করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার 'সেরিফ' পদ প্রাপ্ত হন; তাহার পূর্বে এই সম্মানসূচক পদ কোন ভারতবাসী প্রাপ্ত হন নাই। লর্ড লিটন মুদ্রাযন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করিলে, তিনি উহার প্রতিবাদকল্পে ভীষণ আন্দোলন করেন। তাঁহার বাড়িতে, তিনি একশত দরিদ্র ছাত্রের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন এবং বহু ছাত্র তাঁহার বাড়িতে থাকিয়া শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তদনির্মিত ঝামাপুকুর রাজবাটীতে তিনি পরোলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্র গিরিশচন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশাতেই অকালে ঘোটক হইতে পড়িয়া দেহত্যাগ করেন; তাঁহার দুই পুত্র কুমার মন্মথনাথ, এবং কুমার নরেন্দ্রনাথ বঙ্গদেশে দানধ্যানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। মন্মথনাথও বহু অর্থ পিতামহের ন্যায় দান করেন এবং ভারত সঙ্গীত সমাজ ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মন্মথনাথের পুত্র শরৎচন্দ্র বহু বর্ষ যাবৎ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও কলিকাতা পৌর সভার কাউন্সিলার ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সম্পাদক ও সভাপতির পদও তিনি অলংকৃত করেন।

এই স্থানে পরমহংস শ্রীমদ্ শ্রীমূলচৈতন্য ভারতী ১২৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্বাশ্রমের নাম চুনিলাল মিত্র; ইনি কোন্নগর মিত্র বংশ সম্ভূত। ই'হার পিতার নাম বৈদ্যনাথ মিত্র। ইনি রামবাগানের রমেশচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস মহোদয়ের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। ভারতের বহু তীর্থস্থান দর্শন করিয়া ইনি বৈদ্যনাথের প্রসিদ্ধ বটতলায় ১৫

বৎসর অবস্থান পূর্বক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই সময় বালানন্দ ব্রহ্মচারী তাহাকে প্রসাদস্বরূপ ফলমূলাদি পাঠাইয়া দিতেন এবং তিনি তাহাই আহার করিয়া ১৫ বৎসর অতিবাহিত করেন। তিনি সহজ ভাষায় বেদান্তের দুর্গমতত্ত্ব রচনা করেন। উহা বেদান্ত দর্শন সোপান নামে জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ বসু কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৩০৫ সালে সারস্বত মহা-মণ্ডল তাঁহাকে 'তত্ত্ববিনোদ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

বর্ধমানের প্রসিদ্ধ উকিল তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কোন্নগর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সুরম্য গৃহ নির্মাণকল্পে তিনি বার হাজার টাকা দান করেন। তারাপ্রসন্নের পিতা শ্যামাচরণ হুগলী জেলার বন্দীপুর হইতে কোন্নগরে বাস করেন। তারাপ্রসন্নের একমাত্র পুত্র দেবপ্রসন্ন বর্ধমানে ওকালতী করেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা হরিপ্রসন্ন জেলা জজ ছিলেন।

এই স্থান হইতে 'কোন্নগর-প্রকাশিকা' নামে একখানি পত্রিকা ১৩৫৫ সাল হইতে ছয় বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া 'হুগলী' ও 'প্রচেতা' নামক সাহিত্যপত্র কোন্নগর হইতে প্রকাশিত হইত। মিষ্টান্ন হিসাবে "তিলকুটা" পূর্বে এই স্থানে খুব প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রসিদ্ধ 'পদ্যপাঠ' রচয়িতা সুকবি যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং মানচিত্র সঙ্কলয়িতা শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কোন্নগরের অধিবাসী ছিলেন।

॥ ত্রৈলক্যনাথ মিত্র ॥

এই স্থানে আর একজন কৃতি ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার নাম ডক্টর ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২রা মে কোন্নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম জয়গোপাল মিত্র। বাল্যকাল হইতেই তিনি শ্রমশীল, অধ্যবসায়ী ও স্বাবলম্বী ছিলেন। তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষা দেন এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-এল উপাধি দান করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলীতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন এবং এক বৎসরের মধ্যে হুগলীর শ্রেষ্ঠ উকীলরূপে পরিণত হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিস সুরু করিয়া খুব প্রসার প্রতিপত্তি করেন। পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ল-লেকচারার নিযুক্ত হন। শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর তিনি দশ বৎসর চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি রূপেন্দ্রকুমার মিত্র এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া সাহিত্যিকগণের মধ্যে কবি নরেন্দ্র দেব ও শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের আদিবাস কোন্নগরে।

কবি শঙ্কর দাস ও চন্দ্রশেখর দেব কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্কর দাসের 'গুরু-দক্ষিণা' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে। চন্দ্রশেখর ১২৫৮ সালে প্রকাশিত 'জ্ঞানোদয়' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন।

কোন্নগরের **ঘোষ বংশ** আজ ভারতখ্যাত; কারণ ডাঃ কে· ডি· ঘোষ ও তাঁহার পুত্রগণ এই বংশের মুখোজ্জল করিয়াছেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে প্রদত্ত হইল।

॥ মনোমোহন ঘোষ ॥

জীবনভরা ব্যথার সুর কবির ছিল শ্রেষ্ঠ সম্পদ, জীবনে সাফল্যের স্বর্ণছত্র তাঁর হাতের কাছে বহুবার ধরা দিতে চাহিয়াছে, কিন্তু তিনি হতাশ হইয়াছেন বারবার ব্যথিত হৃদয়ে যে মূর্চ্ছনা বাজিয়াছে, তাহা যেমন মিষ্টি তেমনই করুণ।

ডঃ কৃষ্ণধন ঘোষের ইনি দ্বিতীয় পুত্র, মাতা স্বর্ণলতা দেবী, বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর কন্যা, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

পিতৃমাতৃস্নেহ লাভের সৌভাগ্য পর্যন্ত ইঁহার ছিল না, ৮/৯ বৎসর বয়সেই দার্জিলিং-এ এক মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন, তারপর বিলাতে প্রেরিত হইয়া কি দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যে তিনি বিদ্যার্জন করেন, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। শীতপ্রধান দেশে আগুনের উত্তাপটুকু উপভোগের সঙ্কুলান তাঁর ছিল না, জুতা ও ওভারকোট গায়ে দিয়া তাঁহাকে রাত্রি যাপন করিতে হইত, খরচ সঙ্কুলান করা দুঃসাধ্য হইলে, জিনিসপত্র নিলামে বিক্রয় হইয়া যাইত, দুঃখব্রতী কবি সারাজীবনে সম্পদের সুখ দেখেন নাই।

শিক্ষা সমাপন করিয়া বিলাতে কোন কাজকর্মের সুবিধা না হওয়ায় তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, পাটনা কলেজে প্রথমে তিনি অস্থায়ী অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন, তারপর ঢাকা কলেজে তাঁর পদ স্থায়ী হয়, এই সময় তিনি বিবাহ করেন, কিন্তু সে সুখও তাঁর ভাগ্যে সহিল না, অল্পকাল মধ্যেই স্ত্রী দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন, তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে তিনি নিজের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিলেন, তাহার উপর জীবনের সঞ্চিত অর্থ যে ব্যাঙ্কে ছিল তাহা দেউলিয়া হইল। অর্থসম্পদহীন, বিপত্নীক কবির অসাধারণ অন্তরবল ছিল, তিনি গোপনে বসিয়া ব্যথার সুরে অপার্থিব সঙ্গীত গাহিয়াছেন, সে সঙ্গীতগুলি জগতে শুনাইবার সাধ ছিল, কিন্তু সে সাধও অপূর্ণ রহিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, তাঁর কবিতাগুলি বিলাতে গিয়া ছাপাইবেন, মার্চ মাসে জাহাজের টিকিট পর্যন্ত খরিদ করা হইয়াছিল, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে জানুয়ারী মাসের ১৪ই তারিখে ডাকিয়া লইলেন—ইহজীবনের সৌভাগ্যের মুখ দেখা তাঁর অদৃষ্টে ছিল না, কিন্তু তাঁর অসাধারণ প্রতিভার দান জগতে চিরকীর্তি স্থাপন করিবে, তাঁর হৃদয়ের তারে আঘাতের পর আঘাত দিয়া ভগবান যে রাগিণী বাজাইয়াছেন, বাঙ্গালী সে গান শুনিতে ব্যগ্র, কবি আর ইহজগতে নাই, কিন্তু শ্রদ্ধায় অনেকের মাথা তাঁর চরণে আজ নত হইয়া পড়িতেছে, তাঁর অমর দান বিস্মৃতির আঁধারে ঢাকা পড়িবে না। তাঁহার কন্যার নাম শ্রীলতিকা ঘোষ।

॥ শ্রীঅরবিন্দ ॥

রাজা রামমোহন আর শ্রীঅরবিন্দ—একজন পূর্বে দাঁড়াইয়া পশ্চিমকে দেখিয়াছিলেন আর একজন পশ্চিমে দাঁড়াইয়া পূর্বকে দেখিয়াছিলেন। তাই ঐতিহ্যময়ী বঙ্গমাতার ক্রোড়ে এই দুজনের আবির্ভাব ভারতে ও পৃথিবীতে এক নবজীবনের সূচনা করে। শ্রীঅরবিন্দ ১৫ই আগস্ট ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ (ডাঃ কে, ডি, ঘোষ) ও মাতার নাম স্বর্ণলতা দেবী। স্বর্ণলতা

ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। কৃষ্ণধনের চার পুত্র—বিনয়কুমার, মনোমোহন, অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার। ডাঃ কে, ডি, ঘোষের আদি নিবাস কোন্নগরে ছিল।

তাঁহার পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ সেকালের একজন মস্তবড় চিকিৎসক ছিলেন। গভর্নমেন্টের সিভিল সার্জন-রূপে তিনি অর্থ এবং প্রতিপত্তি অর্জন করেন কিন্তু তাঁহার অন্তরের প্রবলতম বাসনা ছিল, তাঁহার পুত্রসন্তানদের সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা। সেই সময় আমাদের দেশের এক শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ধারণা ছিল, বিলাতী শিক্ষা ব্যতীত কেহ সভ্য হইতে পারে না। কৃষ্ণধন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখন অরবিন্দ ছয় বৎসরের শিশু সেই সময় তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান এবং সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে শিশু-অরবিন্দকে রাখিয়া দিয়া আসেন। তাই শিশুকাল হইতে অরবিন্দ সেই বিলাতী পরিবারে লালিত-পালিত হন। ইংরাজ-শিশুদের সহিত তিনি লণ্ডনের বালক-বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করেন এবং কালক্রমে বাংলা ভাষা পর্যন্ত ভুলিয়া যান। যে-ব্যক্তি পরবর্তী কালে ইংরাজ-শাসনের অভিশাপের বিরুদ্ধে প্রাণান্ত সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন, দৈবের চক্রান্তে তিনি সেদিন সেই ইংরাজী সভ্যতার ক্রোড়েই মানুষ হন। তিনি যে-পরিবারে বাস করিতেন, তাঁহাদের খৃষ্টান উপাধি অক্রয়েড্। অরবিন্দ তাঁহাদের সহিত এমনিই এক হইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি তখন তাঁহার নাম লিখিতেন অক্রয়েড্ এ, ঘোষ।

স্কুলে এবং কলেজে তাঁহার মেধা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া যাইতেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কলেজে পড়িবার সময়ই তিনি য়ুরোপের প্রধান ভাষাগুলি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়ান, ল্যাটিন এবং গ্রীক, ইংরাজী ভাষার মতনই তাঁহার নিকট সহজ ছিল। কলেজের পড়া শেষ করিয়া তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য পড়িতে লাগিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ আই-সি-এস পরীক্ষায় তিনি সাহিত্য এবং বিদেশী ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেন ও গুণানুসারে চতুর্থ হন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়ম হইল, কাগজে-কলমে পরীক্ষার পর অশ্বারোহণ পরীক্ষা দিতে হয়। অশ্বারোহণ করিবার সময় দৈবযোগে তাঁহার পা পিছলাইয়া যায় এই সামান্য অজুহাতে তাঁহাকে সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করা হইল না।

সেই সময় বরোদার মহারাজা এই প্রতিভাশালী তরুণ বাঙালীর প্রতিভায় আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের অন্যতম শিক্ষা-সচিবের পদ দান করেন। বিলাত হইতে এইভাবে অরবিন্দ শিক্ষাকার্যের ভার লইয়া বরোদায় আগমন করেন।

বরোদায় আসিয়া তিনি জ্ঞানানুশীলনে আত্মনিয়োগ করিলেন। বিলাতে মানুষ হইলেও, তাঁহার অন্তর কিন্তু জন্মসূত্রে এই মাটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা ছিল। এই সময় ভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনী দেবীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। ১৩২৫ সালের ২রা পৌষ মৃণালিনী দেহত্যাগ করেন।

অনাড়ম্বর সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে তিনি জ্ঞানের অনুশীলনে একেবারে ডুবিয়া গেলেন। গ্রীক, হিব্রু, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি জগতের সমস্ত প্রধান ভাষার ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের মূলগ্রন্থগুলির পরিচয় লইলেন। এই সময় নিষ্ঠা-সহকারে তিনি সংস্কৃত

সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং সমগ্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ পড়িয়া শেষ করিলেন। এই শাস্ত্রপাঠের ফলে তাঁহার অন্তরে এক ঘোরতর বিপ্লব ঘটিয়া গেল। তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার মূলসূত্রের পরিচয় পাইলেন এবং সেই বিলুপ্ত ঐশ্বর্যকে দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন।

এই সময় বাংলাদেশ হইতে স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁহার বাংলা ভাষার শিক্ষকরূপে বরোদায় তাঁহার নিকট আসেন। তাঁহার নিকট হইতে অরবিন্দ নূতন করিয়া মাতৃভাষা শিক্ষা করিলেন।

এই সময় মহারাষ্ট্র অঞ্চলে যে গোপন-বিপ্লবীদল শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল, অরবিন্দ তাঁহাদের সংস্পর্শে আসেন। কথিত আছে যে, একজন সন্ন্যাসী নাকি এই দলের মন্ত্রগুরু ছিলেন। অরবিন্দ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং স্বদেশের মুক্তি-সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন। এই মুক্তির আদর্শ প্রচার করিবার জন্য তিনি বাংলাদেশে আসেন এবং 'বন্দেমাতরম্' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে 'বন্দেমাতরম্'-এর দান অক্ষয় হইয়া আছে।

তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সেই সময়কার একদল তরুণ বাঙালী, তাঁহাদের জীবন অকুণ্ঠ-ভাবে দেশ-মাতৃকার সেবায় উৎসর্গ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার হইলেন এই তরুণদলের নেতা। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতীত এই দেশব্যাপী জড়ত্বের ঘুম ভাঙ্গাইবার আর কোন পন্থা নাই। তাই তাঁহারা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন শহরে গোপন বিপ্লবী-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। এই-সব কেন্দ্রে দলের যুবকদের গোপনে অস্ত্র-শিক্ষা দেওয়া হইত। যে-সব ইংরাজ-রাজকর্মচারী কুশাসনের অত্যাচারে জীবনকে কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছিল, তাহাদের হত্যা করা ছিল, এই দলের প্রধান কাজ। অস্ত্র-নির্মাণ এবং দল-গঠনের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা ডাকাতি দ্বারা অর্জন করিবার ব্যবস্থা করেন। কলিকাতায় মুরারীপুকুরের বাগানে তাঁহাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু বিস্তারের মুখেই এই দল ও অরবিন্দ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে ধরা পড়েন। দীর্ঘকাল ধরিয়া আদালতে তাঁহাদের বিচার চলে। ইহাই আলিপুরের মামলা নামে ইতিহাসে বিখ্যাত। এই মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিনা-ফীতে অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন এবং সে-দিন আদালতে তিনি যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতেই তাঁহার নাম সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে অরবিন্দ মুক্ত হইলেন কিন্তু বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ এই দলের অন্যান্য সভ্যদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইল। দ্বীপান্তরের আদেশ মাথায় লইয়া এই দুঃসাহসিক দল হাতের লৌহ-শৃঙ্খল বাজাইয়া গান গাহিয়া উঠিল। তাঁহাদের উদ্যম একদিক হইতে ব্যর্থ হইয়া গেল বটে কিন্ত তাঁহাদের জীবনের সংস্পর্শে বাংলাদেশের মধ্যে যে গণ-চেতনা জাগিয়া উঠিল, তাহাকে কেহই আর রোধ করিতে পারিল না। বাংলার সেই অগ্নিমন্ত্রের প্রথম উপাসকের দল দূর আন্দামানে শৃঙ্খলিত হইয়া রহিলেন বটে কিন্তু মৃত্যুভয়-ভীত এই নিবীর্য্য দেশে তাঁহারা যে অভী-র

আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহাই পত্রে-পুষ্পে-পল্লবে প্রস্ফুটিত হইয়া কালক্রমে স্বাধীনতা-মহামহীরুহের রূপ ধারণ করিল। এই তরুণ বাঙালীরা ভারতবর্ষকে মরিয়া অমর হইবার পথ দেখাইয়া গেলেন। (মুক্তিপথে ভারত—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর তিনি অমরধামে যাত্রা করেন। ৯ই ডিসেম্বর আশ্রমের মধ্যে তাঁহার মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়। অরবিন্দ রাজরোষের আঘাত সহ্য করিয়া কারাবাসে বাসুদেব দর্শন করিয়া তাঁহারই ইংগিতে দিব্য জীবনের সন্ধানে মহত্তর পথের পথিক হইবার জন্য যখন তিনি পণ্ডিচারী যান, তখন রবীন্দ্রনাথ "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" গান রচনা করিয়া ভারতবাসীর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

সুদূর পণ্ডিচারীতে নিভৃতে নির্জনে যোগাসনে ধ্যানরত শ্রীঅরবিন্দের অমর লেখনী হইতে ধ্যানলব্ধ প্রগাঢ় সত্যের ভাগীরথী ধারা অনর্গল নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার ভাবধারা আজ সর্বত্র গৃহীত, উহা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উল্লিখিত হইলঃ "নবযুগ ও নবজীবনের বাণী পূর্ণাংগযোগ অবলম্বন কর, অহংকার সমূলে উৎপাটিত করিয়া মনের দুয়ার পুণ্য ভাগবতী শক্তির অনুপ্রবেশের জন্য সর্ব উন্মুক্ত রাখ, দিব্য চেতনা লাভ করিবে। ভাগবতী শক্তি বিপুল পরিমাণে দুর্বার গতিতে মর্তধামে অবতরণ করিবার জন্য প্রস্তুত তুমি নিজেকে সেই শক্তির আধারের উপযুক্ত কর, কিঞ্চিৎ আরোহন কর দেখিবে অত্যল্প কাল মধ্যে তোমার সহিত মধ্যপথে ভাগবতী শক্তির মিলন সংঘটিত হইয়াছে, তুমি অতি মানসিক চেতনা লাভ করিয়াছ, তোমার দেহ মন ও বুদ্ধি শত সহস্রগুণ ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়াছে। তুমি সমাজের, দেশের, বিশ্বের অশেষ কল্যাণ সাধনে সমর্থ ও সর্বতোভাবে ইচ্ছুক হইয়াছ। আরও দেখিবে তোমার সাধনায় কেবল তুমিই ধন্য হও নাই, সংগে সংগে আরও বহুজন অল্পাধিক অতি মানসিক শক্তি লাভ করিয়াছে দিকে দিকে গণদিব্য চেতনা স্বতঃ উৎসারিত হইতেছে। দিব্য জীবনের দ্বন্দহীন, মোহহীন, মালিন্যহীন শান্ত সংযত, পবিত্র অথচ বিরাট শক্তিশালী জীবনের—অভিসার আরম্ভ হইবে।"

আলীপুর আদালতের যে ঘরে অরবিন্দের বিচার হইয়াছিল, সেই স্থানে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দের স্মৃতি ফলকের উন্মোচন করেন।

আলীপুর জেলের দশ নম্বর সেলে তিনি ছিলেন বলিয়া সেই স্থানেও এখন একটি ফলক লাগান হইয়াছে ও তাহাতে লেখা আছে যে এই স্থানে শ্রীঅরবিন্দের বাসুদেব দর্শন হয়।

আলীপুর জেলখানায় তাঁহার ভগবত দর্শন হয়। এই সম্বন্ধে কারাকাহিনীতে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্যঃ

"বাঁচিয়াছি এক বৎসর কারাবাস। বলা উচিত ছিল এক বৎসর বনবাস। অনেক দিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম। উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রসার, অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে সর্ব মঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা

করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে, সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন কুটীরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কোপ-দৃষ্টির একমাত্র ফল আমি ভগবানকে লাভ করিলাম।"

তাঁহার দেহরক্ষার নয় বৎসর পর তাঁহার পূত পবিত্র দেহাবশেষ 'নখ ও কেশ' পণ্ডিচারী হইতে সোনার রথে করিয়া আনিয়া ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে বঙ্গবাণীতে স্থাপন করা হয়। এই সম্বন্ধে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী স্টেটসম্যান পত্রে যে সংবাদ বাহির হয় তাহা এইরূপঃ

Sri Aurobindo's relics, now in Pondicherry, will be enshrined at Navadwip, in Nadia district of West Bengal, says a Statesman staff reporter. After they reach Calcutta on February 15 the relics will be carried in a golden chariot drawn by 59 horses from Howrah station to the central office of the New Life Movement on Indian Mirror Street. The relics will be taken to Navadwip on February 19.

বঙ্গবাণীর মন্দির দ্বার শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ উন্মোচন করেন এবং মধ্যস্থলে এক শ্বেতমর্মর নির্মিত অর্ধস্ফুট বিরাট পদ্মের দ্বারা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক পূণ্য দেহাবশেষের আধারটি স্থাপন করা হয়। পদ্ম শ্রীঅরবিন্দের প্রতীক।

অগ্নিমন্ত্রের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দের দেহাবশেষ সেই, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। তিনি 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে একদিন বাংলাদেশে আগুন জ্বালাইয়াছিলেন তাই এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পুনরাবির্ভাব বাংলা দেশে স্থাপন করা হয়।

॥ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ॥

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বাংলার অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের যাঁহারা নায়ক ও ধারক ছিলেন, ইনি তাহাদের অন্যতম। স্বনামধন্য মনমোহন ঘোষ এবং ঋষি অরবিন্দের সহোদর সুসাহিত্যিক এই অসাধারণ লোকটির জন্মস্থান বৃটেনের ক্রয়ডন নগরে হইলেও তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান হুগলী জেলার কোন্নগরে। তাঁহার পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ রংপুরে সিভিল সার্জ্জেন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার দ্বিতীয়বার লণ্ডন যাত্রার সময় ক্রয়ডনে বারীনের জন্ম হয়।

"সন্ধ্যা" "বিজলী" ও তদানীন্তন "যুগান্তর" কাগজের মাধ্যমে তাঁহার অগ্নিবর্ষী লেখনীর পরিচয় সেই যুগের মানুষ পাইয়াছিল এবং তাহার ফলে, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, সত্যেন বসু প্রভৃতি একদল ভারতের স্বাধীনতার জন্য শহীদ সৃষ্ট হইয়াছিল। শেষজীবনে কিছুদিন তিনি দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকরূপে কার্য করিয়াছিলেন। 'দ্বীপান্তরের বাঁশী' 'বাংলার অগ্নিযুগ' 'আমার আত্মকথা' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য দিয়া তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বাংলার সাহিত্যজগতে তাঁহার বিশিষ্ট আসন সৃজিত হইয়াছে। ৫ই বৈশাখ ১৩৬৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

॥ ডঃ শিশিরকুমার মিত্র ॥

ভারতে বেতার এবং উচ্চাকাশ সংক্রান্ত গবেষণার পথিকৃৎ ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের জন্ম ১৮৯০ সনে। পিতা জয়কৃষ্ণ মিত্র কোন্নগরের অধিবাসী ছিলেন।

১৯১৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এস-সি লাভ করিয়া ডঃ মিত্র ১৯২২ সনে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় (সরবন) হইতে "স্পেকট্রোস্কোপিক" বিষয়ে ডক্টরেট হন।

১৯২৩ সনে ভারতে ফিরিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ভারতে 'রেডিও রিসার্চ কমিটির' তিনিই প্রতিষ্ঠাতা এবং কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিক্স এবং ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। হরিণঘাটার 'আয়নোস্ফিয়ার ফিল্ড স্টেশনটিও তাঁহারই একক উদ্যমের ফল।

১৯৪৭ সনে ডঃ মিত্রের জগদ্বিখ্যাত 'দি আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে বিশ্বের পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায়। গ্রন্থটি অচিরেই বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়।

অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক সূত্র আবিস্কারের জন্য বহু স্বর্ণপদকের অধিকারী ডঃ মিত্র ১৯৩৫ সনে খয়রা অধ্যাপক পদ ছাড়িয়া পদার্থবিদ্যার স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সনে তিনি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটার নিযুক্ত হন।

১৯৬২ সনে ডঃ মিত্র ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' পদবীর রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করেন। ১৩ই আগস্ট ১৯৬৩ সনে তার মৃত্যু হয়।

রাজরাজেশ্বরী পূজা

১১০৭ সালে কোন্নগরে প্রথম রাজরাজেশ্বরী পূজা আরম্ভ হয়, যতদূর জানা যায়, এই পূজা এই গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী সকল স্থানের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বারোয়ারীপূজা। প্রথমাবস্থায় এই পূজা ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় এবং উৎসাহে অনুষ্ঠিত হইত,—তাই সুদীর্ঘ-কালের মধ্যে পূজা প্রতিবছর সাড়ম্বরে হইয়াছে। ১৯২২ খৃস্টাব্দ হইতে গণতান্ত্রিকভাবে সকলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

প্রাচীনকাল হইতে মা রাজরাজেশ্বরী গ্রামের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করেন, ইহা স্থানীয় লোকেদেব বিশ্বাস ছিল। তাই এক সময়ে রাজরাজেশ্বরীপূজা উপলক্ষে চারদিন ধরিয়া গ্রামে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইত এবং সারাগ্রাম আনন্দে উৎসাহিত হইয়া সারাবছর এই পূজার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিত, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটে আর সে রকম আয়োজন করা সম্ভব হয় না। রাজরাজেশ্বরীর বিগ্রহ দেখিতে খুব সুন্দর। বিগ্রহের তলায় মহাদেব শয়ন করিয়া আছেন ও দেবীর দুই পাশে জয়া ও বিজয়া দণ্ডায়মান আছেন।

রাজরাজেশ্বরীপূজা কিভাবে প্রথম আরম্ভ হয় সেই সম্বন্ধে অনেক প্রচলিত কিংবদন্তী

আছে। একটি হইতেছেঃ পাড়ার নেতা বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার ঘোষালকর্তা একদিন সকালে নিজের কাজ দেখিয়েছিলেন, সেই সময়—এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গে মাঠে যাইতে বলেন। মাঠে গিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "তিনি স্বপ্নে দেখেছেন দেবী রাজরাজেশ্বরী ওপার হইতে ভাসিয়া এইখানে উঠিয়াছেন। এই মাঠে রাজরাজেশ্বরীপূজা করুন।"

পার্শ্ববর্তী ন'পাড়ি গ্রামে তখনি লোক ছুটিল পণ্ডিতদের কাছে। ন'পাড়ি তখনকার দিনে দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল। সেখানকার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মাঠে আসিয়া সব কথা শুনিয়া বলিলেন,—ঘটনাটিতে দেবীর আন্তরিক ইচ্ছা প্রতিফলিত। মনে হয় যে, মা রাজরাজেশ্বরী এখানে আবির্ভূতা হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তন্ত্রে মা রাজরাজেশ্বরী দেবীর উল্লেখ আছে, মাঘীপূর্ণিমার দিন হইতেই দেবীপূজার অনুশাসন। আজ পুণ্য শ্রীপঞ্চমীর দিন—এই দিনই হইতে তন্ত্রবিধান অনুযায়ী দেবীর কাঠামো প্রস্তুত হোক্। বলা বাহুল্য ঘোষালকর্তা সন্ন্যাসীর কথা ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সেইদিন রাত্রে ঘোষালকর্তা স্বপ্নে দেখলেন, মা রাজরাজেশ্বরী ওপার হইতে আসিয়া মাঠে হাজির হইয়াছেন। একটী ছোট মেয়ে যেন তাঁহাকে বলিতেছে—"অতদূর থেকে তোর কাছে এলুম আমার পূজো দিবিনে। পূজার আয়োজন কর, তোর মঙ্গল হবে।" ঘোষালকর্তা পরদিন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পূজার আয়োজন করেন—এই ঘটনা প্রায় ২৫০ বছর আগেকার।

১৯৫৭ সালের ৮ই ফাল্গুন ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে দেবী রাজরাজেশ্বরী মাতার ২৫০ তম পূজা উপলক্ষে এক বিশেষ জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

কোন্নগর গ্রামের ঐতিহ্য ও গর্বের বস্তু এই সুপ্রাচীন বারোয়ারী পূজা যাহাতে আপন মহিমায় প্রাচীনের ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া স্বকীয় শক্তিতে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে সেই জন্য গ্রামবাসী সকলের সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। রাজরাজেশ্বরীর চিত্র গ্রন্থে দেওয়া হইল।

পূর্বে চড়কের সময় কোন্নগরে একটি **মেলা** হইত এবং তথায় বহু লোকের সমাগম হইত। মেলা এখনও হয়, কিন্তু পূর্বের জাঁকজমক আর এখন নাই।

॥ দ্বাদশ শিবমন্দির ॥

কলিকাতা হাটখোলার সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র হরসুন্দর দত্ত মহাশয় কোন্নগরে দ্বাদশ শিবমন্দির চাঁদনি ও বাঁধাঘাট নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, এরূপ সুন্দর মন্দির ও ঘাট বর্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘাটের উপরিস্থ চাঁদনির পূর্বভাগে একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর। ১৭৪২ শকাব্দে (১২২৭ সাল) এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল।

"শাকেহক্ষিবেদধরভুগনিতে তপস্যো
গ্রামাহত্র কোণনগরে শিবমন্দিরানি।
সংনির্মমে কলিকাতানগরীনিবাসী
সশ্রীকদত্তহরসুন্দর ইষ্টনিষ্টঃ॥"

কলিকাতা (হাটখোলা) নগর নিবাসী
শ্রীহরসুন্দর দত্ত ইষ্ট অভিলাষী
শতের শ বিয়াল্লিশ শকাব্দে ফাল্গুনে
সুরধুনী তীরে 'কোন-নগর' পত্তনে
শাস্ত্রের বিধান মত করি প্রতিষ্ঠান
করিল দ্বাদশ শিবমন্দির নির্মাণ।

তিনি এই মন্দির নির্মাণের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা **"উদ্ভট-শ্লোক-মালা"** গ্রন্থ হইতে পাঠকগণের অবগতির জন্য এইস্থানে উদ্ধৃত হইল :

কোন্নগরের দ্বাদশ মন্দির, ঘাট ও চাঁদনী নির্মাণ করিতে হরসুন্দরবাবুর অজস্র অর্থব্যয় হইয়াছিল। কত টাকা যে তিনি গঙ্গাগর্ভে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। স্বর্গত সার্থকরাম দে মহাশয় কোন্নগরের দক্ষিণ-দিগ্‌বর্তী 'ভদ্রকালী' গ্রামে একটি বৃহৎ ইটখোলার কারবার করিয়াছিলেন। তিনিই মন্দির নির্মাণের সময় উক্ত দ্বাদশ মন্দির, চাঁদনী ও ঘাট নির্মাণের উপযোগী যাবতীয় ইট, টালি, চূণ, সুরকী প্রভৃতি সামগ্রী দিয়াছিলেন। মন্দির-প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ পূর্বে হরসুন্দরবাবু হাসিতে হাসিতে সার্থকচন্দ্রকে বলিলেন, "সার্থকবাবু। আমি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছি। আপনার প্রদত্ত জিনিসে আমার মন্দিরাদি নির্মিত হইয়াছে। আপনি কি উপহার পাইলে সন্তুষ্ট হন, তাহা বলুন। ঝাড়, লণ্ঠন, শাল-দোশালা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই লউন।" ইহা শুনিয়া সার্থকচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি এ সকল বস্তু চাহি না। আমার একটি মাত্র চাহিবার বস্তু আছে। আপনার এই বৃহৎ সমারোহে আমি এইমাত্র চাহি যে, প্রত্যহ একখানি করিয়া আপনার দেব-সেবার জন্য যে নৈবেদ্য হইবে ও তাহার আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি থাকিবে, তাহার এক-দিনের সামগ্রী আমার গুরু-বংশীয় কোন লোক মাসে মাসে বংশানুক্রমে পাইবেন, এইটুকু আমি ইচ্ছা করি।" দত্ত মহাশয় তাহাতেই সম্মত হইলেন। "ভদ্রকালী" গ্রামে নিস্তারিণী দেবী নাম্নী একটি বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিলেন। তিনি আমাদের গুরু-বংশীয়া। বাল্যকালে আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়া দ্বাদশ-মন্দির হইতে নৈবেদ্য ও অন্যান্য জিনিস আনিতাম। আমরা দুইজনে এত জিনিস আনিতে পারিতাম না। একটি মুটে করিয়া আনিতে হইত। কথা এই যে, এই নৈবেদ্যাদি দ্বারা একটি ব্রাহ্মণের এক মাসের বিলক্ষণ আহার চলিত। এখন আর সেদিন নাই। মহাত্মা সার্থকরাম আনুমানিক ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচাঁদ, তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপুত্র এই প্রবন্ধ-লেখক শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে গাঁজা, গুলি, চণ্ডু খাওয়া খুব প্রবল ছিল এবং সেই জন্য একটি ছড়া প্রচলিত হইয়াছিল। কোন্নগর গুলি খাওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ছড়াটি এই :

"বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা, গুলীর কোন্নগরে,
বটতলায় মদের আড্ডা, চণ্ডুর বৌবাজারে।
এই সব মহাতীর্থ, যে না চোখে হেরে,
তার মত মহাপাপী নাই ত্রিসংসারে।"

উত্তরপাড়ার সার্ভে ম্যাপ
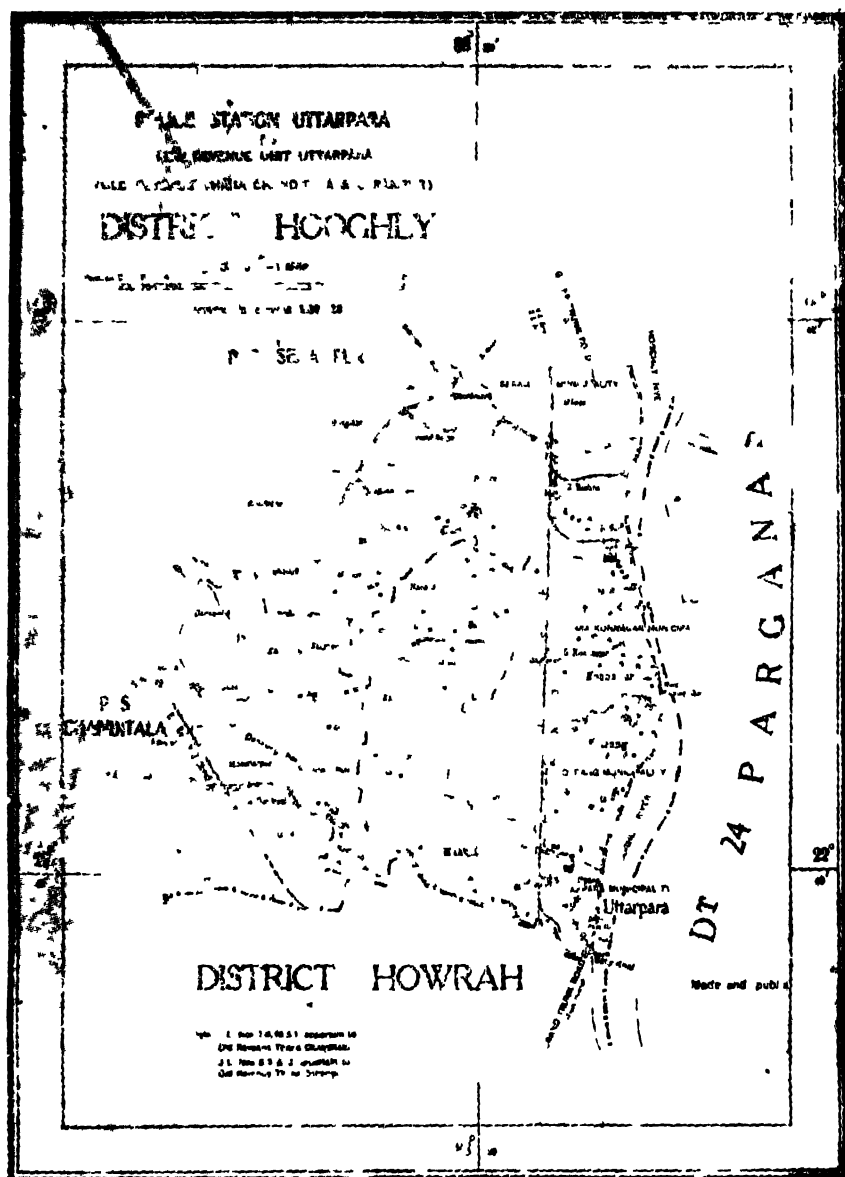
॥ উত্তরপাড়া-কোতরং ॥

উত্তরপাড়ার আভিজাত্যের গৌরব সর্বজনবিদিত ও ইতিহাস-স্বীকৃত। তাই সেকালে "গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল—তার মধ্যে উত্তরপাড়া নগর প্রধান" এই কথাটি প্রচলিত হইয়াছিল। নগর হাল আমলে গড়িয়া উঠিলেও উত্তরপাড়া পৌর-প্রতিষ্ঠান বহু পুরাতন। কেবল বাংলা নয়, সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মধ্যে ইহা প্রাচীনতম। কলিকাতা হইতে এই স্থান সাত মাইল উত্তরে অবস্থিত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়া পৌরসভা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার আয়তন মাত্র দেড় বর্গমাইল। এই শহর অক্ষাংশ ২২° ৪০´ উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৮৮° ২১´ পূর্বে অবস্থিত। হুগলী জেলার মধ্যে ইহাই ক্ষুদ্রতম পৌর শহর। এই শহরের কোন সুপ্রাচীন ঐতিহ্য না থাকিলেও কলিকাতার অব্যবহিত পরেই ইহার স্থান ছিল। ১৭ আগষ্ট ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার সহিত কোতরং পৌরসভার সংযুক্তি হইয়াছে।

রামনারায়ণ চৌধুরী "সত্যনারায়ণের ব্রতকথায়" উত্তরপাড়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

গঙ্গার পশ্চিমকূল উত্তরপাড়া গ্রাম।
স্বাবর্ণ চৌধুরী দ্বিজ নারায়ণ নাম॥
রচিল প্রভুর লীলা করি যোড় পাণি।
সাঙ্গ হল বল সবে হরি হরি ধ্বনি॥

উত্তরপাড়ার **জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়** এক বিরাট পুরুষ ছিলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় কমিসারিয়েটের কণ্ট্রাক্টার ছিলেন—তাই সৈনিক স্কুলে তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা হয় এবং তাঁহার প্রখর বুদ্ধির জন্য তিনি ১৬ বৎসর বয়সেই কমিসারিয়েটে চতুর্দশ সেনা বাহিনীর প্রধান কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পিতা-পুত্রে ভরতপুর যখন ইংরাজ অধিকারে আসে তখন লুণ্ঠিত অংশের কিয়দংশ প্রাইজমানি হিসাবে তাঁহারা পান এবং সেই সময় হইতেই সৌভাগ্যের স্বর্ণদ্বার তাঁহাদের খুলিয়া যায়। জয়কৃষ্ণ তখন বর্ধমানের মহারাজার কাছ হইতে উত্তরপাড়া সহ হুগলী জেলার এক বিস্তৃত এলাকার পত্তনিদার হন। বলা বাহুল্য এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের দ্বারাই উত্তরপাড়া শহরের পত্তন ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। ওম্যালী সাহেব উত্তরপাড়া সম্বন্ধে গেজেটারিয়ারে লিখিয়াছেন ঃ

It owes its progress largely to the Late Raja Jaykrishna Mukherji and his relatives. He did a great deal for his own town, where he founded the college, the library and the dispensary.

জয়কৃষ্ণের মত প্রগতিশীল ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি সেকালে খুব কম ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে আবেদন প্রচার করেন, তখন তাহাতে প্রথম স্বাক্ষর দেন জমিদার জয়কৃষ মুখোপাধ্যায়। ফিউডাল আবহাওয়ার মধ্যে আধুনিক মনোভাব আমদানি করিয়া তিনি এখানকার নাগরিকদের চিত্তবৃত্তি উদ্বোধনে সহায়তা করেন। নগর

তখনও ঠিক হয় নাই—আসলে উত্তরপাড়া গণ্ডগ্রাম—তবু সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রাচীনতম পৌর-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল তৎকালীন গণ্ডগ্রাম উত্তরপাড়ায়। নগরের যাহা প্রয়োজন স্কুল, কলেজ, মেয়ে স্কুল, পাবলিক লাইব্রেরী সমস্তই তিনি করেন—তাই কলিকাতার পরেই ছিল এর আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এখনও অব্যাহত আছে। 'নবজীবন' হইতে নিম্নের দুই লাইন উদ্ধৃতিতে তিনি যে জরাসন্ধ বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাহা জানা যায়।

বয়সে অনাদিলিঙ্গ, জরাসন্দ বলে।
এখনও দাপটে যার, জেলা হুগলী টলে॥

কেবল উত্তরপাড়া বা হুগলী জেলা নয়, তাঁহার সময়ে বাংলাদেশের এমন কোন প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাহার সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল না। ওম্যালী সাহেব বলেন ঃ

Popularly he was known as the Jarasondha of Hooghly district and there was hardly any large public movement in which he did not take part. (Hooghly District Gazetteer).

যে কংগ্রেস আজ আমাদের দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেই কংগ্রেসের কলিকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশন (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ) জয়কৃষ্ণের অকুণ্ঠ অর্থ সাহায্য ও সহযোগিতায় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি সেই অধিবেশনে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ্য ঃ—

Be wise, be moderate and above all be preserving and the success that you will then deserve will assuredly be yours.

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১৯ জুলাই অন্ধ হইয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি বিবিধ সদ্অনুষ্ঠানে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যান। তাঁহার আরব্ধ কার্য পুত্র রাজা প্যারীমোহন সুচারুভাবে করিয়া তিনিও যশস্বী হন। জয়কৃষ্ণের শিক্ষা প্রসারকল্পে আগ্রহের বিষয় ৩৬১ ও ৩৮০-৮১ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। দীনবন্ধু মিত্র সুরধুনী কাব্যে লিখিয়াছেন ঃ

মন্দগতি ভগবতী চলে না চরণ,
উত্তরপাড়ায় ধীরে দিল দরশন।

সুস্থির হইল অঙ্গ, করিল বিশ্রাম
দেখিতে লাগিল চেয়ে জয়কৃষ্ণ ধাম।

রমণীয় অট্টালিকা সরসী বাগান,
মনোহর বিদ্যালয়, ভিষজের স্থান,
বিনাপাণি-মনোরম পুস্তক আলয়,
শত শত শাস্ত্রমালা যথায় সঞ্চয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোম প্যাঁচার নকশায় উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নর্ম্যাল স্কুল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইস্থানে উদ্ধারযোগ্য ঃ

উত্তরপাড়া বালির লাগোয়া, আজকাল জয়কৃষ্ণের কল্যাণে উত্তরপাড়া বিলক্ষণ বিখ্যাত। বিশেষতঃ উত্তরপাড়ার মডেল জমিদারের নর্ম্যাল ইস্কুল প্রায় ইস্কুলের কোর্সলেক্চরর

ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা হোল্ডার, শুনতে পাই, গুরুজীর দু-একটি ছাত্র প্রকৃত বেয়াল্লিশকর্মা হয়ে বেরিয়েছেন।

উত্তরপাড়া স্কুল এই জেলার মধ্যে অন্যতম প্রাচীন শিক্ষালয়। রামতনু লাহিড়ী মহাশয় এই স্থানে ১৮৫২ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকরূপে বিদ্যালয়ের বহু উন্নতি করিয়াছিলেন। স্কুল-গৃহে একটি প্রস্তরফলকে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিত আছে:

THIS TABLET TO THE MEMORY OF
BABU RAMTONOO LAHIRI

Is put up by his surviving Utterpara School Pupils
As a token of the love, gratitude, and veneration
That he inspired in them, while Head Master of the
Utterpara School from 1852 to 1856, by his loving
Care for them, by his sound method of Instruction,
Which aimed less at the mere impartation of knowledge
Than at that Supreme end of all education,
The healthy stimulation of the intellect, the emotions,
And the will of the Pupil, and, above all
By the example of the noble life that he led."

Born December 1813 Died August 1898

বালিখাল গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া সেওড়াফুলির খালে গিয়া মিশিয়াছে; প্রাচীনকালে এই খালের উপর কোন সেতু ছিল না। উত্তরপাড়ায় যাইতে হইলে খেয়া নৌকা করিয়া পার হইতে হইত এবং এই স্থানের ঘাটটি সদর-ঘাট বলিয়া খ্যাত ছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন গুডউইনের তত্ত্বাবধানে এই খালের উপর একটি ঝুলানপুল নির্মিত হয় এবং তৎকালে এই পুলটি একটি প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিষ বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত পুল ভাঙ্গিয়া বর্তমান সুবৃহৎ পুলটি নির্মিত হইয়াছে। সেওড়াফুলি রাজবংশের কোন ব্যক্তি তাঁহার জমিদারির সীমা নির্দেশকল্পে, এই খাল খনন করিয়াছিলেন। উত্তর-পাড়ার প্রথিতযশা জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বালিখালের উক্ত পুল নির্মাণের জন্য গভর্ণমেণ্টকে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়া জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশের গৌরবে এই স্থান গৌরবান্বিত; উত্তরপাড়া কলেজ এবং উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী এই বংশের অনতম প্রধান কীর্তি। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা' শীর্ষক একখানি পত্রিকা এই স্থান হইতে প্রকাশ করেন। 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা' সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সাহিত্যপ্রসঙ্গে ৫২২-৫২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

উত্তরপাড়ার পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে কোন রকম প্রসারের সুযোগ না থাকায় ইহার আয়তন পূর্ববৎ আছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যেখানে লোকসংখ্যা ছিল ৯৩৫০ জন, সেখানে

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ২১,১১৮ জন। বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজারের উপর। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পৌরসভার আয়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু আনুপাতিক বৃদ্ধির হার যথেষ্ট না হওয়ায় নাগরিকদের সুখ-সুবিধা আশানুরূপ বাড়ে নাই। উত্তরপাড়ায় পাকা রাস্তা আছে ১ মাইল ও কাঁচা রাস্তা আছে দেড় মাইল। উত্তরপাড়া পৌরসভার ট্যাক্সের হার খুব বেশী—দার্জিলিং পৌরসভার নীচে। এই সম্বন্ধে ওম্যালী সাহেব বলেনঃ

The incidence of taxation perhead was the highest in the district, viz., Rs. 2-4-1 (Hooghly District Gazetteer)

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাজা জ্যোৎস্নাকুমার মুখোপাধ্যায়ের ৪০ হাজার টাকা দানে উত্তরপাড়া পৌরসভার নিজস্ব পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে নাগরিকদের পানীয় জল সরবরাহের জন্য সরকার ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা সাহায্য ও ৮০ হাজার টাকা ঋণ বাবদ দিয়াছেন। এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া আড়াই লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

উত্তরপাড়ার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হইতেছে গ্রান্ড ট্রাংক রোড। তা ছাড়া পৌরসভার রক্ষণাধীন রাস্তা দিয়া দিবারাত্র যানবাহন চলাচল করে। উত্তরপাড়ার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মাখলা-রঘুনাথপুরের ইটখোলাগুলি ও হিন্দুস্থান মোটর্সের কারখানার কল্যাণে ভারী মালবোঝাই লরীর অষ্টপ্রহর চলাচলে এখানকার পথ ও পথচারীর জীবন সর্বদাই বিপন্ন। বিশেষ করিয়া জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্ট্রীটের অবস্থা অতি শোচনীয়। গ্রান্ড ট্রাংক রোড ধরিয়া এই রাস্তা দিয়া মাখলা পার হইয়া ওল্ড বেনারস রোডে যাওয়া যায়। সরকারের কলকারখানার ভারী যানবাহন ওই দিক দিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্ট্রীটকে ন্যাশনাল হাইওয়ে হিসাবে গণ্য করিলে পৌরসভার ভার কমিয়া যায় ও পথচারীগণও বিপদমুক্ত হয়।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল বাংলা ১২৬৬ সালের প্রথম দিনে জয়কৃষ্ণ **উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী** প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সময় ইহাতে লক্ষাধিক টাকার পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল। তৎকালে ইহা ভারতবর্ষের বৃহত্তম নির্দেশক গ্রন্থাগার ছিল। ইহার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি বাৎসরিক দুই হাজার টাকা উপস্বত্তের সম্পত্তি ও দুইশত টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ অর্পণ করেন। লর্ড ডাফরিন, লর্ড লরেন্স, মেরী কার্পেন্টার প্রভৃতি উক্ত পুস্তকাগার পরিদর্শন করেন। কবি মধুসূদন দত্ত উত্তরপাড়ার এই ভবনের দোতলায় কিছুদিন আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থাগার যেমন অমূল্য গ্রন্থসম্পদে সমৃদ্ধ তেমনি গ্রন্থাগার ভবন ও প্রাঙ্গণ ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বহু মনীষীর স্পর্শধন্য এক পুণ্যতীর্থ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবরেণ্য নেতা বিপিনচন্দ্র পাল, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নীলকরের অত্যাচার দমনকারী ভারতবন্ধু পাদরী লং সাহেব দিনের পর দিন এই ভবনে অতিবাহিত করেন। এই গ্রন্থাগারের নাম কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র বিশ্বের সুধী সমাজের কাছে তখন ছড়াইয়া পড়ে। এই গ্রন্থাগার সম্বন্ধে "এনসাইক্লোপিডিয়া-বৃটেনিকা"য় যাহা লিখিত ছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

Uttarpara is famous for the Public Library founded and endowed by Joykisen Mukherjee which is specially rich in books of local topography. (Encyclopaedia Britannica—11th Edition)

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী সম্বন্ধে "দেবগণের মর্ত্যে আগমন" পুস্তকে দুর্গাচরণ রায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইরূপ ঃ এই বাড়ীতে সাধারণ পুস্তকালয় আছে। বাড়ীটী কলিকাতার টাউনহলের ফ্যাসানে নির্মিত। পুস্তকালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তক এত আছে যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পুস্তকালয়টীর খরচের জন্য জয়কৃষ্ণ বাবু একখানি তালুক দান করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সর্বদা ইহার তত্ত্বাবধান লওয়াতে দিন দিন উন্নতিও হইতেছে। পুস্তকালয়ের উপরের গৃহগুলি অতি সুন্দররূপে সাজান। কোন ইংরাজ কিম্বা সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী বাসের জন্য প্রার্থনা করিলে বিনা ভাড়ায় দুই এক মাস থাকিতে পান।

জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হইবার পর এই গ্রন্থাগার অর্থাভাবে পরিচালনা করা সম্ভব না হওয়ায় উত্তরপাড়ার নাগরিকগণ ২৬শে মে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থাগার রাষ্ট্রীয়-করণের জন্য এক সভা করেন। উক্ত সভায় লাইব্রেরীর দ্বিতলের হলটি বাংলার কৃতিসন্তান জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে **"জয়কৃষ্ণ হল"** ও লাইব্রেরীর নাম **"উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী"** রাখা স্থির হয়।

এই গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ ও ভবন সমেত গ্রন্থাগারটির পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণের জন্য অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় ও বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এই গ্রন্থাগার মাসিক পাঁচশত টাকা সাহায্যে এখন স্পনসর্ড লাইব্রেরীর মর্যাদা লাভ করিয়াছে ও হুগলীর সোস্যাল অফিসার শ্রীনীতীশ বাগচি ইহার সম্পাদক হইয়াছেন। আমরা এই ঐতিহাসিক ভবনটির অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করিতেছি কারণ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে ইহা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নাই। পূর্বে দেশের যাবতীয় কল্যাণকর কার্য জমিদারদের দ্বারা সাধিত হইত—আজ আর জমিদার নাই। এখন সরকারের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহককে রক্ষা করিবে কে?

বঙ্গীয় কৃষকগণের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিবার জন্য তিনি পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। তদনুসারে অধ্যাপক লালবিহারী দে **"গোবিন্দ সামন্ত"** নামক জনৈক কৃষকের জীবনী সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত পারিতোষিক লাভ করেন।

পুস্তক রচনার বিষয় ২৮ মাঘ ১২৭৭ সালের অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদটি এইস্থানে উল্লেখ্য ঃ

দান অনেকে করিয়া থাকেন কিন্তু উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণবাবুর দানের একটু তারিপ আছে। তিনি সম্প্রতি ঘোষণা দিয়াছেন যে ব্যক্তি আমাদের দেশের অন্ত্যজ ও ব্যবসী লোকের সামাজিক রীতিনীতি বর্ণনা করিয়া একখানি বেলম লিখিবেন, তাহার পুস্তক সর্বাপেক্ষা উত্তম হইলে তিনি ৫০০্ টাকা পুরস্কার পাইবেন। পুস্তক ৮ পেজী ফরমার ২০০ পৃষ্ঠার

কম হইবে না ও ১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে দিতে হইবে। পুস্তক পাবলিক লাইব্রেরিতে বাবু প্যারিচাঁদ মিত্রের নিকট পাঠাইতে হইবে।

লালবিহারী দের 'গোবিন্দ সামন্ত' নামক পুস্তক সম্বন্ধে ব্যাকল্যান্ড সাহেব বলেনঃ

His novel *Gobinda Samanta* furnishes pictures of peasant life in Bengal, which have been favourably noticed by critics both in India and in England for their accuracy and power.

জ্যোৎস্নাকুমারের পৃষ্ঠপোষকতা ও দানে তৎকালে হু প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইত। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহার অর্থানুকুল্যে দুর্গাদাস লাহিড়ীর "পৃথিবীর ইতিহাস" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। হাওড়া ডিউক লাইব্রেরী তাঁহার প্রদত্ত অর্থে স্থাপিত হয়।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও হরিহর চট্টোপাধ্যায় **'হিতকারী সভা'** প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ অর্থ-ব্যয়ে উহা পরিচালনা করেন। এই সভা হইতে অনাথা স্ত্রীলোক ও দরিদ্র ছাত্রগণকে আর্থিক সাহায্য ও ঔষধ প্রদান করা হইত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে হিতকারী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। ইহা ছাড়া হুগলী ও বর্ধমান বিভাগের সমস্ত বালিকা বিদ্যালয়ের নিম্নপ্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক ও অন্তঃপুরিকাদের পরীক্ষা গৃহীত হইত ও তাহাদের যোগ্যতানুসারে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইত। ইহা তৎকালে "ফিমেল ইউনিভার্সিটি" বলিয়া কথিত হইত। উত্তরপাড়া হিতকারী সভার অন্যান্য বিবরণ ৩৭৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মনোহর মুখোপাধ্যায় 'হিতকরী সভা' পরিচালনা করেন। মনোহরের "রোগের প্রতিকার ও নিবারণের উপায়" ও "ধর্ম ও বাসনা প্রশ্নোত্তরসার" নামে দুইখানি পুস্তক আছে। ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গোপাল উড়ের **বিদ্যা-সুন্দর** পালা পুনঃ মুদ্রিত করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের একটি শোচনীয় অভাব পূর্ণ করেন।

প্রথম তিনজন বাঙ্গালী সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হিতকারী সভার পক্ষ হইতে ১৭ অক্টোবর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পাড়ায় আনয়ন করিয়া বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সম্বর্ধিত করা হয়।

চন্দ্রনাথ বসু তাঁহার 'ত্রিধারা' পুস্তকে লিখিয়াছেনঃ উত্তরপাড়ার হিতকারী সভার কথা সকলেই শুনিয়াছেন এবং উক্ত সভার বাৎসরিক উপলক্ষে বোম্বাই আঁবের যে গুণাগুণ বিচার হয় তাহা বোধহয় কেহ কখনও ভুলিতে পারিবেন না।

হিতকরী সভা প্রতিষ্ঠার তারিখ ৫ এপ্রিল ১৮৬৩। প্রথম সম্পাদক ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হরিহর চট্টোপাধ্যায়। বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সভাপতি হন।

হান্টার সাহেব, ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার রচনার সময় উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে আসিয়া অবস্থান করিতেন।

কবি নগেন্দ্রনাথ সোম, মাইকেল মধুসূদনের উত্তরপাড়া বাসের বিবরণ 'ভারতবর্ষে' (বৈশাখ ১৩২৪) সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

দুর্গাচরণ রায় 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ উত্তরপাড়ায় "হিতকারী সভা" নামে একটি সভা আছে। এ সভার দ্বারা দেশের যথেষ্ট হিত সাধিত হয়।

জয়কৃষ্ণ বাবুর ন্যায় বিষয়কর্মে এমন উপযুক্ত লোক বাঙ্গালীয় দ্বিতীয় নাই। ইহার স্মরণশক্তি অসাধারণ। কোন তালুকে কোন সনে কত টাকা আনা পাই আদায় হইয়াছে, পর বৎসর বিনা কাগজপত্র দৃষ্টে বলিতে পারেন। জয়কৃষ্ণ বাবুর মৃত্যু হইলে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি-আই-ই মহোদয় পিতার বিবিধ সদগুণের অধিকারী হইয়া সমস্ত পৈত্রিক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ইঁহার ন্যায় মেধাবী, বিচক্ষণ ব্যক্তি বঙ্গসমাজে বিরল।

বাকল্যান্ড সাহেব লিখিয়াছেনঃ

He converted his native village of Uttarpara into a flourshing town, established in it a High Class English College, a Charitable Dispensary and a Public Library and founded several English and Vernacular Schools throughout his estates... He took a leading part in the early political movement of his countrymen.

এই স্থানের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের ভূবনমোহন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টে ওকালতী করিতে যান ও তথায় অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে প্রধান উকিলরূপে পরিগণিত হন। সন্তদাস বাবাজী তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তাঁহার পুত্র মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শ্রীশ্রীভক্তি রত্নাবলী" নামে একখানি গ্রন্থ আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের প্যারীমোহন সিপাহী বিদ্রোহের সময় যুদ্ধ করিয়া "ফাইটিং মুনসিফ" আখ্যা পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি সাধারণের হিতার্থে উত্তরপাড়া হিতকারী সভায় দান করিয়া যান। ইহা ছাড়া এই বংশে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান জজ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ ছিলেন) ও অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় পরিবারের কৃতি সন্তান হিসাবে তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল মুখোপাধ্যায় স্যার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ও হুগলী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং যোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ্য।

উত্তরপাড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশে বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। রামতনু চট্টোপাধ্যায় তদানীন্তন কালে একজন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র হরনাথ সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে বাঙ্গলার বাহিরে গিয়া সামরিক বিভাগে রসদ সরবরাহের কার্য করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করেন এবং ফিরিয়া আসিয়া উত্তরপাড়ায় গঙ্গার ধারে **রামচন্দ্র জীউর মন্দির, শিবমন্দির,** বিস্তৃত বাঁধান গঙ্গার ঘাট প্রস্তুত করান ও বাৎসরিক বার হাজার টাকার সম্পত্তি রামচন্দ্রজীউকে অর্পণ করেন। প্রতিবৎসর রামনবমীর দিন রামচন্দ্রের মন্দিরে বাৎসরিক উৎসব এখনও হয়। তাঁহার পৌত্র ডাঃ চুনিলাল চট্টোপাধ্যায় এই অঞ্চলে সুচিকিৎসক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন।

উত্তরপাড়ার গঙ্গাতীরে অবস্থিত আরও কয়েকটি দেবমন্দির উল্লেখ্য।

মুক্তকেশী কালী—উত্তরপাড়ার প্রাচীনতম গ্রাম্য দেবী। প্রতিষ্ঠা সময় সঠিক বলা যায় না। ইহা ডাকাতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবতঃ রতন ডাকাত ইহার প্রথম প্রাণ

প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সাবর্ণ চৌধুরী মহাশয়েরা দেবীর তত্ত্বাবধান করিতেন। দেবীর পুরাতন মন্দির ভগ্ন হইলে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে নূতন মন্দির ও নাটমন্দির নির্মিত হয়।

মন্দিরবাটির শিব—এখানে তিনটি প্রাচীন মন্দির আছে। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হাটখোলা নিবাসী রামনারায়ণ মল্লিক এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরের শীর্ষদেশে ফলকে স্থাপয়িতার নাম ও নির্মাণ সময় ১৭১৬ শকাব্দ (১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের সামনে কারুকার্যখচিত ইটে রামায়ণে বর্ণিত যুদ্ধাবলীর চিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কিত আছে। মধ্যের মন্দিরটি পঞ্চচুড় বিশিষ্ট বলিয়া দেখিতে খুব সুন্দর।

বানেশ্বর ও রামেশ্বর মন্দির—এই মন্দির দুইটিতে পাঁচটি ছত্রে নির্মাণ সময় ও প্রতিষ্ঠাতাগণের নাম ক্ষোদিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) শ্রীশ্রী৺বাণলিঙ্গস্য রাম (২) সেবক ৺রামতনু চট্টোপাধ্যায়স্য (৩) পুত্রাঃ শ্রীহরনাথ শ্রীভোলানাথ (৪) শ্রীতারকনাথ শ্রীশিবনাথ শ্রীদেবনাথ (৫) শকাব্দ ১৭৬৯ সন ১২৫৪ [১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ]।

বাণেশ্বরের মন্দিরে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ গাছ হওয়ায় ইহার এখন ভগ্নাবস্থা। বর্তমানে শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বংশধরগণের কর্তৃত্বাধীনে এই মন্দির দুইটি আছে বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহারা অচীরে ইহার সংস্কারের ব্যবস্থা না করিলে ইহা শীঘ্রই ধূলিস্যাৎ হইয়া যাইবে।

রায় বাহাদুর গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার পিতা কেদারনাথ ফরাক্কাবাদ প্রভৃতি স্থানে কমিশরিয়টে কার্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাঃ সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাহার পিতা যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবাসে কিমশরিয়টে কার্য করিতেন এবং বহু প্রবাসী বাঙ্গালীকে তাহার আশ্রয়ে রাখিয়া তিনি প্রতিপালন করিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্বুজনাথ কেয়ুরভঞ্জ ষ্টেটের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

উত্তরপাডায় 'গ্যাঞ্জেস্ ভ্যালী বোন মিল' নামে একটি হাড়কল ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসেও উত্তরপাড়ার বিশিষ্ট স্থান আছে। রাজা প্যারীমোহন বিপ্লবী যুবকবৃন্দকে গোপনে অর্থ দিতেন এবং শ্রীঅরবিন্দের 'উত্তরপাড়া স্পীচ' বহু বিদিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মুখোপাধ্যায় পরিবারের নিকট হইতেও স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।

উত্তরপাড়া গ্রন্থাগারের দ্বিতলে বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন জীবন সায়াহ্নের শেষ কয়েকমাস অতিবাহিত করেন বলিয়া ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে পাঠাগারে একটি ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে।

> ১৮২৪ খৃঃ ও ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের তিন মাসাধিককাল যাঁহার পুণ্য পরশধন্য এই গ্রন্থাগার তাঁহারই স্মৃতির উদ্দেশে এই শ্বেত ফলক স্থাপিত হইল।

২৯ জুন ১৯৫৫ শ্রীমধুসূদন সাহিত্য সংস্থা

বিপ্লবী অরবিন্দ ঋষি অরবিন্দরূপে উত্তরপাড়ায় সাধারণের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া ৩০ মে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের জনগণকে উদাত্ত কণ্ঠে "জাতীয়তা মানে সনাতন ধর্মরক্ষা" বলেন বলিয়া একটি ফলকে উহা উৎকীর্ণ আছে।

ঋষি শ্রীঅরবিন্দের উত্তরপাড়া গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে দুইটি সমাবেশে উপস্থিতি এবং তাঁহার ঐতিহাসিক 'উত্তরপাড়া অভিভাষণ' দানের স্মৃতিরক্ষাকল্পে গভীর শ্রদ্ধার সহিত এই ফলক স্থাপিত হইল।

উপস্থিতি দিবস—১৯০৮ ও ৩০শে মে ১৯০৯

২১ আগস্ট ১৯৫৫ সারস্বত সম্মেলন

(শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

১৮৬৪ খৃস্টাব্দে উত্তরপাড়ায় মিউনিসিপ্যাল অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের বেঞ্চ সৃষ্টি হইলে নিম্নোক্ত চারজন ব্যক্তি প্রথম অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হন।

১। বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২। বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বনমালী মিত্র ৪। বিজয়নাথ চট্টোপাধ্যায়

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন। ছাপাখানার নাম "ইউনিয়ন প্রেস"। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এই ছাপাখানা উঠিয়া যায়। পরে কালীদাস মুখোপাধ্যায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র ঘোষ "তারা প্রেস" ও ললিতকুমার মুখোপাধ্যায় "পিকউইক প্রেস" স্থাপন করেন। বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্তরপাড়া হইতে প্রকাশিত (১৩১৬-১৭) **'কর্মযোগিন'** নামক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

বাঙলার বাহিরে যাইয়া উত্তরপাড়ার যে সকল ব্যক্তি বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাহাদের নামঃ

লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্টের দেওয়ান রামকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ ডাক্তার অমৃতলাল মুন্সী ও জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায, লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমরনাথ চৌধুরী (মধ্যপ্রদেশ), রাজপুতানার ডাঃ নিরাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উত্তরপাড়ার নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কাঞ্চনমালা দেবীর নাম সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম গুচ্ছ, রসির ডায়েরী প্রভৃতি।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় বহু জীবনহানি হয়। মহাত্মা গান্ধী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য আবেদন জানান। তাঁহার আবেদনে শচীন্দ্রনাথ মিত্র বহু হিন্দু যুবককে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় পাঠাইয়া শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন। কলিকাতার কলাবাগান বস্তীতে উত্তরপাড়ার **স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়** 'শান্তিবাণী' দিবার সময় পিছন হইতে একজন মুসলমান গুন্ডার দ্বারা ছুরিকাহত হইয়া মারা যান। তাঁহার পুণ্য স্মৃতি রক্ষাকল্পে বালিখালের পুলের নিকট গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর উত্তরপাড়ায় স্মৃতীশের একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূর্তির দুই দিকের উৎকীর্ণ লিপি নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

"রক্তের অক্ষরে যিনি মৈত্রী, শান্তি ও মিলনের উজ্জ্বল লিপি রচনা করেছেন গত ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭"

"শহীদ স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের মুক্তিযুদ্ধের দুইশত বৎসরের রক্তরাঙগা আত্মদানের ইতিহাস রং ও রেখার সাহায্যে জাতীয় প্রদর্শনীতে রূপায়িত করে যিনি নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।"

ওয়াতুমল পুরস্কার লাভ

উত্তরপাড়া নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, লেখক ও গ্রন্থগারিক অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় বঙ্গভাষায় রচিত "গ্রন্থাগার বিজ্ঞান" পুস্তকের জন্য ১৯৬১ সালের "ওয়াতুমল পুরস্কার" (পুরস্কারের মূল্য ৫০০০্ টাকা বা এক হাজার ডলার নগদে) লাভের গৌরব অর্জন করিয়াছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'শিক্ষা-বিজ্ঞান সংস্কৃতি' সংস্থার একটি বৃত্তির সাহায্যে তিনি ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রে গ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন।

॥ মোহিতমোহন ঘোষ ॥

১৯১১ খৃষ্টাব্দে **মোহিতমোহন ঘোষ** কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তরপাড়া বিদ্যালয় হইতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র হিসাবে গণিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম-এসসি পাশ করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ায় তাঁহার জন্ম হয়। সজনীকান্ত দাস তাঁহার "আত্মস্মৃতি" ২য় খণ্ডে এই কৃতি ছাত্রের বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "শনিবারের চিঠি"তে মোহিতমোহন রচিত "উর্দোস্কৃত প্রচারিণী সভা" নিত্যরসে টলমল মাণিক্য বিশেষ বলিয়া সজনীবাবু অভিহিত করিয়াছেন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত অধ্যাপকরূপে তাঁহার গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। সজনীবাবু বলেনঃ বিশুদ্ধ অঙ্কের ছাত্র হইলেও মোহিতমোহন সর্ববিদ্যাবিশারদ ব' চৌকস ছিলেন। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার ব্যাপক জ্ঞান ছিল, ব্রিজ খেলাতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মাতৃভাষায় তাঁহার অতিশয় সরস রচনাভঙ্গির পরিচয় 'উর্দোস্কৃতে'র উদ্ধৃতাংশেই মিলিবে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অতিশয় মাতৃ-ভ্রাতৃপরায়ণ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করিতে করিতে তাঁহার অকালমৃত্যু হয়। তাঁহার রচনার নিদর্শন উদ্ধৃত হইলঃ

আজ প্রায় তিন মাস হইল মামা বাত সারাইবার জন্য আমার বাসায় আসিয়াছেন। মামার বাত সারিয়া গিয়াছে, এখন প্রত্যহ দুপুরবেলায় ষ্টীমারে চাঁদপাল ঘাট হইতে রাজগঞ্জ অবধি ভ্রমণ করেন। সেদিন মামার সহিত ষ্টীমারে বেড়াইতেছি। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের জেটি হইতে একটি প্রৌঢ় বয়স্ক মুসলমান ষ্টীমারে উঠিলেন। শ্রোতার অভাবে এতক্ষণ মামার গল্প বন্ধ ছিল। মুসলমানটিকে সাদরে নিজের পাশে বসাইয়া একটি বিড়ি দিলেন। মিঞা সাহেব ব্যাগ হইতে একখানা হাতপাখা বাহির করিয়া দাড়িতে বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, বিসমিল্লা, কি গরম!

মামা। হ্যাঁ, সামান্য গরম পড়েছে বটে তবে বোগ্‌দাদের তুলনায় এ কিছুই নয়।

মিঞা। আপনি বোগ্‌দাদ গ্যাছলেন না কি?

মা। আমি ধনপতি বসু। পৃথিবীর কোন্‌ জায়গায় যাই নাই তাই জিজ্ঞাসা করুন।

মি। বোগ্‌দাদে কি খুব গরম?

মা। গরম তা আর বলতে? সেবার তিনটে উট আমার চোখের সামনে হার্টফেল হয়ে মরে গেল। আবার পড়ে রইল আমার তাবুর সামনে। তখন ভয়ানক যুদ্ধ চলেছে, ঘণ্টায় ২৫/৩০টা হাত পা মাথা অ্যাম্পুট করছি, উটগুলোকে যে টাইগ্রিসে ফেলে দেব সে সময় নাই। দুদিন বাদে হাসপাতাল থেকে বেরুবার সময় পেলুম। বেরিয়ে দেখি, উটগুলো পচে নি। তিন দিন দিনযামিন্যোস্বায়ং প্রাতঃ লেগে একেবারে আমসত্ত্বের মতন হয়ে গেছে।

মি। বলেন কি? হাড্ডি ভি শুকিয়ে গেল?

মা। একদম বিলকুল শুকিয়ে খেংরাকাটি বনিয়ে গেল।

মি। তাজ্জব কি বাত!

মা। এ আর তাজ্জব কি? তখন চীন দেশে ডাক্তারি করি। বুদ্ধদেবের উইসডম টুথ উদগম উপলক্ষে আমাদের ২১ দিনের ছুটি। সঙ্গে একটি চীনে হাবসী চাকর নিয়ে চীনের পাঁচিল দেখতে বেরুলুম। গিয়ে দেখি, চীনারা কাঁচা পাঁপরে জলের ছিটে দিয়ে পাঁচিলের ওপর রাখছে আর খানিক বাদে পাঁপর মুচমুচে ভাঁজা হয়ে উঠছে।

মি। বিসমিল্লা, এমন কাণ্ড তো কখনও শুনি নি!

মা। শুনবেন কোত্থেকে? আগে তো আর ধনপতি বোসের দেখা পান নি! আমি 'চীনময় ভারত' বলে একখানা বই লিখছি, তাতে এই সব কথা থাকবে। গরমে পাঁচিলের পাথরগুলো ফটাফট ফাটছিল, তার এক টুকরো ছিটকে লেগে হাবসীটা মরে গেল।

মি। একদম মরে গেল?

মা। একদম আপাদমস্তক মরে গেল। প্রতি বৎসর পাঁচিলের কাছে ৩৭ হাজার লোক গরমে গলে মারা যায়—

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্তের "জয়কৃষ্ণ চরিত" ও শ্রীঅবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "উত্তরপাড়া বিবরণ" নামক পুস্তিকায় অনুসন্ধিৎসু পাঠক উত্তরপাড়া সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

॥ কোতরং ॥

কোতরং শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান। উত্তরপাড়া ও কোন্নগরের মধ্যবর্তী দুই বর্গমাইল স্থান কোতরং পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে যখন এই পৌরসভার পত্তন হয়, তখন এই অঞ্চল গণ্ডগ্রাম বলিয়া পরিগণিত হইত। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে কোতরং শহরের জনসংখ্যা ছিল ১৪ হাজার ১ শত ৭৭ জন আর ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে জনসংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়ায় ৩০ হাজার ৯ শত ৭৭ জন। অর্থাৎ দশ বৎসরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১২৬ জন। বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। গত কয়েক বৎসরে মাখলা হিন্দমোটর, ভদ্রকালী ও কোতরং এলাকার জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৭ আগষ্ট ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়া শহরের সহিত ভদ্রকালী কোতরং ও মাখলার বিস্তীর্ণ অনুন্নত

অঞ্চল উন্নয়নের জন্য উত্তরপাড়া ও কোতরং পৌরসভার সংযুক্তি হয় এবং শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপশুপতি দত্ত নবগঠিত পৌরসভার সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। কোতরং-এর পূর্বদিকে ভাগীরথী নদী, পশ্চিমে পূর্ব রেলওয়ে দক্ষিণে উত্তরপাড়া ও উত্তরে কোন্নগর অবস্থিত।

১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের কবিতায় এই স্থানের উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও তাঁহার চন্ডীকাব্যে 'কোতরং'-এর কথা লিখিয়াছেন। এই স্থানটি পূর্বে খুব অস্বাস্থ্যকর ছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এই স্থানের প্রতি মাইলে মৃত্যুহার ছিল ৪৯·২১ ও জন্মহার ছিল ১৯·৭৭। ওম্যালী সাহেব গঙ্গার ধারে ইটখোলার ভাসমান শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্য এই স্থানের জন্মহার কম বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ The low birthrate is largely due to a considerable floating population of males, who are attracted to the town for the brick and the tile making industry.

উত্তরপাড়া ও বালি পূর্বে এক গ্রাম থাকায় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কেবল বালির নাম আছে। কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন (১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে)

ত্বরায় চলয়ে তরি তিলেক না রহে।
ডাহিনে মাহেশ রাখি চলে খড়দহে॥
কোন্নগর, কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
কুচিনান ধনপতি একেবারে পায়॥

কোতরং গ্রাম প্রাচীন হইলেও শহর খুব আধুনিক, কারণ পুরাণো মানচিত্রে এই স্থানটির কোন চিহ্ন নাই। পাল উপাধিধারী কুম্ভকার ও সেন উপাধিধারী তাম্বুলি সম্প্রদায়ের এই অঞ্চলে খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। এবং তাহারাই কোতরং গ্রামের পুরাতন বাসিন্দা। মাটির কাজ ও তৎসংক্রান্ত ব্যবসায়ের জন্য এবং কুটিরশিল্প হিসাবে পাটের দড়ি ও সুতাতৈয়ারী করিবার জন্যও এই স্থানের খ্যাতি ছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণের সময় কোতরং-এর ইঁট ভাল বলিয়া উহাতে কোতরং-এর ইঁট ব্যবহার করেন। কলিকাতা পৌর সভার এই স্থানে একটি বৃহৎ, ইটখোলা ছিল এখন উহা ইজারা দেওয়া হইয়াছে।

কোতরং-এ রাধাগোবিন্দনগরে শ্রীহীরালাল পাল তাঁহার পিতৃদেবের নামে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

কোতরং নামটি আর্য শব্দ নয় বলিয়া মনে হয়। ডঃ সুকুমার সেন বলেন ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রোপকূল অঞ্চল দ্রাবিড় জাতির বসতি আগে ছিল বলিয়া মনে হয়। তাম্রলিপ্ত বা দামলিপ্ত (প্রাকৃতে দামলিও) এই স্থান নাম এবং তামলি এই জাতিনাম তামিল বা দমিল (দ্রাবিড়) হইতে আসিয়াছে অনুমান করি। তামলিরা তখনও তাম্বুলের ব্যবসা করে নাই, আর কদাচ তাম্বুলের (অর্থাৎ পানের) কোন ব্যবসার কথার উল্লেখ নাই। যাহারা পানের চাষ করিত তাহারা বারই (বারুই), পান বেচা তাহাদেরই ব্যবসা। তামলিরা সম্ভবতঃ সমুদ্রযাত্রী বণিক ছিল। এ কাজ তামিলেরা চিরকাল করিয়া আসিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের

অনেক গ্রাম নামের আর্যভাষা সম্মত ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এ সব নাম এ দেশের প্রাচীনতর অধিবাসী অস্ট্রিক ও দ্রাবীড় ভাষীদের দেওয়া।

এই জনপদের অধিবাসীগণের উপাধি ও গ্রামগুলির নাম পর্যালোচনা করিলে উপরোক্ত কথাগুলির সত্যাসত্য বেশ ভালভাবে বুঝা যাইবে। অনার্য ভাষা গ্রাম নামের মাঝে দুই একটি আর্যভাষার নাম আসিয়া গিয়াছে। কোতরং, রিষড়া, সেওড়াফুলি, মাখলা, গোড়েল প্রভৃতি অনার্য নামের মাঝে ভদ্রকালী, কোন্নগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামের নামগুলি আর্যীকরণের প্রচেষ্টা ধ্বনিত করিতেছে। বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাসের অনেক কিছুর ইঙ্গিত ইহার মধ্যে পাওয়া যায়।

পূর্বে এই অঞ্চলে ডাকাতির খুব প্রকোপ ছিল এবং মুসলমান রাজত্বকালে পর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপাতের দরুণ বহু প্রাচীন বংশ এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসবাস করেন। শ্রীমদ চৈতন্য মহাপ্রভু এই গ্রামের রামচন্দ্র খানের* বাড়িতে একবার পদার্পণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র খান পরবর্তীকালে উড়িষ্যায় জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তথায় বসবাস করেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়, আই, সি, এস ইহার বংশের অন্যতম সন্তান। তাঁহার সম্বন্ধে ৪৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

॥ ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

কোতরং-এ বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে লক্ষ্ণৌ প্রবাসী ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ্য। পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে কার্য করিবার জন্য ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনার সহিত ঘনিষ্ট যোগ ছিল। তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন ও সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। বিশিষ্ট ইংরাজ রাজপুরুষগণ জটিল সমস্যা সম্পাদনের জন্য তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে স্যার জেমস্ আউটরামের উক্তি উদ্ধারযোগ্য ঃ

I am proud to mention that my assistant Baboo Bhyrub Chandra Banerjee of Lucknow Residency is so clever, intelligent and clear headed that he could guide his European superiors in the due performance of their public duties regarding most intricate political matters.

তিনি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হয়। বীরেশ্বর ব্যানার্জি ষ্ট্রীটে তাঁহার বাস ছিল।

॥ ভদ্রকালী ॥

কোতরং পৌরসভার মধ্যে ভদ্রকালী একটি প্রাচীন স্থান। গ্রাম্যদেবী শ্রীশ্রীভদ্রকালী-মাতার নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম ভদ্রকালী হইয়াছে। কথিত আছে যে প্রাচীনকালে এই স্থান যখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল তখন একটি পুষ্করিণী হইতে এই মূর্তি আবিষ্কৃত হয়।

* বেনাপোলে আর একজন রামচন্দ্র খাঁ ছিলেন, তিনি হরিদাস ঠাকুরের সহিত অসৎ আচরণ করেন বলিয়া কথিত আছে।

পূর্বে ডাকাতির জন্য ভদ্রকালী কুখ্যাত ছিল এবং এখনও ডাকাতে কালী এইস্থানে আছে। মহামায়ার আদ্যাস্তোত্রে লিখিত আছেঃ

কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা।
বিষ্ণুভক্তি প্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা পরা॥

ওয়ালী সাহেব ভদ্রকালীমাতার নাম হইতে গ্রামের নামকরণ হইয়াছে লিখিয়াছেনঃ
Bhadrakali is so called from an old temple of goddess Kali.

মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মঠাকুর ও মাণিক পীর হরনাথপুরে বহু বৎসর ধরিয়া আছে। ধর্মঠাকুরের পূজারী ও উপাসক যোগী বা নাথ সম্প্রদায়ের লোক। ইহারা পূর্বে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে মাণিকপীরের তলায় মেলা হয়। মেলায় বহু বৎসর ধরিয়া যাত্রা, কবিগান, তর্জা প্রভৃতির জন্য বহু লোকসমাগম হয়। ওয়ালী সাহেব এই মেলা ও মাণিক পীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইস্থানে উল্লেখ্যঃ

A religious fair is held here about the middle of January in honour of a saint named Manik Pir. (Hooghly District Gazetters).

এখন "মাণিকপীর" প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। আর একটি প্রবাদ এই অঞ্চলে বহুল প্রচলিত, সেটি হইতেছে "ইট খোলা টালি, এই তিন নিয়ে ভদ্রকালী।"

দোলের সময় এখানে আর একটি মেলাও উল্লেখযোগ্য। তদুপলক্ষে বাজী পোড়ান হয় এবং রাত্রে কীর্তন করিয়া ঠাকুরকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হয় এই সময় পূর্বে পুতুলনাচ, কৃষ্ণযাত্রা, কবিগান প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইত। এখন থিয়েটার, বায়োস্কোপ, জলসা প্রভৃতি হয়।

পুকুর কাটাইবার সময় ভদ্রকালী হইতে নৌকার হাল ও কয়েকটি প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শিল্পী শ্রীসুধাংশু রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ মিউজিয়ামের সংগ্রহশালায় উহা দিয়াছেন। বঁটি, কাটারী, লাঙ্গলের হাল পূর্বে এখানে নির্মিত হইত। এখন ইঁট ও টালির জন্য এই স্থান খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

॥ রামলাল দাস দত্ত ॥

ভদ্রকালীতে বহু কৃতবিদ্য লোক জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সাধক রামলাল দাস দত্তের নাম উল্লেখ্য। তিনি কয়েকখানি নাটক ও বহু শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়া যশস্বী হন। তাঁহার চারখানি সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'শাক্ত-পদাবলী' নামক গ্রন্থে রামলাল দত্তের অনেকগুলি সঙ্গীত আছে। নিম্নে তাঁহার রচিত একটি সঙ্গীত এই স্থানে উদ্ধৃত হইলঃ

বার বার যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
সে কেবল দয়া তব, জেনেছি গো দুঃখ হরা।

সন্তান-মঙ্গল-তরে, জননী তাড়না করে,
তাই বহিতেছি সুখে, শিরে দুঃখের পশরা।

জিনি অমূল্য রতন, ব্রহ্মময়ী-নাম-ধন,
তারা ব'লে ডাকি যখন, হই গো আপন-হারা।
তুমি গো দীন-তারিণী, শরণাগতপালিনী,
আমি ঘোর পাতকী বলে, তোমারে হয়েছি হারা।
আমি তব পোষা পাখী, যা শিখাও তাই যে শিখি,
রামে শিখায়েছ তারা বুলি, তাই বলি 'তারা' 'তারা'॥

প্রসিদ্ধ শিল্পী অর্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী ২৬ মার্চ ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের 'অমৃত' পত্রে আমার কথা ও ভারতের শিল্পকথা প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ তারপর তিনি তাঁর বিখ্যাত গান গাইলেন, "তনয়ে তার তারিণী ওমা তারা" রামবাবুর গানের সঙ্গে চারুবাবু সঙ্গত করে-ছিলেন চমৎকার। চারুবাবুর পাখওয়াজের ছন্দলহরী ভক্তের সরল সুগম্ভীর গানের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের উদ্যানবাটীকে সেদিন মুখরিত করে তুলেছিল, সেদিন এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

কবি খুব ভাল ইংরাজী জানিতেন। তাঁহার একমাত্র জীবিত কনিষ্ঠ পুত্রও সুগায়ক, নাম শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত। ভদ্রকালীতে রামলাল দত্ত রোড নামে একটি রাস্তা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া অধ্যাপক পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর ও তাঁহার ভ্রাতা প্রধান শিক্ষক বিপিনবিহারী দে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা জহরলাল বসু, আমাদের অদৃশ্য শত্রু রচয়িতা চিকিৎসক ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃসিংহকুমার মুখোপাধ্যায়, বাঁশী ও চলতি দুনিয়ার লেখক শ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সিপাহী ঝোরা'র লেখক ডাঃ বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় , ফণীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র দে তাঁহার স্বলিখিত আত্মজীবনীতে যে বংশপরিচয় দিয়াছেন তাহা এইঃ

জনকঃ কৃষ্ণচন্দ্রো মে জননী বিন্ধ্যাবাসিনী।
পিতামহো রামচন্দ্রঃ সার্থকঃ প্রপিতামহঃ॥
শোভারাম ইতি খ্যাতো মদ্বৃদ্ধপ্রপিতামহঃ।
'দে'-বংশখ্যাতিসম্পন্না ইমে মে পূর্বপুরুষা॥

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আদি বাস এই গ্রামে ছিল। তাঁহার পুত্র এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও কন্যা রেণুকা রায় এম, পি, ভদ্রকালীর অধিবাসী। এই স্থানে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে একবার ভীষণ ডাকাতি হইয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসী হরিলাল চট্টোপাধ্যায় ডাকাত সর্দারকে নিহত কবায় ইংরাজ সরকার কর্তৃক তিনি পুরস্কৃত হন।

গ্রামে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভদ্রকালী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য বালিকা আশ্রম, দেশপ্রিয় বালিকা বিদ্যালয়, বিপিনবিহারী স্মৃতি পাঠাগার, ভদ্রকালী এসোসিয়েশন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া খেলা-ধূলা ও যাত্রার কয়েকটি সংস্থা আছে।

পূর্বে যে সকল স্থান ইঁটখোলা ও চাষ-আবাদের জন্য ব্যবহৃত হইত এখন সেই স্থানে কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ-ওয়ালেশ কোম্পানীর বেঙ্গল ডিস্টিলারী ও

ইয়েস্ট কারখানার নাম করা যায়। বেঙ্গল ডিস্টিলারী যেখানে হইয়াছে, তথায় আগে একটি ডক স্থাপিত হইয়াছিল। সেখানে ম্যাকিন্টোস বার্ন এন্ড কোম্পানী সিমেন্ট কংক্রিটের বোট তৈয়ারী করিত। ডক নির্মাণের আগে উক্ত স্থানে পালেদের খুব বড় ইটখোলা ছিল।

এই স্থানের বুড়োশিবের মন্দির প্রাচীনতম ধর্মস্থান বলিয়া কথিত। মন্দিরের এখন ভগ্নাবস্থা। পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর এই বুড়োশিব হাজার বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। ভদ্রকালীর মন্দির আধুনিক। সেওড়াফুলির রাজবংশ কর্তৃক ইহা নির্মিত হয়। মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি সাধারণ। মন্দিরগাত্রে একখানি পাথরে "শ্রীশ্রীভদ্রকালীমাতা—সেওড়াফুলি রাজ" এই কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে। ভদ্রকালীর বিগ্রহ দেখিতে খুব সুন্দর। দেবী চতুর্ভুজা, বাম দিকের দুই হাতে খড়্গ ও নরমুণ্ড এবং দক্ষিণের দুই হাত দিয়া যেন অভয়দান করিতেছেন। ইঁহাকে আরাধনা করিলে সুখ শান্তি পাওয়া যায় ও মোক্ষ লাভ হয় বলিয়া প্রত্যহ বহু পুণ্যলোভাতুর ব্যক্তির এই মন্দিরে সমাগম হয়।

রামবাড়ি বা রামসীতার মন্দিরে রাম-লক্ষ্মণের দণ্ডায়মান অবস্থায় শ্বেতপ্রস্তরের মূর্তি ছাড়া রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ এবং আরও চারটি বিগ্রহ আছে। বিগ্রহগুলি দেখিতে খুব সুন্দর এবং প্রাত্যহিক পূজার ব্যবস্থা আছে। বিশালাক্ষী মাতার মন্দির 'বিশালাক্ষী সমিতি' কর্তৃক সম্প্রতি পুনর্নির্মিত হইয়াছে। মন্দির আড়ম্বরবিহীন অতি সাধারণ হইলেও স্থানীয় ব্যক্তিগণ পুরাতন মন্দির ভগ্ন হইলে, যত্ন সহকারে ইহার পুনর্গঠন করিয়াছেন ইহা খুবই শ্লাঘার বিষয়। মন্দিরগাত্রে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে ঃ

"শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী মাতা। জনসাধারণের অর্থে ও সাহায্যে এই মন্দির সংস্কার
ও পূর্ণগঠন করা হইল। বিশালাক্ষ্মী সমিতি, ভদ্রকালী ১৪ই বৈশাখ
সন ১৩৫৯ সাল।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীবিশালাক্ষ্মী মাতাকে দর্শন করিবার জন্য এই গ্রামের হরিপদ চক্রবর্তীর বাড়িতে একবার আসিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া ধর্মঠাকুরের মন্দির ও মাণিকপীরের তলা এখানে আছে। কিছুকাল আগে ভদ্রকালীতে বাবু মোল্লা একটি মসজিদ ও অমৃতলাল পাল একটি কালীবাড়ি করিয়াছেন। দোলের সময় বহু বৎসর ধরিয়া এখানে একটি মেলা হয়। চড়কের মেলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে "তরুণ" নামে একখানি পত্রিকা এই স্থান হইতে প্রতি ঋতুতে প্রকাশিত হইত। ইহার পল্লীসমাজ বিভাগে বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, ভদ্রকালী প্রভৃতি স্থানের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর চলিবার পর ইহা উঠিয়া যায়। ভদ্রকালী এসোসিয়েশনের নিজস্ব ভবন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে হয়। ভদ্রকালী পাঠাগার এই ভবনে অবস্থিত।

এই গ্রামে সামরিক বিভাগের ডেপুটি একাউন্টেণ্ট জেনারেল শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুরের বিখ্যাত উকিল শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ্যাণ্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটির অন্যতম সংগঠক ও ডাঃ বেণ্টলির সহকারী ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপশুপতি দত্ত, শ্রীতারকদাস মিত্র প্রভৃতি কৃতি ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

॥ . চণ্ডীতলা . ॥

চণ্ডীতলা শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্ভূক্ত একটি পুরাতন স্থান কারণ শ্রীমন্ত সওদাগর প্রতিদিন যে চণ্ডীদেবীর পূজা করিতেন, সেই দেবী অদ্যাপি এইস্থানে বিদ্যমান আছেন এবং চণ্ডীদেবী হইতেই এই স্থানের চণ্ডীতলা নামকরণ হইয়াছে। সুদূর অতীত কাল হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সপ্তগ্রাম ভারতের প্রসিদ্ধ শহর ও ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রধানতম বন্দর এবং সরস্বতী নদী তৎকালে সমুদ্র-যাত্রার একমাত্র পথ ছিল। সরস্বতী-তীরবর্তী এই প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানটি বর্তমানে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইউরোপীয় উপনিবেশকারিগণ ভাগীরথীতীরে প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত শিয়াখালা, জনাই-বাকসা, বেগমপুর এবং বড়তাজপুর, ফুরফুরা-শরীফ, গুড়গুড়িপোতা প্রভৃতি স্থানগুলি ধনাঢ্য, সুসভ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের লীলাভূমি ছিল। বর্তমানে শিয়াখালা, আকুনি-ইছাপাসার, নবাবপুর-কুমিরমোড়া, জনাই, বেগমপুর, চণ্ডীতলা, মনোহরপুর ও কৃষ্ণরামপুর এই আটটি ইউনিয়ন লইয়া চণ্ডীতলা থানা গঠিত হইয়াছে। এই থানার বর্তমান জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮ শত ৮৪ জন। প্রতি বর্গমাইলে এই থানার লোকসংখ্যা ২,৬৪৫ জন। গ্রাম্য এলাকায় এইরূপ ঘনবসতিপূর্ণ স্থান জেলার আর কোথাও নাই।

চণ্ডীতলা জনাইয়ের দক্ষিণ পূর্ব কোণে, প্রায় দুই মাইলের কিছু দূরে অবস্থিত। এখানে প্রসিদ্ধ চণ্ডীর দেউল আছে। শৈবধর্মের আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালে, অর্থাৎ যে সময়ে সেনরাজগণ এদেশে রাজত্ব করিতেন, সেই সময় হইতে মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবীর ব্রতকথায় ধনপতি সদাগর ও তৎপুত্র শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল যাত্রা প্রভৃতি বিষয়ের উপাখ্যান চলিয়া আসিতেছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাহা অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিদধিক চার শত বর্ষ হইল আপনার লিপিকৌশলে অপূর্ব চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ধনপতি সদাগর যে পথে বাণিজ্যার্থ সিংহল গিয়াছিলেন, সে পথ ত্রিবেণী হইতে সরস্বতী নদী দিয়া। চণ্ডীতলার ঘটস্থাপিত প্রাচীন চণ্ডীদেবী শ্রীমন্ত সদাগরের দ্বারা স্থাপিত, এবং এই চণ্ডীদেবী হইতে এই স্থানের নাম চণ্ডীতলা হইয়াছে। চণ্ডীতলার হাট পুরাতন এবং এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। চণ্ডীতলা-থানা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভে স্থাপিত হয়। মার্টিন কোম্পানীর রেলের ইহা একটি জংসন, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে স্থাপিত। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর হিসাবে এই গ্রামের লোকসংখ্যা ১৮৯৫ জন।

চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত প্রায় সমস্ত প্রাচীন বংশগুলিতে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি আছেন; দুঃখের বিষয় ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সকলেই প্রায় দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। পুরাকালের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে বহু বাড়ীতে অদ্যাপি দুর্গোৎসব হইয়া থাকে; বঙ্গের কোন থানায় এত অধিক দুর্গোৎসব হইতে দেখা যায় না। কিন্তু দুর্গোৎসব হইলে কি হইবে, সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়ায় পূর্বের সে শ্রী যেন চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া

গিয়াছে; চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরস্বতী কাটাইয়া জল নিকাশের সুব্যবস্থা হইবে বলিয়া শুনিয়াছি, যদি হয় তাহা হইলে এই অঞ্চলের গৌরব-রবি যে পুনরায় উদিত হইবে তাহা সুনিশ্চিত।

॥ শিয়াখালা ॥

শিয়াখালা বহু প্রাচীন ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা জনাইয়ের উত্তর পশ্চিম দিকে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম শিবাক্ষেত্র। পূর্বকালে এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া কৌষিকী বা কাণানদী প্রবাহিত ছিল। শিয়াখালার উত্তর-বাহিনী দেবীর মাহাত্ম এ অঞ্চলে সুপরিজ্ঞাত। পাঠানযুগে বঙ্গের সুলতান হোসেন শাহের প্রধান আমাত্য বা উজীর গোপীনাথ বসুর বাসস্থান ছিল। গোপীনাথ বসু মুসলমান দরবারে 'মল্লিক পুরন্দর খান' উপাধিলাভ করেন। কুলগ্রন্থে তাঁহাকে 'মহারাজ ও গৌড়াধিকারী' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সমগ্র গৌড়বঙ্গে রাজা বল্লাল সেনের নাম যেরূপ সর্বজনবিদিত, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে পুরন্দর খাঁর নামও সেইরূপ সুপ্রসিদ্ধ। পুরন্দর খাঁর পিতা ঈশান খাঁও গৌড়ের মুসলমান দরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পুরন্দর খাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতা মালাধর বসু ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' নামক অমূল্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করায় সুলতানের নিকট হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হন। মালাধর বসুর পৌত্র রায় রামানন্দের নাম বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত। রায় রামানন্দ উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের একজন ঊর্ধতন কর্মচারী ছিলেন এবং 'জগন্নাথ বল্লভ' নামক নাটক রচনা করেন। পুরন্দর খাঁর অন্যতম জ্ঞাতি পরমানন্দ বসু চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়া নিজ বাহুবলে সমগ্র পূর্ববঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন। শিয়াখালার নিকটবর্তী দেশমুখো গ্রাম সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আদিনিবাস। তাঁহার পিতামহ রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতুলের বিষয় পাইয়া কাঁঠালপাড়ায় বাস করেন। সঞ্জীবনী সুধাতে লিখিত আছে যে অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্বপুরুষ। তাঁহার বাসস্থান ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্বতীরস্থ কাঁঠালপাড়া গ্রামনিবাসী বসুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন: সেই সময় শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে এক নবযুগের প্রবর্তন করেন। তিনি মুসলমান-ধর্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার সাহায্যে সংস্কৃত-সাহিত্য ও দর্শনাদির নানারূপ গবেষণা হয়। তাঁহার উজীর গোপীনাথ বসু ওরফে পুরন্দর খাঁ এই স্থানের অধিবাসী তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। গোপীনাথ প্রথম জীবনে বঙ্গেশ্বরের অধীনে একজন সৈনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং নিজ বীরত্বে নবাবকে মুগ্ধ করিয়া তাহার সেনাপতি হন। পরে পুরন্দর নামক স্থানে নবাবের হইয়া যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন বলিয়া তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে "পুরন্দর খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই সম্বন্ধে সারদাচরণ মিত্র "পুরন্দর খাঁ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন:

"পুরন্দর খাঁ হোসেন শাহের একজন প্রধান মন্ত্রী এবং রূপ ও সনাতন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। পুরন্দর দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশোদ্ভব ও মাহীনগর সমাজের বসু বংশের সমুজ্জ্বল রত্ন। বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত চণ্ডীতলা থানার অধীন কৌশিকী-নদী সনাথ শেয়াখালা গ্রাম পুরন্দরের জন্মস্থান। এক্ষণে কৌশিকীর অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র আছে। যে নদীপথ দ্বারা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর শ্রীমন্ত সওদাগর পোতে গমন করিয়া মগরায় মহাঝড় ও বৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন এবং অবশেষে সমুদ্রপথ দ্বারা সিংহলে গিয়েছিলেন, সে নদীর এক্ষণে চিহ্নমাত্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্তমান ভাগীরথী, কালীঘাট উত্তীর্ণ হইয়া অনতিদূরে টালীর নালায় বিলুপ্ত হইয়াছে। সরস্বতী ও রূপনারায়ণের খাঁড়ী এক্ষণে ভাগীরথীর পরিদৃশ্যমান মুখ এবং তাহা ইংরাজ বাহাদুর কর্তৃক হুগলী নামে অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ভাগীরথীর মুখ নহে। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে খিদিরপুর হইতে সাঁখরাল পর্যন্ত নদীর চিহ্নমাত্র ছিল না। ভাগীরথীর সহিত সরস্বতীর যোগ প্রথমতঃ একটি খাল কাটিয়া সম্পাদিত হয়। জলপ্রবাহে 'কাটিগঙ্গা' এক্ষণে হুগলীর একাংশ।"

॥ পুরন্দর খাঁ ॥

পুরন্দর অত্যন্ত মেধাবী, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা গোবিন্দ বসু ও প্রাণবল্লভ বসু, উভয়েই নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং নবাব তাঁহাদিগকে "গন্ধর্ব খাঁ" এবং "নবাব খাঁ" উপাধি দেন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বঙ্গভাষায় বহু রচনা অদ্যাপি তাঁহার সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দিতেছে। নবাব হোসেন শাহ তাহার রচনায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে 'যশরাজ খান' উপাধি দেন বলিয়া, নগেন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। রায় রামানন্দের নাম বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত। ইনি দ্বারকা নগরী হইতে নীলাচল পর্যন্ত মহাপ্রভুর সহিত পর্যটন করেন এবং মহাপ্রভু ইহাকে 'মিত্র' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

পুরন্দর খাঁ "শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল" নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, নিম্নে উক্ত পুস্তক হইতে দুই লাইন উদ্ধৃত হইল; এই ভনিতা হইতে তিনি যে "যশরাজ খান" উপাধি পাইয়াছিলেন, তাহাও দৃষ্ট হয়:

"শ্রীযুত হুসেন জগতভূষণ সোহ এ রসজান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভনে যশরাজ খান॥"

পুরন্দরের অন্যতম জ্ঞাতি পরমানন্দ বসু, চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়া নিজ বাহুবলে সমগ্র পূর্ববঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন। "বসুবংশ ছত্রধারী, চন্দ্রদ্বীপের অধিকারী" এই প্রবাদবাক্য আজও সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'মধ্যযুগে বাঙ্গলা' শীর্ষক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

"হোসেন শার পূর্বে গৌড়ের রাজ সরকারে উচ্চতর বিস্তর রাজকার্যে হিন্দুর নিয়োগের

বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্যাতনামা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ গোপীনাথ বসু হোসেন সার উজীর ছিলেন। ইনি পুরন্দর খাঁ উপাধি লাভ করেন। বর্তমান হুগলী জেলার শেয়াখালা গ্রাম পুরন্দর খাঁর জন্মস্থান। অদ্যাপি তথায় পুরন্দরনগর বিদ্যমান আছে। পুরন্দর খাঁর পিতামহও গৌড় সরকারে চাকুরী করিয়া সুবুদ্ধি খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।"

গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ বাল্যকালে পুরন্দরের পিতামহ সুবুদ্ধি খাঁর অধীনে চাকুরী করিতেন এবং সুবুদ্ধি খাঁর চেষ্টায় হুসেন রাজ সরকারে নিযুক্ত হন। উত্তরকালে, স্বীয় সুতীক্ষ্ম বুদ্ধি-প্রভাবে তিনি বঙ্গের রাজ সিংহাসন পর্যন্ত প্রাপ্ত হন। এই সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইরূপঃ

"Hussen had been in early life the servant of a Kayastha officer of the state named Subudhi Khan. He entertained great respect for the Hindoos, two of whom Rup and Sanatan had high offices under him."* (History of India)

শিয়াখালায় 'পুরন্দর-গড়' ব্যতীত পুরন্দরের স্মৃতিচিহ্ন কিছু না থাকিলেও, বহু প্রাচীন মন্দির শিয়াখালার পূর্ব-গৌরব আজও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। শিয়াখালার **উত্তরবাহিনী দেবী** হুগলী জেলায় বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। স্থানীয় চৌধুরী-বংশ এই বিগ্রহের সেবায়েত; বর্তমান প্রস্তর নির্মিত সুন্দর মূর্তিটি ১৩৪০ সালে ডাঃ যামিনীকান্ত বলের চেষ্টায় নির্মিত হয়। উত্তরবাহিনী জাগ্রতা দেবী এবং দেশদেশান্তর হইতে বহু নরনারী উঁহার পূজা দিবার জন্য এইস্থানে সমবেত হন। প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইয়া যাইলে, স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় বর্তমান গৃহটী নির্মিত হইয়াছে। দেবীর স্বর্ণমণ্ডিত ক্ষুদ্র পাষাণ মূর্তি এই অঞ্চলের একটি দর্শনীয় বস্তু।

॥ দেবী উত্তরবাহিনী ॥

বর্তমানে দেবী উত্তরবাহিনীর যে পাষাণ মূর্তি পূজিত হয়, সেটি কিন্তু বেশীদিনের পুরানো নয়। ১৩৪০ সালের পূর্বে মৃন্ময় মূর্তিতে দেবীর পূজা হইত। কৌশিকী নদীর গর্ভ হইতে যে সাধক ব্রাহ্মণ দেবীর আদি পাষাণ বিগ্রহ পাইয়াছিলেন, উহা মাত্র ছয় ইঞ্চি লম্বা ছিল। সেই পাষাণ মূর্তি দেখিয়া এতাবৎকাল দেবীর বিগ্রহ তৈয়ারী হইত। এবং পরিশেষে নূতন পাষাণমূর্তিটিও উহা দেখিয়া উৎকীর্ণ হইয়াছিল। আদি মূর্তি স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া মন্দিরে পূজিত হইত। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে স্বর্ণমণ্ডিত আদি পাষাণ মূর্তিটি মন্দির হইতে অপহৃত হইয়াছে।

---

* হোসেন শাহ বাল্যকালে সুবুদ্ধি খাঁর চাকর ছিলেন, ইহা আমরা বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না।

দেবী উত্তরবাহিণীর পাষাণ মূর্তিটি বিচিত্র বলা যায়। ইহার উচ্চতা প্রায় সাত ফুট। গায়ের রং হলদে। দেবী দ্বিভুজা। দক্ষিণ হস্তে খড়্গ আর বাম হস্তে খর্পর। দেবীর দক্ষিণ চরণ মহাকালের বুকে শায়িত আর বাম চরণ যুক্তকরে উপবিষ্ট বটুকভৈরবের মাথার উপর স্থাপিত। দেবী উলঙ্গিনী নন—তাঁর পরিধানে বিচিত্র রক্তাম্বর এবং বক্ষ কণ্টুলিকায় আবৃত। নরমুণ্ডমালিনী ত্রিনয়না দেবী উত্তরবাহিনী মুকুটে, কঙ্কনে, কেয়ূরে, নূপুরে সুসজ্জিতা। দেবীর দুই চরণের মধ্যে দৈত্য নিশুম্ভের একটি ছিন্নমুণ্ড আছে। দেবীমূর্তির পশ্চাতে দেওয়ালের গায়ে বিন্যস্ত একটি চিত্রে ডাল হইতে দেবীর আবির্ভাবের কাহিনী ও ধনিক ছলনা চিত্রিত আছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার চণ্ডীকাব্যে উত্তরবাহিনী সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

"বর্ধমানে বন্দি গাবো সর্বমঙ্গলা।
উত্তরবাহিনী বন্দো গ্রাম শেয়াখালা॥"

প্রতিবৎসর শারদীয়া শুক্লা একাদশীর দিন মন্দিরে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি অবধি উৎসব হয়। তদুপলক্ষে এই স্থানে একটি মেলা বসে। মেলায় বহু লোকের সুসমাগম হয়। বর্ধমানের মহারাজা দেবীর পূজার জন্য অনেক ভূসম্পত্তি দান করেন। কিন্তু উহা নানাভাবে এখন হস্তচ্যুত হইয়াছে। এখন "উত্তরবাহিণী সেবা সমিতি" দেবীর দৈনন্দিন সেবা পূজা, বার্ষিক উৎসব, মন্দির সংস্কার প্রভৃতি কার্য করেন। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু 'লৌকিক দেবতা' নামক প্রবন্ধে দেবী উত্তরবাহিনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইলঃ আমাদের বাংলা দেশের পল্লী বিশেষে এমন এক একটি লৌকিক দেবতার সন্ধান পাওয়া যায়—যাঁদের স্ব স্ব অধিষ্ঠান মন্দির বা থান ব্যতীত অন্যত্র কোথাও কারও দ্বিতীয় মূর্তি নেই, অন্যত্র পূজিতও হন না, অথচ তাঁদের অনেকেই বেশ প্রাচীন ও বিখ্যাত। স্বীয় অঞ্চলে বহুজন পূজ্য ত বটেই। শাস্ত্রীয় দেবতার মর্যাদাও পান, উন্নত ধরনের মন্দির আছে, এমনকি শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী বর্ণ-ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজিত হন। উদাহরণস্বরূপ এ প্রবন্ধে হুগলী জেলাব দুটি দেবীর উল্লেখ করছি—এ'রা রাজবল্লভী ও উত্তরবাহিনী।

উত্তর-বাহিনী হুগলী জেলার শিয়াখালা (বা শিবাক্ষেত্র) পল্লীর অতি বিখ্যাত ও বহু শতাব্দীর প্রাচীন লৌকিক দেবী। দেবীর মূর্তি বেশ সুশ্রী, দীর্ঘাঙ্গী, উচ্চতায় প্রায় ৬ ফুট ও বিশেষ বলিষ্ঠ। বর্ণ রক্তাভ হরিদ্রা, মাথায় এলোকেশের উপর মুকুট, ত্রিনেত্র, নাকে নথ, গলায় মুণ্ডমালা ও নানারূপ হার, ডান হাতে খড়্গ, বামে রুধির পাত্র (আগে খর্পর বা মড়ার মাথার খুলি থাকতো)। পরিধানে কাঁচুলি বা বক্ষবন্ধনী ও বিচিত্র বর্ণের গাড়া জাতীয় শাড়ি কটিদেশ থেকে পদতল পর্যন্ত বিস্তৃত। হিন্দুস্থানী মেয়েরা যে ধরনের হার চুড়ি, মল পরেন, দেবী সেইরূপ অলঙ্কারাদি ব্যবহার করেন। তার কারণ পরে জানাচ্ছি। উত্তর-বাহিনীর বাম-পা—জোড়হাতে উপবিষ্ট নীলবর্ণের বটুক ভৈরবের মাথায় এবং অপর পা শায়িত মহাকালরূপী শিবের বুকে স্থাপিত। শিবের নাভিদেশে একটি বৃহৎ আকারের অসুরের মুণ্ড ও গলার কাছে দুটি সাপের মূর্তি দেখা যায়।

দেবীর মন্দিরটি চূড়াহীন—'ঘী-আকারে'র তবে বেশ বৃহৎ। মেঝে শ্বেতপাথরের। চত্বরের মধ্যে নাটমন্দির, ভোগ-ঘর আছে।

নিত্য পূজা হয়, সাধারণ ফল-মূল-মিষ্টান্ন নৈবেদ্য ব্যতীত অন্নভোগ দেওয়াও হয়। ছাগ বলি হয় বিশেষ পূজায়। বর্ণ-ব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্য করেন। তাঁরা প্রচার করেন, উত্তর-বাহিনী ও বিশালাক্ষী অভিন্ন। পূজায় ধ্যানমন্ত্র ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই দেবীকে আচমন প্রণাম বা অর্ঘদানের কালে 'উত্তর-বাহিনী' বলেই ব্রাহ্মণরা সম্বোধন করেন।

এ'র নবঘট প্রতিষ্ঠা ও বিশেষ পূজা হয় শারদীয়া শুক্ল একাদশী তিথিতে। বিশেষ আড়ম্বরের পূজা—বহু দূর-দূরান্তর থেকে শত শত ভক্ত এসে এতে যোগদান করেন—বিরাট মেলা হয়।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত দেবীর মাটির মূর্তি ছিল, বর্তমানের মূর্তিটি পাথরের। বাংলা দেশের কোন লৌকিক দেবতার এরূপ বৃহৎ (৬/৭ ফুট)। পাথরের মূর্তি নেই। স্থানীয় ভক্তদের চেষ্টায় ও বদান্যে কাশীর ভাস্কর দ্বারা উত্তর-বাহিনীর এই মূর্তি তৈরী করা হয়েছে। এর কারণও একটা আছে। এই দেবীর একেবারে আদি মূর্তি দুটি হল পাথরের—এখনও আছে, তবে ক্ষুদ্রাকৃতি বলে এই বিরাট মূর্তি নির্মিত হয়েছে। এটিকে ভোগমূর্তি বলা যায়।

উত্তর-বাহিনীর যে বহুকাল পূর্বেও ব্যাপক খ্যাতি ছিল তা জানা যায় মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্য থেকে। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গলে'র দিগ্‌বন্দনাতে আছে :--

"শ্মশানে বন্দিলাম শ্যামা করালবদনী।
সেই খালায় বন্দিলাম উত্তর-বাহিনী॥"

উত্তর-বাহিনীর প্রাচীনত্বের বিষয় জানা যায় যে, হুগলী জেলার এই অংশ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল এবং অধিবাসীরা ছিল অনুন্নত শ্রেণীর। তারা ভীষণ প্রকৃতির ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল। রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ঐ সময় বাংলার অধিপতি ছিলেন সুলতান হোসেন শা। তাঁর উজীর ছিলেন গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁ (শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচয়িতা) তাঁর যুদ্ধ বিষয়েও দক্ষতা ছিল। সুলতান সৈন্যের নায়করূপে তিনি শিয়াখালা অঞ্চলের সেই আদিবাসীদের দমন করেন। সে কারণে সুলতানের কাছ থেকে ঐ অঞ্চল পুরন্দর খাঁ 'জায়গীর'-রূপে পান ও শিয়াখালায় নিজের প্রাসাদ ও উত্তর-বাহিনীর মন্দির নির্মাণ করে দেন। এই হল ইতিহাস। উত্তর-বাহিনীর বিষয় ঐ অঞ্চলে লোক পরম্পরায় প্রচলিত কিংবদন্তীর কথা শ্রদ্ধেয় সুবোধ ঘোষ তাঁর 'কিংবদন্তীর দেশে' নামক পুস্তকে যথাযথ ও বিশদভাবে প্রকাশ করেছেন। আমি সংক্ষেপে বলছি :

'......শিয়াখালা অঞ্চলে ভৌমিক বা জমিদার ছিলেন মহা ধনগর্বিত, ধনহীনদের মানুষ বলেই গণ্য করতেন না। একবার একটি দরিদ্র শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁর চতুষ্পাঠীর জন্যে সাহায্য-প্রার্থী হয়ে ভৌমিকের কাছে গেলে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে অপমান করেন। ব্রাহ্মণ মর্মাহত হয়ে কৌশিকী নদীর তীরে যান। (সম্ভবত আত্মহত্যা করবার ইচ্ছায়) কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়লো নদীর বুকের ওপর অল্প নিমজ্জিত একটি দেবীমূর্তির উপর। দেবী যেন

সস্নেহে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। ভক্ত শাস্ত্রী ব্রাহ্মণ ঐ মূর্তিটিকে বুকে করে নিয়ে এসে তীরের উপর একটি পর্ণকুটীরে প্রতিষ্ঠা করলেন ও নিয়মিতভাবে তাঁর পূজা অর্চনা করতে লাগলেন। এই সময় একদিন ঐ নদী দিয়ে ভৌমিক একটি বিরাট নৌকা করে যাচ্ছিলেন, তাঁর নৌকায় নৃত্য-গীত হচ্ছিল। দেবী ঐ নৃত্য-গীত উপভোগ করতে ইচ্ছুক হয়ে মানবীর বেশ ধরে তীরে এসে নৌকাটি থামাতে বললেন। ধনগর্বী ভৌমিক তাঁকে চাষীর মেয়ে মনে করে নৌকা থামালেন না। দেবী কোপ ভরে উত্তর দিকে মুখ ফেরালেন, সঙ্গে সঙ্গে ভৌমিকের নৌকা গভীর জলে তলিয়ে গেল।......।'

আঞ্চলিক বিশ্বাস দেবী সেই থেকে উত্তরাস্যা হয়েছেন। বর্তমান মন্দিরের কাছে একটি খাত দেখিয়ে বলেন,—'ঐখানে ভৌমিকের নৌকা ডুবে গিয়েছিল।' তাঁরা আরও বলেন, 'ঐ সময় দেবী উত্তরাস্যা হন বলেই এ'র নাম হয় 'উত্তর-বাহিনী'। ইনি আদিতে বিশালাক্ষী। তাঁদের সে ধারণার ঠিক প্রতিবাদরূপে নয়—তবে বলা যায় ঐ অঞ্চলেই অপর কয়েকটি বিশালাক্ষী আছেন, তাঁদের মধ্যে দুটি উত্তরাস্যা, কিন্তু তাঁরা উত্তর-বাহিনী নামে অভিহিত হন না।

এ-বিষয় অনুমান করা যায়, এককালে বিশালাক্ষী বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে খ্যাতি লাভ করেছিল, সে সময় বহু স্থানের বিভিন্ন দেবী বিশালাক্ষী বলে প্রচারিত হতেন। নজির দেখানো যায়,—নান্নুরের বীণা হস্তা জপমালাধারিণী সরস্বতীকে—'খড়্গ-খর্পরধারিণী' বলে পূজা করে লোকে বিশালাক্ষী বানিয়েছে।

এই জাতীয় দেবতাদের উদ্ভব বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত করা দুরূহ ব্যাপার। তবে উত্তর-বাহিনী বিষয়ে মনে হয়, এই অঞ্চল এককালে গভীর অরণ্যাকৃতি ছিল, অধিবাসীরা ছিল অনুন্নত শ্রেণীর। হয়ত তারা আর্যেতর বা শক্তি উপাসক আর্যেতরদেব ধর্মাচার পালন করতো। উত্তর-বাহিনী (হয়ত তখন শক্তি উপাসক চণ্ডী বা অন্য নামে অভিহিত হতেন) তাদের উপাস্য একটি দেবী, পরে অরণ্য হাসিল হওয়াতে সেই বন্য জাতি অন্যত্র চলে গেছে, তাদেব দেবতা থেকে গেছেন। কালক্রমে উন্নত ধর্মের প্রভাবে সুশ্রী আকৃতি হয়েছে পল্লীর লোকে—সুন্দর মন্দির গড়ে দিয়েছে—শাস্ত্রীয় দেবতার মর্যাদা দিয়েছে। আদিযুগের চণ্ডী বা চণ্ডী পল্লী বিশেষে বিভিন্ন নাম নিলেও এ অঞ্চলে চণ্ডীর প্রাধান্য দেখা যায়, তাঁরা স্ব স্ব নামেই আছেন।

শিবের বুকের উপর দণ্ডায়মান এই জাতীয় দেবীদের দেখে আরও একটি কথা মনে হয়, শক্তি উপাসকরা তাঁদেব উপাস্যা দেবীদের প্রাধান্য প্রচারের জন্য এই সকল দেবীদের এককালে সৃষ্টি করেছিলেন।

শিয়াখালার নিকটবর্তী **রঘুনাথপুরের** ঘোষ ও মিত্র বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ঘোষ বংশের যতীন্দ্রনাথ ঘোষ ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিতেন এবং দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য সকলের প্রিয় পাত্র ছিলেন।

মিত্র বংশের প্রসন্নকুমার মিত্রের পুত্র ডাঃ বীরেশ্বর মিত্র বিলাত হইতে ডাক্তারী পাস করিয়া কলিকাতায় 'সার্জন' রূপে অস্ত্রচিকিৎসায় খুব সুনাম অর্জন করেন। কলিকাতা

কর্পোরেশনের ইনি কিছুদিন কাউন্সিলার ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা কণিকা বসু বি-এ, বিলাতে বসবাস করেন এবং মহিলা মহলের বিলাতের নিজস্ব প্রতিনিধি।

রঘুনাথপুরের বর্তমান নাম 'মধুপুর হইয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভট্টপুরে অনুকুল নাগ বাস করিতেন। কলিকাতার ফ্রেন্ডস্ সোসাইটির তিনি মালিক ছিলেন এবং বহু অর্থ উপার্জন করেন। গ্রামে তিনি একটি সর্বসাধারণের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে মধুপুরের জনসংখ্যা ৭৭৯ জন ছিল।

শিয়াখালার পার্শ্ববর্তী গ্রাম **মশাট** এক সময় সমৃদ্ধ জনপদ ছিল এবং এই গ্রামের **মিত্রবংশ** বিশেষ প্রসিদ্ধ। এইস্থানের স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল মিত্র বিশেশ্বরের মন্দির সংস্কারার্থে এবং একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে কিছু অর্থ ব্যয় করেন। রমানাথপুরের স্বর্গীয় সত্যপ্রিয় পাল এবং তাহার ভ্রাতা কুমিরমোড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ পাল, স্বর্গীয় আশুতোষ পাল এবং ননীলাল পালের স্মৃতি রক্ষার্থে কুমিরমোড়া গ্রামে তাহারা "আশুতোষ ননীলাল উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শিয়াখালা গরলগাছা এবং জনাই গ্রামেও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় বহুদিন যাবৎ আছে; তন্মধ্যে জনাই গ্রামের বিদ্যালয়টি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন—১লা জানুয়ারী ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ৩৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। মশাট আপতাপ মিত্র উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

চন্ডীতলার নিকট গরলগাছা গ্রামে হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টার মিঃ এস. এন, ব্যানার্জীও এইস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পি, সি, কুমার তাঁহার পিতৃদেব শ্যামাচরণ কুমারের স্মৃতিরক্ষার্থে চন্ডীতলায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া একটি দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে উক্ত দাতব্য-চিকিৎসালয়ের স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কর্তৃক উদ্বোধন হয়। হুগলী জেলাবোর্ড বর্তমানে ইহার তত্ত্বাবধান করেন। গরলগাছার বিবরণ ১২৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সরস্বতী তীরবর্তী বুইতা গ্রামে বেহুলা লখীন্দরের ঘট-স্থাপিত চন্ডীদেবী একটি প্রকান্ড বৃক্ষমূলে এরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, বৃক্ষের শিকড়গুলি ঘটটিকে আবৃত করিয়া যেন একটি গৃহমধ্যে রাখিয়া দিয়াছে। দেবীর সেবার জন্য বহু জমিজমা ছিল। পরবর্তী কালে পৃথক্‌ভাবে ব্রাহ্মণের বৃক্ষমূলে উঠিয়া পূজা করিতে অসুবিধা হওয়ায় বর্তমান গৃহে ঘটস্থাপিত চন্ডীদেবীকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

॥ জনাই ॥

চন্ডীতলার নিকটবর্তী জনাই এবং বাক্‌সা এই দুই গ্রাম বহু সম্ভ্রান্ত বংশ এবং অসংখ্য দেবালয়ে সুশোভিত; জনাই-বাক্‌সার মধ্য দিয়া সরস্বতী মগরার নিকটবর্তী ত্রিবেণী হইতে উদ্ভূত হইয়া রাজগঞ্জ অবধি অতি বৃহৎ ছিল, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জনাই গ্রামের

মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ এবং বাক্সা গ্রামের মিত্র, চৌধুরী ও সিংহ বংশ বিশেষ খ্যাত। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের তালিকায় জনাই গ্রামে ৬, ৩৮৭ জন ও বাকসা গ্রামে ৩,৪৭৭ জন লোক বাস করে।

জনাই মুখোপাধ্যায়-বংশের কীর্ত্তিকলাপ, এই অঞ্চলে বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ; এই বংশের ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মুৎসুদ্দির কার্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং হিন্দুধর্মোক্ত বিবিধ ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন।

জনাইয়ের উত্তরে সরস্বতী নদী ও বাকসা। জনাই-বাকসা পূর্বে এক গ্রাম ছিল, সপ্তদশ শতাব্দী হইতে জনাইয়ের উত্তরাংশ বাকসা নামে অভিহিত হইতে থাকে। জনাইয়ের পূর্বে সরস্বতী নদী। দক্ষিণে পায়রাগাছা, বেণীপুর ও কলাছড়া গ্রাম এবং পশ্চিমে জগন্নাথ বাটী গ্রাম। জনাইয়ের পশ্চিমাংশে হাঠপুকুর পল্লী।

হাঠপুকুরের কয়েকটী মুসলমান বংশ বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। খ্যাতনামা হাজি কছিমুদ্দীন খান বাহাদুর এই হাঠপুকুরের সন্তান। ইঁহাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা এখনও বর্তমান। খানবাহাদুরের দানশীলতা ও লোকহিতকর কার্যাবলী সর্বজনবিদিত। জনাইয়ের দক্ষিণাংশে নলদিঘি পল্লী। নলদিঘির কয়েকটী নবশাখ বংশ সমাজে সুপরিচিত দানশীল ও সম্ভ্রান্ত। রেনুপদ মুখোপাধ্যায়ের 'সেকালের জনাই' পুস্তকে এই অঞ্চলের বহু বিবরণ দেওয়া আছে। উহা হইতে কিছু তথ্য স্থানে স্থানে লিখিত হইল।

রাজস্বক্ষেত্রে জনাই বর্ধমান মহারাজার ১নং তৌজির অধীন পত্তনী মৌজা, বালিয়া পরগণার অন্তর্গত। বর্ধমান রাজষ্টেটের নথিতে পত্তন ও নামজারিতে ৭ ব্যক্তির নাম আছে। সকলেই জনাই কর্তাবাটীর অধিবাসী। এক্ষণে পত্তনির বৃহদংশ হস্তান্তরিত, এবং বর্তমানে পত্তনিদারদের সংখ্যা প্রায় বাইশ। সকলেই জনাইয়ের অধিবাসী।

জনাই দুইটি রেলওয়ে ষ্টেশনের অধীন, একটি জনাইয়ের মধ্যে মার্টিন কোম্পানীর অধীন জনাই ষ্টেশন* অপরটি ইষ্টার্ণ রেলওয়ের অধীন 'জনাই রোড' ষ্টেশন। এই ষ্টেশনটি বেগমপুর ইউনিয়ান বোর্ডের অধীন। জনাইয়ের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ২·৩৬ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১·৩১ মাইল। জনাইয়ের প্রধান সাধারণ রাস্তার সংখ্যা ১৩টী, ২টী জেলাবোর্ডের অধীন, ১০টী ইউনিয়ান বোর্ডের অন্তর্গত।

জনাইয়ের বাটীর সংখ্যা ৯৩৮। ইহার মধ্যে একক সংখ্যাহিসাবে জনাইয়ের বৃহৎ বৃহৎ ও প্রাসাদোপম বাটীগুলি ও প্রসাদগুলিও অন্তর্ভুক্ত। জমিদার জগমোহন মুখোপাধ্যায় প্রাসাদ, জমিদার কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রাসাদ, জমিদার চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রাসাদ এবং জমিদাব হরমোহন মুখোপাধ্যায় প্রাসাদের প্রত্যেকখানিতে একমাত্র শয়ন ঘরের সংখ্যা প্রায় ৮০ হইতে ১২০ খানি। জনাই ইউনিয়ানের অধীনে ৯ খানি গ্রাম আছে।

হুগলী জেলার এই অঞ্চলের সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান প্রাণকেন্দ্র হইতেছে জনাই-বাকসা সমাজ। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রধান এই সমাজ প্রতিপত্তিশালী, শিক্ষাদীপ্ত এবং

---

*সম্প্রতি জনাই ষ্টেশন উঠিয়া গিয়াছে,

রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন। ইংরাজ আমলের প্রথম পর্ব হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্যন্ত বহু মনীষী ও ভূম্যধিকারীর কীর্তিগরিমা এই সমাজ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এই যুগে যেসব মহতী প্রতিভা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকশিত হইয়া অতুলনীয় আদর্শের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য এই সমাজ গর্ব-গৌরব অনুভব করিতে পারে।

ব্রাহ্মণ-প্রধান জনাই গ্রামে সংখ্যানুপাতে নবশাখ সম্প্রদায় দ্বিতীয় স্থান এবং মাহিষ্য সম্প্রদায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং স্থানীয় জীবিকা-মূলক বৃত্তিসমূহ প্রধানতঃ এই দুই সম্প্রদায় দ্বারা চালিত। বর্তমানে শিক্ষামূলক জীবিকার ক্ষেত্র যেরূপভাবে প্রসারতা লাভ করিতেছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রার্থীর সংখ্যাও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমনি বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। বিশুদ্ধ সমাজ-চিত্রের আত্মপ্রকাশ সামাজিক ক্রিয়াকলাপে দক্ষতার পরিচয় এবং সমাজ-উন্নতিমূলক সুচিন্তিত পরিকল্পনা এই দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে লক্ষ্য করা যাইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কয়েকজন শক্তিধর ব্যক্তি সমাজ-সেবার দ্বারা জনাইয়ে স্মরণীয় অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।

লক্ষণীয় যে জনাইয়ের প্রায় অধিকাংশ পল্লীর নামকরণ নবশাখ সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন শাখার কৌলিক পদবী অনুসারে চলিত। এই নামকরণের ইতিহাস জানিতে হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ব্রাহ্মণ-প্রধান জনাইয়ের বুদ্ধিদীপ্ত সমাজ-ব্যবস্থার এবং নবশাখ সম্প্রদায়ের স্বভাব-সিদ্ধ সমাজ সেবার মূল সূত্রটি ধরিয়া আলোচনা করিতে হয়। একথা স্বীকার্য যে জনাই-সমাজের জীবনীশক্তিকে বাঁচাইয়া রাখিবার ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের এবং তার সঙ্গে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের এবং নিম্নতর কয়েকটি সম্প্রদায়ের দান স্মরণীয়। জনাইয়ের প্রাচীন ও অর্ধ-প্রাচীন নবশাখ বংশগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বংশগুলি অন্যতম—

সিমলাই পাড়াব তিলী বংশ, ময়রা পাড়ার নাগ বংশ, বেণিয়া পাড়ার গন্ধবণিক বংশ, গড়ের ঘোষ বংশ, বাজার পাড়ার সামন্ত বংশ, সিমলাই পাড়ার পান বংশ, সিমলাই পাড়ার ঘোষ বংশ, কাঁসারি পাড়ার কংসবণিক বংশ, পান পাড়ার পান বংশ, পান পাড়ার ঘোষ বংশ, বাজার পাড়ার নাপিত বংশ, মালী পাড়ার মালাকার বংশ, কামার পাড়ার কর্মকার বংশ, মেন্দাপাড়র মেন্দাবংশ, পশ্চিম পাড়ার ঘোষ বংশ, কুমোর পাড়ার কুম্ভকাব বংশ।

জনাইয়ের প্রাচীন ও অর্ধপ্রাচীন মাহিষ্য বংশগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বংশগুলি অন্যতম—ধাড়া বংশ, আদক বংশ, দাস বংশ, বাঘ বংশ, কোলে বংশ, সাঁতরা বংশ, দে বংশ এবং মণ্ডল বংশ। জনাইয়ের তেলী বংশ অধিকারী বংশ এবং উপানৎকার বংশ ও প্রাচীন।

সুশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত তরুণ ও বর্ষীয়ান বৃদ্ধগণের নিকট জনাই গ্রামের পরিচয়ের দুইটি কারণ—একটি হইতেছে জনাইয়ের মনোহরা নামক মিষ্টান্নের বাংলা-জোড়া খ্যাতি, আর অন্যটি মুখোপাধ্যায় জমিদার পরিবারের বিরাট ঐশ্বর্য, প্রতাপ ও উদারতার কাহিনী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতেই জনাই বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই প্রসিদ্ধি এখনও চলিয়া আসিতেছে। তবে মহাকালের প্রতি পদক্ষেপের উত্থান-পতনের সঙ্গে যেমন দেশের, রাষ্ট্রের, তথা জাতির উন্নতি ও অবনতি সূচিত হয়, তেমনি

সেই অমোঘ নিয়মানুসারেই জনাইয়ের পূর্বগৌরব এখন স্মৃতিকথায় পর্যবসিত হইয়াছে। নিম্নে এই স্থানের চারটি ভবনের বিষয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উল্লিখিত হইল ঃ

নূতন বাড়ী।—(নির্মাতা জমিদার রাজা জগমোহন মুখোপাধ্যায়)...জনাইয়ে বসতবাটী হিসাবে এক বিরাট সৌধ...বর্তমানে এই সৌধ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে...বর্তমানে ৺করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজা জগমোহনের দৌহিত্র) এর বংশধরগণ এই প্রাচীন সৌধের একটি মহলেব সংস্কার সাধন করিয়া বসবাস করিতেছেন। আর সমস্তই গিয়াছে, কেবল পূজামণ্ডপটি বর্তমান।...

মাঝের বাড়ী।—মাঝের বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা ৺ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ে। ইনি বিরাট জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত হন। তবে মাঝের বাড়ীর মধ্যে হরমোহনবাবুর নামই সর্বাধিক। মাঝের বাড়ীর বিরাট অট্টালিকা তিনিই নির্মাণ করেন।

কালীবাবুর বাড়ী।--৺ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ৺রামজয় মুখোপাধ্যায় কালীবাবুর বাড়ীর স্থাপয়িতা।...ইঁহার পুত্র ৺কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁহার দানশীলতা ও লোকহিতকর কার্যাবলী সববজনবিদিত। এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের বিরাট সৌধ ও জমিদারী কালীবাবুর নামের সহিত যুক্ত হইয়া আছে।...সরস্বতী নদীর তীরে এখনও এই জমিদার বাটীর অশ্বশালা, অতিথিশালা, কাছারী বাড়ী ও খাজাঞ্চীখানার ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। এখন শুধু বর্তমান পোষ্ট অফিসের সম্মুখে বিরাট প্রাসাদও অট্টালিকার দুই পাশে সারি সারি পাম গাছ। একপাশে দুইটি শিবমন্দির। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আরতির শুদ্ধ সমাহিত পবিত্র পরিবেশটি পল্লীর নির্জন আবহাওয়ায় এক অনির্বচনীয় পুলকের সঞ্চার করে।...

বাকসা বাড়ী।—বাকসা বাড়ী জনাইয়ের প্রান্তে অবস্থিত।...এই জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তদানীন্তন জনাইয়ে ইনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থবান ব্যক্তি। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহকালে এরূপ ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে আমোদ ও উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল যে সেই যুগের পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার তুলনা মেলে না। এই পরিবারের বংশধর স্বর্গত চন্দ্রকান্তবাবু। চন্দ্রকান্তবাবুর পুত্র স্বর্গত পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। পিতার শ্রাদ্ধে তিনি যে দান ও খয়রাতী করেন তাহা জমিদারগণের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ।...সদর মহলটি, প্রাসাদতুল্য, ইহার সম্মুখে এক বিশাল পুষ্করিণী।...অথৈ স্বচ্ছ তাহার নীল জল। এই নীল জলে ছায়া পড়ে বিরাট সৌধের। সোনালী প্রভাতে জলতরঙ্গে সেই ছায়া আন্দোলিত হইতে থাকে—মনে হয় যেন রূপকথার রাজপুরী। পুকুরের দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ ভূমিতে আমের বাগান। তাহারি কোলে সুপারি গাছের সারি। পুকুরের দুই তীরে দুইটি বিস্তৃত সানবাঁধান ঘাট। অট্টালিকার দুই পাশে দুই মহীরুহ, এক দিকে বকুল, অন্যদিকে অশোক। পূর্বদিকের ফটকে মালতীলতার কুঞ্জ।...বর্ষায় কাজল বনে মালতী কুসুমের সুরভী পথিকের মনপ্রাণ আকুল করিয়া তোলে। সৌধের সম্মুখে ঘাটের দুই পাশে ফুলের বাগান।

বাগানের মধ্যে মধ্যে বাংলার প্রাচীন মৃৎশিল্পের সাক্ষ্য কয়েকটি নারীমূর্তি।...বাড়ীর আলোকচিত্র গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রকান্তবাবুর "বাকসা বাড়ী" দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "জনাইয়ের জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশের কথা লোকমুখে শুনিতাম, কিন্তু ধর্মসভার উপলক্ষে আসিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম, 'বাকসা বাড়ী' যেন বাংলার তাজমহল। কার্যব্যপদেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এত আনন্দ কোন স্থানে পাই নাই।"

চন্দ্রকান্তবাবু কলিকাতায় পরলোকগমন করিলে, জনাই গ্রামে তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে দশ হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বিদায় দেওয়া হয় এবং হাওড়া তেলকলঘাট হইতে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা হয়। এই সম্বন্ধে ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন উদ্ধারযোগ্য :

Howrah-Sheakhala Railway—Announcement.
Reserved Special Train.

Gentlemen and Pandits wishing to attend the Sradh ceremony of Late Babu Chandra Kanta Mukerjee at Janai can avail themselves of the special train which will leave Telkal Ghat, Howrah at 10-30 a.m. on Thursday the 15th December 1897. By order, A.E. ADIE. Manager.

সুন্দরবন অঞ্চলের চন্দ্রাবাদ গ্রাম এবং চাঁদখালি খাল জনাইয়ের জমিদার চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়ের নামানুসারে স্থাপিত। চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধে ব্যয় হইয়াছিল ১,১৩০০০৲ টাকা। শ্রাদ্ধে সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণের সংখ্যা ছিল ৩৭০০।

জনাই ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম। ইহা ছাড়া অন্যান্য সর্বপ্রকার জাতির অধিবাসী বাস করিয়া থাকে। এখানে একটি হাইস্কুল ও ছেলেদের ও মেয়েদের দুইটি পৃথক ইউ, পি, স্কুল আছে... এখানে একটি পোষ্ট অফিস আছে, রেজেষ্ট্রি অফিস আছে, একটি জাগ্রত কালীমাতার ও শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির আছে। প্রত্যহ বাজার বসে। এখানে একটি রেজিষ্টার্ড পাঠাগার আছে।...

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ হইতে হুগলী—চুঁচুড়া অঞ্চলে "জনাইয়ের সুর" বলিয়া সঙ্গীতের এক নির্দ্দিষ্ট সুর প্রচলিত ছিল। এই সুরের শ্রষ্টা ছিলেন জনাইয়ের গোলাবাটীর দীননাথ মুখোপাধ্যায়, সুরসাগর—ডাক্তার অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, কনকশালী, চুঁচুড়া।

বৃন্দাবনে "ব্রজবালা ট্রাষ্ট্ ষ্টেট্স" পরিচালিত এক প্রসিদ্ধ ধর্মশালা প্রতিষ্ঠিত। ব্রজবালা দেবী হইতেছেন জনাইয়ের পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা এবং হেতমপুরের রাজা সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্তীর পত্নী।

পুরীর লুলিয়াসাইয়ের প্রাচীন আশ্রমের (মাতৃকা আশ্রম) প্রতিষ্ঠাত্রী সাধুমা হইতেছেন জনাইয়ের কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়ের কন্যা, নুটুমণি দেবী।

পরে বন্দর স্থাপনা হইবার পর গ্রামের দক্ষিণাংশের 'জনাই' নাম বজায় থাকে। উত্তরাংশ 'বাকসা' নামে অভিহিত হইতে থাকে। এই গ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যা ৩,৪৭৭ জন।

রামজয় (কালীবাবু) চাতরায় একটি ঘাট এবং কাশীতে একটি মঠ এবং শিব স্থাপনা করেন। তাঁহার ভ্রাতা জগন্নাথ, চণ্ডীতলা হইতে জনাই পর্যন্ত এই চার মাইল রাস্তা নির্মাণ করিয়া বেহুলা-লখীন্দরের চণ্ডীর দেউল দেখিবার পথ সুগম করিয়া দেন। কলিকাতায় নাটশালা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, এই পরিবারের পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জনাই গ্রামে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্বন্ধে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' (১৬ই জুন) পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল:

"২৯শে মে ১৮৫৮ সালে জনায়ের জমিদারবাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও ব্যয়ে তাঁহার নিজ বাটীতে "শকুন্তলা" নাটক অভিনীত হয়। ১৮৫৭ সালে কলিকাতায় নূতন থিয়েটারগুলি দেখা দিবার পর বৎসরই তিনি জনাই গ্রামে নিজ বাটীতে একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন।* এই অভিনয় সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল (১ জুন ১৮৫৮) "পল্লীগ্রামে নাটক অভিনয়ের এই প্রথম অনুষ্ঠান। অতএব মুক্তকণ্ঠে বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করি। নটগণ সকলেই গ্রামস্থ ট্রেনিং স্কুলের ছাত্র, অতএব তাহাদিগের বিদ্যাবত্তা সাহস প্রভৃতি গুণেরও প্রশংসা করি।"

এই বংশের রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ১২৪৯ সালে পরলোকগমন করিলে 'সমাচার-দর্পণ' পত্রে (১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১২৪০) বিশেষ ভাবে শোক প্রকাশ করা হয়। উক্ত পত্রে লিখিত হয় যে, "তাঁহার রূপ, গুণ, দয়া-ধর্মাদি স্মরণ হওয়াতে নয়ননীরে পত্র আর্দ্র হইতে লাগিল। শীলতা ও লোকলৌকিকতায় কি পর্যন্ত লোককে তিনি সন্তুষ্ট করিতেন; তাহা যাঁহার সহিত একবার আলাপ হইয়াছে, তিনি জানেন।" সুপ্রসিদ্ধ পার্বতী মুখোপাধ্যায় এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

জনায়ের গঙ্গোপাধ্যায় বংশের রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় হাজারিবাগ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার পৌত্র কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় Reis & Rayet পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং বর্ধমানের মহারাজা কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া 'সাহিত্যরথী' বলিয়া প্রসিদ্ধ হন ও ভারত সরকার হইতে অতিরিক্ত মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। ইঁহার পুত্র হরিচরণ শাস্ত্রী রিপণ কলেজের হিন্দু আইনের অধ্যাপনা করেন এবং রঘুবংশ ও ভট্টির কলেজ-সংস্করণ প্রকাশ করেন।

এই স্থানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য স্বামী সারদানন্দ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁহার পিতার নাম গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী ও মাতার নাম নীলমণি দেবী। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই

---

* জনায়ের নাট্যশালার বিষয়, ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিত Indian Stage Vol, 1, ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিখিত আছে।

আগষ্ট স্বামী সারদানন্দ দেহরক্ষা করেন। বেলুড়ে তাঁহার সমাধিমন্দিরে তাঁহার মর্মর-মূর্তি আছে। স্বামী সারদানন্দের রচিত পুস্তকের নাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'।

এই স্থানের 'মনোহরা' সন্দেশ বঙ্গবিখ্যাত, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ভীমনাগের আদি নিবাস এই জনাই গ্রামে। কলিকাতায় ইংরাজ রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর, তাঁহার পিতা পরাণ-চন্দ্র নাগ কলিকাতায় বৌবাজার অঞ্চলে প্রথম ব্যবসা আরম্ভ করেন। ভীম নাগের পুত্র আশুতোষ মোদক-সমাজকে একত্রে সম্মিলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন।

॥ বাকসা ॥

বাকসা জনাইয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রাম, জনাইয়ের উত্তরদিকে অবস্থিত। প্রায় চারি শত বর্ষ পূর্বে লিখিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চন্ডীকাব্যে বাকসার এইরূপ উল্লেখ আছেঃ

এড়াইল গাঙ্গবাড়া, ঘাট কুলীনপাড়া,
ডাইনে এড়ায় কুণ্ডরপুর।
ভাস্কর মেলায় বায়, বাকসা এড়ায়ে যায়,
বেলেড়া বাহিল কতদূর॥

প্রায় ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে পর্তুগীজরা বাণিজ্যব্যপদেশে বাঙ্গালায় যাতায়াত আরম্ভ করে। উল্লেখ দেখা যায় যে কিছুকাল পরে ইহারা সরস্বতী নদীব দক্ষিণতীরস্থ বাকসা গ্রামে একটী ছোট বন্দর স্থাপনা করে। পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকের মতে 'বাকসা' পর্তুগীজ শব্দ 'Baixel' (বজরা) এর অপভ্রংশ। পুরাতন পুঁথি ও কুলগ্রন্থসমূহ ষোড়শ শতাব্দীতে এই স্থান রাঢ়ীয় ও মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণ সমাজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করে। বর্গীর হাঙ্গামাকালে এবং শোভাসিংহ ও রহিমখাঁর বিদ্রোহের সময় সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়ায় বাহির হইতে এই স্থানে জলপথে অভিযান বন্ধ হইয়া যায় এবং এই কারণে ইহা একরূপ আশ্রয়স্থলে পরিণত হওয়ায় বহু ব্যক্তি দূরাঞ্চল হইতে পলাইয়া আসিয়া এখানে বসতি স্থাপন করে। ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত 'ভবিষ্যব্রহ্মকাণ্ড' গ্রন্থে জনাই বর্ধমানভুক্তির অন্যতম প্রধান গ্রাম বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু বাকসার পৃথকভাবে উল্লেখ নাই। অপরদিকে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে লিখিত পুঁথি ও কুলগ্রন্থসমূহ জনাই-বাক্‌সা এক গ্রাম ও এক সমাজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে দেখা যায়।

বাকসার চৌধুরীগণ সম্মানীয় ও প্রতিপত্তিশালী প্রাচীন কায়স্থ জমিদার বংশ। এই বংশের পূর্বপুরুষ বাণীনাথ ওরফে মালাধর গৌড়ের বাদশাহ সরকারে নায়েব উজীরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার প্রপৌত্র রাজারাম চৌধুরী হইতেই চৌধুরী বংশের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়।

রাজারাম অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বর্ধমান মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। তিনি রাজ-সরকার হইতে ভদ্রাসনের জন্য ২ বিঘা ও দেউড়ীর চৌকী পাহারা দিবার জন্য ৭৫ বিঘা সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাঁহার ভ্রাতাও রূপনারায়ণ চৌধুরী মহারানী কিষণকুমারী কর্তৃক রাজ

ষ্টেটের দেওয়ান নিযুক্ত হন। বর্ধমান রাজের দেবসেবার জন্য সমস্ত ছাড়পত্র তিনি করিয়া যান। বর্গীর হাঙ্গামার সময় মহারাজা কীর্তিচন্দ্র সপরিবারে বাকসা চৌধুরী-বাটীতে কিছু-দিন বাস করিয়াছিলেন।

রূপনারায়ণ বর্গীর হাঙ্গামার প্রধান নায়ক দয়াআড়িয়ার মস্তক ছেদন করেন। বার্ক সাহেব তাঁহার পুস্তকে* রূপনারায়ণকে Astute Rupnarain (সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন) বলিয়াছিলেন, কারণ তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে খুব সুন্দর সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

তাঁহার সম্বন্ধে 'বর্ধমান রাজবংশানুচরিত' লেখক রাখালদাস মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে নাবালক মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের সুযোগ্য দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরীর অসাধারণ কার্যকুশলতায় ও সুব্যবস্থায় রাজকার্য অতি সুচারুরূপেই নির্বাহিত হইয়াছিল।...ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ হইত এই সময় মাসিক এক সহস্র টাকা বেতনে ভবানীচরণ মিত্র নামক একব্যক্তি দেওয়ান ছিলেন।

ইনিও বাকসার অধিবাসী ছিলেন এবং বাকসায় সরস্বতী নদীর তীরে দ্বাদশ শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের বিবরণ ১২৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

বাকসা চৌধুরী পরিবারের স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ এ্যাড-ভোকেট এবং বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। পূর্বপুরুষদের কীর্তি-কলাপাদি রক্ষাকল্পে প্রতি বৎসর গ্রামে আসিয়া তিনি বস্ত্র বিতরণাদি করিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী, তাঁহার স্বর্গত পিতা শ্যামাপদ চৌধুরীর স্মৃতিরক্ষার্থে এই স্থানে "শ্যামাপদ দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন করেন।† বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং দোল-দুর্গোৎসবাদি প্রাচীন কালের ন্যায় অদ্যাপি এই বংশে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রবোধচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র শ্রীশচীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, পি এখন ভারতের অর্থমন্ত্রী। বাকসা বি, এন বিদ্যালয় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

॥ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ ॥

সিংহ পরিবারের পূর্বপুরুষ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। জোড়া-সাঁকোতে পরবর্তীকালে তিনি বসবাস করেন এবং হিন্দুধর্মোক্ত ক্রিয়াকলাপাদি পূর্বের ন্যায় এই বংশে আজও অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ এই পরিবারে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ ভবনে বিদ্যাৎসাহিনী-সভার প্রতিষ্ঠাই তাঁহার সাহিত্যানু-রাগের পরিচায়ক। বঙ্গদেশে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন এবং মালতীমাধব, বিক্রমোর্বশী প্রভৃতি নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। হুতোম পেঁচার নক্সা রচনা

---

*Impeachment of Warren Hastings.

† সম্প্রতি এই দাতব্য চিকিৎসালয়টি উঠিয়া গিয়াছে।

করিয়া বাঙ্গালী সমাজের দূষিত চিত্র দেখাইয়া তৎকালে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। এ ছাড়া 'পরিদর্শক' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামক দুইখানি দৈনিক সংবাদপত্র এবং (২০ এপ্রিল ১৮৫৭) 'বিদ্যাৎসাহিনী পত্রিকা' নামক একখানি মাসিকপত্র পরিচালনা করেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বঙ্গের তৎকালীন পণ্ডিতবর্গের সাহায্যে তিনি মহাভারতের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে তাহা বিতরণ করেন। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ দরদ ছিল এবং ইহার প্রসারকল্পে তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিলে তিনি তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে কয়েক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন এবং তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা লিখিয়া দেওয়ায়, রেভারেণ্ড লং সাহেবের একমাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়। কালীপ্রসন্ন উক্ত অর্থদড প্রদান করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিলে তিনি নিজ বাটিতে সভা আহ্বান করিয়া, অমর কবিকে এক অভিনন্দন ও রৌপ্যনির্মিত মানপত্র প্রদান করেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে প্রকাশিত নিম্নোক্ত সংবাদটি উদ্ধারযোগ্য—

'টিকি-কাটা জমিদার' বললে এককালে সবাই বুঝতো, কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা হচ্ছে। গুজব ছড়িয়েছিল, কালীপ্রসন্ন টাকা দিয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টিকি কেনেন। কাটা টিকি সাজিয়ে রাখেন আলমারিতে।

আবার টিকির সঙ্গে টিকিট লাগিয়ে রাখেন। টিকিটে নাকি লেখা আছে—কোন টিকিটি কতো টাকায় কেনা। কালীপ্রসন্ন টিকি-কাটা জমিদার!

একথা যে রটেছিল, তার মূলে কি কোনো হেতু নেই? আছে বৈকি। যা রটে, তার কিছু তো বটে।

সত্যিই একবার একজন ব্রাহ্মণের টিকি কালীপ্রসন্ন স্বহস্তে কেটে নিয়েছিলেন। মাত্র একবার, মাত্র একজনের।

কিন্তু কালীপ্রসন্নের মতো মানুষ একবারই বা একজন ব্রাহ্মণের টিকি কাটলেন কেন?

সেবার কী একটা ব্রত উপলক্ষে কালীপ্রসন্নের বাড়িতে একটি গরু দান করা হয়েছিল সেই ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ গরুটিকে নিজের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেলেন না, পথেই বিক্রী করে দিলেন একজন কসাইয়ের কাছে।

খবর পেয়েই কালীপ্রসন্ন সেই ব্রাহ্মণকে ডেকে আনালেন বাড়িতে। কসাইকে গরু বেচে দেয়, এ কেমন ব্রাহ্মণ?

নিজের হাতে সেই ব্রাহ্মণের টিকি কেটে নিলেন কালীপ্রসন্ন।

আর এই ঘটনা পল্লবিত হ'তে-হতে শেষ পর্যন্ত রটনা হ'লো টিকি-কাটা জমিদারের গুজব। না, গুজবে কান দিতে নেই।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ বাটীতে 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাবু, বেণী সংহার, ভানুমতী, বিক্রমোর্বশী, রাজা পুরুরবা প্রভৃতি নাটকগুলি অভিনয়

করান এবং স্বয়ং প্রধান ভূমিকায় লক্ষাধিক টাকার বহুমূল্য পোষাক পরিয়া অবতীর্ণ হন। সংস্কৃত, বাঙলা ও ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বল্প জীবনকাল সাহিত্যসেবা ও জ্ঞানানুসন্ধানে অতিবাহিত করিয়া মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন। সাহিত্য প্রসঙ্গে ৪৩৯-৪১ পৃষ্ঠায় ইঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে।

বাকসা সিংহ পরিবারের গোবিন্দচন্দ্র সিংহ এবং তাঁহার দুই পুত্র গুরুদাস সিংহ এবং রামচন্দ্র সিংহ দয়াদাক্ষিণ্যের জন্য এই অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠিত শীতলা দেবীর মন্দির অদ্যাপি এই স্থানে দৃষ্ট হয় এবং দোল-দুর্গোৎসবাদি হিন্দুধর্মোক্ত ক্রিয়াকলাপ দেওয়ান শান্তিরামের আমলে যেভাবে হইত, অদ্যাপি সেইরূপ ভাবেই মহাসমারোহের সহিত এই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। গুরুদাসের পৌত্র নন্দলাল সিংহ 'অতি-আধুনিক' মাসিক পত্র সম্পাদনা করেন। তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস আছে।

জনাই গ্রামের উত্তর-পূর্ব দিকে বাকসা গ্রামের শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউর নবরত্নের সুবৃহৎ মন্দির বঙ্গের প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। বাকসার মিত্রবংশোদ্ভব দেওয়ান ভবানীচরণ মিত্র ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রত্যেকটি মন্দির ষাট ফুট উচ্চ এবং প্রতি বৎসর এই স্থানে চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিবসে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় লক্ষাধিক লোকউহাতে যোগদান করেন। সরকারী গ্রন্থে দ্বাদশ মন্দির সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

"The monument consists of twelve temples built all in a line on the bank of the Saraswati river. They are all of the same size and in height nearly sixty feet. Adjoining the temples is a large tank with a magnificient masonary ghat with seats all round. They are all dedicated to Siva named Isanesvar. They were built by Bhabani Charan Mitra in 1187 B.S. corresponding to A.D. 1740. In honour of the Siva an annual fair or mela is held on the ground adjoining those temples on the last date of the Bengal year which is resorted to numerously by the people of the the neighbouring villages."

বাক্সার রঘুনাথজীউর রথের ন্যায় সুবৃহৎ নবরত্নের মন্দির স্থাপত্যশিল্পের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এইরূপ মন্দিব বঙ্গদেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে রুদ্রুকটবাম মিত্র এই মন্দিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার দৈনিক সেবার জন্য তিনি জমি দান করিয়া য-। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব তাহার ষ্টাটিসটিক্যাল এ্যাকাউণ্ট অফ বেংগল নামক গ্রন্থে এই মন্দির সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে সরকারী গ্রন্থে রঘুনাথজীউর মন্দির সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা উল্লেখ্যঃ

Temple of Raghunath—This is a big temple with nine pinnacles of the present car fashion dedicated to the God Raghunathji. It was

built by Bhurkut Ram Mitra in the Bengali year 1199, corresponding to A.D. 1792. (List of Ancient Monuments in Bengal)

দেওয়ান ভবাণীচরণ মিত্র পূর্বোক্ত দ্বাদশ শিবমন্দির ব্যতীত গ্রামের মধ্যে আরও ছয়টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দুইটি করিয়া তিনটি বিভিন্ন স্থানে উক্ত মন্দিরগুলি বিদ্যমান আছে। চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত বহু গ্রামে প্রায় শতাধিক শিবের প্রাচীন মন্দির অদ্যাপি দৃষ্ট হয় ইহা হইতে এই অঞ্চলে বহু প্রাচীনকাল হইতে শৈব ধর্মের যে প্রতিপত্তি ছিল, তাহা সুনিশ্চিত। মঙ্গলচন্ডীর ব্রতকথা সুদূর অতীত কাল হইতে এই স্থানে প্রচলিত থাকিলেও, সেন রাজাগণের সময় হইতেই শৈব ধর্মের এইস্থানে প্রাদুর্ভাব হয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার চন্ডীকাব্যে শিবপূজা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইরূপঃ

"যেই জন চন্দনে করয়ে শিবপূজা।
কত জন্ম অবনীমন্ডলে হয় রাজা॥
শিবের মন্দিরে যেবা করে শঙ্খধ্বনি।
অভিপ্রায় বুঝি তার শিব হয় ঋণী॥
চামর ঢুলায় যেবা হরি সন্নিধানে।
স্বর্গালোকে চলি যায় চড়িয়া বিমানে॥"

বাক্সা গ্রামে সরস্বতী নদীতীরস্থ শ্মশানের পাকাঘর স্বর্গীয় যদুনাথ মিত্রের পুত্র স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মিত্র ১৩১৭ সালে নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্মশানের আচ্ছাদন-গৃহের গাত্রে প্রস্তরফলকে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছেঃ

"পূজ্যপাদ পিতৃদেব যদুনাথ মিত্রের পরলোকগত স্মৃতিতে এই আচ্ছাদন প্রতিষ্ঠা করিলাম। ইতি তাং ২২শে মাঘ, সন ১৩১৭ সাল। সেবক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র।" বাক্সা গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাটি স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত চৌধুরী নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাকসা গ্রামের প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি পায়। উক্ত সময়ে বাকসা গ্রামে বঙ্গের চারিটি খ্যাতনামা ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, যথা, দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ, দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরী, দেওয়ান ভবানীচরণ মিত্র এবং জ্যোতিষী মদনমোহন আচার্য। শান্তিরাম সিংহ স্যার টমাস্ রমবোল্ড ও মিণ্টার মিডল্টনের অধীনে মুকসুদাবাদ ও পাটনার নবাবের দেওয়ান ছিলেন। কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ইনি কলিকাতার জোড়াসাঁকো পল্লীতে আসিয়া বসবাস করেন। এই শান্তিরামই জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ সিংহ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরী এবং দেওয়ান ভবানীচরণ মিত্র উভয়েই যেরূপ বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, সেইরূপ দান, প্রতিষ্ঠা, অতিথিসৎকার ও দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া-কলাপ করিয়া তদানীন্তন সমাজে প্রীতিভাজন নিষ্ঠাবান হিন্দু-নেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষী মদনমোহন আচার্য বাণীর বরপুত্র বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইঁহার মনীষা, প্রতিভা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্যের কথা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইলে বাকসা গ্রাম জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইয়া উঠে।

বাকসা গ্রামের আর একটি প্রসিদ্ধির কারণ ইহার নবরত্নের মন্দির ও দ্বাদশমন্দির। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি জার্ণেলে এই দুইটি দেবস্থান সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে।

The nava-ratna, or nine jewelled type, which is rather later, may be studied in the Raghunath temple of Baxa, Hugli, circa 1199 Bengali sana (1793 A. D.). Groups of duplicated temples exist in Buxa, Hugli, and are said to be of nearly the same age as the neighbouring Raghunath 1781 (1187 BS).—Vol-V (1909).

॥ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) বাগাণ্ডা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং মাতার নাম সরস্বতী দেবী। ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশে তাঁহার মাতার জন্ম হয়। তিনি মাতৃকুল ও পিতৃকুল এই উভয় বংশের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে একটি বৃত্তি সংগ্রহ করিয়া তিনি পিতার বিনানুমতিতে ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। এবং তথায় যাইয়া 'লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' নামক একটি সমিতি স্থাপন করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্বগীয় মনোমোহন ঘোষের সহিত তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান, স্বদেশ সেবায় প্রবল উৎসাহ এবং সত্য ও স্বাধীনতার জন্য তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে, তিনি পুনরায় সভাপতি হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল তিনি কংগ্রেসের সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজনীতিক জ্ঞানের গভীরতা ও স্বদেশপ্রেমের আন্তরিকতায় তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

উমেশচন্দ্রের ভগিনী মোক্ষদায়িনী দেবী ১লা বৈশাখ ১২৭৭ সালে "বঙ্গমহিলা" নামক পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মহিলা সম্পাদিত ইহাই বাংলাদেশে প্রথম সংবাদপত্র। "স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব প্রভৃতি সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য" বলিয়া পত্রিকাশীর্ষে লেখা থাকিত। তাঁহার কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে সাহিত্য-প্রসঙ্গে ৪৬৩ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।

তিনি বিলাতে (ক্রয়ডন) বাটী নির্মাণ করিয়া উহার "খিদিরপুরহাউস" নাম দিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া প্রিভিকাউন্সিলের বিচারালয়ে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন এবং দাদাভাই নৌরজী ও মিঃ ডিগবি প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় ভারত শাসন সংস্কার বিষয়ে ইংরাজগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য তথায় একটি রাজনৈতিক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৌবাজারের মতিলাল বংশের

নীলমণি মতিলালের কন্যা হেমাঙ্গিনী দেবীকে বিবাহ করেন এবং পতিব্রতা, উদারতা আতিথেয়তা প্রভৃতি নানা সদগুণের অধিকারিণী হইলেও, তিনি খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু উমেশচন্দ্র তাঁহার পৈত্রিক হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করেন নাই। বিলাতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই তাঁহার দেহান্ত হয়; কিন্তু তিনি তাঁহার শব দাহ করিবার নির্দেশ দিয়া যান। তাঁহার শব দাহ করিয়া চিতাভস্ম ক্রয়ডনে প্রোথিত করা হয়। তাঁহার চিতাভস্ম এখন কলিকাতায় আনা উচিৎ। তাঁহার সমাধিস্তম্ভে এই কথা লিখিত আছেঃ

"Here lies Woomes Chandra Bonnerjee a Hindu Brahmin who on his way to native country fell a victim to Brights disease."

হুগলী জেলার রঞ্জপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও বহু পণ্ডিত লোকের বসবাসের জন্য এই স্থান পূর্বে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। পণ্ডিত শালগ্রাম ভট্টাচার্য একজন প্রখ্যাতনমা অধ্যাপক ছিলেন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থিত গ্রামসমূহের ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার পুত্র এবং পৌত্র কাশীনাথ সার্বভৌম এবং রামকুমার বিদ্যারত্ন পিতা ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সুযশ অর্জন করেন।

॥ আদান ॥

আদান গ্রাম জনাইয়ের উত্তরদিকে সরস্বতী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। ইহার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। এক মতানুসারে 'আদান' পর্তুগীজ শব্দের অপভ্রংশ। আদান মাহিষ্যপ্রধান গ্রাম। বাণিজ্যিক বস্তুর মধ্যে পান প্রধান। প্রাচীন দেবস্থানের মধ্যে শিবমন্দির ও ষষ্ঠীতলা অন্যতম। প্রাচীন বংশের মধ্যে মুখোপাধ্যায় বংশ (ইঁহারা জনাইয়ের মুখোপাধ্যায় (ফুলিয়ামেলী) বংশের প্রতিষ্ঠাতা নন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞাতিভ্রাতা মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বংশ), হাতীবংশ (ইঁহাদের কৌলিক উপাধি 'রায়', নবাবীআমলে ইঁহাদের এক পূর্বপুরুষ নবাবের হস্তীবাহিনীর সৈনাধ্যক্ষ থাকায় তদবধি হাতীবংশ বলিয়া খ্যাত), চক্রবর্তীবংশ এবং দাসবংশ অন্যতম। চক্রবর্তীবংশের বনমালী চক্রবর্তী সে-কালে একজন খ্যাতনামা কবিরাজ ছিলেন। এই বংশের এক শাখা গিরিডিবাসী এবং কয়লা ও 'মাইকা' খনির মালিক। আদানের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশকে অর্ধপ্রাচীন বলা যাইতে পারে। এই সম্ভ্রান্ত বংশে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কয়েকটি কৃতী সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। জনাইয়ের মুখোপাধ্যায় বংশ এবং উত্তরপাড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশ ও মুখোপাধ্যায় বংশের সহিত এই বংশ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ। এই গ্রামের লোকসংখ্যা ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ছিল ১,৬৮৭ জন, বর্তমান লোকসংখ্যা ২,১৪৩ জন।

॥ বেগমপুর ॥

বেগমপুর একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি মত দেখা যায়। প্রথম মতানুসারে পাঠানযুগে ইহার বেগমপুর নাম হয়। সুলতান গিয়াসুদ্দিনের আদেশে হজরত শাহসুফি এই অঞ্চল আক্রমণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া

মুসলিম-গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন এবং কালক্রমে এই স্থানের নাম 'বেগমপুর' হয়। দ্বিতীয় মতানুসারে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ফুরফুরা শরীফের পীরবংশ যখন দিল্লী হইতে ফুরফুরা আগমন করেন, তখন তাঁহাদের সহিত সাতশতঘর মুসলমান ফুরফুরা আগমন করেন। উত্তরকালে তাঁহাদের কয়েকটি বংশ এই অঞ্চলে বসতিস্থাপন করিবার পর হইতে এই স্থানের 'বেগমপুর' নাম হয়। ১৯৬১ সালের হিসাবে এই স্থানের জনসংখ্যা ৫,০৭৭ জন।

বেগমপুরকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারি গ্রন্থে "তাঁতীদের গ্রাম" বলিয়া উল্লেখ কবা হইয়াছে।

Begampur of Chanditala thana is a weavers' village where out of the total workers of 2,835, nearly half, about 1,481 in number are engaged in household industries.

বেগমপুরের প্রসিদ্ধি ইহার তাঁতশিল্প ও কয়েকটি প্রাচীন বংশ লইয়া। ইহার কার্পাস-সূত্র নির্মিত ধুতি বঙ্গবিখ্যাত। বাণিজ্যিক বস্তুর মধ্যে আর একটি হইল পান। এই পান ভারতের চতুর্দ্দিকে রপ্তানী হইয়া থাকে। বেগমপুর এক ঘনবসতিপূর্ণ স্থান। উল্লেখ দেখা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এখানে প্রায় এক হাজার-ঘর তাঁতির এবং প্রায় দুইশতঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। গ্রামের দক্ষিণভাগে ইংরাজদিগের এক বৃহৎ নীলকুঠীও বর্তমান ছিল। গ্রামে প্রাচীন দেবস্থানের মধ্যে বসাকদিগের স্থাপিত শিবমন্দির, বেগমপুর বাজারের শিবমন্দির ও ঘোষ-পরিবারের পূজার দালান অন্যতম। প্রাচীন বংশের মধ্যে পালবংশ, গুপ্তবংশ, দীর্ঘাঙ্গীবংশ, লাহাবংশ; ভড়বংশ, দত্তবংশ, সোমবংশ; মুখোপাধ্যায় বংশ, বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, শূরবংশ, ঘোষবংশ ও বোসবংশ অন্যতম। রাজচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র ও দুর্গাদাস প্রভৃতি বঙ্গবিখ্যাত কবিরাজগণ বেগমপুরের গুপ্তবংশের সন্তান। বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব বিহারী গুপ্ত এই গুপ্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেকালের অন্যতম ধনশালী প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি দাতা যজ্ঞেশ্বর লাহা বেগমপুরের সন্তান। কলিকাতাব ভবানীপুরস্থ জগুবাবুর বাজার' এই যজ্ঞেশ্বর লাহার নামানুসারে স্থাপিত।

১২৬৫ সালের ১৯শে বৈশাখ হুগলী জেলার অন্তর্গত বেগমপুরের বিখ্যাত কবিরাজ বংশে অবিনাশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই অবিনাশচন্দ্রের অসাধারণ নাড়ীজ্ঞান দেখিয়া পিতামহ কবিরাজ আনন্দচন্দ্র গুপ্ত ও সমসাময়িক সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার ১৭ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। পরবর্তীকালে কয়েক বৎসর তিনি খুব আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে কালাতিপাত করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় প্রপিতামহ কবিরাজ রাজচন্দ্র গুপ্তের নামে "রাজচন্দ্র ঔষধালয়" নামক এক ঔষধালয় স্থাপন করেন। স্বহস্তে প্রস্তুত ঔষধ ভিন্ন কোন ঔষধ তিনি ব্যবহার করিতেন না। ১৩৩১ সালের ১৮ই ভাদ্র তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। বঙ্কিমযুগের প্রাচীন সাহিত্যিক অবতারচন্দ্র লাহা এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাসীর সহযোগী সম্পাদক কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এই বংশের সন্তান।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহীভক্ত **নবগোপাল ঘোষ** বেগমপুরে ১৮৩২ সালে জন্ম-গ্রহণ করেন। তৎকালে হেণ্ডারসন কোম্পানীতে কার্য করিয়া তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। ১৯০৯ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহার দেহান্ত হয়।

বেগমপুরের 'সং' এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই 'সং' এর প্রচলন আরম্ভ হয়। সামাজিক শিক্ষণীয় বিষয় সকল নির্মল ব্যঙ্গে, কৌতুকে ও রহস্যাদিতে প্রকাশ করা হইত। জনসাধারণের উৎসাহের ও আনন্দের সীমা থাকিত না। ইহা চৈত্র মাসের শেষে জনাইয়ে আসিয়া সমস্ত জনাই গ্রাম প্রদক্ষিণ করিত।

জনাইয়ের অধিবাসিরাও একদিন পরে (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে) বেগমপুরে যাইয়া সং গাহিয়া আসিত। জনাই, বেগমপুর যেন সুখের, আনন্দের বিশ্রাম ভূমি বলিয়া মনে হইত। এখনও সং হয় বটে, কিন্তু সে উৎসাহ নাই, সে আনন্দও নাই। বেগমপুরের অনতিদূরে বড়তাজপুরের 'আলি' বংশ বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। এই বংশে বহু কৃতী সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ব্যারিষ্টার মিঃ ওয়াজেদ আলি এই বংশের এক উজ্জ্বল রত্ন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা আলি সাহেব জীবনবীমা ক্ষেত্রে দক্ষতার জন্য খুব সুনাম অর্জন করেন। জীবনবীমা সম্বন্ধে তাঁহার দুখানি গ্রন্থ আছে। এই গ্রামের বড়মসজিদ গ্রামবাসীদের চেষ্টায় নির্মিত হয়।

গুটুল ॥ ইহা জনাইয়ের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে দেড় মাইলের মধ্যে অবস্থিত। গুটুল গোটইল এর অপভ্রংশ। পণ্ডিতগণের মতে গোটইল পর্তুগীজ শব্দ হইতে উৎপন্ন। এখানকার মুণ্ডমালা কালীমাতার মন্দির বহু প্রাচীন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এখানে কয়েকটি বিখ্যাত পণ্ডিত বংশের বসতির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং কথিত আছে যে তৎকালে ইহা স্মৃতি শাস্ত্রের এক বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। এখানকার কুমার বংশ প্রাচীন ও বনিয়াদী। কলিকাতার বিখ্যাত ইনজিনীয়ার স্বর্গীয় পি. সি. কুমার এই বংশের সন্তান। ইনি ইঁহার স্বর্গত পিতৃদেব শ্যামাচরণ কুমারের স্মৃতিরক্ষার্থে চণ্ডীতলায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এই কুমার বংশে আরও কয়েকটি কৃতী সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা দেশের ও কলিকাতার ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন বা আছেন।

॥ গরলগাছা ॥

গরলগাছা চণ্ডীতলার পার্শ্ববর্তী এক সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে শিক্ষায়, সভ্যতায়, পাণ্ডিত্যে ও আভিজাত্যে ইহা এ অঞ্চলে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এখানকার ঘোষাল বংশ ও সারখেল বংশ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বংশের মধ্যে অন্যতম। অন্যান্য প্রাচীন বংশের মধ্যে মুখোপাধ্যায় বংশ, বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ চট্টোপাধ্যায় বংশ এবং গঙ্গোপাধ্যায় বংশের নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জনাইয়ের ভদ্রেশ্বর গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ভদ্রেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ বল্লভের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম চাঁদ মুখোপাধ্যায়। গরলগাছার মুখোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য সন্তোষ

বাকসা বাড়ী--জনাই (পৃঃ ১২৫৯)

দেবী উত্তরবাহিনী—শিয়াখালা (পৃঃ ১২৫২)

দ্বাদশ শিবমন্দিরের ১ম ছয়টি—বাক্‌সা (পৃঃ ১২৬৫)

রঘুনাথজীউর মন্দির—বাক্‌সা (পৃঃ ১২৬৫)

দ্বাদশ শিবমন্দিরের ২য় ছয়টি—বাক্‌সা (পৃঃ ১২৬৫)

॥ ৮৩ ॥

দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ (পৃঃ ১২৬৬)

বিদ্যাবাগীশ এই চাঁদের বংশধর। সন্তোষের পৌত্র রাধানাথ মুখোপাধ্যায় এক প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে এক উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং কার্যের প্রতিদান স্বরূপ নবাব-সরকার হইতে বহু নিষ্কর সম্পত্তি লাভ করেন। ইঁহার পুত্র স্বনামধন্য জমিদার রায় বাহাদুর দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায়। দ্বারিকানাথ প্রথম জীবনে গ্যারিসান্‌ ইনজিনীয়ার ছিলেন। দ্বারিকানাথ প্রতিষ্ঠিত চারিটি শিবালয় এখনও বর্তমান; দুইটি সরস্বতী তীরে তাঁহার বাগানবাটীতে, আর দুইটি তাঁহার প্রাসাদসদৃশ বাটীর সম্মুখে। দ্বারিকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ গরলগাছার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বংশে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় ই, বি, রেলওয়ের বড় অফিসার ছিলেন। অনাদিনাথের পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও দেশনেতা স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। এই বংশের অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা করপোরেশানের কমিশানার ছিলেন। এই বংশের জমিদারীর মধ্যে খিদিরপুরের জমিদারী উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর হিসাবে গরলগাছার লোক-সংখ্যা ৩,৪৩৯ জন। গরলগাছা মৌসুমী সম্প্রদায় একটি প্রগতিশীল নাট্যপ্রতিষ্ঠান।

গরলগাছার শিক্ষিত সমাজে বহু কৃতী সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে **ওয়ার্ড-বুক প্রণেতা শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়** উত্তরপাড়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। শ্যামাচরণবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় রেণ্ট্‌ কনট্রোলার ছিলেন। এতদ্ভিন্ন সাব-জজ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত ব্যবসায়ী কৃষ্ণধন গঙ্গোপাধ্যায়, এশিসট্যাণ্ট পুলিশ কমিশনার হরিহর মুখোপাধ্যায়, গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারি সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং লয়েড্‌স্‌ ব্যাঙ্কের প্রধান কর্মচারী মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম করা যাইতে পারে। বীমা ব্যবসায়ে পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠা করিয়া সুনাম অর্জন করেন। শিক্ষাবিদ শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রামের অধিবাসী।

গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার এই অঞ্চলের প্রাচীন গ্রন্থাগারের মধ্যে অন্যতম। ১৩৭০ সালে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পাঠাগারে পাঠ্যসূচী গ্রন্থ সংগ্রহ বিভাগের উদ্বোধন হয়।

গবলগাছা 'মোক্তার বাটী'র শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতৃদেব ৺বৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থে বিদ্যালয় সংলগ্ন জমি ও পুষ্করিণী এবং শ্রীবিধুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার পিতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়েব স্মতিরক্ষার্থে বিদ্যালয়ের তলস্থ ১০ কাঠা জমি ট্রাস্টকে দান করেন। একটি প্রস্তরে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছেঃ

সুরবালা বিদ্যামন্দির গরলগাছা

১৩৫৭ সালের শুভ অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে সুরবালা ট্রাস্টের সভাপতি শ্রীমোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বিদ্যামন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৩৫৭ সালের ৩রা চৈত্র তারিখে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন দেশবরেণ্য ডক্টর রাধাবিনোদ পাল এম, এ, ডি, এল মহোদয় এই বিদ্যামন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

৩রা চৈত্র ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ সুরবালা ট্রাস্টের পক্ষে শ্রীমানিকলাল গুপ্ত সম্পাদক।

॥ পায়রাগাছা ॥

পায়রাগাছা একটি প্রাচীন গন্ড গ্রাম, জনাইয়ের সংলগ্ন এবং ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। পণ্ডিতগণের মতে পর্তুগীজ 'পেরা' শব্দের সহিত 'গাছা' সংযুক্ত হইয়া পায়রাগাছা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পায়রাগাছা গ্রামে 'রায়' উপাধিধারী এক প্রবল প্রতাপশালী জমিদার বংশের বাসের উল্লেখ আছে। এই বংশ ক্ষুদ্র স্বাধীন ভূস্বামীর ন্যায় বাস করিতেন এবং বাগ্দী ও ডোম জাতীয় বহু লাঠিয়াল পোষণ করিতেন। ইঁহাদের বৃহৎ ঠাকুরবাটীর ভগ্নাংশের চিহ্ন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দিঘী ইঁহাদের অতীত বৌরবের সাক্ষীহিসাবে এখনও বর্তমান। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে পায়রাগাছায় নবশাখ সম্প্রদায়ভুক্ত কযেকটি ধনবান ব্যবসায়ীর বাসের উল্লেখ আছে। ইঁহারা গঙ্গাতীরে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া আমদানী ও রপ্তানীর কার্য করিতেন। এই গ্রামের দেবতা 'কালিরায' এবং 'দক্ষিণরায়' পাঠানযুগে স্থাপিত। প্রবাদ, কালাপাহাড়ের আদেশে এই দুইটি মূর্তিকে দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছিল। এই গ্রামের লোকসংখ্যা ২,৫৪৮ জন।

পায়রাগাছার দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ সেনবংশ বহু প্রাচীন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রত্নেশ্বর সেন প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। খ্যাতনামা ঠাকুরদাস সেন এই বংশের সন্তান। ইনি বর্ধমান রাজ-সরকারের এক উচ্চ দায়িত্বশীল কর্মচারী ছিলেন এবং কার্যের প্রতিদানস্বরূপ বহু সম্পত্তি লাভ করেন। এই বংশের জমিদারীর মধ্যে খোঁড়াগোড়, ছুঁচে প্রভৃতি অন্যতম। পায়রাগাছার অন্যান্য প্রাচীন বংশের মধ্যে চক্রবর্তী বংশ এবং মুখোয়াধ্যায় বংশ অন্যতম। চক্রবর্তী বংশের কৌলিক উপাধি 'মুখোপাধ্যায়'। উপরোক্ত রায় বংশের সাহায্যে ইঁহাবা পায়রাগাছায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। বঙ্গের কযেকটি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সহিত ইঁহারা কৌলিকসূত্রে আবদ্ধ। পায়রাগাছার মুখোপাধ্যায় বংশ জনাইয়ের মুখুটী সমাজেরই এক শাখা। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামময় মুখোপাধ্যায় বর্গীয় হাঙ্গামাকালে গঙ্গাতীরস্থ চাতরা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া জনাইয়ের মধ্যে ইহাব দক্ষিণ প্রান্তে বসতি স্থাপন করেন। স্বর্গীয় কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার নথিতে রামময়কে তৎকালীন জনাই-সমাজের অন্যতম সমাজপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রামময়ের পৌত্র রামতনু মুখোপাধ্যায় এক কীর্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার বংশের বিববণ রেণুপদ মুখোপাধ্যায়ের 'সেকালের জনাই' নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্তমানে ইঁহাদের ঠাকুরবাটী এবং একটি শাখার বসতবাটী এখনও জনাইয়ে বহিয়াছে। এই বংশে বহু কৃতী ও বিদ্বান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। রামতনুবংশধর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে দান, প্রতিষ্ঠা, দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া-কলাপ করিয়া তদানীন্তন সমাজে একজন প্রীতিভাজন সামাজিক নেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার পুত্র গুরুপদ মুখোপাধ্যায় এ অঞ্চলে এক নিষ্ঠাবান কংগ্রেস নেতা ছিলেন। ইনি প্রথম জীবনে যেরূপ বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সেইরূপ শিক্ষায় ও সামাজিক

কার্যে দানও ছিল তাঁহার যথেষ্ট। ই'হার ভ্রাতারাও শিক্ষিত ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গুরুপদ বাবুর পুত্র মোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায় সরকারীকার্যে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত এবং এই বংশের এক উজ্জ্বল রত্ন।

নৈটী ॥ ইহা পায়রাগাছার বিপরীত দিকে সরস্বতীর পূর্বতীরে অবস্থিত। পণ্ডিত গণের মতে নৈটী 'নবহাটের' অপভ্রংশ। নৈটীর জাগ্রত দেবতা পঞ্চানন ঠাকুরের মাহাত্ম্য এ অঞ্চলে সুবিদিত। ই'হার মন্দির আধুনিককালে নির্মিত হইলেও, ইহার প্রাচীনত্ব ৪০০ শত বৎসরের ঊর্ধ্বে যাইবে। নৈটী কৃষি-প্রধান স্থান। এখানে প্রাচীন বংশের মধ্যে ফুলিয়ামেলী মুখোপাধ্যায় বংশ অন্যতম। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা দেবীচরণ মুখোপাধ্যায় বর্গীর হাঙ্গামাকালে এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। দেবীচরণ-বংশধর প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। নৈটীর দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী কৃষি-প্রধান স্থান হইতেছে **শ্রীখণ্ড।** ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজদিগের এক বৃহৎ নীলকুঠি এখানে বর্তমান ছিল। শ্রীখণ্ডের হাটের জন্য গ্রামের প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি পায়। প্রবাদ, প্রথমে এই বিরাট হাট' নৈটী হইতে শ্রীখণ্ড পর্যন্ত সরস্বতীর পূর্বতীর ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল এবং আমদানী ও রপ্তানী ব্যবসায়ের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। জনশ্রুতি এই যে, হাওড়ার হাট শ্রীখণ্ডের হাট ভাঙিগয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই গ্রামের লোকসংখ্যা ৩,২২৯ জন।

কলছড়া ॥ পায়রাগাছা এবং বেণীপুরের পার্শ্বে অবস্থিত এই গ্রামও খুব প্রাচীন। প্রবাদ, কলাধর মিত্র হইতে এই স্থানের নাম কলাছড়া হইয়াছে। **কলাছড়ার মিত্র বংশ বহু প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত।** এই বংশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উপরোক্ত কলাধর মিত্র আমতা অঞ্চল হইতে আসিয়া এ স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এই মিত্র বংশে বহু কৃতী, বিদ্বান ও দেশমান্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। **হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বারিকানাথ এই বংশের সন্তান।** অন্যান্য বংশধরদিগের মধ্যে ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মিত্র, মুৎসুদ্দি রাজা মিত্র, নিমকির দারোগা মতিলাল মিত্র, উচ্চ রাজ কর্মচারী যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, বেনিয়ান হেম মিত্র, উকিল হরিদাস মিত্র এবং খ্যাতনামা জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্রের নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অন্যান্য প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যে ভট্টাচার্যবংশ, ঘোষবংশ, বসুবংশ এবং দত্তবংশ অন্যতম। প্রথমোক্ত ভট্টাচার্য বংশের চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ও দানশীল ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর বংশের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কলাছড়ায় দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস দেখা যায়। ই'হারা সংখ্যায় ১০।১২ ঘর। **কলাছড়ার শিবমন্দির বহু পুরাতন।** এক্ষণে ইহা ভগ্নাবস্থায় অবস্থিত। অন্য পুরাতন দেবস্থানের মধ্যে বিশালাক্ষী দেবীর ও পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মন্দিরের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এই স্থানের লোকসংখ্যা ১,৯৮৭ জন।

বরিঝাঁটী ॥ ইহা একটি প্রাচীন গ্রাম। চণ্ডীতলার পার্শ্বে অবস্থিত। বরিঝাঁটীর মল্লেশ্বর মন্দির বহু পুরাতন। প্রাচীন বংশের মধ্যে চৌধুরী বংশ, ভট্টাচার্য বংশ, বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ও চট্টোপাধ্যায় বংশ অন্যতম। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই গ্রাম আয়ুর্বেদ শিক্ষার অন্যতম বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। বর্তমান লোকসংখ্যা ৩,৩৪১ জন।

॥ ভুরশুট ॥

প্রাচীন ভুরশুট বা ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য সেকালে দক্ষিণ রাঢ়ের একটি সুসমৃদ্ধ নগর ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যবন্দর ছিল। দামোদর নদের দুই তীরে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের যখন অবস্থিতি, তখন দামোদরের বিশাল বক্ষে সমুদ্রগামী পোত তাম্রলিপ্তের পথে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিত। এবং ভুরশুটের শ্রেষ্ঠীগণ বাণিজ্যসম্ভার লইয়া তখন দেশদেশান্তরে যাত্রা করিত। কাল-প্রবাহে নদীর গতি পরিবর্তন হওয়ায় দামোদর যেমন 'কানা দামোদরে' পরিণত হইয়াছে ঠিক সেইভাবে বাণিজ্যনগর ভূরিশ্রেষ্ঠ আজ কেবল প্রাচীন রাজ্যের বিলিয়মান ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করিতেছে। দামোদর নদের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি নক্সার সাহায্যে বিস্তারিতভাবে ৭২-৭৮ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। এখন দামোদর নদ হাওড়া ও হুগলী জেলার সীমানা বলিয়া ইহার পূর্বদিক হুগলী জেলা ও পশ্চিম দিক হাওড়া জেলার অন্তর্গত। সুতরাং গড়ভবানীপুর, পেঁড়ো-বসন্তপুর, ডিহিভুরশুট, পারভুরশুট, দোগাছিয়া প্রভৃতি দামোদরের পশ্চিম তীরবর্তী গ্রামগুলি হাওড়া জেলা এবং আঁটপুর, রাজবলহাট, গুলিটা প্রভৃতি দামোদরের পূর্বতীরবর্তী গ্রামগুলি প্রাচীন ভুরশুট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং আধুনিক হাওড়া ও হুগলী জেলার অনেকটা অঞ্চল জুড়িয়া প্রাচীন ভুরশুট রাজ্য ও পরগণা বিস্তৃত ছিল।

আদমসুমারী গ্রন্থে ভূরশুট সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিত আছে ঃ

Bhursut (Bhurishrestha)—On the bank of Damodar river, Bhursut was once the capital of South Rarh and a famous port. (District Census Handbook—1911—Hooghly).

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তোডরমল্ল রাজস্ব নির্ধারণকল্পে যে 'সরকার' গঠন করেন, সেই সরকার সোলিমানাবাদের অন্তর্গত ৩১টি মহালের মধ্যে বসুন্ধরী পরগণার রাজস্ব সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। তার পরই ছিল ভুরশুট পরগণা। ভুরশুটের রাজস্ব ছিল প্রায় বিশ লক্ষ 'দাম'। ৪০ হইতে ৪৮ দাম এক টাকার সমান ছিল। সরকার সাতগাঁও বা সরকার মান্দারুণের কোন পরগণার এত অধিক রাজস্ব ছিল না। সরকারগুলির বিবরণ ১৫৮-৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। সুদূর অতীতের ভুরশুট রাজ্য ও পরগণার আয়তন কত বড় ছিল তাহা এই রাজস্বের পরিমাণ হইতে অনুমান করা যায়। প্রাচীন পুস্তক ও দলিলপত্রে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের নানারকম নামান্তর দেখা যায়—যথা ভূরিশ্রেষ্ঠী, ভূরিশিট, ভুরসুট, ভূরি-সৃষ্টি, ভুরসিট্, ভরশুটা প্রভৃতি।

দশম শতাব্দীর ভারতবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত কন্দলীকার শ্রীধর আচার্য তাঁহার 'ন্যায়-কন্দলী' গ্রন্থে আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন ঃ

আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাং।
ভূরিসৃষ্টিরিতি নামো ভূরিশ্রেষ্টিজনাশ্রয়ঃ॥

এই শ্লোক হইতে দশম শতাব্দীতে দক্ষিণরাঢ় উত্তররাঢ় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। এবং তখন ভুরশুটে বহু 'শ্রেষ্ঠীজন' ও 'ভূরি-

কর্মা' ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল। তখন কে এই রাজ্যের রাজা ছিলেন, তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে শূরবংশের কোন রাজা এই স্থানে রাজত্ব করিতেন বলিয়া মনে হয়। কালের যাত্রায় ভুরশুট রাজ্যের ভাগ্যবিপর্যয় দামোদরের গতিপথ পরিবর্তনের ফলেই যে হইয়াছে, তাহা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ভুরশুট রাজ্যের অধীপতি কায়স্থ রাজা পান্ডুদাস শ্রীধর আচার্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার পূর্বে একজন ধীবর রাজা এই স্থানের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। রাজা পান্ডুদাসের পর নবাব হুসেন শাহের রাজত্বকালে চতুরানন নিয়োগী নামে একজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ভুরশুটে ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। চতুরাননের দৌহিত্র ফুলিয়ার মুখুটিবংশীয় কৃষ্ণ রায় ভুরশুটের প্রথম ব্রাহ্মণ রাজা। রাজা কৃষ্ণ রায় মহাকবি কৃত্তিবাসের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ। তিনি সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে ভুরশুটে রাজত্ব করেন। এই রাজবংশে কৃষ্ণ রায়ের বংশধর রাজা প্রতাপনারায়ণ কীর্তিমান পুরুষ।

রাজা প্রতাপনারায়ণ

সম্রাট সাজাহান ও আওরঙ্গজেবের অধীন 'রাজা' উপাধীধারী ভুরশুটের ভূম্যাধিকারী ছিলেন রাজা প্রতাপনারায়ণ। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তিনি বহু ভূমি দান করেন এবং বিদ্যোৎসাহী রাজা বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহার 'ভূরিশ্রেষ্ঠ মহীপাল—সভাপণ্ডিত' ভরত মল্লিক চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা (১৬৮০ খৃষ্টাব্দ) গ্রন্থে রাজা প্রতাপনারায়ণের বিষয় 'ইতি প্রজাধীশ্বর-ধীরবীর প্রতাপনারায়ণ—সৎসদস্যঃ' বলিয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

রাজা প্রতাপনারায়ণ সর্বজনবন্দিত রাজা ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে হায়াতপুর নিবাসী রঘুনন্দন আদকের পুত্র **রামদাস আদক** ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে "অনাদিমঙ্গল" নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। কবি কর্তৃক অনাদিমঙ্গল-কাব্য হায়াতপুর গ্রামে যাত্রাসিদ্ধ নামক ধর্মঠাকুরের সম্মুখস্থ চাতালে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে প্রথম গীত হয়। রাজা প্রতাপনারায়ণের ইচ্ছায় রামদাস রাজবাড়ী সংলগ্ন বিরাট নাটমন্দিরে উক্ত মঙ্গলকাব্য দ্বিতীয় বার গান করিয়া শোত্রীমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। রামদাসের রাজ-বন্দনা এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য ঃ—

ভুরসুটে রাজা রায় প্রতাপনারায়ণ।
দানদাতা কল্পতরু কর্ণের সমান॥
তাঁহার রাজত্বে বাস বহু দিন হতে।
পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে॥
যাত্রাসিদ্ধি বন্দিলাম গ্রাম হায়াৎপুরে।
প্রথম প্রচার গীত যাঁহার দুয়ারে॥
তিন বাণ বসু বেদ শাক সুপ্রচার।
ভাদ্র আদ্য কৃষ্ণপক্ষে অষ্ট দিবস তাহার॥

প্রতাপনারায়ণের মাতা রায়বাঘিনী মোগল-পাঠান সংঘর্ষের সময় নিজ রাজ্য রক্ষার্থে অপূর্ব রণকৌশল দেখাইয়া ছিলেন। এই বীরাঙ্গণার বিষয় পরে আলোচনা করিব।

রাজা প্রতাপনারায়ণের একমাত্র পুত্রের নাম নরনারায়ণ।* নরনারায়ণের দুই পুত্র, নাম লক্ষ্মীনারায়ণ ও হীরারাম। তিনি ১০৯২ হইতে ১১১৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্র বলপূর্বক ভুরশুট পরগণা দখল করেন। সেই সময় কনিষ্টশাখায় কবি ভারতচন্দ্রের পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ পেঁড়োরগরের শাসনকর্তা ছিলেন। নরনারায়ণ সরাই গ্রামে দেবী মনসার মূর্তি ও মন্দির স্থাপন করেন।

ভুরশুট রাজ্যে প্রাচীনকালে তিনটি প্রধান গড় ছিল। তাহার মধ্যে প্রথম হইতেছে গড়ভবানীপুর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহা রাজবংশের প্রধান শাখার অধিকারভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় গড় পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রাম। রাজা কৃষ্ণ রায়ের কনিষ্ঠ পৌত্র বসন্তরায়ের নামে পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রাম পেঁড়ো-বসন্তপুর বলিয়া খ্যাত। কৃষ্ণ রায়ের অনুজ রাজা শ্রীমন্ত এই স্থানে বাস করিতেন এবং কবি ভারতচন্দ্রের এই শাখায় জন্ম হয়। তৃতীয় গড় দোগাছিয়া কৃষ্ণরায়ের তৃতীয় পুত্র মুকুট রায়ের অধিকারে ছিল। শ্রীবিনয় ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে রাজবংশ ও দেবোত্তর সম্পত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

"প্রাচীন রাজৈশ্বর্যের একমাত্র সাক্ষীরূপে গড়ভবানীপুরে বিশাল দোতালা ইঁটের মন্দিরটি আছে। তাও একেবারে জীর্ণ ইঁটের স্তূপে পরিণত হয়েছে এবং আগাছায় ঢেকে গেছে সব। এত বড় ইঁটের মন্দির এবং এরকম দোতলা গড়ন, বিরল।

গড়ভবানীপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির মধ্যে (৪৮০৭৫ নং তায়দাদ) এই দেবালয়ের একটি কৌতুকজনক নক্‌শা আছে। তার মধ্যে কোন দেবতা কোন কোঠায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাও এঁকে দেখান আছে। দেবতাদের তালিকা এইঃ

একতলায় চতুর্ভূর্জ গণেশ, দ্বিভূজা ইন্দ্রাণী, দ্বিভূজা অভয়া, চতুর্ভূর্জা সিংহবাহিনী, দশভূজা, দ্বিভূজা ভৈরবী, চতুর্ভূর্জা ভুবনেশ্বরী, চতুর্ভূর্জা গজলক্ষ্মী। দোতলায় গঙ্গাধর শিব, গোপাল, গোপীনাথ, দামোদর (চক্র) রাধিকা ও কাশীনাথ শিব।

এই বিগ্রহগুলি কোথায় গেল এবং কি ভাবে গেল, এখন তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়

---

* পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে শ্রীবিনয় ঘোষ "প্রতাপনারায়ণের একমাত্র পুত্রের নাম শিবনারায়ণ। শিবনারায়ণের একমাত্র পুত্র নরনারায়ণ। হয় তাঁর জীবদ্দশায়, না হয়, তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই ১১১৯ সনে বর্ধমান রাজ কীর্তিচন্দ্র বলপূর্বক ভুরশুট পরগণা দখল করেন" বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক।

প্রতাপনারায়ণের একমাত্র পুত্রের নাম নরনারায়ণ—শিবনারায়ণ নয়। প্রতাপের পিতার নাম রুদ্রনারায়ণ ও মাতার নাম রাণী ভবশংকরী, যিনি রায়বাঘিনী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এবং পিতামহের নাম শিবনারায়ণ—পুত্র নয়। রাজা নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে (সন ১১১৯) ভুরশুটে হিন্দুরাজ্য লোপ পায়। বিস্তারিত বংশলতা 'রায়বাঘিনী ও ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিনী' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

না। মনে হয় বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র যখন ভূরশুট দখল করেছিলেন, গড়বাড়ি যখন লুট হয়েছিল, সনদ তায়দাদ যখন খোয়া গিয়েছিল, তখন বিগ্রহগুলিও স্থানান্তরিত হয়েছিল।

১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে পাটনার সুবেদার বিজবলদেব নামে এক রাজার আজ্ঞায় ভারতবর্ষের ভৌগলিক বিবরণ ও সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সমন্বিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল; গ্রন্থখানির নাম 'দেশাবলী বিবৃতি' এবং পণ্ডিত জগমোহন এই গ্রন্থ রচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে দক্ষিণ রাঢ়ের কিয়দংশ হিন্দু রাজত্বকালে যে ভান দেশ নামে পরিচিত ছিল তাহাও জানিতে পারা যায়।

"কংসাবত্যাহি সরিতঃ শিলাবত্যা হি ভূমিপ।
উভয়োর্মধ্যবর্তী চ ভানকো বিশ্রুতো ভূবি॥
বকদ্বীপাৎ পূর্বভাগে মণ্ডলঘাটস্য পশ্চিমে।
ত্রয়োদশ যোজনৈশ্চ মিতো হি ভানদেশকঃ॥"

অর্থাৎ কংসাবতী, শীলাবতী, বকদ্বীপ ও মণ্ডলঘাট, এই চতুঃসীমান্তবর্তী প্রদেশ তৎকালে ভানদেশ নামে পরিচিত ছিল।

ভানদেশে চন্দ্রকোণা, ভূরিশ্রেষ্ঠ ও বলিয়ার নামে তিনটি নগর ছিল; উক্ত নগরগুলির মধ্যে চন্দ্রকোণা এবং ভূরিশ্রেষ্ঠ অদ্যাপি মেদিনীপুর জেলায় ও হুগলী-হাওড়া জেলায় যথাক্রমে বিদ্যমান আছে; কিন্তু বলিয়ার নগর যে কোথায় ছিল, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

দামোদর তীরে অবস্থিত ভূরিশ্রেষ্ঠ বর্ত্তমানে ভূরসুট নামে একটি সামান্য গ্রাম হইলেও, প্রাচীনকালে ইহা দক্ষিণ রাঢ়ের রাজধানী এবং একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দর বলিয়া খ্যাত ছিল। ভূরিশ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ 'বহু বণিকের বসতি'; ভূরি অর্থাৎ বহু শ্রেষ্ঠী মানে বণিক্ (ভূরি+শ্রেষ্ঠী) অর্থাৎ যে স্থানে একত্র বহু বণিক্ বসবাস করেন।

একাদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক নাটকেও ভূরিশ্রেষ্ঠ নামটি দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং প্রায় হাজার বৎসর পূর্বেও যে এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল তাহা সুনিশ্চিত। নিম্নে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক হইতে চার লাইন উদ্ধৃত হইল ঃ

"গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনামধামপরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা॥
তৎপুত্রাশ্চ মহাকুলা ন বিদিতাঃ কস্যাত্র তেষামপি।
প্রজ্ঞাশীলবিবেকধৈর্যবিনয়াচারৈরহং চোত্তমঃ॥"

ভূরিশ্রেষ্ঠিক নিবাসী ব্রাহ্মণকে লইয়া প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে অন্যতম প্রধান পুরুষচরিত্র আঁকা হইয়াছিল এবং সেই নাট্যচরিত্রের নাম দেওয়া হইয়াছিল 'অহঙ্কার'। আর কাশীনিবাসী ব্রাহ্মণদের নাম "দম্ভ"। কাশীবাসী ব্রাহ্মণ 'দম্ভ' দূর হইতে ভূরিশ্রেষ্ঠের ব্রাহ্মণ 'অহঙ্কারকে' আসিতে দেখিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, তিনি নিশ্চয় দক্ষিণরাঢ়ের লোক। 'অহঙ্কার' 'দম্ভের' আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তথায় যথোচিত অভ্যর্থনা না পাওয়ায় তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া শিষ্যকে বলিলেন যে, আমরা ম্লেচ্ছদেশে আসিলাম না কি? তারপর অভ্যর্থনার পর 'অহঙ্কার' আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে যাহা বলেন তাহা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার অর্থ ঃ

অহঙ্কার বলিতেছেন ঃ গৌড়দেশ শ্রেষ্ঠ রাজ্য। তাহার মধ্যে নিরুপম প্রদেশ হইতেছে রাঢ়াপুরী। সেই স্থানের পরমসুন্দর ভূরিশ্রেষ্ঠ নগরে আমার নিবাস॥ আমার পিতা ভূরিশ্রেষ্ঠ নগরের একজন প্রধানব্যক্তি। তাঁহার মহাকুলোদ্ভব পুত্রদের এই স্থানের কে না জানে? তাহাদের মধ্যে আবার প্রজ্ঞা শীল বিবেক ধৈর্য বিনয় ও আচারে আমিই হইলাম সর্বশ্রেষ্ঠ।

মুসলমান রাজত্বকালে ভূরসুট একটি পরগণা হইয়াছিল; ৯১৩ শকে এই স্থানে কায়স্থ পাণ্ডুদাস নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার রাজত্বকালে গৌড় পাল রাজাগণের অধীনে ছিল, কিন্তু পাণ্ডুদাস স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। তিনি কাহাকেও কর দিতেন না। রাজা পাণ্ডুদাসের রাজ্য পাণ্ডুয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহার নামানুসারে পরবর্তীকালে পাণ্ডুয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি বুদ্ধদেবের পিতৃব্য অমৃতোদনের পুত্র পাণ্ডুশাক্যের বংশধর ছিলেন। পাণ্ডুয়ার বিবরণ ৮৭৭ পৃষ্ঠায়

রাজা পাণ্ডুদাসের উৎসাহে বলরাম পণ্ডিতের পুত্র শ্রীধর পণ্ডিত বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদ ভাষ্যের "ন্যায়কন্দলী" নামক একখানি টীকা রচনা করেন। উক্ত টীকা অদ্যাপি বৈশেষিক দর্শনের একখানি প্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। ১০৯২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমিশ্র চন্দেলরাজ কীর্তিবর্মার অভ্যর্থনার্থ যখন "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নামক নাটক রচনা করেন, তখন ভূরিশ্রেষ্ঠে নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইত। ভূরিশ্রেষ্ঠের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ কুমারিলের মত মানিতেন না; প্রভাকর মতের শালিকনখী পুঁথি তাঁহাদের পাঠ্য ছিল এবং তাঁহারা আপনাদিগকে অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব অনুভব করিতেন এবং তাহাদের আভিজাত্যবোধ খুব বেশী ছিল। মধ্যদেশী ব্রাহ্মণগণ এই স্থানের প্রধান অধিবাসী ছিলেন; এই সম্বন্ধে 'দেশাবলী বিবৃতি'তে লিখিত আছে যে, "মধ্যদেশী ব্রাহ্মণোণাং বসতির্বৈ পুরা কৃত্য।"

মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ ও মধ্যশ্রেণী কায়স্থ এখনও বঙ্গদেশের মধ্যে একমাত্র মেদিনীপুর জেলায় দৃষ্ট হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—"রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ভিন্ন অনেক ব্রাহ্মণ বল্লাল সেনের পূর্বেও মধ্যদেশ হইতে আসিয়া দক্ষিণ রাঢ় ও উড়িষ্যায় বাস করিয়াছিলেন। ইহারাই আমাদের মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণের আদি বৃত্তান্ত লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা শুনা যায়। সে সব ঠিক নয়। রাঢ়ী শ্রেণীদের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। রাঢ়ে ও বারেন্দ্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা বসতি করার পর মধ্যপ্রদেশ হইতে আসিয়া যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ এদেশে আসিয়া বাস করেন, তাম্রপট্ট ও শিলালিপিতে উহাদিগকে 'মধ্যদেশবিনির্গত' বলিয়া লেখা আছে।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ভূরসুট একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল; বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায় ভূরসুট রাজ্য অধিকাব করিয়া এই স্থান মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সেই সময় জ্যেষ্ঠশাখায় রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও কনিষ্ঠ শাখায় রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ছিলেন কনিষ্ঠশাখায় রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ পেঁড়োরগড়ের শাসনকর্তা ছিলেন; বর্ধমানের শাসনকর্তার সহিত তাঁহার মনান্তর হওয়ায়, মহারাজা কীর্তিচন্দ্র ভুরসুট দুর্গ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া এই স্থানকে মুসলমানদের হস্তে তুলিয়া দেয়। নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি

ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর এই স্থানে ১৬৩৪ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'অন্নদামঙ্গলে' নিম্নোক্ত পিতৃপরিচয় দিয়াছেন:

"ভূরসুট পরগণায় নৃপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদা মঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥"

ষোড়শ শতাব্দীতে মদন মুখোপাধ্যায় ভূরসুটে রাজত্ব করিতেন। তিনি পরলোকগমন করিলে, তাঁহার পুত্র সদানন্দ মুখোপাধ্যায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তৎপরে কৃষ্ণ রায় ও তাঁহার পুত্র দেবনারায়ণ শাসনভার গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ রায় মুসলমান সম্রাটের নিকট হইতে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার পর দর্পনারায়ণ, উদয়নারায়ণ ও সত্যনারায়ণ এই স্থানে রাজত্ব করেন। তৎপরে শিবনারায়ণ, রুদ্রনারায়ণ ও রাণী ভবশংকরী রাজত্ব করেন। রাণী ভবশংকরীর প্রপৌত্র লক্ষ্মীনারায়ণের সময় ১১১৯ সনে বর্ধমানের মহারাজা এই রাজ্য যে বাজেয়াপ্ত করেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শোভা সিংহের হস্তে বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায় নিহত হয়। তাঁহার পুত্র জগৎরাম বর্ধমানের শাসনভার তৎস্থলে গ্রহণ করেন এবং ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ রক্ষা করিলে, তাঁহার পুত্র কীর্তিচন্দ্র রায় বর্ধমানের শাসন ভার প্রাপ্ত হন। মুসলমান রাজত্বকালে বঙ্গদেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য হিন্দুদিগের দ্বারা শাষিত হইত. কিন্তু কীর্তিচন্দ্র উক্ত হিন্দু রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিয়া উহার বহুলাংশ মুসলমান শাসনকর্তার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন এবং বহু জমিদারী তিনি নিজ জমিদারীভুক্ত করিয়া লন।

বর্ধমানরাজ কর্তৃক ভূরসুট পরগণা বাজেয়াপ্ত করা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল:

Kirtti Chandra Rai inherted the ancestral Zamendari and added to it the Parganas of Chetwa, Bhursut, Barda and Manohar Sahi. He was bold and alventurous and fought with the Rajas and dispossessed them of their petty Kingdoms. (Statistical Account of Bengal, Page 41).

রাজা কৃষ্ণরায় জ্যেষ্ঠশাখা হিসাবে গড়ভবানীপুরে ও তাঁহার ভ্রাতা **রাজা শ্রীমন্তরায়** কনিষ্ঠ হিসাবে পেঁড়ো গ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। এই কনিষ্ঠশাখার পঞ্চম পুরুষে গোপীমোহন ও রাজীবলোচন দুই ভাই ছিলেন। রাজীবলোচন পরবর্তীকালে "কালা-পাহাড়" বলিয়া কখ্যাত হন। গোপীমোহনের পুত্র ভূপতিকৃষ্ণের নাম ভারতচন্দ্র তাঁহার সত্যনারায়ণের ব্রতকথায় উল্লেখ করিয়া পরে নিজের পরিচয় স্থাপন করেন।

ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতিরায়ের বংশ,
সদাভাবে হত কংস, ভুরসুটে বসতি।

ভূপতিকৃষ্ণ ভারতচন্দ্রের প্রপিতামহ। তিনি রাজবংশের দ্বিতীয় ধারার সুকৃতিপরায়ণ রাজা বলিয়া খুব জনপ্রিয় এবং সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে একজন শক্তিমান ও পরক্রমশালী রাজা বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

॥ ভারতচন্দ্র রায় ॥

ভূরসুটের শাসনকর্তা নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার পিতৃসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইলে, মাতুলালয়ে গমন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জমিদার রামরাম দত্ত মুন্সী মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি ফারসী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি ১১৩৪ সালের রচিত "সত্যপীরের কথা" নামক পাঁচালী কবিতায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপঃ

দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম
কহে অধিকারী রাম-রাম দত্ত মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়,
হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী॥

ভারতচন্দ্র কুড়ি বৎসর বয়সে পুনরায় তাঁহাদের রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ভূরসুটে যান, কিন্তু তথায় তিনি বর্ধমানের রাজা কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। কিছুকাল পরে তিনি কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া কটকে চলিয়া যান এবং তথায় মহারাষ্ট্রীয় সুবেদার শিবভট্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ফরাসীদের অধিকৃত চন্দননগরে দুপ্লে সাহেবের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় লাভ করেন। এই স্থান হইতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি দিয়া নিজ রাজসভায় লইয়া যান এবং 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' শ্রবণে প্রীতি হইয়া 'রায়গুণাকর' উপাধি এবং মূলাজোড়ে বহু নিষ্কর সম্পত্তি প্রদান করেন। ভারতচন্দ্র 'রসমঞ্জরী' নামক আর একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের গুণাকর উপাধি সম্বন্ধে ৭৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে ১৬৮২ শকাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

ভূরসুটে রায় বংশের বংশধরগণ অদ্যাপি সামান্য ব্রাহ্মণরূপে বসবাস করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে বিবরণ সাহিত্যপ্রসঙ্গে ৪১৪-৪১৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

বর্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান প্রাণচন্দ্র 'হরিহর মঙ্গল' সংগীত নামক একখানি সুবৃহৎ মঙ্গলকাব্য মহারাজের আদেশে রচনা করেন: এই কাব্যে তেজচন্দ্রের জমিদারী বর্ধমানের একটি কবিতা আছে, তন্মধ্যে ভুরশুট পরগণারও নাম লিখিত আছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে 'হরিহর মঙ্গল সংগীত' প্রকাশিত হয়। নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত হইলঃ

রাগিনী পূরবী॥ **তাল ধামার॥**

জমিদার বর্ধমান জগতে প্রধান নাম শ্রীল তেজসচন্দ্র যার পতি।
মহারাজ বাহাদুর যশে পূর্ণ মহীপুর যার গুণে ধন্য বসুমতী॥
বর্ধমান চাকলার যতদূর অধিকার সংক্ষেপেতে নাম শুন তার।
দক্ষিণের সীমা তার কাঁসাই নদীর ধার পূর্বসীমা পশ্চিমে গঙ্গার॥
উত্তরে রাজ্যের সংখ্যা শুন কহি তার লেখা মুরশিদাবাদের দক্ষিণে।
পশ্চিমে গণনা এই পঞ্চ কূট পূর্বে যেই চতুঃসীমার গণনে॥

ইহার সামিল আর নাম শুন পরগণার অভয়া আপনি অধিষ্ঠান।
শেরগড় সেনপাহাড়ী শ্যামরুপার গড়বাড়ী শ্রীযুত ধীরাজে কৃপাবান॥
বাঘা মুজঃফর শাহী হাবেলী আজমত শাহী গোপভূম চাম্পাই নগরী।
স্বয়ম্ভুরে সর্বক্ষণে পুজে যথা চাঁদ সহ দ্বন্দ্ব বিষহরি॥
বায়ড়া মনোহর শাহী সমর শাহী নলহি ইন্দ্রানী পাটুলী জাহাঙ্গীরাবাদ॥
রাণীহাটি রায়পুর বরদা সেলামপুর বালিগড় চেতো শাহাবাদ॥
আরসা আর আম্বুয়া বামুন ভূম বলিয়া চন্দ্রকোনা চৌম্মাহ ঘাটাল
খণ্ডঘোষ খরিদা ধরি বিষ্ণুপুর বরহাজারি পাণ্ডুয়ায় মানাদ জাঙ্গাল॥
জাহানাবাদ জয়পুর লিখিলাম দুরাদুর ভূর শিট আদি মণ্ডল ঘাট।
অপর তরফ যত বিস্তার লিখিব কত ধাঞা যথা যুগাদ্যার পাট॥
বর্ধমান তুল্য পুরী তুলনা দিবার নারি সর্বমঙ্গলা যেই পুরে।
রাজা অতি পুণ্যবান হরিভক্তিপরায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ যার ঘরে॥

রাজা পাণ্ডুদাস বিশেষ ধার্মিক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বৈশেষিক দর্শনের প্রধান ভাষ্য "ন্যায় কন্দলী" প্রণেতা প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীধর ভট্ট বা শ্রীধরাচার্য তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ৯৫৪ খৃষ্টাব্দে চন্দেলরাজ যশোবর্মা মিথিলা ও গৌড় জয় করেন ও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। চন্দেলরাজের সভাকবি কৃষ্ণ মিশ্র প্রণীত "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। পাণ্ডুদাসের বংশধরগণ হীনবল হইয়া পড়িলে বাগদী জাতীয় বীর মনি ভাঙড়ে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য জয় করেন। রোণ নদের তীরে দিল-আকাশ নামক স্থানে তিনি তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থানের নিকটবর্তী এক অরণ্য মধ্যে তিনি এক ভয়ংকরী ভৈরব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নিকট নরবলি দিতেন। এই দেবী এখনও দিলে আকাশে পূজিত হইতেছেন। একবার দেবীর সম্মুখে অষ্টমবর্ষীয় এক ব্রাহ্মণ কুমারকে বলি দিবার জন্য উপস্থিত করা হইলে বাগদী রাজার কাপালিক গুরু স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন ও স্বয়ং তাঁহাকে পুত্রবৎ লালন-পালন করেন ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া এই ব্রাহ্মণকুমার মনি ভাঙড়কে পরাজিত করিয়া স্বয়ং ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের রাজা হন। ইনি চতুরানন নিয়োগী নামে পরিচিত ছিলেন। চতুরানন রাজ্য অধিকার করিয়া বর্তমানে পেঁড়ো হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে দামোদর নদের তীরে ভবানীপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থপন করেন। এই স্থান এখন গড়ভবানীপুর নামে পরিচিত। চতুরাননই ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার কোন পুত্র ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সদানন্দ মুখোপাধ্যায় রাজা উপাধি লাভ করিয়া ভুরিশ্রেষ্ঠের অধিপতি হন। এই বংশীয়গণ বহুকাল ধরিয়া গড়ভবানীপুর ও পেঁড়ো বসন্তপুরে রাজত্ব করেন। উত্তরকালে নবাবের সহায়তায় বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র গড়ভবানীপুরের শেষ রাজা নরেন্দ্র নারায়ণকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং গড়ভবানীপুর ও পেঁড়োর গড় হস্তগত করেন। পেঁড়োর গড়ের শেষ রাজা নরেন্দ্র নারায়ণের পুত্র মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর নষ্ট পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারে অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

॥ রাণী ভবশঙ্করী ॥

পাঠান আমলে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। মুঘল সম্রাট আকবরের সময় ইহা নামে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন হইলেও কার্যতঃ স্বাধীনই ছিল, তৎকালে মুঘলদরবারে ভূরিশ্রেষ্ট রাজাকে বার্ষিক একটি স্বর্ণমুদ্রা, একটি ছাগল ও একখানি কম্বল রাজকর স্বরূপ দিতে হইত। সম্রাট আকবরের সময়ে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী রাণী ভবশংকরী ভূরিশ্রেষ্ঠের অধিশ্বরী হন। তিনি অতি তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। মুঘল অধিকার হইতে পাঠান সাম্রাজ্যের উদ্ধার সাধনের জন্য পাঠান সর্দার ওসমান রাণী ভবশংকরীকে সসৈন্যে পাঠানদলে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন।

ভুরশুট রাজগুরু বংশীয় বিধুভূষণ ভট্টাচার্য 'রায়বাঘিণী' গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ রক্ত-বস্ত্রপরিধানা এই রমণীমূর্তি যখন শূলহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করিত তখন মনে হইত যেন মানবীরূপে মহেশমনোমোহিনী মহাশক্তিরূপিণী, মহিষমর্দিনী দুর্গা দনুজ দলন করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

আধুনিক হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ লইয়া প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য ছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই ভূরিশ্রেষ্ঠই আজকাল ভূরশুট নামে পরিচিত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভূরিশ্রেষ্ঠ অতি সমৃদ্ধ ও রত্নপ্রসূ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ওসমান মনে করিলেন—এই ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য করতলগত করিতে পারিলে বঙ্গদেশ মোগলের হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করিবাব জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া চেষ্টা চলিতে পারে। কারণ ভূরি-শ্রেষ্ঠ শস্যপূর্ণ। এখানে সৈন্যগণের খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইবে না। ভূরিশ্রেষ্ঠের অন্তর্গত ছাওনাপুরের ভূমধ্যস্থ দুর্গ শত্রুর অনধিগম্য। আবার ভূরিশ্রেষ্ঠ উড়িষ্যা ও সপ্তগ্রামের মধ্যবর্তী। সেই সময় রুদ্রনারায়ণের পত্নী রাণী ভবশংকরী ভূরিশ্রেষ্ঠে শাসন করিতেন। এই পবাক্রমশালিনী, মহাবীর্যবতী নারীকে স্বপক্ষভুক্ত করিতে পাঠানগণ বহুবার বিফল চেষ্টা করিয়াছে। এক্ষণে ওসমান রানী ভবশংকরীর সেনাপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এক অমাবস্যার মহানিশায় বিধবা রানী রাজধানী গড় ভবানীপুর হইতে প্রায় ১২।১৪ মাইল উত্তরে বাসডিংগার গড়ে (বর্তমান বাসুড়ী গ্রামে) নিজের প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরের পুনরাভিষিক্ত হইবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। বাসুড়ী সম্বন্ধে ১২৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রানী ভবশংকরীর সেনাপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রজনীর অন্ধকারে গুপ্তভাবে মন্দিরে উপস্থিত হইয়া অসহায়া ব্রহ্মচর্যানিরতা রানীকে করায়ত্ত করিতে ওসমান অগ্রসর হইলেন। তিনি নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পাঠান বীরগণকে সঙ্গে করিয়া দামোদরের নির্জন তটদেশ ধরিয়া উত্তরমুখে চলিতে লাগলেন। পুড়শুড়ার নিকট দামোদর পার হইয়া ওসমান—সদলবলে অতি সন্তর্পণে বাশুড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু মন্ত্রী, সেনাপতির আচরণে সন্দিগ্ধ হইয়া পূর্বেই রানীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারের রানী বাশুড়ী হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরবর্তী ছাওনাপুর দুর্গ হইতে দুর্গাধিপতিকে সসৈন্যে ভবানী মন্দিরে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা দেন। দুর্গাধিপতি আসিয়া পৌঁছিলে রানী মন্দিরের নিকটবর্তী সু-বিস্তৃত প্রান্তরে সৈন্যসজ্জা করিতে আদেশ
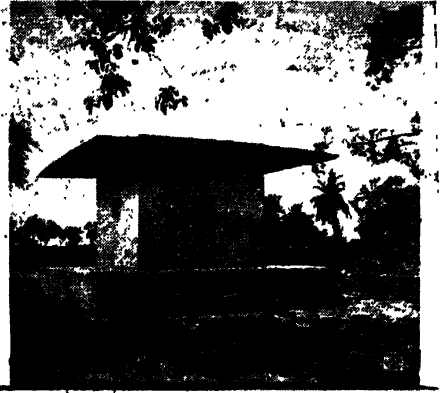
১—শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির—পাড়্নান (পৃঃ ৮৬৪) ২—রূপান্তরিত শিবমন্দির—বেলমুড়ি (পৃঃ ৮০৫) ৩—শ্রীশ্রীটাটেশ্বরনাথের মন্দির—পাউনান (পৃঃ ৮৬৩) ৪—মন্মথনাথ মল্লিক দাতব্য চিকিৎসালয়—সপ্তগ্রাম (পৃঃ ৭২৮) ৫—টাটেশ্বরনাথের অনাদি শিবলিঙ্গ—পাউনান (পৃঃ ৮৬৩)

১—নন্দদুলালের মন্দির—গুড়প (পৃষ্ঠা ৭৯৯), ২—রাধাকান্তজীউর মন্দির—গোস্বামী মালিপাড়া (পৃষ্ঠা ৮৪৯), ৩—মসজিদে রূপান্তরিত প্রাচীন মন্দির—সপ্তগ্রাম (পৃঃ ৭২১), ৪—কবি হেমচন্দ্রের বাসভবন—গুলিটা (পৃঃ ১৩০২)

রামসীতার মন্দিরের ইঁটে কারুকার্য ভদ্রেশ্বর (পৃষ্ঠা ১০৪৭)
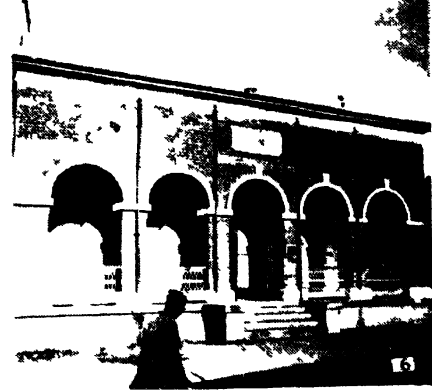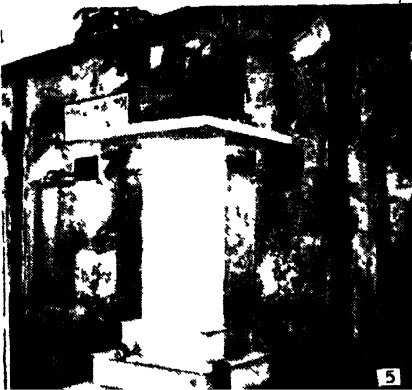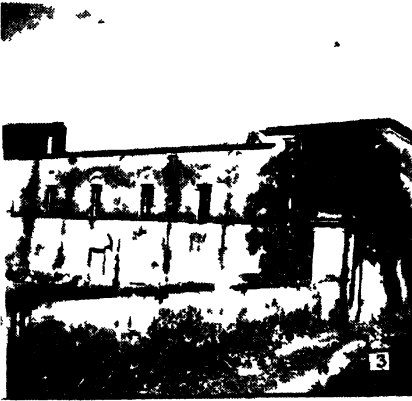
১—দাতা গৌরী সেনের বাটি—হুগলী (পৃঃ ৬৫৪) ২—বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের বাটি—পানিসেওলা (পৃঃ ১১০৫) ৩—বসু বংশীয়দের বাটি—পানিসেওলা (পৃঃ ১১০৫) ৪—বসু বংশের শিবমন্দির—পানিসেওলা (পৃঃ ১১০৫) ৫—শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ—হুগলী (পৃঃ ৬২৮) ৬—ফ্রেণ্ডস লাইব্রেরী—হুগলী (পৃঃ ৬৮০)

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের সহধর্মিণী
স্বর্ণপ্রভা মল্লিক (পৃষ্ঠা ১০৬৭)

রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবরায় (পৃষ্ঠা ৭১১)

দেন এবং হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বয়ং সৈন্যচালনা করেন। ওসমান সদলবলে প্রান্তর-সমীপে উপস্থিত হইলে মশালের আলোকে প্রান্তর আলোকিত করা হয়। অনন্তর পাঠানদলকে বেষ্টন করিয়া রানী ভবশঙ্করীর সৈন্যগণ তাহাদিগকে ভীষণবেগে আক্রমণ করে। পাঠান বীরগণ এই আক্রমণ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। পলাইবার সময় অনেকেই হতাহত হয়। ওসমান কয়েকজন সহচরের সহিত অতিকষ্টে পলায়ণ করিয়া রক্ষা পান। এই যুদ্ধে প্রধান প্রধান পাঠানবীর নিহত হওয়ায় ওসমান একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়েন।

আকবর রানীভবশঙ্করীর এই অলৌকিক বীরত্বের জন্য তাঁহাকে রায়বাঘিনী উপাধি দান করেন। ইহার পর পাঠানগণ পূর্ববঙ্গে আর দুইবার বিদ্রোহ করিয়াছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বীর্যবতী রানী ভবশঙ্করীর দ্বারা নিন্দিত হইবার পর পাঠানগণ এ প্রদেশে আর মস্তকোত্তলন করিতে পারে নাই। গড়ভবানীপুর মাহিষ্যপ্রধান গ্রাম্।

গড়ভবানীপুরে একমাত্র মণিনাথ মহাদেব নামক শিবের মন্দির প্রাচীন যুগের সাক্ষ্য স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। রাজবাটীর কোনরূপ চিহ্ন এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পেঁড়ো-বসন্তপুরে এখনও একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহা ভারতচন্দ্রের গড় নামে পরিচিত। কয়েক বৎসর হইল মহাকবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থানে "রায় গুণাকার ভারতচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউশন" নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহা পরিচালনা করিতেন রাজবংশের কুলপ্রদীপ বিধুভূষণ রায়। গ্রামে ধর্মঠাকুরের উৎসব উল্লেখযোগ্য। এই উৎসবে পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু লোক উপস্থিত হয়। মণিনাথ শিমন্দির "১৩০৬ শকাব্দে" প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উৎকীর্ণ আছে। এই মণিনাথজীউ গ্রামের প্রধান দেবতা। শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবারে মণিনাথ মহাদেবের বিশেষ উৎসব হয়। ইহা এখন হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত।

রানী ভবশঙ্করী **ভবানীদেবীর মন্দির** প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে মন্দির নষ্ট হইলে ভবানীদেবীর দারুমূর্তি কোন অজ্ঞাত স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এখন উহা সংগৃহীত হইয়া রাজবলহাট অমূল্য প্রত্নশালায় সংরক্ষিত হইয়াছে। দেবীর আলোকচিত্র গ্রন্থে প্রদত্ত হইল।

বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরে রায়বাঘিনীর নামানুসারে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। রায়বাঘিনীর উপর সম্প্রতি আদমসুমারির এক সমীক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে গ্রামে হিন্দুদের নয়টি শ্মশানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্মশান দুইটি বাগদি সম্প্রদায়ের, একটি তন্তুবায় পরিবারের, একটি ব্রাহ্মণ ও বাগদিদের, একটি মোদক, সূত্রধর ও শঙ্খবণিক সম্প্রদায়ের মিলিত আর দুইটি বিশেষ দুইটি পরিবারের জন্য সংরক্ষিত আছে।

॥ কালাপাহাড় ॥

ভারতবর্ষের অসংখ্য হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী ইতিহাসবিশ্রুত কালাপাহাড় ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকুল সম্ভূত ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল রাজীবলোচন রায় এবং তিনি ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ রুদ্রনারায়ণের সেনাপতি ছিলেন। পাঠান নবাব সুলেমান কররানি সপ্তগ্রাম আক্রমণ করিলে মহাবীর রাজীবলোচন উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব ও ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রুদ্রনারায়ণ রায়ের সেনা-বাহিনী লইয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। সুলেমান সন্ধি করিতে বাধ্য হন। রাজীবলোচনের

বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে গৌড় আক্রমণ করিতে লইয়া যান। সেখানেও রাজীবলোচন অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দেন। একদিন পশুশালার পিঞ্জর হইতে একটি ব্যাঘ্র কোনরূপে বাহির হইয়া পড়ে। রাজীবলোচন উহাকে ধরিয়া পুনরায় পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করান। তাঁহার সৌন্দর্য ও বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া নবাব কন্যা তাঁহার প্রেমে পড়েন। বহু ইতস্ততঃ করিয়া রাজীবলোচন তাঁহাকে বিবাহ করেন। হিন্দু হইয়া মুসলমানকে বিবাহ করায় রাজীবলোচন স্ব-সমাজ কর্তৃক অপমানিত ও ধিক্কৃত হন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন এবং দারুণ হিন্দু বিদ্বেষী হইয়া পড়েন। সুলেমানের সেনা-বাহিনী লইয়া উড়িষ্যা জয় করেন এবং তথাকার বহু দেবমন্দির কলুষিত ও দেববিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। কথিত আছে যে তাঁহার ভয়ে পাণ্ডাগণ জগন্নাথদেবকে লইয়া চিল্কা হ্রদের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। তিনি চিল্কা হইতে জগন্নাথ খুঁজিয়া বাহির করিয়া ত্রিবেণীতে আনিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করেন এবং গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেন। সেই অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড উদ্ধার করিয়া পরে জগন্নাথদেবের নূতন বিগ্রহ নির্মাণ করা হয়।

কালাপাহাড় পূর্বদিকে কামরূপ কামাখ্যা পর্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন। দেশের বহু স্থানে বহু অঙ্গহীন দেববিগ্রহ কালাপাহাড়ী অত্যাচারের স্মৃতি বহন করিতেছে। কথিত আছে কেবলমাত্র তাঁহার জন্মভূমি ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য তাঁহার এই অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

॥ কবি বসন্ত রায় ॥

কবি বসন্ত রায় ১৩৫৫ শকে ভূরশুটে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪০৩ শকে তাঁহার দেহান্ত হয়। ইনি বিদ্যাপতি উপাধি পাইয়াছিলেন। কবির অন্য পরিচয় আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তাঁহার রচিত পদগ্রন্থের নাম "বসন্ত-সুকুমার কাব্য"। ইহার প্রচুর পদে গোবিন্দদাসের উল্লেখ আছে বলিয়া ইহাকে গোবিন্দদাসের সমসাময়িক বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাঁহার রচিত একটি 'বরাড়ী পদ' নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

বড় অপরূপ, দেখিনু সজনি, নয়লী কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্রনীল-মণি, কনকে জড়িত, হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম শয়নে মিলিত নয়নে, উলসিত অরবিন্দ।
শ্যাম-সোহাগিনী, কোরে ঘুমায়লি, চান্দের উপরে চান্দ॥
কুঞ্জ কুসুমিত, সুধাকরে রঞ্জিত, তাহে পিককুল গান।
মরমে মদন-বাণ, দোঁহে অগেয়ান, কি বিধি কৈলা নিরমাণ॥
মন্দ মলয়জ, পবন বহ মৃদু, ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস ধন- দোহার দুহু জন, কহয়ে রায় বসন্ত॥

রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিনী গ্রন্থে যে বংশতালিকা আছে তাহাতে কনিষ্ঠ-শাখায় পেঁড়োরগড়ের রাজা শ্রীমন্ত রায়ের প্রপৌত্র হইতেছেন অমরেন্দ্র। অমরেন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্র এবং তাঁহার দুই পুত্র গোপীরমণ ও রাজীবলোচন (কালাপাহাড) লেখা আছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের একস্থানে (পৃষ্ঠা ১৪৭) 'অমরেন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র রাজীবলোচন' বলিয়া যাহা লেখা আছে তাহা ভুল বলিয়া মনে হয়।

॥ জাঙ্গীপাড়া—কৃষ্ণনগর ॥

জাঙ্গীপাড়া হুগলী জেলার একটি প্রাচীন স্থান; ইহা জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর বলিয়া এই অঞ্চলে খ্যাত এবং জাঙ্গীপাড়া ও কৃষ্ণনগর এই দুইটি গ্রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। খানাকুল থানায় আর একটি কৃষ্ণনগর গ্রাম আছে। দুই কৃষ্ণনগরের মধ্যে যাহাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়, সেই জন্য উহা খানাকুল-কৃষ্ণনগর বলিয়া কথিত হয়। জাঙ্গীপাড়ার দক্ষিণ-পূর্বে কৃষ্ণনগর অবস্থিত এবং জনসংখ্যায় এই গ্রাম থানার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কৃষ্ণনগরের জনসংখ্যা ৫,২৫০ জন ও জাঙ্গীপাড়ার জনসংখ্যা ৭৫৫ জন।

জাঙ্গীপাড়া থানার মধ্যে আটটি ইউনিয়ন আছে। উহাদের নাম রাজবলহাট, রসিদপুর, দিলাকাশ, আঁটপুর, মণ্ডালিকা, রাধানগর, ফুরফুরা এবং কোটালপুর। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর তালিকায় জাঙ্গীপাড়া থানার জনসংখ্যা ৯৬,৯৪৪ জন। জাঙ্গীপাড়া দক্ষিণডিহি উচ্চ বিদ্যালয় এই থানার প্রাচীনতম শিক্ষালয়। ইহা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া জাঙ্গীপাড়া দ্বারকানাথ বিদ্যালয় জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগরের শিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিবার জন্য রাজকুমার ভড় প্রস্তাব করেন এবং অযোধ্যা গ্রাম নিবাসী মাখনলাল দে বিদ্যালয়ের জন্য দশ বিঘা জমি দান করেন এবং তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ দে-র নামানুসারে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। প্রধান শিক্ষক বৃন্দাবন সিংহরায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বিদ্যানুরাগী রাখনলাল দে, ভূতনাথ নন্দী, ইন্দুনারায়ণ সাহা প্রভৃতির ঐকান্তিক চেষ্টায় ইহা সর্বার্থসাধক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। পথের পাঁচালির লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার "অপরাজিত" পুস্তকে এই গ্রামের আশেপাশের বহু জায়গার বর্ণনা ও নামের উল্লেখ আছে।

জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর পূর্বে তাঁতশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। গ্রামে বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয়, বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও ছয়টি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অনেকগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। তন্মধ্যে রেজিষ্টারী অফিস, জলকর অফিস, পোষ্ট অফিস, ষ্টেট ইলেকট্রিক অফিস, ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিস, ল্যাণ্ড রেকর্ড অফিস উল্লেখযোগ্য। গ্রামে পশুচিকিৎসালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। গ্রামে সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে। হাটে বহু দূর হইতে তরিতরকারী ও অন্যান্য জিনিষপত্র আমদানী হয়। এতদঞ্চলে এত বড় হাট আর কোন গ্রামে নাই। গ্রামে অনেকগুলি ভগ্ন দেবমন্দির আছে। তাহার মধ্যে হাটমন্দির ও শিবতলার শিবমন্দির উল্লেখ্য।

জাঙ্গীপাড়া স্কুল সংলগ্ন ফুটবল মাঠে ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রতি বৎসর শীল্ডের প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়। এই গ্রামে একটি সাধারণ নাট্যমঞ্চ, একটি সিনেমা, কোল্ডষ্টোরেজ (২টি) ও গ্রন্থাগার আছে।

কৃষ্ণনগর পল্লীকবি **ভক্ত গোবিন্দ দাসের** জন্মস্থান। তিনি স্বরচিত পদাবলী রচনা করিয়া কীর্তন করিতেন। পদকর্তা ও গায়ক হিসাবে এই অঞ্চলে তাঁহার খুব সুনাম ছিল। বর্ধমানের মহারাজা তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং অর্থ ছাড়া বহু নিস্কর জমিও

তিনি গোবন্দদাসকে দান করেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষের চেষ্টায় কবির বাস্তুভিটায় সম্প্রতি "শান্তি-কুঠির"প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঐস্থানে কবিগান, যাত্রা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়।

চন্দনপুরে **শ্রীরামরাজার পুজা** এই অঞ্চলের একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। ১২৮৮ সাল হইতে এই পুজার প্রচলন হয়। শ্রীরামচন্দ্রের বিরাট প্রতিমার আষাঢ় মাসের রথের পর হইতে এক মাস ধরিয়া এই পুজা হয়। তদুপলক্ষে প্রত্যহ বহু যাত্রী সমাগত হন এবং বিবিধ আনন্দানুষ্ঠানের তথায় ব্যবস্থা থাকে। চন্দনপুরের জনসংখ্যা ৬৪১ জন।

বিষ্ণুপুর ইহার পার্শ্ববর্তী গ্রাম। এই গ্রামে বাবুযাম সাঁওতালের পুজা প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে ২রা মাঘ একটি বিরাট মেলা হয়। মেলায় আশেপাশের গ্রাম হইতে হাজার হাজার সাঁওতাল আসেন।

বাহিরগড়়॥ জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগরের অন্তর্ভুক্ত বাহিরগড় এখন একটি নগণ্য গ্রাম হইলেও পূর্বে এই অঞ্চল সিংহ-রায় বংশের গড়বেষ্ঠিত বাড়ির বহির্ভাগ ছিল বলিয়া ইহা বাহিরগড় বলিয়া খ্যাত হয়। প্রাচীনকালে বারো বিঘা জমির সিংহরায় বংশের প্রাসাদতুল্য ভবন ছিল। এখন প্রাচীন গৃহের ইট কাট দিয়া সমস্ত সরিক পৃথক বাড়ি নির্মাণ করিয়াছেন। পুজামণ্ডপের সামান্য একটু গড়টিও এখন মজিয়া গিয়াছে। হাওড়া ময়দান হইতে মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেলে চাঁপাডাঙ্গা লাইনে বাহিরগড়া বলিয়া এখন একটি স্টেশন হইয়াছে। স্টেশন হইতে গ্রামের দূরত্ব প্রায় এক মাইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে রাজপুত-ক্ষত্রিয় সিংহরায় বংশ মুসলমানদের অত্যাচারে দেশ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলাদেশে আসেন এবং ধীরে ধীরে নবাবী আমলের শেষে হুগলী জেলায় জমিদারী দখল করিযা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বারাণসীর কাছে জৌনপুর জেলায় কেশব হাজারী বাস করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাজা বিষ্ণুদাস ও কনিষ্ঠেব নাম রাজা ভারামল্ল। বিষ্ণুদাস বাহিরগড়ে ও ভারামল্ল তারকেশ্বরের নিকট রামনগরে বাস করেন। নিবারণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ রিবচিত "তারকেশ্বর মাহাত্ম" নামক পুস্তকে ইহার বিবরণ আছে। রাজা বিষ্ণুদাস ও ভারমল্লের বিষয় তারকেশ্বর অধ্যায়ে ১১১০-১২ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিষ্ণু দাসের বংশ বাহিরগড়ে অদ্যাপি বাস করেন। তারকেশ্বরের মামলায় ধরণীধর সিংহরায় ৩০ জুলাই ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যাহা বলেন তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

We originally came to Bengal from the West. Our ancestor who came to Bengal first, was Keshab Hazari. He had two sons—Rao Bhara Mulla and Raja Bishun Das. We are the direct descendants of Raja Bishnu Das. I am tenth in succession from him.

বাহিরগড় ও জাঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগরে এক সময় বহু শিবমন্দির ছিল। এখনও গ্রামের চতুর্দিকে কয়েকটি পরিত্যক্ত শিবমন্দির দেখা যায়। বাহিরগড়ে দামোদর নামে কথিত শিবমন্দিরে ইঁটের কারুকার্য একটি দেখিবার জিনিস। মন্দিরটি পূর্বে অন্নদাপ্রসাদ দে বংশীয়দের ছিল। এখন ইহা উহাদের দৌহিত্র বংশের মানিকলাল শেঠ পাইয়াছে। মন্দিরের গায়ে "শুভমস্তু শকাব্দ ১৬৬৫" এই সালটি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরটি সরকার সংরক্ষণ

করিলে ভাল হয়। ইহা ছাড়া আনন্দময়ী কালী এই অঞ্চলের জাগ্রতা দেবী বলিয়া কথিত। কৃষ্ণবর্ণ পাথরের এইরূপ সুন্দর মূর্তি খুব অল্পই দেখা যায়। দেবীর সম্মুখে পঞ্চানন্দ, কালী, শীতলা ও মনসার চারিটি ঘট আছে। বাহিরগড়ে প্রাচীনকালের আর কোন নিদর্শন এখন নাই—সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সিংহরায়ের বংশের প্রবীণ ব্যক্তি রাধারমণ সিংহরায় মহাশয়ের বাড়ির নিকটে ১৩৬৭ সালে "রাজা বিষ্ণুদাস সিং স্মৃতি" বলিয়া একটি চাতাল নির্মিত হইয়াছে। এই গ্রামে বাংলাদেশে কৃষ্ণযাত্রার অন্যতম প্রবর্তক গোবিন্দ অধিকারী জন্মগ্রহণ করেন। কেবল যাত্রা-গান নয়, পালাগান রচনায় তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। তাঁহার প্রাসাদের ন্যায় বিরাট অট্টালিকা এখন পড়িয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বাড়ির পাশে অভিনেতাদের জন্য একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। গোবিন্দ অধিকারী ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পূজামণ্ডপে স্থানীয় ব্যক্তিগণ এখন একটি "নাটমন্দির" করিয়াছেন। উহাতে প্রতি বৎসর অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

গোবিন্দ অধিকারীর "কালীয় দমন" যাত্রার নাম শুনিলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বহু দূরবর্তী গ্রামে যাইতেও কুণ্ঠাবোধ করিত না। তাঁহার রচিত একটি গান উদ্ধৃত হইলঃ—

নূপুরে শোনরে শোন, বিনে সুজন, সুজনের বেদন জানে না।
অবোধ যদি উচ্চভাষে, সুবোধ বুঝায় মৃদুভাষে,
ভাষের আভাষে ভাষে, কভু ডুবে না॥
বড়র বড় দায়, তাতে কি বড়ত্ব যায়, পেলে একদিন বড়ই পায়।
বড় ঝড় বড় গাছ বই লাগে না॥

গ্রামে রাস্তাঘাটের এখনও ভাল ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া যাতায়াতের খুবই অসুবিধা আছে। গ্রামের মধ্যে অন্নপূর্ণা মিলন বীথি ও আনন্দময়ী নাট্যসমাজ এই অঞ্চলের উল্লেখ-যোগ্য প্রতিষ্ঠান। এই গ্রামের পার্শ্ববর্তী হাটপুকুর গ্রামের পদ্মপুকুরে কয়েকটি পাথরের মূর্তি পাওয়া যায়। এই গ্রামে রথ হয। বহু কৃতিব্যক্তি এই জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন তন্মধ্যে সুচারুমোহন চক্রবর্তী, গোবর্ধন শেঠ, ডাঃ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তর্কতীর্থের নাম উল্লেখ্য।

বাসুড়ী ॥ ইহার প্রাচীন নাম বার্সাডিংগা বা বাসুড়িয়া দামোদর নদের প্রায় দুই মাইল পূর্বদিকবর্তী—থানা জাংগিপাড়া-কৃষ্ণনগরের এলাকায়। আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এখানে বেণুরায় নামক এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন। গৌড়েশ্বর ধর্মপাল তাঁহার বৈবাহিক ধর্মপালের পুত্র, বেণুরায়ের কন্যা, ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা মানিক গাংগুলীর মতে ভানুমতীর এবং ঘনরামের মতে বিমলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেণুরায় অভিধান বাসুড়ায় বাস,
ধর্মশীল ধনে ধন্য ধরায় প্রকাশ॥
বিমলা বণিতা তার বৈদগ্ধী অতি,
সুশীলা সতত চিন্তা সংকৃতা সুমতি॥

বেণুরায়ের পরলোকপ্রাপ্তিতে তাঁহার পুত্র মাহুদা যার পর নাই প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিলে

প্রজাগণ রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। রাজ্য প্রজাশূন্যে হইল, অবিবাহিতা ভগ্নী রূপবতীকে লইয়া মাহুন্দা গৌড়নগরে আপন জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি গৌড়েশ্বরের আশ্রয় লইলেন, কালক্রমে তিনি গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রিত্ব পাইয়া প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। বাসুড়ীর গড় রাজা হরিপালের হস্তগত হইল। হরিপাল গৌড়েশ্বরের একজন সামন্ত রাজা—তাঁহার রাজধানীর নাম শিমুল, তাঁহার নামানুসারে পরে শিমুল নগরের নাম হয় "হরিপাল"। উহা অধুনা এই জেলার একটি থানা এবং তারকেশ্বর রেলপথের একটি স্টেশন। হরিপাল নামক প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বাসুড়ীর নিকটবর্তী পিয়াশাড়া গ্রামে একঘর জমিদার ছিলেন। এখন তাঁহাদের অবস্থা আর পূর্ববৎ নাই। 'আনন্দরাম ও 'বাহিরদাস সরকারের নাম আজও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের প্রতাপে এককালে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খাইত।

॥ রাজবলহাট ॥

রাজবলহাট হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। হাওড়া ময়দান হইতে মার্টিন কোম্পানীর হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের আঁটপুর স্টেশন হইতে প্রায় চার মাইল পশ্চিমে এই প্রাচীন স্থানটি অবস্থিত। রাজবলহাটের দূরত্ব কলিকাতা হইতে ছাব্বিশ মাইল। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের তারকেশ্বর শাখার হরিপাল ষ্টেশন হইতে রাজ-বলহাট পর্যন্ত বাস সার্ভিস আছে। এই স্থানের জনসংখ্যা ৮,৩৫০ জন।

রাজবলহাটের নামকরণ এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীরাজবল্লভীর নামানুসারে হইয়াছে। এই দেবী জাগ্রতা বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি। দেশদেশান্তর হইতে পুণ্যার্থী নরনারী তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার নবমীর দিন দেবীর নিকট পূজা দিবার জন্য এই স্থানে সমবেত হন।

রাজবলহাটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম; ইহার একদিকে দামোদর নদ ও অন্য-দিকে রণ নদ গ্রামটিকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া আছে। প্রাচীনকালে এই স্থান ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অন্যতম নগরী ছিল। এ অঞ্চলের যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য তৎকালে নদীপথে সুসম্পন্ন হইত। ভূরিশ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ 'বহু বণিকের বসতি'; ভূরি অর্থাৎ বহু, শ্রেষ্ঠী মানে বণিক (ভূরি+শ্রেষ্ঠী), অর্থাৎ যে স্থানে বহু বণিক বসবাস করেন। মুসলমান রাজত্ব-কালে ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরশুট একটি প্রখ্যাত পরগণা ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অধিপতি সদানন্দ রায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দামোদর ও রণ নদের জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিষ্কার করাইয়া একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় একটি বৃহৎ হাট বসান। রাজা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নগর বলিয়া এই স্থান 'রাজপুর' বলিয়া প্রখ্যাত হয়। প্রাচীনকালে হাওড়া ও হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি প্রকাণ্ড অঞ্চল জুড়িয়া এই ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য ও পরগণা অবস্থিত ছিল। 'আইন-ই-আকবরী' হইতে জানা যায় যে, সরকার সোলেমানাবাদের অন্তর্গত একত্রিশটি মহালের মধ্যে এক বসন্ধরী পরগণা ব্যতীত, ভূরশুট পরগণার রাজস্ব ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী—প্রায় বিশ লক্ষ 'দাম'। রাজবলহাট ভূরশুটের অন্তর্ভুক্ত ভূরশুটের বিবরণ ১২৭৮-১২৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভূরশুট রাজবংশের বসন্তপুর শাখার সম্পত্তির বিবরণে দেখা যায় যে, রাজবলহাটে সাত বিঘা ভূমির উপর রাজার গড়বাটি ছিল এবং দেবী রাজবল্লভী ঠাকুরাণীর নামে দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল পাঁচ শত বিঘা। দেবীর প্রভূত ভূসম্পত্তি অধিকাংশই প্রায় বেদখল হইয়াছিল। *অন্যায়ভাবে যাঁহারা দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগদখল করিতেছিলেন, তাহা উদ্ধার করিবার জন্য ২৬শে বৈশাখ ১৩৪৪ সালে রাজবল্লভী স্টেটের জিম্মাদার তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর সভাপতিত্বে মাতার সেবক ও ভক্তগণের সহযোগে 'রাজবল্লভী সেবা সমিতি' গঠিত হয়। বিশ বৎসরের চেষ্টায় সেবা সমিতি দেবোত্তর স্টেটের ও সেবা পূজার প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন। কেবল বেদখল সম্পত্তি উদ্ধার নয়, ধ্বংসোন্মুখ জঙ্গলাবৃত মন্দিরগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া সেবা সমিতি সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

॥ দেবী রাজবল্লভী ॥

রাজবল্লভী দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তী যাহা আছে তন্মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি দেবী রাজবল্লভী ব্রাহ্মণ কন্যার বেশে কোন পরিবারে পরিচারিকার কার্য করিতেন। সেই সময় নদীপথে বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিত। একদিন এই রূপবতী ব্রাহ্মণকন্যাকে দেখিয়া এক বণিক তাঁহাকে বলপূর্বক নিজ বজরায় লইয়া আসার সংকল্প করেন। সেই বণিক সপ্তডিঙা লইয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যাকে হরণ করিয়া যখন তাঁহাকে একটির পর একটি ডিঙা অতিক্রম করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন তাঁহার পদস্পর্শে এক একটি করিয়া ছয়খানি বজরা নদীগর্ভে ডুবিয়া যায়।

যখন সপ্তম ডিঙার, অর্থাৎ বণিকের নিজস্ব ডিঙায় ব্রাহ্মণকন্যাকে তোলা হইবে, সেই সময় এক দৈববাণী শুনিয়া বণিক তাঁহাকে দেবী বলিয়া জানিতে পারেন এবং তাহার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দেবী তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিমজ্জিত তরীগুলি উঠাইয়া দেন এবং সেই স্থানে রাজবল্লভী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য তিনি নির্দেশ দেন।

দ্বিতীয় কিম্বদন্তী এই যে, ভূরশুটের রাজা 'কমলদীঘি' নামক এক পুষ্করিণী খনন করান; তাহার তীরে অবস্থিত ফুলবাগানে মালিনী রাণীর আরাধ্যা গৌরী দেবীর জন্য প্রত্যহ ফুল তুলিত। একদিন ফুল তুলিবার সময় এক ব্রাহ্মণ কন্যা আসিয়া তাহার নিকট হইতে ফুল চায়। কিন্তু মালিনী গৌরী দেবীর পূজার ফুল দিলে রাণী অসন্তুষ্ট হইবেন বলায়, ব্রাহ্মণ কন্যা বলিলেন যে, তিনি গৌরীর বড় দিদি রাজবল্লভী, তাঁহাকে ফুল দিলে যদি রাণী রাগ করেন তাহা হইলে গৌরীকে সরাইয়া তিনি তাহার স্থানে অধিষ্ঠান করিবেন।

বালিকার কথা শুনিয়া মালিনী ভীত হইয়া চক্ষু বুজিলেন। চক্ষু খুলিয়া দেখেন যে, রাজবল্লভী দেবী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। দেবীর বর্ণ শরৎকালীন জ্যোৎস্নার ন্যায়, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একখানি ছুরিকা, এবং বামহস্তে রুধির পাত্র।

এদিকে রাজাও সেই দিন রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিলেন যে, দেবী রাজবল্লভী তাহাকে বলিতেছেন—তিনি রাজপুরে যাইতেছেন; সেখানে যেন তাঁহাকে ভালভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নগরের নাম রাজবল্লভীহাট রাখা হয়।

"নিশী পোহাইলে নাম রাখ নগরীর
দেবী রাজবল্লভী আর মহা হাট
এই যুগ্মনাম রাখ রাজবল্লভী হাট।"

রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় পরবর্তী কালে ষোড়শ শতাব্দীতে রাজবল্লভীর মন্দির নির্মাণ করাইয়া তথায় দেবীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ বৃহৎ মূর্তি সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। বিগ্রহের উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট; দেবীর বাম হস্তে রুধির পাত্র ও দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা। তাঁহার দক্ষিণ পদ মহাকাল ভৈরবের বক্ষে এবং বাম পদ বিরূপাক্ষ মহাদেবের মস্তকে রক্ষিত আছে। এইরূপ মূর্তি বঙ্গদেশে আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না।

এক বার দেবীর মূর্তি পুনর্গঠন করিতে হইয়াছিল, তখন কালীঘাট হইতে আদি-গঙ্গার মাটি, গঙ্গাজল এবং কুশ, কাপড় ও তার দিয়া উহা তৈয়ারী করা হইয়াছিল। মন্দিরের মধ্যে একখানি প্রস্তরে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে ঃ

"শ্রীশ্রীরাজবল্লভী মাতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা*
সন ১৩৪০, ১৬ আষাঢ়
স্বর্গীয় গৌরমোহন দত্তের পুত্র
শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্ত, সাং রাজবলহাট
(জেলা হুগলী)"

মন্দির-গাত্রে আর একখানি প্রস্তর ফলকে দেবীর বেদী শ্বেতপ্রস্তর দ্বারা "শ্রীযজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়— গোপীনাথপুর নিবাসী, ১২৭৫ সালে বাঁধাইয়া দিয়াছেন" বলিয়া লেখা আছে। এই কার্যের "উদ্যোগী সাহায্যকারক ছিলেন শ্রীরামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়"।

১৩৪০ সালের ১১ই আষাঢ়, শ্রীফকিরচন্দ্র, মন্মথনাথ ও জহরলাল ভড় মন্দির ভগ্ন হইয়া যাইলে বহু অর্থ ব্যয়ে উহার আমূল সংস্কার করিয়া দেন। ১৩৪৬ সালে তাঁহারা পুনরায় মন্দিরের সম্মুখের বিরাট নাটমন্দিরটি নির্মাণ এবং নহবতখানা, গড়, মায়ের পুকুরের ঘাট, মন্দির-সংলগ্ন চারিটি শিবমন্দির ও রন্ধনশালা সংস্কার করিয়া দেন। নাট-মন্দির ১৬ই আষাঢ় ১৩৪৭ সালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন।

দেবী রাজবল্লভী চণ্ডীরই রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। 'পীঠনির্ণয়' গ্রন্থে রাজবল-হাটকে শাক্তপীঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'চণ্ডী' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চণ্ডী প্রাচীনকালে অনার্য দেবী ছিলেন; পরে আর্য ও অনার্যের দীর্ঘ সংঘাতের ফলে তিনি লোকসমাজে পূজ্য হইয়াছেন।

মন্দিরের মধ্যে একটি বাসুদেব নারায়ণের প্রস্তরের মূর্তি রক্ষিত আছে: ইহার পার্শ্বে লক্ষ্মী ও বামে সরস্বতী। সম্ভবতঃ অন্য কোন স্থান হইতে এই মূর্তিটি সংগ্রহ

---

*শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্ত ১৩৪০ সালে "রাজবল্লভী মাতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা" বলিয়া যাহা প্রতরে লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক। বিগ্রহ যথাস্থানে আছে; সুতরাং "পুনঃ-প্রতিষ্ঠা" বলিতে কি বুঝায় তাহা জানিতে পারা যায় না।—লেখক

করিয়া এই স্থানে সংরক্ষণ করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর অষ্টমী পূজার পূর্বে সাতটি ছোট ছোট ডিঙা তৈয়ার করিয়া মায়ের দীঘিতে ছয়টি ডুবাইয়া দেওয়া হয় পরে পূজা আরম্ভ হয়। সুতরাং পূর্বোক্ত কিংবদন্তীটি অদ্যাপি পূজার অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহানবমীর দিন মহিষ বলিদান হয় এবং দেবীর বামদিকের দীপশিখা সেই দিন পূজার পর সোজা হইয়া যায়।

'রাজবল্লভী মাহাত্ম্য' নামক পুস্তকে দেবীর যে বর্ণনা আছে তাহা এইরূপ ঃ

"মন্দিরে শোভিছে মাতা শ্রীরাজবল্লভী
শরৎ জ্যোৎস্না প্রভা বিশালা ভৈরবী।
বিল্বমালা গলে, ছুরি ধৃত ডান হাতে
প্রসারিত বাম হস্তে পাত্র শোভে তাতে।
রণরঙ্গিণীর মূর্তি—ভীমা সুনয়না
বরাভয় প্রদায়িণী, প্রসন্ন আননা।
উজ্জ্বল মুকুট শিরে ত্রিলোক জননী।
শিববক্ষে শব শিরে চরণ ধারিণী।"

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার চণ্ডীকাব্যে রাজবল্লভী সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

রাজবোল বন্দি রাজবল্লভীর চরণ।
ইলিপুরে রঙ্গিণী বন্দো হয়ে একমন॥

রাজবলহাট পূর্বে যে বাণিজ্যপ্রধান নগর ছিল আজও ইহার কর্মমুখরতা দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। হুগলী জেলাব সহস্রাধিক গ্রাম পরিভ্রমণ কবিয়াছি, কিন্তু এইরূপ কর্মমুখর গ্রাম দুইটি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতে তাঁতশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এই সম্বন্ধে "Hand book of Hoogly District" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ

"Rajbalhat—A considerable village famous for handloom cloth on the left bank of the Damoder in thana Jangipara of the Serampur subdivision."

রাজবলহাটের মধ্যে এমন কোন গ্রাম্য পথ নাই, যেখানে তাঁত বুনিবার শব্দ শোনা যায় না। এখনও আদমসুমারির ১৯১২ সনের তালিকা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৫২২৫ জনের মধ্যে প্রায় বার শত তাঁতে চার হাজার লোক তাঁতের কাপড় বুনিয়া কালাতিপাত করে। এক কথায় রাজবলহাটকে কুটিরশিল্পের কেন্দ্রস্থান বলা যায়। কেহ কেহ ইহাকে 'দ্বিতীয় ম্যাঞ্চেস্টার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই স্থানের তাঁতীসম্প্রদায়ই যে কেবল তাঁত বুনিবার কার্য করে তাহা নয়, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণও এই স্থানে তাঁতের কাজকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁতবোনা শিক্ষার্থী গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাজবল্লভীর নিকট তাঁতবোনা শিক্ষার জন্য কাপড় মানত করে; তাই দেবী কাপড় উপহার পান সর্বাপেক্ষা বেশী।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে যখন বাংলাদেশে ব্যবসা করিতে সুরু করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের কাজের সুবিধার জন্য একজন করিয়া বড় দালাল রাখিতেন; তাহার তলায় আবার অনেকগুলি ছোট ছোট দালাল থকিত। এই দালালটি ইংরেজের হইয়া এদেশে বিলাতী মাল কাটাইত এবং এই দেশ হইতে স্থানীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশে পাঠাইবার জন্য সংগ্রহ করিয়া দিত। প্রাচীনকাল হইতে অসংখ্য তাঁতী রাজবলহাটে বাস করিত। তাহাদের প্রস্তুত সুন্দর সুন্দর কাপড় বুধবার ও রবিবারের হাটে কেনাবেচা হইত, অনেক কাপড় দেশান্তরে গমনাগমন করিত।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে দালালদের অত্যাচারের জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ দালালের সহায়তা না লইয়া তাহার স্থলে নিজেদের বেতনভোগী গোমস্তা রাখেন। এই সময় মহম্মদ রেজা খাঁ ইংরেজদের নায়েব দেওয়ান হইয়া রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা অত্যধিক বাড়িয়া গেল। কুশাসনের ফলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক ইহধাম পরিত্যাগ করিল। কোম্পানী রেজা খাঁকে তখন বরখাস্ত করিয়া হেস্টিংসকে বাংলার গভর্ণর করিয়া পাঠান।

হেস্টিংস আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। তিনি কোম্পানীর ব্যবসা চালু রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে 'কমার্সিয়াল রেসিডেন্সী' খুলিয়া দিলেন। সেই রেসিডেন্সীতে প্রধান হইয়া বসিতেন একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট। কমার্সিয়াল রেসিডেন্ট সম্বন্ধে ১২৭-১২৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লেখা হইয়াছে।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজবলহাটে একটি কমার্সিয়াল রেসিডেন্সী খোলা হয়। এখানে কাঁচামাল সংগ্রহান্তর নিজেদের কারখানায় চালানী বস্তু তৈয়ারী করিয়া কলিকাতায় পাঠানো হইত। এই স্থানে বহু তাঁতী ছিল বলিয়া ইংরেজ কোম্পানীর রাজবলহাটে আড়ং বা ফ্যাক্টরী ছিল। পূর্বে নীলের চাষের জন্যও এই স্থানটি বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। অদ্যাপি রাজবল্লভীর মন্দিরের নিকট নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রেসিডেন্সী খুলিবার পর হইতে ইংরেজ রেসিডেন্টই রাজবলহাটের সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন; তিনি এই স্থান হইতে কর্মী ও কারিগর সংগ্রহ করিয়া কাজ চালাইতেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়ায় গ্রামবাসীরা কোম্পানীর কলিকাতাস্থ কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করেন এবং ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তজ্জন্য রাজবলহাট হইতে রেসিডেন্সী হরিপাল উঠিয়া যায়। এই সম্বন্ধে শ্রীঅশোক মিত্র "হুগলীর" হ্যাণ্ডবুকে লিখেছেনঃ

"In the early British period it was a place of importance, being selected in 1786 for the seat of a Commercial Residency. The Residency was transferred to Haripal about 1790. Rajbaulhat appears in Rennell's Atlas as a police station and the Junction of several roads."

রাজবলহাটের সুবিন্যস্ত পথ-ঘাট, সুরম্য ভবন, সুন্দর পুষ্করিণী ও অসংখ্য দেবালয়ের মধ্যে গ্রামের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রাম সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে ঃ

"চার চক্, চৌদ্দ পাড়া, তিন ঘাট,
এই নিয়ে হয় রাজবলহাট।"

চার চক্ হইতেছে—দফর চক্, সুখর চক্, বৃন্দাবন চক্ আর বদুর চক্; চৌদ্দ পাড়া—নন্দী পাড়া, দে পাড়া, মনসাতলা, শীলবাটী, ভড়পাড়া, উত্তর পাড়া, দীঘির ঘাট, কুমোর পাড়া, বাড়ুয্যে পাড়া, দাস পাড়া, কুঁড় পাড়া, নস্কর ডাঙ্গা, সানা পাড়া, ও পান পাড়া; তিন ঘাট ঃ দীঘির ঘাট, মায়ের ঘাট ও বাবুর ঘাট।

রজবলহাটের মধ্যে শীলপাড়ায় শীলেদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধর দামোদর মন্দির ও রাধাকান্তজীউর মন্দির ভাস্কর্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। ইটের পোড়ামাটির কারুকার্যখচিত অসংখ্য দেবদেবীর চিত্র মন্দিরগাত্রে শোভা পাইতেছে। "শ্রীধর দামোদর মন্দির ১৬৪৬ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত" বলিয়া একটি ফলকে উৎকীর্ণ আছে। এই মন্দির লম্বোদর শীল প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীধর দামোদর মন্দিরের মধ্যে শ্রীধর ও দামোদরের শালগ্রাম শিলা আছে। এইগুলি সুন্দর একটি সিংহাসনের মধ্যে রক্ষিত। সিংহাসনের তলায় লিখিত আছেঃ

"৺গোবিন্দ শীল ঐ কন্যা
ক্ষিরোদমোহিণী দাসী"

রাধাকান্তজীউর মন্দির ১৬৬৬ শকাব্দে নির্মিত বলিয়া একটি প্রস্তরে লিখিত আছে। ইটের পোড়ামাটির কারুকলা মন্দিরগাত্রে সর্বত্র শোভা পাইতেছে। বাংলাদেশে দেবালয় স্থাপত্যের এই সকল চিত্রকলা এক অপূর্ব শিল্প-নিদর্শন। সম্প্রতি এই মন্দিরটির ফকিরচন্দ্র ভড় ও জহরলাল ভড় কর্তৃক সংস্কার করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় স্থানে, স্থানে চুণকাম করিবার সময় অনেক কারুকার্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে মন্দিরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। রাধাকান্তজীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে আরও অনেকগুলি দেবদেউল ছিল, কিন্তু বর্তমানে তাহা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। রাধাকান্তদেবের রথ এই অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। মাহেশ, গুপ্তিপাড়ার পরেই এই রথের স্থান। পূর্বে কাঠের রথ ছিল, বর্তমানে গ্রামবাসীদের চেষ্টায় বহু অর্থব্যয়ে একটি সুন্দর লোহার রথ নির্মিত হইয়াছে।

রাজবলহাটে দাতব্য চিকিৎসালয়, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস আছে। দাতব্য চিকিৎসালয় ভবন গোষ্ঠবিহারী দাস কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। পূর্বে এই স্থানে থানা ছিল বলিয়া রেনেলের মানচিত্রে উল্লেখ আছে। এই গ্রামে দৈনিক বাজার বসে এবং তাহাতে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বহু লোকের সমাগম হয়; এইরূপ বৃহৎ বাজার এতদ্অঞ্চলে খুব অল্প দেখা যায়।

রাজবলহাটে সর্বত্র দিবারাত্রি তাঁতবোনার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রামে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন এক বিরাট কাপড়ের কলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। এখানকার তাঁতশিল্পই তাঁহাদের সকলের সচ্ছল অবস্থা আনিয়া দিয়াছে। প্রতি মাসে গড়ে চার লক্ষ টাকার তাঁতের কাপড় এই ছোট গ্রামখানি হইতে কলিকাতা ও হাওড়ায় রপ্তানি হয়।

রাজবলহাটের প্রাণ ছিলেন স্বর্গীয় জহরলাল ভড়; যেমন সিঙ্গুরের ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। ইনি সামান্য অবস্থা হইতে ব্যবসা করিয়া যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, তেমনই গ্রামের কল্যাণের জন্য তাঁহার সদাসর্বদা চিন্তা; পথ-ঘাট নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন,

পুরাতন মন্দির সংস্কার, পোষ্ট-আপিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার, প্রত্নশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় লক্ষাধিক টাকার উপর তিনি ব্যয় করিয়াছেন। জহরলাল কলকাতায় বহু সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও কেন দেশে থাকেন জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি কেবল একটি উত্তর দেন, "রাজবল্লভীর মায়ায় কলিকাতায় থাকিতে পারি না।" শিক্ষিত বাঙালী গ্রামকে এইরূপ দরদ দিয়া কবে ভালবাসিতে শিখবেন? তিনি পুত্র দুলালচন্দ্রের নামে "দুলালের তাল মিছরি" প্রচলন করেন।

॥ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

রাজবলহাট কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মভূমি। তাঁহার জন্মস্থানে স্মৃতিরক্ষার্থে "হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার" ১৩৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজবলহাটের সংলগ্ন গুলিটা গ্রামে মাতুলালয়ে তিনি ৬ই বৈশাখ ১২৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহের নাম রাজচন্দ্র চক্রবর্তী। রাজচন্দ্রের একমাত্র কন্যা আনন্দময়ীর সহিত উত্তরপাড়ার কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। রাজচন্দ্রের অবস্থা ভাল ছিল, সুতরাং তিনি জামাতা কৈলাসচন্দ্রকে স্বগৃহে রাখিয়া পুত্রের আদরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

কৈলাসচন্দ্রের চারি পুত্র, হেমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র এবং দুই কন্যা বসন্তকালী ও নৃত্যকালী। হেমচন্দ্র সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। হেমচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। হেমচন্দ্রের শৈশব রাজবলহাটে অতিবাহিত হইয়াছিল; এই স্থানে পাঠশালায় নয় বৎসর পর্যন্ত পড়িয়া তিনি দাদামহাশয়ের খিদিরপুরের বাড়িতে চলিয়া আসেন এবং সেখানে শিক্ষালাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি মুন্সেফী ও হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন। হেমচন্দ্র বহু কবিতা-গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে চিন্তাতরঙ্গিণী, বীরবাহু কাব্য, পদ্মের মৃণাল, বৃত্রসংহার, কবিতাবলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা তিনি বিস্তর রচনা করেন। হেমচন্দ্র ১০ই জৈষ্ঠ ১৩১০ সালে দেহরক্ষা করেন। মন্মথনাথ ঘোষ রচিত "হেমচন্দ্র" পুস্তকে কবির বিস্তারিত জীবনী লিখিত আছে। গুলিটা গ্রামেব **শিবমন্দির** উল্লেখ্য।

হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র ১৫ই মার্চ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার চিত্তমুকুর, বাসন্তী, যোগেশ কাব্য ও চিন্তা নামক কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। ঈশানচন্দ্র প্রথমে হুগলী কালেক্টরীতে ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টে কর্ম করিতেন। তাঁহার উদ্যোগে ও উৎসাহে বাঁশবেড়িয়া হইতে ১৩০০ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'পূর্ণিমা' নামে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র প্রকাশিত হয। রাজবলহাটের এই কৃতী সন্তানের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইলে তাহা খুব আনন্দের বিষয় হইবে।

॥ অমূল্য প্রত্নশালা ॥

রাজবলহাটের 'অমূল্য প্রত্নশালা' ১৩৪৮ সালে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রত্নশালা দক্ষিণ রাঢ়ের ঐতিহাসিক প্রাচীন দ্রব্যাদি সংরক্ষণের একটি অমূল্য প্রতিষ্ঠান। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এই প্রত্নশালার সম্পাদক।
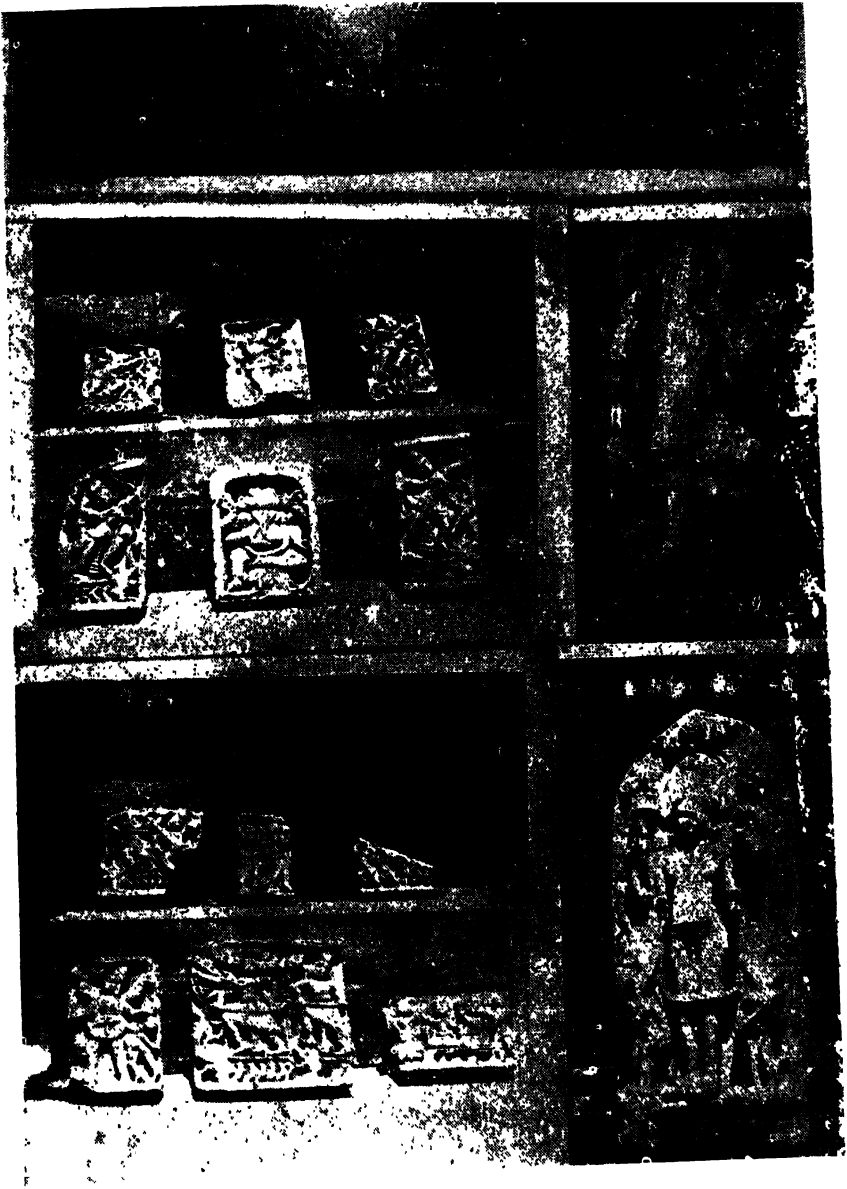
অমূল্য প্রত্নশালায় সংগৃহীত পুরাবস্তু—উপরে ঃ ভালির গ্রামে প্রাপ্ত ১৭শ শতাব্দীর প্রাচীন মন্দিরের কারুকার্যখচিত কাঠের দরজার ফ্রেম, মধ্যে ও নীচে—১৮শ শতাব্দীর হুগলী জেলার ইঁটশিল্পের নিদর্শন, মধ্যে দক্ষিণে—প্রাচীন মনসামূর্তি (পৃঃ ১৩১০), নীচে দক্ষিণে--সাটিথান গ্রামে প্রাপ্ত ১৬শ শতাব্দীর বিষ্ণুমূর্তি।

॥ ৫৭ ॥

কাশী-যোগাশ্রম।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর একখানি পত্র (পৃঃ ৯৪৭)

নিমাইতীর্থের ঘাটে আবিস্কৃত সূর্য-মূর্তি—বৈদ্যবাটী (পৃঃ ১২০৫)
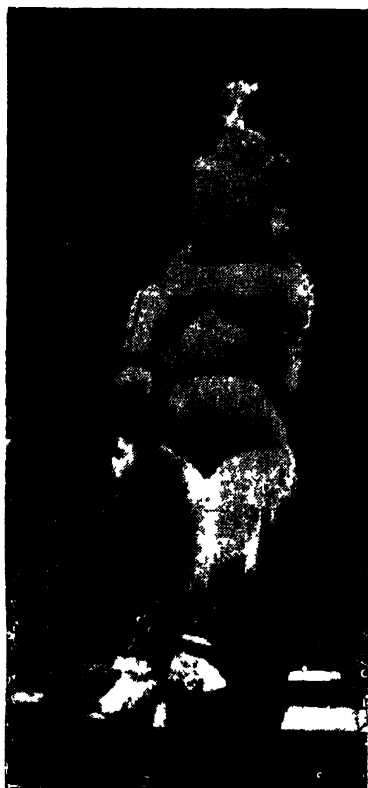
রায়বাঘিনী প্রতিষ্ঠিত কাঠের ভবানীমূর্তি (পৃঃ ১২৯১)

সংতগ্রাম হইতে প্রাপ্ত কারুকার্যখচিত ইষ্টক (পৃষ্ঠা ৭৪২)

১৮৫৪ সালের হাওড়া-হুগলী রেলের টাইমটেবিল

গৌরী সেনের শিবমন্দির (পৃষ্ঠা ৬৫৫)
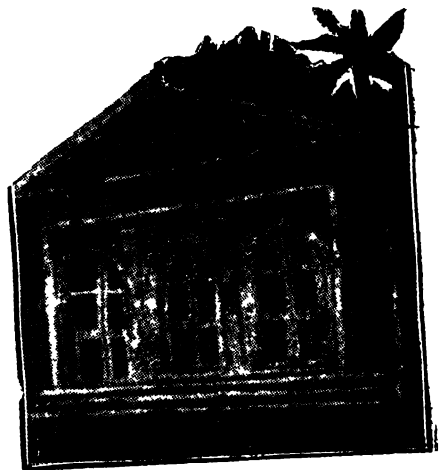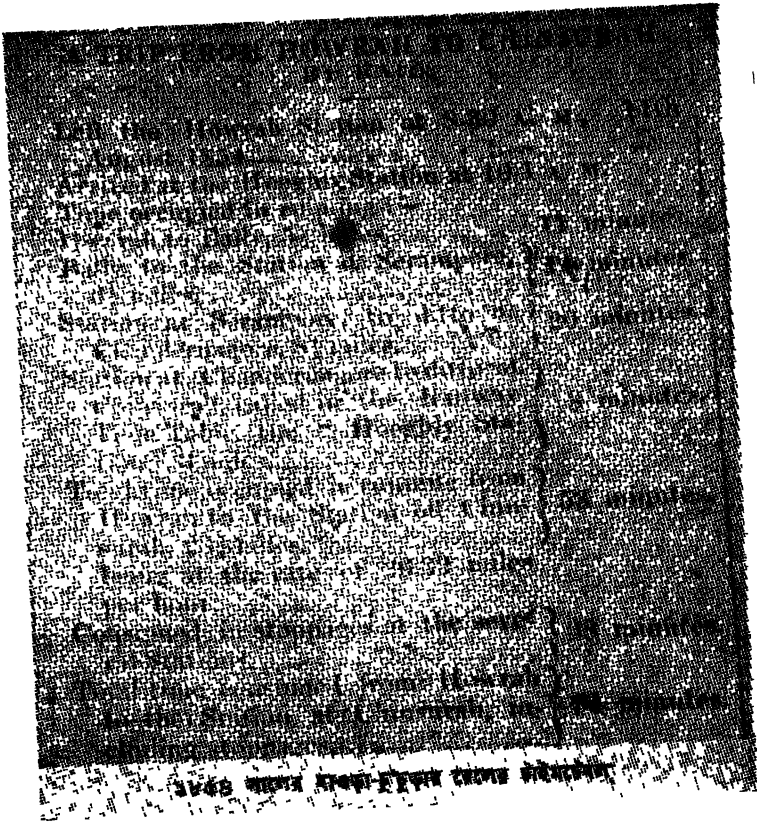
১৩৫৩ সালে শ্রীফকিরচন্দ্র ভড় ও শ্রীজহরলাল ভড় কর্তৃক নির্মিত নিজস্ব ভবনে অমূল্য প্রত্নশালা স্থানান্তরিত হয়। বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। এই ভবনে হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একখানি প্রস্তরফলকে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে ঃ

"হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও অমূল্য প্রত্নশালার জন্য
স্বর্গীয় ভূষণচন্দ্র ভড় ও তদীয় পত্নী যাদুবিন্দু দাসীর
স্মৃতিকল্পে তদীয় পুত্রগণ
শ্রীফকিরচন্দ্র ভড় শ্রীজহরলাল ভড়
কর্তৃক এই ভবন নির্মিত হইল
২১শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫৩ সাল

বিদ্যাভূষণ মহাশয় রাজবলহাটের সন্তান না হইলেও এই স্থানে হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনি যে সহযোগিতা করেন তাহা স্মরণ করিয়া গ্রামবাসিগণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অমূল্য প্রত্নশালার এই বৃহৎ ভবনটি নির্মাণকল্পে স্থানীয় দানবীর শ্রীজহরলাল ভড় মহাশয় ষাট হাজার টাকা দান করিয়া হুগলী জেলার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই প্রত্নশালা ভবনটির বাংলার জাগরী কবি হেমচন্দ্রের স্মৃতি, "হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার" ভবনটিও এক সংগে সংযুক্ত রহিয়াছে।

এই প্রত্নশালা রাঢ় বাংলার বিভিন্ন পল্লী হইতে বহু প্রাচীন ও অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদগুলি যথা পুঁথি, পুস্তক, মূর্তি, মুদ্রা, পট, কাঠশিল্পের নিদর্শন ইত্যাদি নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেছে। সংগৃহীত দ্রব্যগুলি সত্যই অপূর্ব। বাংলার বহু সুসন্তান এই প্রত্নশালাকে নানা পুরাবস্তু দান করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে চন্দননগরের শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয়, মহানাদ গ্রাম নিবাসী শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল। তাঁহার এই "পাল সংগ্রহ" সত্যই বাংলার গৌরবের বস্তু। এই পাল সংগ্রহে প্রায় ৩/৪ হাজার, যথা পাল, গুপ্ত, সেন ও মুসলমান যুগের নানা পুরাবস্তু রহিয়াছে। কলিকাতার শ্রীবিজয়সিং নাহার, পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে "নাহার সংগ্রহ" করিয়া দিয়া পল্লীবাসীর প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া "ললিত স্মৃতি" ইত্যাদি দু-একটি অপর স্মৃতিও বর্তমান রহিয়াছে। এই প্রত্নশালা রাঢ় বাংলার একটি প্রাচীন পুরা-গবেষক পল্লী-প্রতিষ্ঠান।

অমূল্য প্রত্নশালায় যে সকল পুরাবাস্তু সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ স্থাপক-সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৩৬১ সালের চৈত্র মাস ও ১৩৬৩ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে দিয়াছেন। উহা হইতে নিম্নে কয়েকটি পুরা দ্রব্যের কথা বিবৃত হইল।

১। প্রাচীন শোলার ছবি—প্রত্নশালায় সংগৃহীত একখানি প্রাচীন শোলার ছবি রহিয়াছে। শিল্পী, শোলাগুলিকে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া অতি মনোযোগ সহকারে এই ছবিখানি নির্মাণ করিয়াছেন। ছবিখানিতে একটি গৃহ, বাগান, গাছপালা ও গৃহের নিচে নদী ও নদীর উপর সেতু ইত্যাদির দৃশ্য, শিল্পী অতি অপূর্ব কৌশলে নির্মাণ করিয়াছেন।

ছবিখানিতে কোন রং না লাগাইয়া কেবল খণ্ড খণ্ড শোলাগুলিকে কাটিয়া ছবির উপরে যে ভাবে ধৈর্য্যসহকারে সংযোগ করিয়াছেন, তাহা সত্যই মনোমুগ্ধকর। শিল্পীর নাম অজ্ঞাত। শোলাগুলিও আমাদের দেশীয় শোলা নহে। বেলজিয়ম শোলা বলিয়া অনুমান হয়। যদিও শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় নাই, তথাপি তাঁর এই সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

২। প্রাচীন অভ্রের উপর অঙ্কিত ছবি—এই অভ্রের ছবিখানিও অতি প্রাচীন ও মূল্যবান। একখণ্ড শুভ্র অভ্রের উপর এই ছবিখানি তৈয়ারি করা হইয়াছে। ছবিখানিতে একটি বৃক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখীসহ ঝুলনযাত্রার দৃশ্য অঙ্কন করা হইয়াছে। ছবিখানির মাপ ১০×৭ ইঞ্চি। প্রাচীনতার দিক হইতে ছবিখানির মূল্য খুব বেশী, কারণ ইহার অঙ্কনপ্রণালী কাংড়া রীতির অঙ্কনের ন্যায়। এইরূপ অভ্রের উপর আঁকা ছবি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। শিল্পীর নাম অজ্ঞাত। এইরূপ মূল্যবান সংগ্রহ ছাড়াও প্রত্নশালার শিল্পবিভাগে, রাঢীয় সংস্কৃতি বজায় রখিবার মানসে, বহু 'রাঢ়ের পট' রাঢ়দেশীয় পটুয়ার দ্বারা অঙ্কন করাইয়া রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাঢ়ের অতীত গৌরব এই পটশিল্প' এবং 'পটুয়া' জাতি উভয়েই এখন রাঢ়দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করা বাংলার প্রধান কর্ম। অভ্রের ছবিখানি ১৫শ শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়।

৩। ব্রহ্ম ও চীন দেশীয় শিল্পসংগ্রহ—আমরা বহু পরিশ্রম করিয়া এই চীনদেশীয় শিল্পসম্ভারগুলি সংগ্রহ করিয়া, পল্লীবাসীর অজ্ঞতা দূরীকরণের নিমিত্ত প্রত্নশালায় সংগ্রহ করিয়াছি। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পারেখ তাঁহার চীন পরিভ্রমণকালে উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই শিল্প সম্ভারগুলির মধ্যে হাতে-বোনা রেশমের একখানি সুন্দর ছবি রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, চীনদেশের বারখানি বিভিন্ন স্থানের দৃশ্যের সুদৃশ্য কার্ড রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত পারেখ প্রথম দফায় উপরোক্ত দ্রব্যগুলি এবং দ্বিতীয় দফায় তিনি অতি সুন্দর দুইটি কাচের পাখি ও হাঁস দান করিয়া এই পল্লী প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। এ ছাড়া অধ্যাপক শ্রী পি, সি, চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে এই প্রত্নশালা ব্রহ্মদেশীয় একসেট বিভিন্ন শিল্পসংগ্রহ, একটি সুন্দর শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্তিসহ প্রায় তিরিশ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি দান পাইয়াছে।

৪। রাঢ়ের যুদ্ধাস্ত্র ও ঢাল—নিষ্ঠুর কালের গতিতে, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে আমাদের রাঢ় অঞ্চলে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ, তাহাদের ব্যবহৃত বহু যুদ্ধাস্ত্র এখনও রাঢ়দেশের সর্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে। এমনকি প্রত্নপ্রস্তর যুগের, পাথরের বহু যুদ্ধাস্ত্রসমূহ কিছু কিছু রাঢ়দেশ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আজকালের বৈজ্ঞানিক যুগে যদিও ঐ সকল যুদ্ধাস্ত্রের প্রচলন বা ব্যবহার লোপ পাইয়াছে, তথাপি ঐ প্রকার অস্ত্রসমূহের গঠনপ্রণালী ও তাহার ব্যবহার দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তখনকার দিনেও অর্থাৎ দুই শত হইতে তিন শত বৎসর পূর্বেও এই ঢাল ও তলোয়ারই ছিল নৃপতিদিগের যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র। দেশের স্বাধীন নৃপতিগণ সর্বপ্রথমে নিজেদের আত্মরক্ষার্থে, নিজেরাই কারিগর বা শিল্পী নিয়োগ করিয়া, নিজ তত্ত্বাবধানে এই সকল অস্ত্রশিল্পের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। আমি অন্যান্য অস্ত্রের কথা এখানে

আলোচনা না করিয়া, কেবলমাত্র একটি সামান্য 'ঢাল' অস্ত্রের কথাই আপনাদের বলিব। কারণ এই 'ঢাল' শিল্প 'রাঢ়দেশ' হইতে এখন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র এখন ভারতের দু' একটি স্থানে সখের শিল্প হিসাবে জীবিত রহিয়াছে। গোয়ালিয়র, হায়দরাবাদ, রাজস্থান এবং পুণায় কিছু কিছু এই 'ঢাল-শিল্প' তৈরি হইতে দেখা যায়। তৈয়ারি এবং ব্যবহারের অনুপাতে এই শিল্প এখন মৃত প্রায়। এখন যেসব ঢাল তৈয়ারি হয় তাহা পূর্বের ন্যায় ভাল এবং মজবুত হয় না। পূর্বে এই শিল্প ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রের নৃপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হইয়া ইহা তখন প্রধান শিল্পহিসাবে বহু লোকের অন্নসংস্থান করিত।

আমরা ঐরূপ ১৫শ শতাব্দীর প্রাচীন দু' একটি ঢাল এবং তলোয়ার প্রত্নশালায় সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পূর্বে আমাদের রাঢ়দেশের বিভিন্ন যথা ঃ হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের শিল্পীগণ ঢাল তৈয়ারী করিতে জানিত। তাহার প্রমাণস্বরূপ আজও রাঢ়ের বহু উচ্চ বংশসম্ভূত জমিদার এবং প্রাচীন নৃপতিগণের বংশধর-গণের গৃহে খোঁজ করিলে এখনও কিছু কিছু ঢাল পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় শিল্পিগণ প্রথমে গণ্ডারের পেটের এবং পিঠের মোটা চামড়া মাপ দিয়া গোল করিয়া কাটিয়া লইত। পরে ঢাল তৈয়ারির জন্য ভারী পাথরের চাপ দিয়া চামড়াগুলিকে ঠিক লক্ষ্মীর সরার ন্যায় বাঁকাইয়া লইত। পরে চামড়াগুলিকে শুকাইয়া, কাল রং বা ভূসা এবং কয়েকটি দ্রব্যের সংমিশ্রণে এক প্রকার প্রলেপ তৈয়ারি করিয়া ঢালটির উপর এবং নিচে লাগাইয়া শুকাইতে দিত। এইরূপ তিন-চারি বার প্রলেপ লাগাইয়া শুকোইবার পর পালিশ করিয়া উজ্জ্বল করিয়া লইত। এই পালিশ এত সুন্দর হইত যে, পালিশের উজ্জ্বলতার বর্ণে লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া যাইত এবং লোহার ঢাল বলিয়া ভ্রমে পতিত হইত। পরে ঢালটির মাঝখানে চারিটি ছিদ্র করিয়া ধরিবার জন্য লোহার কড়া লাগাইয়া দিত। কোন কোন ঢালে লোহার কড়ার সহিত লোহার শিকল ব্যবহার করা হইত। নির্দিষ্ট মাপের কোন ঢাল তৈয়ারি হইত না। শিল্পী-গণ নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী ছোট বড় বিভিন্ন আকারের ঢাল তৈয়ারি করিয়া রাজদরবারে উপঢৌকন পাঠাইত। পরে নৃপতিগণ তাহাকে গুণানুপাতে পুরস্কৃত করিয়া দেশে শিল্পের প্রসার করিতেন এবং শিল্পও পরিপুষ্টি লাভ করিত।

পরবর্তী মুসলমান যুগেও ঐরূপ চামড়ার এবং বেতের উপর নির্মিত ঢালের প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়। এখন আর কোনরূপ ঢাল দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্নশালায় ঐরূপ চামড়া এবং বেতের দুই প্রকার ঢাল সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেছি। এই মূল্যবান ঐতিহাসিক সম্পদগুলি হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-কুমার চোংদার মহাশয়, তাঁহার পিতার স্মরণার্থে 'ললিত স্মৃতি' হিসাবে প্রত্নশালাকে দান করিয়া হুগলী জেলার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি প্রত্নশালার একজন পরম হিতৈষী-বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক।

প্রাচীন বাংলা অক্ষরের শিলালিপি—উপরোক্ত শিলালেখটি ১৪৫ বৎসরের প্রাচীন তাহা সন ও তারিখ দেখিলেই জানা যায়। ১২১৭ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ। উক্ত 'দাতারাম দাস দত্ত মহাশয় তাঁহার নিজ কুলদেবতার নাম শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর মহাদেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

উক্ত শ্রীচন্দ্রশেখর মহাদেবের মন্দির এখনও হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে বর্তমান থাকিয়া অতীতকালের সাক্ষ্য দিতেছে। যদিও লেখাটি প্রাচীন তাহা হইলেও শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ কম ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ শিলালিপির ধারের লাইনগুলি সোজা করিয়া কাটিতে পারেন নাই। ভাষা এবং অক্ষরের সমতাও রক্ষা করা হয় না। শিলালিপির অক্ষরগুলি প্রাচীন বাংলা অক্ষরের দলীলের লেখার ন্যায়। পাথরের রং কাল। মাপ ৮″×৬″। কাল শ্লেট পাথর বলিয়া অনুমান হয়।

সাদা পাথরের ছোট লিঙ্গেশ্বরী মূর্তি—প্রত্নশালায় আর একটি সাদা বালী পাথরের ছোট মূর্তি সংগৃহীত হইয়াছে। আমি এই মূর্তিটি 'লিঙ্গেশ্বর' বা এক লিঙ্গেশ্বরী মূর্তি বলিয়া অনুমান করিতেছি। কারণ 'লিঙ্গসারী' তন্ত্রে 'শিবপার্বতী' সংবাদে এইরূপ শিব ও শক্তির একত্রে সম্মিলিত রূপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় যথাঃ

১। আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত লিঙ্গরূপী হ্যহং প্রিয়ে।
২। ইতি তে কথিতং দেবী মম নাম--শতোত্তমম॥
৩। . অহঞ্চ জগদাধারো মমাধারস্তমেবো হি।
৪। তৎসমা প্রকৃতিনাস্তি মৎসমো নাস্তি পুরুষঃ
৫। তব যোনিং সমাসাদ্য সর্বমেব কবোম্যহম।

এইবার দেখুন এই পাষাণ মূর্তিটিতে শিবলিঙ্গের সঙ্গে শক্তিরূপী যোনীর একত্রে সংযোগ রহিয়াছে। নিম্নদিকের লিঙ্গেব সহিত উপরে শক্তিরূপী যোনীর বেষ্টনীর বন্ধন রহিয়াছে। মূর্তিটি ছোট এবং সাদা বালী পাথরের। মাপ ৬×৩ ইঞ্চ মাত্র। লিঙ্গরূপ শিব এবং যোনীরূপ শক্তির রূপ ছাড়া মূর্তিটিতে অন্য কিছু খোদাই করা হয় নাই। মূর্তিটি ১৬শ শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়।

প্রাচীন কাঠের মনসামূর্তি—এই বৃহৎ কাঠের মনসামূর্তিটি কিছুদিন হইল হুগলী জেলার কোন এক গণ্ড গ্রাম হইতে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়ার সময় সংগৃহীত হইয়া এই প্রত্নশালায় সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। যদিও মূর্তিটির অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি, এখনও যাহা বর্তমান রহিয়াছে তাহাই উপলব্ধির বস্তু। মূর্তিটি একখানি মনসা কাঠের গুড়ি হইতে খোদাই করিয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে। ইহা রাঢ় বাংলার প্রাচীন কাষ্ঠশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। মনসা কাঠ সাধারণতঃ খুব নরম এবং হাল্কা। মূর্তিটি উচ্চতায় আড়াই হাত। মূর্তিটির গঠনে, শিল্পী তাঁহার একাগ্রতা এবং ভাবতন্ময়তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কারণ, মূর্তিটির গঠন, হাত, পা, হাতের আঙ্গুল, সাপ দুটি এবং গহনাগুলির কারুকার্য অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম। মূর্তিটির হাতের আঙ্গুলগুলির ও সাপ দুইটির ফণা দেখিলে শিল্পীরী সৃজনী শক্তির কলাকৌশলতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। শিল্পীর নাম অজ্ঞাত। এইরূপ কাষ্ঠশিল্পও রাঢ়দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। মূর্তিটির আলোকচিত্র গ্রন্থে প্রদত্ত হইল।

সংগৃহীত প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা—প্রত্নশালায় যে সকল প্রাচীন মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারও কিছু কিছু বিববণ আপনাদের দিব। সংগৃহীত মুদ্রার সংখ্যা সর্বসমেত প্রায়

পাঁচ শতাধিক হইবে। তন্মধ্যে যে কয়টি ভারতীয় মুদ্রার প্রাচীনতা হিসাবে মূল্য খুব বেশী, এখানে কেবলমাত্র সেই কয়টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।*

ছবির প্রথম লাইনের ১, ২ নং দ্বিতীয় লাইনের অর্থাৎ ৫নং, এই তিনটি মুদ্রা সম্রাট সাজাহানের রৌপ্যমুদ্রা। মুদ্রা তিনটির আকার এবং ওজন এক নহে।

ওজন এক ভরী হইতে সওয়া ভরী। মুদ্রার উপরের লেখাগুলিও বিভিন্ন প্রকারের তবে ১, ২ এবং ৫নং মুদ্রায় সম্রাটের নাম সন (হিজীরা) ও তারিখ খোদাই করা রহিয়াছে। ৬নং মুদ্রাটিও সম্রাট সাজাহানের বলিয়াই মনে হয়। কারণ মুদ্রাটির উপর সাঙ্কেতিক চিহ্ন সম্রাট সাজাহানেরই রহিয়াছে। মুদ্রার উপর এবং পার্শ্বে নানারূপ ছিদ্র করিয়া তখনকার দিনে, নবাবী আমলে সম্রাটগণের নিজ নিজ সাঙ্কেতিক চিহ্ন করিয়া দিতেন। ৭নং মুদ্রাটিও খুব প্রাচীন। তবে সম্রাটের নাম, মুদ্রা তৈয়ারিকালে কাটিয়া গিয়াছে, তাই পাঠ করিবার উপায় নাই। ৪নং মুদ্রাটিতে আমাদের বাংলা অক্ষরের এইরূপ লেখা আছে ঃ

(ক) ৪...শ্রীশ্রীহরগৌরী চরণারবিন্দ মকরন্দ মধুকরস্য

(খ) ৪ (অপর পৃষ্ঠায়)...শ্রীশ্রীস্বাঙ্গদেব শ্রীলক্ষ্মীসিংহ নৃপস্য শাক ১৬৯৮...।

এখন শকের সহিত ৭৮ বৎসর যোগ করিলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। তাহা হইলে ১৬৯৮+৭৮ বৎসর=১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইল। তাহা হইলে ১৯৫৬—১৭৭৬=১৮০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা গেল। এখন দেখা যাক...শ্রীলক্ষ্মী সিংহ নামীয় কোন বাঙালী নৃপতি রাজত্ব করিতেন কিনা। আমি নিজে অবশ্য মুদ্রা গবেষক নই। তবে অনুমান হয় যে, আসাম অথবা ত্রিপুরায় ঐরূপ কোন হিন্দু নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীহরগৌরীর নাম মুদ্রার একপৃষ্ঠায় খোদাই করিয়া নৃপতি নিজ রাজকীর্তি ঘোষণা করিয়াছেন। অপর পৃষ্ঠায় নৃপতির নাম...শ্রীলক্ষ্মী সিংহ, সন (শক) এবং তারিখ খোদাই করিয়া মুদ্রাটির প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নামের পূর্বেও শ্রীশ্রীস্বাঙ্গদেব নামটি কাহার? এখানেও ঐরূপ কুলদেবতার নাম খোদাই করিয়াছেন। কারণ, দেবতাগণের নামের পূর্বে শ্রীশ্রী থাকার ফলে দেবতার নাম এবং শ্রী স্থলে নিজ নাম অনুমান হইতেছে। মুদ্রাটি খাঁটি রৌপ্যের দ্বারা নির্মিত। এরূপ অষ্টকোণবিশিষ্ট রৌপ্য মুদ্রা বড় একটা দেখা যায় না। মুদ্রাটি ক্ষুদ্রাকৃতি। ওজন এক ভরি। এখন ৮নং মুদ্রাটি দেখুন। উহা সামন্তদেবের সময়ের মুদ্রা। মুদ্রার উপরে 'শ্রীসমন্ত' লেখাটির ছাপ কেবলমাত্র উঠিয়াছে। 'সমন্ত' লেখার পূর্বে 'শ্রী' কথাটির মাত্র (ী) দীর্ঘইর দাঁড়ী মাত্র ছাপ উঠিয়াছে। 'সমন্ত' কথাটি কেবলমাত্র ভালভাবে পড়িতে পারা যায়। "সমন্ত" লেখার নীচে একটি ষাঁড় অংকিত রহিয়াছে। ষাঁড়টির মুখের, গলার নীচের দিকে এবং সামনের পায়ের কিছু কিছু অংশ ছাপ দিবার সময় কাটা পড়িয়া বাদ হইয়া গিয়াছে। পিছনের দিকে কেবলমাত্র কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের ছাপ অংকিত রহিয়াছে। মুদ্রাটি ক্ষুদ্রাকৃতি, ওজন

---

*মুদ্রা সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ ৫৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাঁচ আনা। ৯নং মুদ্রাটি "গধিয়া" মুদ্রা বলিয়া পরিচিত। ৮নং এবং ১০নং মুদ্রাগুলি খুব মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য। ঐগুলিকে "পাঞ্চমার্ক" বা কার্ষাপণ মুদ্রা বলা হয়। ঐগুলি নানা আকারের এবং বিভিন্ন ওজনের প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রাগুলি নাকি আমাদের প্রথম প্রচলিত মুদ্রা। এই মুদ্রা সকলের পরিবর্তে রাজসরকারগণ তখন দেশে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সংগ্রহ করিতেন। রাজসরকারগণ এই মুদ্রা তৈয়ারী করার জন্য প্রথমে অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা রৌপ্যের পাতকে, বিভিন্ন প্রকারের ছাপ দিয়া দিতেন। পরে ঐগুলি সমতা এবং অংশ বজায় না রাখিয়া কাটিয়া প্রচলন করিতেন। ফলে কাটিবার সময় ঐ ছাপেরও কিছু কিছু অংশ বাদ পড়িয়া যাইত। ঐ মুদ্রাগুলির উভয় পৃষ্ঠে নানা রকমের ছাপ দেখা যায়, যথাঃ--পর্বত, সূর্য, চন্দ্র, ফুল, বলদ (ষাঁড়), গৃহ ইত্যাদি। মুদ্রাগুলি খাঁটি রৌপ্যের, ওজন তিন আনা হইতে চারি আনা। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন মার্সাল, স্যার জন কানিংহাম, সি, জে, ব্রাউন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল মজুমদার ইত্যাদি মনীষীবৃন্দ এই মুদ্রা সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতীয় মুদ্রার প্রকৃত জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন।

১১নং প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রাটি ভারতের গ্রীক মুদ্রা। এই দুইটি প্রত্নশালার খুব মূল্যবান সংগ্রহ। ভারতের গ্রীক অভিযানের ফলে এই মুদ্রাগুলির প্রচলন হইয়াছিল। ইহাকে 'মিনান্দার' বলা হয়। মুদ্রাগুলির উপরে রাজার নাম ও রাজার মস্তকদেশের ছাপ দেখা যায়। রাজার মাথার উপরে গ্রীক্ ভাষায় তাঁহার নাম খোদাই করা হইয়াছে এবং পর পৃষ্ঠায় অর্থাৎ (১১ খ) একটি নারী মূর্তি এবং গ্রীক্ ভাষায় কিছু লেখা খোদাই করা হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলির ওজন আট হইতে দশ আনা।

পাল সংগ্রহে নূতন অবদানঃ—হুগলী জেলার মহানাদ গ্রাম নিবাসী শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার 'পাল সংগ্রহে' এই বৎসর বহুবিধ পুরাদ্রব্য দান করিয়া এই সংগ্রহটির উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি এই বৎসর বহু গুপ্ত, পাল, সেন এবং মুসলমান যুগের পুরাদ্রব্য দান করিয়া এই পল্লী-প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত পুরাবস্তুগুলির মধ্যে কতকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। পাল যুগের মৃৎশিল্পের ভগ্ন নারীর অংশগুলি, শ্রীকৃষ্ণের মস্তক, চূড়া, শরীরের অংশগুলি বর্তমান রহিয়াছে। এইগুলি 'পাল যুগে'র মৃৎশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। মূর্তিগুলি দেখিলে বেশ ভালভাবে মৃৎশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, 'পালযুগের' কাল পাথরের বিষ্ণুমূর্তির মস্তকদেশ, বাহুদ্বয় ইত্যাদিও মূল্যবান সম্পদ।

প্রাচীন বৌদ্ধযুগের দুইটি নিদর্শনঃ—প্রত্নশালায় বৌদ্ধযুগের পাথরের দুইটি মূর্তি সংগৃহীত হইয়াছে। একটি পাথরের ছোট বৌদ্ধ বিহার (চৈৎ বা স্তূপ)। তাহার মধ্যে বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ হইয়া রহিয়াছেন। বিহারটি সাদা বেলে পাথরের। মাপ ৬৷৷×৫ ইঞ্চি; অপরটি ঐ সাদা পাথরের চতুষ্কোণ খণ্ডের মধ্যে বড় হইতে ছোট দ্বাদশটি বুদ্ধের মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। মূর্তিগুলি দর্শনীয় বস্তু। মাপ ৫×৭ ইঞ্চি। এগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্নশালায় সংগৃহীত হইয়াছে।

যে পণ্ডিতের স্মৃতিরক্ষার্থে অমূল্য গ্রন্থশালা প্রতিষ্ঠিত তাঁহার বিষয় জীবনী অভিধান হইতে নিম্নে উল্লিখিত হইলঃ

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—জন্ম ঃ ১৮৭৭ খৃঃ মৃত্যু ঃ ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪০ খৃঃ। এ'র পিতার নাম উদয়নাথ ঘোষমজুমদার।

ইনি বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ছিলেন। কাশীতে সংস্কৃত পাঠ করার পর ইনি দেশী-বিদেশী মোট প্রায়বিশটি ভাষা আয়ত্ব করেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় চিঠিপত্র অনুবাদের জন্যে ইনি ১৮৯৭ সালে 'Translating Bureau' প্রতিষ্ঠা করেন। এর চার বছর পরে বিভিন্ন ভাষা শেখাবার জন্যে ইনি 'Edward Institution' নামে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সালে ইনি বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন।

'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার ইনিই প্রথম সম্পাদক (১৩১৯ সন)। 'বাণী' এবং 'Indian Academy' নামে পত্রিকাদ্বয়ও এ'র সম্পাদনায় কিছুকাল প্রকাশিত হয়েছিল। 'পঞ্চপুষ্প' নামে আরেকটি মাসিক পত্রিকা ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার মুখপত্র 'কায়স্থ পত্রিকা' ইনি কিছুকাল সম্পাদনা করেন। ইনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ও সদস্য ছিলেন।

'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস', 'জৈন জাতক' প্রভৃতি বই ইনি লিখেছেন। 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামে বৃহৎ অভিধানখানির সংকলনের কাজ অসমাপ্ত রেখে ইনি পরলোকগমন করেন।

ফুরফুরা শরীফ॥ ফুরফুরা-শরীফ হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান; পূর্বে ইহা 'বালিয়া বাসন্তী' বলিয়া পরিচিত এক বাগ্দী রাজার রাজধানী ছিল। ৭৯৬ হিজরীতে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণকে দমন করিয়া তাঁহাদের রাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যুদ্ধ করেন। সেই সময় সুলতানের আদেশে হজরত শাহ সুফি, বালিয়া-বাসন্তী আক্রমণ করিয়া বাগ্দী রাজাকে পরাজিত করেন এবং এই স্থানে মুসলীম গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা 'ফুরফুরা-শরীফ', নামে অভিহিত হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের হিসাব মত ফুরফুরার জনসংখ্যা ২,৫৮৮ জন।

ফুরফুরা বঙ্গের মুসলমানদিগের একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান; এক সময় প্রধান পীর মৌলানা আবু বক্কার সাহেবের ধর্মনিষ্ঠা এবং পবিত্র চরিত্রের জন্য প্রায় পাঁচলক্ষ মুসলমান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ইনি স্বয়ং সাম্প্রদায়িকতা পছন্দ করেন না বলিয়া ইহার শিষ্যবর্গও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে আছেন বলিয়া প্রকাশ আছে। এই স্থানের পীরবংশ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বাগদাদ হইতে দিল্লীতে সর্বপ্রথম আগমন করেন এবং সম্রাট তাহাদের ধর্মপ্রবণতা দেখিয়া তাহাদিগকে নিষ্কর জায়গীর আয়মা প্রদান করিয়া ফুরফুরায় প্রেরণ করেন। সেই সময় প্রায় সাতশত ঘর মুসলমান এই স্থানে বসবাস করেন এবং মুসলমান রাজত্বকালে তাঁহাদের প্রত্যেকেই প্রায় বিচারকের (কাজীর) কার্য করিতেন।

ফুরফুরা পীরবংশে বহু ভগবদ্ভক্ত ফকীর ও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করায় এই স্থান বঙ্গের মুসলমানদিগের নিকট তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানে হজরত মৌলানা জোবের শাহ নামক এক যোগসিদ্ধ ফকীর বাস করিতেন। কিংবদন্তী

এইরূপ যে, লর্ড ক্লাইভ ইহার নিকট হইতে পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলে, তিনি 'জয়ী হও' বলিয়া আশীর্বাদ করেন। তিনি ইংরাজদিগকে আশীর্বাদ করায় তাঁহার এক শিষ্য ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে তিনি বলেন যে, ধ্যানে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে ঈশ্বরের লোক বিজয় পতাকা লইয়া ইহাদের অগ্রে যাইতেছে সুতরাং তিনি আশীর্বাদ না করিলেও তাহাদের জয় কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের 'হুগলী ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকে' ফুরফুরা শরীফ সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ

A considerable centre of Musalmans, it is inhabited by many respectable *aimadars* or rent free tenure-holders known as *Ashrafs*. A place of pilgrimage for Mussalmans.

ফুরফুরায় একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। ইহা মুকলিস খাঁন কর্তৃক ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয় বলিয়া একটি প্রস্তরে লেখা আছে। ইহা ছাড়া হজরৎ মহম্মদ কবীর সাহেব যিনি জনসমাজে শাহ আনওয়ার কুলি বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহারও কবর এইস্থানে আছে। তাঁহার সমাধির নিকট দুইটি প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি উক্ত স্থানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাড়ি কামাইতেন। শিয়াখালা ষ্টেশন হইতে ফুরফুরার দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। হুগলী হ্যান্ডবুকে শ্রীঅশোক মিত্র লিখিয়াছেনঃ

The actual place of the shrines is called Mohra Simla. The tomb of Hazrat Muhammad Kabir Saheb generally called Shah Anwar kult of Aleppo. Two stones near the tomb are pointed out as those on which the saint used to kneel at the time of shaving.

এই বংশে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তন্মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার কিউ, এ, রহমান, রেজিষ্ট্রার অফ এসিওরেন্স মহম্মদুর রহমান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ফুরফুরায় সাবসিডিয়ারি হেলথ সেণ্টার আছে।

জাঙ্গীপাড়ার নিকটবর্তী বোড়াল গ্রামের বিশ্বাস বংশে প্রসিদ্ধ আইনজীবী আশুতোষ **বিশ্বাস** জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত "বেঙ্গলী" পত্র সম্পাদনা করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলায় সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করিবার জন্য নিয়োজিত হন বলিয়া ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আলিপুর কোর্টের মধ্যে চারুচন্দ্র বসু রিভলভারের গুলিদ্বারা তাঁহাকে নিহত করেন। তাঁহার নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা আছে। তাঁহার পুত্র **চারুচন্দ্র বিশ্বাস** কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও পরে ভারত সরকারের আইনমন্ত্রী হিসাবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন।

জাঙ্গীপাড়া থানার মধ্যে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মন্দিরের বিবরণ দেওয়া হইল। সীতাপুর স্টেশনের নিকট **কোটালপুর** গ্রামের **রাজরাজেশ্বরী মন্দির** অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। মন্দিরগাত্রে সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির (টেরাকাটা) চিত্র আছে।

প্রসাদপুর স্টেশনের পূর্ব দিকে **গোবিন্দপুর** গ্রামের **শ্রীধরজীউর মন্দির** ১৬৪৯ শকে নির্মিত হয়। মন্দিরে শ্রীধর, লক্ষ্মী ও চণ্ডীর বিগ্রহ আছে। মন্দিরগাত্রে যে সকল

টেরাকোটা আছে তাহার অনেক চিত্র ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মন্দির সংস্কারের সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহগুলি প্রত্যহ পূজিত হন। **স্টেশনের দুই মাইল পশ্চিম** দিকে **হরিরামপুর** গ্রামের **জোড়া শিবমন্দির** ১৬৬০ শকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লেখা আছে। মন্দির দুইটি আকারে ছোট হইলেও ইহাদের গাত্রে ইংরাজ সওদাগরের জাহাজ, বন্দুক হস্তে কয়েকজন সৈন্য প্রভৃতি চিত্রগুলি এখনও বিনষ্ট হয় নাই। দুইটি মন্দিরেই শিবলিঙ্গ আছে এবং নিত্য পূজা হয়। একটি মন্দিরের উপর বটগাছ হওয়ায় উহা শীঘ্রই পড়িয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হয়। মন্দিরটি সংরক্ষণ করা কর্তব্য।

বাহিরগড় স্টেশনের আধ মাইল দূরে **কৃষ্ণনগরের শিবমন্দিরের** গায়ে পোড়ামাটির চিত্রগুলি মনোহারিত্বে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই মন্দির ১৬৬৫ শকে নির্মিত হয় এবং ইহার বর্তমান সেবায়েত হইতেছেন শ্রীপুলিনবিহারী তা। মন্দিরের খিলানের উপর দেবীযুদ্ধ, লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং রাজার ঘোড়ার যে চিত্র আছে তাহার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য দর্শককে মুগ্ধ করে। সমস্ত প্যানেলগুলি অক্ষত অবস্থায় আছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের "হুগলী ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকে এই মন্দিরের কথা লেখা আছে।

This is a very good example of a typical Hoogly temple of its kind (e.g. as at Kotalpur, Rajbalhat, Krishnapur). The facade is richly decorated with terracottas mostly in excellent condition the three great battle scenes above the arches are particularly good; at the bottom vultures peck at the bodies of the dead.

॥ আঁটপুর ॥
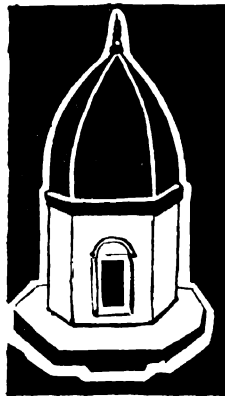
আঁটপুর হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। হাওড়া ময়দান হইতে মার্টিন কোম্পানীর রেলে আঁটপুর নামক একটি স্টেশন আছে। ইহা কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই স্থান ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাঁতের কাপড়ের জন্য ইহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। পূর্বে এই স্থানের নাম 'বিষখালি' ছিল, পরে এই অঞ্চলে ভূরিশ্রেষ্ট রাজার অষ্ট সেনাপতি বসবাস করিতেন বলিয়া ইহা আঁটপুর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। যে আটটি গ্রাম লইয়া আঁটপুর গঠিত হইয়াছিল. সেই আটটি গ্রাম আজও বিদ্যমান আছে। সেই গ্রামগুলির নাম ১। তড়া, ২। বোমনগর, ৩। কোমর বাজার, ৪। ধরমপুর. ৫। অনারবাটি, ৬। রানীর বাজার, ৭। বিলাড়া. ৮। লোহাগাছি।

আঁটপুর নামকরণ সম্বন্ধে আর একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মুসলমান রাজত্ব-কালে এই স্থানে আঁনোর খাঁ ও আঁটোর খাঁ নামে দুইজন প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার বাস করিতেন, তাঁহাদের নামানুসারে আনোরবাটি ও আঁটপুর নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু এই স্থানে কোন মুসলমানের বাস নাই। আঁটপুরের ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির হিসাব-মত জনসংখ্যা ১,৫২০ জন।

এই সকল স্থানে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'ফার্স্ট বুক' প্রণেতা প্যারীচরণ সরকার, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম ঘোষ), হুগলীর দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু, পরমেশ্বর ঠাকুর, কৃষ্ণরাম মিত্র, ক্যাপ্টেন রসিকলাল দত্ত (আর এল দত্ত) ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নরসিংহ দত্ত, ব্যারিস্টার আর মিত্র, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত বলরাম বসু ও ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ, পণ্ডিত কালীপ্রসাদ তর্কশিরোমণি, পণ্ডিত প্রমথনাথ বেদান্তশাস্ত্রী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আঁটপুর বহতা নদীর ধারে অবস্থিত। নদীমাতৃকা বাংলাদেশের নদীগুলি যখন বেগবতী ছিল তখন ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে শুরু করিয়া দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি হিন্দু ধর্মোক্ত যাবতীয় ক্রীয়াকলাপের জন্য তখন এই স্থান বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং বাংলার অন্যান্য বর্ধিষ্ণু গ্রামের ন্যায় ইহাও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা ছিল। আঁটপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম-সমূহ এক সময় খুবই উন্নত ছিল। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে ও পরিচ্ছন্নতায় এই স্থান এরূপ মনোরম ছিল যে, ইংরাজ রাজত্বকালে ইহাকে রাজকর্মচারিগণ "একটি ছোট সুন্দর শহর" বলিয়া (nice little town) অভিহিত করিতেন।

আঁটপুরের মিত্র ও ঘোষ বংশ এবং তড়ার বসু ও সরকার বংশ সেকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কন্দর্প মিত্র সর্বপ্রথম কোন্নগর হইতে আঁটপুরে আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহার পৌত্র **কৃষ্ণরাম মিত্র ১১২৫ সালে** জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি বর্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন। তৎকালে তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য দান ও অতিথিসেবা সর্বজনবিদিত ছিল। কৃষ্ণরামের দেবালয় ও জলাশয় প্রভৃতি স্থাপনের মধ্যে আঁটপুরে

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বৈদ্যবাটী হইতে গঙ্গাজল ও গঙ্গামাটি আনাইয়া এবং সেই গঙ্গামাটিতে ইঁট পোড়াইয়া রাধাগোবিন্দের মন্দির নির্মাণ করান। মন্দির একশত ফুট উচ্চ এবং মন্দিরের গাত্রে পোড়ামাটির অষ্টাদশ পুরাণোক্ত সমুদয় দেবদেবীর মূর্তি এবং পুরাণানুযায়ী কারুকার্যমণ্ডিত চিত্রাবলী দেখিলে প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্যশিল্প যে কত উন্নত ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এই মন্দিরের কয়েকটি ছবির প্যানেল ১৮ ডিসেম্বর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের "স্ফিয়ার" কাগজে মুদ্রিত হয়। ছবি দেখিয়া বহু শিল্পানুরাগী ব্যক্তি মুগ্ধ হন। ছবিতে লেখা ছিলঃ The temple of mud a sacred edifice at Antpur in Bengal five hundred years old and built entirely of Ganges mud and water. (Sphere) ইঁটের কারুকার্যখচিত হুগলী জেলার মন্দিরগুলির মধ্যে ইহা বৃহত্তম। মন্দিরের মধ্যে সিংহাসনের উপর রাধাকান্ত ও শ্রীরাধার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ছাড়া মিত্র-বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালার কাঠের উপর যে অপরূপ কারুকার্য তাহা দেখিলে সেকালের শিল্পিগণের নিকট মস্তক অবনত করিতে হয়। পুরাতন আটচালা পড়িয়া গিয়াছে, এখন আর নাই কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপের যে সকল অংশ এখনও বিদ্যমান আছে, সেগুলির উপর কাঠের কারুকার্য এখনও দর্শকগণকে বিস্মিত করে। বহু দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তি এই সকল শিল্পকীর্তি দেখিবার জন্য আঁটপুরে আসেন। এবং শিল্পিগণ এই সকল কারুকার্যের ছাঁচও তুলিয়া নেন। আঁটপুরের শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে প্রভাতকুমার দত্ত 'দেশ' পত্রে ১৭ মাঘ ১৩৬৫ সালে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইলঃ

আঁটপুর হুগলী জেলার একটি ছোট গ্রাম। মার্টিন রেলওয়ের হাওড়া ময়দান স্টেশন থেকে চাঁপাডাঙ্গা লাইনে এই গ্রামে যেতে হয়। হাওড়া থেকে এর দূরত্ব মাত্র পঁচিশ মাইল। গ্রাম হিসাবে আঁটপুর অবশ্য খুবই সাধারণ, তবে শিল্পকীর্তির দিক থেকে এই গ্রামের অসাধারণত্ব আছে। এই অসাধারণত্ব আলোচনার জন্য বর্তমান প্রবন্ধের সূত্রপাত। আঁটপুরের শিল্পকীর্তির বিস্তৃত আলোচনা করার আগে কয়েকটি কথা বলা দরকার। বাংলাদেশের যে সমস্ত গ্রামে প্রাচীন শিল্পকীর্তি এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, সেগুলির কোনটার ইতিহাস তিন-চার শ' বছরের বেশী পুরানো হবে না। অবশ্য বাংলাদেশে তিন-চার শ' বছরের চেয়ে অনেক পুরানো গ্রাম আছে। কিন্তু সেই সমস্ত গ্রামের শিল্পকীর্তির বেশীর ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের প্রাচীন শিল্পকীর্তির মধ্যে পোড়ামাটির ভাস্কর্যখচিত মন্দির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের মন্দির বাংলাদেশে এখনও যা চোখে পড়ে, তার কোনটাই তিন-চার শ' বছরের আগেকার নয়! বেশীর ভাগ মন্দিরই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত আঁটপুরের শিল্পকীর্তির সূত্রপাত এই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে। এখন বাংলার গ্রামে মন্দিরকেন্দ্রিক শিল্পকীর্তিগুলি কিভাবে গড়ে উঠেছিল তার একটা চমৎকার সামাজিক ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসই আমরা অল্প কথায় বর্ণনা করার চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশের গ্রামে তিন-চার শ' বছর আগে মন্দির চণ্ডীমণ্ডপ ইত্যাদি যে শিল্পকীর্তি নির্মিত হয়েছিল সেগুলির নির্মাতা ছিলেন গ্রামের প্রভূত বিত্তবান ও প্রতিপত্তি-

শালী ব্যক্তিগণ। এই প্রভূত বিত্তবান ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা ছিলেন মুসলমান বাদশা-নবাব ও প্রাদেশিক শাসক এবং পরবর্তীকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসকদের সাহায্য-পুষ্ট ব্যক্তি। আমাদের দেশে হিন্দু যুগ থেকেই দৈনন্দিন দেশ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য, যাকে আমরা 'ব্যুরোক্রেসি' বলি অর্থাৎ আমলাতন্ত্র, তার উপস্থিত ছিল। মৌর্য-যুগে চাণক্য ক্ষমতা বজায় রাখা ও সুষ্ঠু দেশ শাসনের জন্য আমলাশ্রেণী গড়ে তোলার প্রতি প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয় সর্দার কে এম পানিকর তাঁর 'সার্ভে অব ইণ্ডিয়ান হিস্টোরি' পুস্তকে চমৎকার আলোচনা করেছেন। যাই হোক, আমাদের ইতিহাসের একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানে রাজা-বাদশা বদল হতো বটে, কিন্তু আমলাশ্রেণী মোটামুটি একই থেকে যেত। মুসলমানেরা যখন তাঁদের ইসলাম ধর্মের উগ্র উৎসাহ নিয়ে এদেশে এসে দেশ শাসন আরম্ভ করেন, তখন অনেকে আশা করেছিলেন যে, পুরানো আমলাশ্রেণীকে একেবারে নাকচ করে তার জায়গায় কেবলমাত্র মুসলমানদের নিয়ে নতুন আমলাশ্রেণী গড়ে উঠবে। কিন্তু আসলে তা হয়নি। মুসলমান শাসকেরা শাসন বিভাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদ ছাড়া অন্যান্য পদে হিন্দু আমলাদেরই নিযুক্ত রেখেছিলেন। এ ব্যাপারে পানিকরের উপরিউক্ত পুস্তকে সুন্দর ইংগিত আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা তা পড়ে দেখতে পারেন। শাসন-ব্যবস্থা ও রাজস্ব বিভাগে হিন্দু আমলাদের বাতিল না করে মুসলমান নবাব-বাদশারা রাজনৈতিক বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। কারণ ধর্মান্তরিতদের কথা বাদ দিয়ে মুসলমানেরা সংখ্যায় এমন বেশী ছিলেন না যে, শাসনযন্ত্রের নীচু থেকে উপর পর্যন্ত সব কিছু দায়িত্ব তাদের নেওয়া সম্ভব হত। তাছাড়া হিন্দুরা বংশানুক্রমে বহুদিন ধরে আমলার কাজ করে আসছেন এবং ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশকে শাসন করতে হলে তাঁদের অভিজ্ঞতাকে মোটেই অস্বীকার করা যায় না। এরই জন্য আমরা দেখি, মুসলমান রাজত্বকালে বহু হিন্দু জায়গীরদার, দেওয়ান, কানুনগো হিসাবে অসীম প্রতিপত্তি ও সম্মানের সংগে জীবন অতিবাহিত করেছেন। এ'রা মুসলমান দরবারের কর্মচারী হলেও নিজেদের এলাকায় প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বাংলাদেশে এই সমস্ত বাঙ্গালী আমলারা খানিকটা তাঁদের প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির চিহ্নস্বরূপ এবং অনেকটা ধর্মভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের জন্মস্থানের গ্রাম বা যে গ্রামে তাঁরা বেশীরভাগ সময় থাকতেন, সেই সমস্ত গ্রামে নানা কীর্তিসৌধের দ্বারা শ্রীমণ্ডিত করে তুলতেন। এই সমস্ত কীর্তিসৌধের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ইটের তৈরী ও পোড়ামাটির ভাস্কর্যখচিত ছোট-বড় দেবমন্দিরগুলি। এছাড়া তৈরী হত খড়ের চালা করা ও ভিতরে কাঠের কারুকার্য শোভিত ফ্রেমের চণ্ডীমণ্ডপ। কখনও আমরা দেখতাম মন্দিরের প্রাংগণ এলাকায় দোলমঞ্চ ইত্যাদি; সুন্দর ঘাটবাঁধানো বড় বড় পুষ্করিণীও নির্মাণ করা হত সমগ্র দেবস্থানটির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। এইভাবে বাংলার গ্রামে কীর্তি-সৌধগুলি গড়ে ওঠায় একদিকে যেমন তখনকার মানুষের ধর্মপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হবার সুযোগ হয়েছিল, তেমনি অপরদিকে সৃষ্টি হয়েছিল বাংলার শিল্পকলার পরিপূর্ণ বিকাশের অপূর্ব পরিপ্রেক্ষিত। সে সময়কার বাংলার গ্রামের ধর্মগত জীবন ও সংবাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই সুপরিকল্পিত ও সুসজ্জিত দেবস্থানগুলি। গ্রামের নানা বৃত্তির
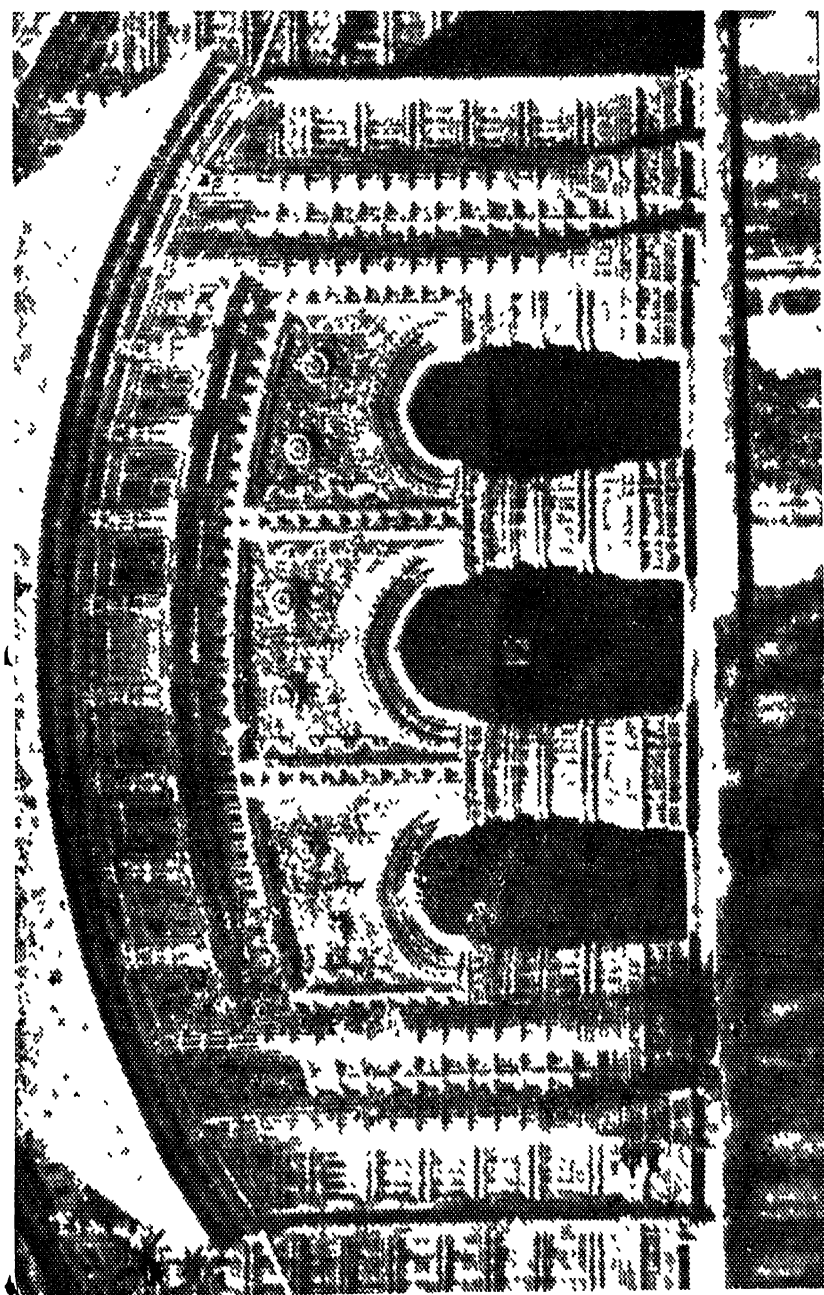
॥ ৯২ ॥

রাধাগোবিন্দের মন্দির—আঁটপুর (পৃঃ ১৩১৭)

রাধাগোবিন্দের মন্দিরের ভাস্কর্য প্যানেল (পৃঃ ১০২৩)

স্বামী প্রেমানন্দ (পৃঃ ১৩২৫)

স্বামী সারদানন্দ (পৃঃ ১২৬১)

॥ ১৪ ॥
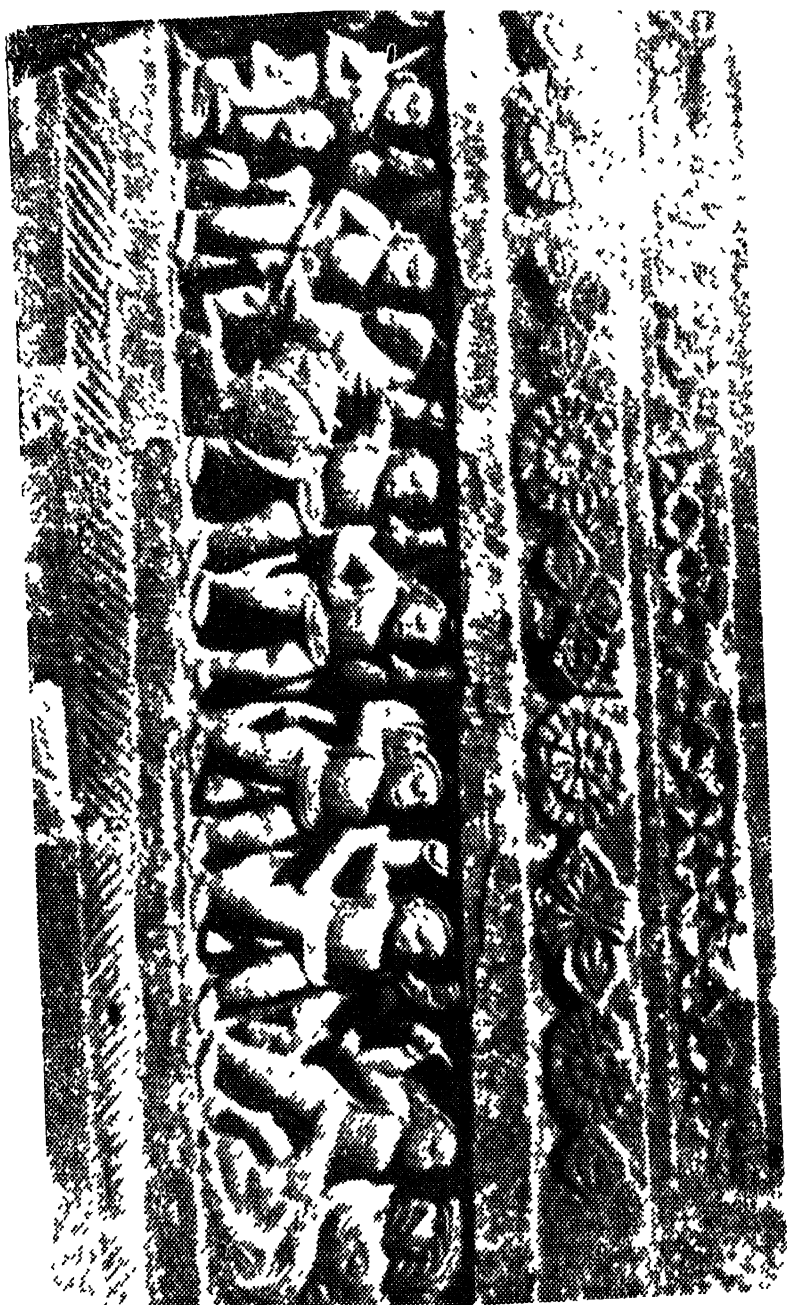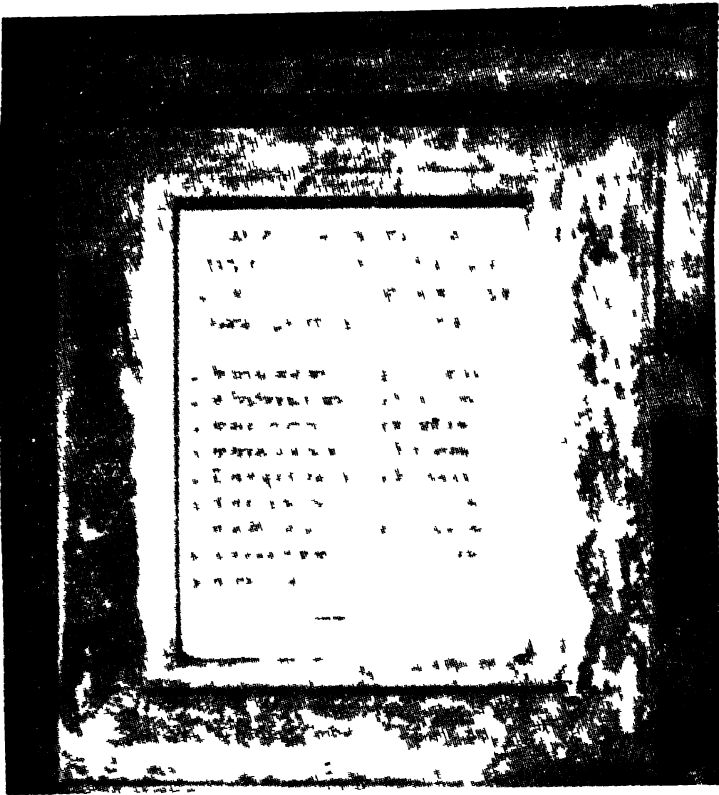
সন্ন্যাসধর্ম ব্রত গ্রহণের স্মৃতি ফলক (পৃঃ ১৩২৬)

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাটি—ত্রিবেণী (পৃঃ ৭৮৫)
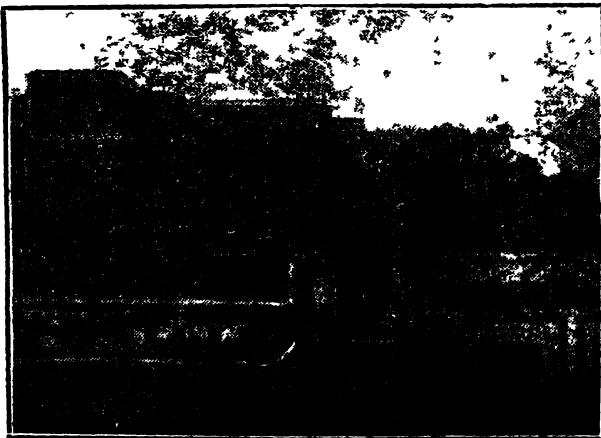
(প্রফেসন) লোকেরাও আর্থিক দিক থেকে এই সমস্ত দেবস্থানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। মোটামুটি তখনকার গ্রাম-বাংলার জীবন অনেকটা বিবর্তিত হত এই দেবকীর্তিগুলিকে কেন্দ্র করে। মুসলমান আমলের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগে অনেক বাঙগালী হিন্দু কোম্পানীর ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করে, পরে জমিদারী লাভ করে প্রচুর বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। এঁরাও তাঁদের স্ব স্ব গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন।

যাই হোক, আমাদের আলোচনার বিষয় হল আটপুর গ্রামের শিল্পকীর্তি। সেই প্রসঙ্গেই আমরা উপরোক্ত মন্তব্য করলাম। আঁটপুরের মিত্রবংশই হচ্ছে সবচেয়ে প্রখ্যাত। এই গ্রামের দেবমন্দির ইত্যাদির নির্মাতা এই মিত্রবংশ। বংশটি প্রাচীন এবং এদের পূর্বপুরুষেরা বর্ধমানের রাজদরবারে দেওয়ানীর কাজ করতেন। এই দেওয়ানীর কাজ থেকেই এই বংশের সমৃদ্ধির সূত্রপাত। মিত্রদের দেশঘর ছিল আঁটপুর। এখন অবশ্য মিত্র পরিবারের সেই সমৃদ্ধি আর নেই। সম্পত্তির মধ্যে প্রাচীন শিল্পকীর্তিগুলি বাদ দিলে আঁটপুর এমনি একটা সাধারণ গ্রাম। তবে অনুমান করা হয় আলোচ্য গ্রাম এক সময়ে বিখ্যাত ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানদের আগে পাঠান আমলে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার অনেকটা অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। এই রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল ভূরিশ্রেষ্ঠ যা বর্তমানে ভূরশুট নামে পরিচিত। এই ভূবশুট গ্রাম আঁটপুর থেকে খুব বেশী দূরে নয়। ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য পাঠান আমলে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এবং মুঘল আমলে দিল্লীর দরবারে নজরানা পাঠানো হলেও কার্যত ভূরিশ্রেষ্ঠ স্বাধীন ছিল। আঁটপুরে অবশ্য ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ আমলের কোন প্রাচীন কীর্তি চোখে পড়ে না।

আঁটপুরে মিত্রংবংশীয়দের শিল্পকীর্তির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রাচীর-বেষ্টিত সুবৃহৎ রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটি। এই ধরনের সুউচ্চ মন্দির শুধু হুগলী জেলা কেন পশ্চিম বাঙলার অন্যান্য জেলাতেও খুব কম লক্ষ্য করা যায়। এই মন্দিরটিকে গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। দুয়েরই মোটামুটি গড়ন একরূপ। অবশ্য বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের গায়ে কোন পোড়ামাটির ভাস্কর্য কাজ নেই। কিন্তু আঁটপুরের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সমগ্র সম্মুখভাগ এবং দু'পাশের খানিকটা করে অংশ অজস্র পোড়ামাটির ভাস্কর্য প্যানেল দ্বারা শোভিত। ভাস্কর্য প্যানেলের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আমাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে। হস্তী, হংস, অশ্ব প্রভৃতি নানা জীবজন্তর সারি, যুদ্ধের বিভিন্ন দৃশ্য, ফিরিঙ্গী বণিক, কৃষ্ণের বাল্য ও গোষ্ঠলীলার বিভিন্ন আলেখ্য, পাশা খেলা ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ হয়েছে এখানে। বেশীরভাগ প্যানেলগুলিই অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এগুলি একটি একটি করে দেখতে দেখতে মনে হয় যেন আমাদের চোখের উপর দিয়ে কত না দৃশ্যপটের পরিবর্তন হচ্ছে। আড়াইশো তিনশো বছর আগেকার বাঙলার গ্রামের জীবনযাত্রার ছবি আমরা এতে পাই এবং এ ছবি পুঁথিতে বর্ণিত ঘটনার চেয়ে অনেকক্ষেত্রে বেশী জীবন্ত। আঁটপুরের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের নির্মাণকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বলেই অনুমান করা হয়। রাধাকৃষ্ণ মন্দির ছাড়াও মিত্রবাটীর প্রশস্ত চত্বরে আরো দু'একটি ছোট ইটের শিবমন্দির আছে। তবে এগুলির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। কারুকার্য খুব কম, আর যা ছিল তাও সব নষ্ট হয়ে গেছে। আলোচ্য চত্বরের এক

অংশে একটি সুন্দর দোলমঞ্চ প্রত্যেক দর্শকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দোললীলার সময় রাধাকৃষ্ণের দোদুল্যমান যুগলমূর্তি আর ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে এই দোলমঞ্চ এক নবরূপ ধারণ করে। দোলমঞ্চ হিন্দুদের এক অপূর্ব কল্পনামধুর মনের সৃষ্টি। এই দোলমঞ্চটি থাকার জন্য মন্দির-চত্বরের মাধুর্য যেন শত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মিত্রবংশের আর একটি বিশিষ্ট শিল্পকীর্তি হচ্ছে কাঠের কারুকার্য করা চণ্ডীমণ্ডপ। উড়িষ্যায় যেমন ভগবত-ঘর, আসামে যেমন নামঘর, তেমনি বাঙলাদেশের হচ্ছে চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের সংগে বাঙলার গ্রামীণ সংস্কৃতির ওতপ্রোত সম্পর্ক। বাঙলার গ্রাম-জীবন বহুদিন ধরে এই চণ্ডীমণ্ডপকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চণ্ডীমণ্ডপ হচ্ছে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালের ঘর আর সামনে খানিকটা দাওয়া। এখানে বাৎসরিক প্রধান পূজা অর্থাৎ দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, আর অন্যান্য সময়ে চলে গ্রামের মাতব্বর লোকেদের আড্ডা। তবে কিছু চণ্ডীমণ্ডপ আছে যেগুলির গড়ন বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই সমস্ত চণ্ডীমণ্ডপে মাটির বদলে ইঁটের দেওয়াল থাকে, আর উপরে খড়ের চাল হলেও তলাকার কাঠের ফ্রেম সমস্তটাই থাকে কারুকার্যখচিত। কাঠের ফ্রেমের কোন অংশই সাদা রাখা হয় না: হয় থাকে ফুল-লতাপাতা বা জীবজন্তুর নকশা, না হয় মানুষের মূর্তি। এমন কি মণ্ডপের মূল খুঁটিগুলি পর্যন্ত কারুকার্য শোভিত থাকে। আঁটপুরের মিত্রদের চণ্ডীমণ্ডপটি হচ্ছে ঠিক এই ধরনের। মণ্ডপটি পর্যবেক্ষণ করলে বাঙলার পুরানো তক্ষণ শিল্পের চমৎকার নিদর্শনগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। মণ্ডপটি বর্তমানে মোটামুটি ভাল অবস্থাতেই আছে। চণ্ডীমণ্ডপে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত হচ্ছে কাঠের ফ্রেমের উপরিভাগের যুগল রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি বড় মূর্তিগুলি। নির্মাণ-রীতি ও কৌশলের দিক থেকে এগুলি অনবদ্য। এছাড়া তলার দিকে মূল খুঁটিগুলির গায়ে কতকগুলি মানুষ ও জন্তুর নিচুর দিকে মাথা করা মূর্তিগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সর্বোপরি দর্শকেরা বিস্মিত হবেন মূর্তিগুলি সংস্থাপনের অভিনব কৌশল দেখে। এখানে আমরা স্থাপত্য-বিদ্যা ও শিল্পজ্ঞানের এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করি।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের হুগলী জেলার 'ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক' গ্রন্থে রাধাগোবিন্দ-জীউর মন্দির সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা উল্লেখ্য ঃ

The Radha-Govinda temple in this village is the largest of the terracotta-decorated temples of Hooghly District. It is comparatively late, 1780 sak; but the terracotta still show great liveliness. It is an 8-chala with a projecting porch covered on all three sides with terracottas decoration. The five great battle scenes above the archways include a splendid Chandi fighting the demon army. The mythological frieze near the ground level includes scenes from the Mahabharat as well as the usual Krishnalila.

শ্রীতুলসীদাস মিত্র ২৯ আশ্বিন ১৩৫৫ সালে কৃষ্ণরাম মিত্রের জন্মস্থানে একখানি প্রস্তর গ্রথিত করিয়া তাঁহার 'জন্ম ১১২৫ সাল' উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার

প্রপৌত্র প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার রাজনারায়ণ মিত্র (আর মিত্র) ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

॥ স্বামী প্রেমানন্দ ॥

আঁটপুরের ঘোষবংশও প্রসিদ্ধ বংশ। এই বংশে **স্বামী প্রেমানন্দ** জন্মগ্রহণ করেন। আঁটপুরের মিত্রবংশ তাঁহার মাতুল বংশ। মাতুলালয়ে এখন কেহ নাই, গৃহও পড়িয়া গিয়াছে কেবল বাস্তুভিটা পড়িয়া আছে। এই ভিটায় স্বামী প্রেমানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শান্তিরাম ঘোষ একটি প্রস্তরফলক প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই স্থানে "প্রেমানন্দ স্মৃতি মন্দির" নির্মিত হইবে। প্রস্তরফলকে লেখা আছেঃ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ) জন্মস্থান
জন্ম—১২৬৮ সন, ২৬শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, শুক্লানবমী।

স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অতি প্রিয় ছিলেন। এবং স্বামী বিবেকানন্দের তিনি খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার আট জন অন্তরঙ্গ বন্ধুসহ আঁটপুরে স্বামী প্রেমানন্দের গৃহে গমন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। মাতা সারদাদেবীও স্বামী প্রেমানন্দের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দের জীবনীতে তুলসীরাম ঘোষের চিঠিতে এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ২য় খণ্ডে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। রঁমা রঁলাও রামকৃষ্ণের জবনীগ্রন্থে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

They were assembled at Antpur in the house of the mother of one of the disciples (Baburam). It was late in the evening when the monks gathered together before the fire. Meditation began continuing for a long time. Then a break was made and the Leader (Vivekananda) filled the silence with the story of the Lord Jesus. The many points of similarity in thought and action as well as the relationship with the disciples, between Christ and Ramkrishna, forcibly brought to their minds the old days of ecstasy with their Master.

Then Vivekananda appealed to the monks. He besought them to become Christs in their turn, to work for the redemption of the world, to renounce all as Jesus had done and to realise God. Standing before the wood fire, their faces reddened by the leaping flames, the crackling of the logs the only sound that broke the stillness of their thoughts, they solemnly took the vows of everlasting Sannyasa, each before his fellows and all in the sight of God.

বাবুরাম ঘোষের বাড়িতে মন্দিরের সামনে যাঁহারা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বড়দিনের পূর্বদিন সমগ্র পৃথিবীর মানবসমাজকে গড়িবার জন্য ধুনি জ্বালাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প গ্রহণ

করেন তাঁহাদের নাম ঃ ১—নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), ২—নিত্যরঞ্জন ঘোষ (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), ৩—বাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ), ৪—তারানাথ ঘোষাল (স্বামী শিবানন্দ), ৫—শশীভূষণ চক্রবর্তী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), ৬—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ), ৭—কালীপ্রসাদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ), ৮—গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় (স্বামী অখণ্ডানন্দ), ৯—সারদাপ্রসন্ন মিত্র (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ)।

স্বামী প্রেমানন্দের ভ্রাতা শান্তিরাম ঘোষ মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ অষ্টজন মহাত্মা যে স্থানে সন্ন্যাসধর্মের ব্রত গ্রহণ করেন এবং মাতা সারদাদেবী স্বামী প্রেমানন্দের যে গৃহে অবস্থান করেন—এই উভয় স্থানে দুইটি প্রস্তরফলক প্রোথিত করিয়া দিয়াছেন।* বিবেকানন্দ যে কক্ষে শয়ন করিতেন তাহাও চিহ্নিত করিয়াছেন। প্রতি বৎসর ২৫, ডিসেম্বর এই দিনটি স্মরণ করিবার জন্য আঁটপুরে স্বামী প্রেমানন্দের গৃহে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। জ্ঞানের ধুনি জ্বালাইয়া নয়-জ্যোতিষ্ক যে সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধুনি যেন অনন্তকাল প্রজ্বলিত থাকে ইহাই আমাদের কামনা। সংকল্প গ্রহণের স্থানে প্রেমানন্দের নামে একটি মন্দির নির্মাণ করিবার জন্য আমি দেশবাসীর নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। বেলুড় মঠে স্বামী প্রেমানন্দের নামে "প্রেমানন্দ-ভবন" আছে। এই ভবনে এখন রামকৃষ্ণমিশনের স্বামীজীরা অবস্থান করেন।

১৮৮৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর হুগলী জেলার **আঁটপুর গ্রামে** স্বামী প্রেমানন্দের (তখন বাবুরাম ঘোষ) গৃহে স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) প্রেমানন্দসহ আটজন সঙ্গী লইয়া একটি প্রজ্বলিত ধুনীর সম্মুখে সংসার ত্যাগের মহান সংকল্প গ্রহণ করেন। আঁটপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার আটজন সঙ্গী আর কখনও তাঁহাদের স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যান নাই। শ্রীশ্রীমাও আঁটপুরস্থ স্বামী প্রেমানন্দের গৃহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই পবিত্র দিনটি উদযাপন করিবার জন্য ১৯৫২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর হইতে আঁটপুর গ্রামের যে স্থানে স্বামী বিবেকানন্দ এবং অপর সন্ন্যাসিবৃন্দ সেই পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করেন সেই স্থানে প্রতি বৎসর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম প্রিয় মন্ত্রশিষ্য **শান্তিরাম ঘোষ** শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত বলরাম বসু ভবনে ২৯ অক্টোবর ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। পিতা তারাপ্রসাদ ও জননী মাতঙ্গিনী ঘোষের এক কন্যা ও তিন পুত্র মধ্যে শান্তিরাম সর্বকনিষ্ঠ। কন্যা কৃষ্ণভাবিনীর সঙ্গে ভক্ত বলরাম বসুর শুভ পরিণয় সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার মেজদা বাবুরাম ঘোষ মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের অন্যতম শিষ্য। তিনি উত্তরকালে স্বামী প্রেমানন্দ নামে খ্যাত ছিলেন। প্রেমানন্দ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুলাই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। প্রেমানন্দজননী পূর্ব হইতে

---

*প্রস্তরফলকে যে নয়জন স্বামীজীর নাম উৎকীর্ণ করা হইয়াছে, উহাতে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের গৃহাশ্রমের নাম সারদাচরণ মিত্র বলিয়া লেখা হইয়াছে। তাঁহার নাম ছিল **'সারদাপ্রসন্ন'**—সারদাচরণ নয়। মধ্যের এই উপসর্গটির ভুলের জন্য ভবিষ্যতে অনেকে দারুন সংশয়ের মধ্যে পড়িবেন। তাই এই ভুলটি সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে ঠাকুর একদিন মাতাঙ্গিনীকে বলেন ঃ হ্যাঁগা, তোমার বাবুরামটিকে আমায় দেবে? জননী বলিলেন ঃ আমি দান করবো বা বিক্রী করব। ঠাকুর ঃ কি মূল্যে? জননী ঃ ভক্তি মূল্যে। তুমি বল আমার ভক্তি হবে, তবেই বাবুরাম তোমার হবে। ঠাকুর ভাবস্থ হইয়া বলিলেন ঃ তোমার ভক্তি হবে। এই ভক্তিলাভ হইল ঃ জীবিত অবস্থায় মাঝে মাঝে ইষ্ট দর্শন।

শান্তিরাম বি-এ পর্যন্ত পড়িয়া অগ্রজ তুলসীরামবাবুর কারবারে যোগ দেন। তাঁহার ব্যবসায়ে সততা, স্বভাবে সত্যনিষ্ঠা, কর্তব্য পালনে তৎপরতা থাকায় একদিকে যেমন ব্যবসায়ী মহলে তাঁহার খাতির ছিল, তেমনি বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসিগণের তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষের জন্মেও এই বংশ গৌরবান্বিত হইয়াছে।

আঁটপুরে দ্বাদশগোপালের অন্যতম **পরমেশ্বর দাস ঠাকুরের** শ্রীপাঠ আছে! শ্রীপাঠে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজীউব নয়নাভিরাম বিগ্রহ একটি দর্শনীয় বস্তু। শ্রীপাঠে একটি বহু প্রাচীন বকুল ও কদম গাছ একত্রে আছে। ইহা ছাড়া পরমেশ্বর দাস ঠাকুরের সমাধি ও শ্রীমদ নিত্যানন্দ প্রভু ব্যবহৃত খুন্তি সংরক্ষিত আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রতি বৎসর পরমেশ্বর দাসের তিরোভাব উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্থাভাবে বর্তমানে বৈষ্ণবধর্মোক্ত যাবতীয় উৎসবাদি এখন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ' নামক গ্রন্থে হরিদাস দাস মহাশয় "শ্রীপাঠের বকুলবৃক্ষটি পরমেশ্বর ঠাকুরের দন্তধাবন কাষ্ঠে উৎপন্ন" বলিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীপাঠ যে স্থানে অবস্থিত উহার নাম আনুরবাটী। শ্যামসুন্দর জীউর মনোহর বিগ্রহের আলোকচিত্র এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল। অমূল্যধন রায়ভট্ট লিখিত 'দ্বাদশগোপাল' গ্রন্থে দ্বাদশ পাঠের বিস্তারিত বিবরণ আছে। পরমেশ্বর দাস সম্বন্ধে পাঠ-পর্যটনের উক্তি উদ্ধারযোগ্য ঃ

> পরমেশ্বর দাস পূর্বে স্তোক কৃষ্ণ ছিল।
> বোদখানাতে নাগর পুরুষোত্তম জন্মিল॥
> সাচড়াতে পরমেশ্বর দাসের বসতি।
> পরমেশ্বর অর্জুন সখা পূর্বে এই খ্যাতি॥

১৩২২ সালে ললিতমোহন দত্তের উদ্যোগে শ্যামের-পাঠ সংস্কার করা হয়। যাঁহারা এই সংস্কারে অর্থ সাহায্য করেন, তাঁহাদের নামও একটি পাথরে লেখা আছে। ১লা চৈত্র ১৩২৬ সালে পরমভাগবত ননীলাল সাহা মন্দিরের মধ্যে প্রভুর পাকশালা নির্মাণ করিয়া দেন। নাটমন্দির প্রথমে খড়ের ছিল পরে পাকা ঘর নির্মাণ করা হয়। যাঁহারা ইহা নির্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম উৎকীর্ণ আছেঃ

পরম দয়ালু গোবিন্দচন্দ্র লাহা। তস্য কন্যা কাদম্বিনী দাসী। তস্যপুত্র পরম ধার্মিক শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত। তস্যপত্নী শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দাসী। সাং আনরবাটি (১৩৩১)।

শ্যামসুন্দরের মন্দিরের প্রবেশদ্বারে "সেবায়েত শ্রীযুক্ত বেণিমাধব অধিকারী" বলিয়া লেখা আছে।

নবীনকৃষ্ণ বসু তড়া-আঁটপুরের অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার শ্যামবাজারস্থিত প্রাসাদোপম ভবনে প্রথম রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালীদের "বিদ্যাসুন্দর" অভিনয় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে

অনুষ্ঠিত হয়। পুকুর, ঘাট, উদ্যান, সুড়ঙ্গ সমস্ত এই অভিনয়ে দেখান হইত। রঙ্গমঞ্চে বজ্র ও বিদ্যুতের দৃশ্য দেখিয়া দর্শকগণ চমৎকৃত হইত। এই থিয়েটারের অভিনয় করিতে নবীনবাবুর তিনলক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং তিনি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া শেষে বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। স্বনামধন্য কৃষ্ণরাম বসু তাঁহার পূর্বপুরুষ। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৩৬৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'মাসিক বসুমতী' পত্রে তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন। নবীনকৃষ্ণের ভবন ভাঙ্গিয়া উক্ত স্থানে এখন শ্যামবাজার ট্রামডিপো হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ

In Bengal, however we do not find our public theatres employing actresses till 1873 through in 1833 an attempt was made by Babu Nabin Krishna Bose of Shambazar in his house where some women appeared in the performance of Vidyasunder. The Indian Stage, Vol. I

॥ দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু ॥

দেওযান কৃষ্ণরাম বসু ১১৪০ সালে তড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দয়ারাম বসু। জনৈক সন্ন্যাসী বাল্যাবস্থায় কৃষ্ণরামকে দেখিয়া ভবিষ্যতে তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি হইবেন জানিতে পারিয়া, তাঁহার পিতার অনুমতিক্রমে তিনি ইহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণরাম কলিকাতায় আসিয়া পিতার সামান্য মূলধন লইয়া লবণের ব্যবসা করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ সৌভাগ্য লাভ করেন। পরে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে হুগলীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। তৎকালে তিনি একজন বিখ্যাত ধনী ও দানবীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি একলক্ষ টাকার চাউল বিতরণ করেন। মাহেশের সুপ্রসিদ্ধ রথের তিনিই প্রবর্তক। কলিকাতায় শ্যামবাজারে তিনি বসতি স্থাপন করেন। যশোহরে শ্রীশ্রীমদনগোপাল ও বীরভূমে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা ছাড়া কাশী ও ভাগলপুরে শিব মন্দির প্রভৃতি স্থাপন এবং গয়ায় রামশিলা সোপানশ্রেণী প্রস্তুত তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। শ্যামবাজার ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভেনিউতে তাঁহাদের শ্রীরাধাদামোদরের ঠাকুর-বাড়িতে এখনও দেবসেবার সুব্যবস্থা আছে। তাঁহার নামানুসারে কলিকাতায় একটি রাস্তা হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ ৬১৫, ৬৮০, ১১৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

॥ প্যারীচরণ সরকার ॥

ফাষ্টবুক প্রণেতা **প্যারীচরণ সরকার** ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আঁটপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী হন। হুগলী, বারাসাত প্রভৃতি স্কুলে শিক্ষকতা করিবার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্বে কোন ভারতীয় ইংরাজী ভাষায় উক্ত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন নাই। ইংরাজী ভাষা সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার জন্য তিনি ফাষ্টবুক সেকেণ্ড বুক এবং থার্ড বুক অফ রিডিং প্রণয়ন করিয়া ছাত্রদের ইংরাজী শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারকল্পে চোরবাগানে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার চেষ্টায় সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য তিনি

ইংরাজী ভাষায় "ওয়েল উইশার" ও বাংলায় "হিতসাধক" নামে দুইখানি পত্রিকা প্রচার করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি "এডুকেশন গেজেট" পত্রের সম্পাদক হন। তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্য পুস্তকগুলি আজও বিশেষভাবে সমাদৃত। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি একটি অন্নছত্র খুলিয়া বহু লোককে অন্নদান করেন। তাঁহার নামেও কলিকাতায় একটি রাস্তা হইয়াছে। তাঁহার পুত্রের নাম **শৈলেন্দ্রনাথ সরকার**; তিনিও একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। ওরিয়েণ্ট্যাল মেসিনারীর তিনি প্রধান শিক্ষকরূপে বহুদিন কার্য করেন। পরে তিনি সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। মাতার নামে তিনি গিরিবালা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটিউশনের এখন শৈলেন্দ্র সরকাব বিদ্যালয় নামকরণ হইয়াছে। এই সরকার বংশে স্যার এন এন সরকার জন্মগ্রহণ করেন' তাঁহার অন্যতম পুত্র বি এন সরকার নিউথিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সমগ্র ভারতের চিত্র-জগতে সুপরিচিত'

আঁটপুরের ঘোষ বংশের আর একজন কৃতিব্যক্তি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২২ আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হইতেছেন **ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ।** তাঁহার পিতার নাম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে পূর্ণবাবুর একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা ছিল। তখন আঁটপুর হইতে যে কেহ কার্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিত, তাঁহারা সকলেই পূর্ণবাবুর বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করিত। স্বগ্রামবাসিগণের প্রতি পিতাব এই প্রীতি ও সেবার ভার পুত্র বিপিনবাবুতে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল। আঁটপুরের উচ্চবিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণে তিনি অর্থ সাহায্য করেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শশীভূষণ ঘোষ গ্রামে একটি টোল স্থাপন করেন। স্বামী বিবেকানন্দের তিনি পরম বন্ধু ছিলেন। মিশনভুক্ত যে কোন ব্যক্তির অসুখ হইলে তিনি তাঁহার সেবায় আপনাকে নিয়োগ করিতেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৩ মে তাঁহার দেহান্ত হয়। ডাঃ চূণীলাল বসু তাঁহার জীবনী ১৩৩৬ সালের বসুমতীতে আলোচনা করিয়াছেন।

আঁটপুরের রাধামোহন দত্ত নীলকুঠির ব্যাংকার ছিলেন। তিনি গ্রামে দুইটি শিব-মন্দির ও একটি রাসমঞ্চ নির্মাণ করেন। আঁটপুরের বাজারে যে শিবমন্দির আছে উহাতে "শুভমস্তু শকাব্দ ১৬৪২" লেখা আছে। এই মন্দিব বর্ধমানেব মহারাজার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩২২ সালে নিবারণচন্দ্র দাস মন্দির সংস্কার করিয়াছেন। এ ছাড়া গ্রামে আরও কয়েকটি মন্দির আছে। ক্ষেত্রপাল একটি প্রাচীন দেবস্থান। মানত করিলে বাতব্যাধি আরোগ্য হয়।

মিত্রবাটীর সম্মুখস্থ বৃহৎ পুষ্করিণীর ঘাটের দুই ধারে দুইটি করিয়া শিবমন্দির ও মধ্যস্থলে দোলমঞ্চ একটি দর্শনীয় বস্তু। মন্দির ১১৭৬ সালে নির্মিত বলিয়া লেখা আছে। শিবলিঙ্গের নাম জলেশ্বর ও ফুলেশ্বর। অন্য দুইটি শিবমন্দির ১৬৯৫ শকাব্দে (১১৮০ সাল) নির্মিত হয়। শিবলিঙ্গের নাম সীতারাম ও বাণেশ্বর। সীতারাম লিঙ্গের উচ্চতা প্রায় চার হাত। ভিতরে আরও একটি শিব মন্দির আছে। উহার নাম গঙ্গাধর। মিত্রবংশে এখন বর্ষীয়ান ব্যক্তি হইতেছেন রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ মিত্র: তাঁহার শষ্যবপণ পঞ্জিকা, ফলের চাষের ক-খ-গ। কচুরিপানা,, ভুলের ফসল প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক আছে। ব্রহ্মচারী ভোলানাথ এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

[রাধাগোবিন্দের মন্দিরের চিত্রাবলী]

মন্দিরের একটি কোণ
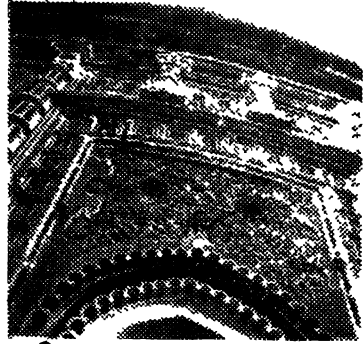
মন্দিরের খিলানের একাংশ
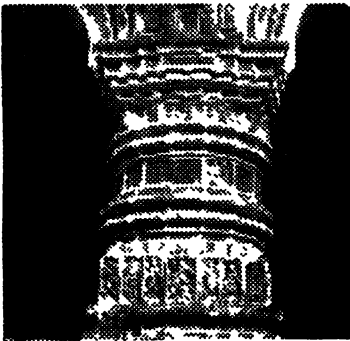
কারুকার্যমণ্ডিত স্তম্ভ
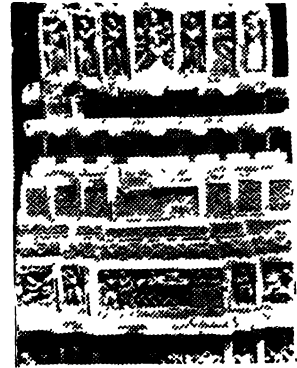
কারুকার্যের নমুনা
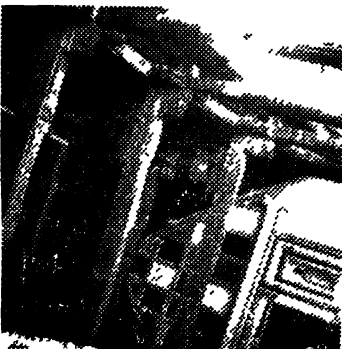
চণ্ডীমণ্ডপে কাঠের কারুকার্য

মন্দিরের চিত্র

আরামবাগ

॥ আরামবাগ ॥

হুগলী জেলার অন্যতম মহকুমা আরামবাগ একটি প্রাচীন স্থান। ইহার নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল; কারণ যে সব লোকোত্তর মহাপুরুষ ভারতবর্ষকে কুসংস্কার ও অন্ধকার হইতে পথ দেখাইয়াছেন, যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় ও যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই আরামবাগের সন্তান। এই মহকুমার প্রধান সহরের নামও আরামবাগ; পূর্বে ইহার নাম ছিল জাহানাবাদ। এই স্থান কলিকাতা হইতে ৪৫ মাইল দূরে অক্ষাংশ ২২°৫৩´ উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৮৭°৪৭´ পূর্বে, দ্বারকেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত। পূর্বে কলিকাতা হইতে বর্ধমান হইয়া ঘোরাপথে আরামবাগে যাইতে হইত। অথবা হাওড়া ময়দান হইতে মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেলে চাঁপাডাঙ্গা হইয়া খেয়া নৌকায় দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরী পার হইয়া যাইতে হইত। কিন্তু এখন চাঁপাডাঙ্গায় দামোদরের উপর বিদ্যাসাগর সেতু ও মুণ্ডেশ্বরীর উপর সেতু নির্মিত হওয়ায় তারকেশ্বর হইতে আরামবাগ পর্যন্ত বাসে যাওয়া যায়। হাওড়া হইতে রেলপথে তারকেশ্বরের দূরত্ব ৩৫ মাইল।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার তাঁহাদের কার্যের সুবিধার জন্য প্রথম মহকুমা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তদনুসারে উক্ত বৎসরের শেষে মিঃ এল এস জাকসন দারহাট্টাতে (বর্তমান নাম শ্রীরামপুর) মহকুমা শাসক নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জাহানাবাদ মহকুমা গঠিত হয়, ইহার পূর্বে এই স্থান ক্ষীরপাই মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর এবং বর্ধমানের রায়না হুগলী জেলার মধ্যে ছিল। "In 1872 the Parganas of Chandrakona and Barda were transferred from Hooghly District. In the high lands there are various old garhs or forts of the Petty Jungle Rajas of which little is left but the site."—Imperial Gazetteer of India, Vol. II. ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ক্ষীরপাই মহকুমার প্রথম শাসক। অবশেষে ক্ষীরপাই হইতে মহকুমা কার্যালয় জাহানাবাদে উঠিয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মহকুমার অধিকাংশ অঞ্চল বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়; সাত বৎসর পরে পুনরায় জাহানাবাদ মহকুমা হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

The present subdivision was formed in 1879 and used to be known as the Jahanabad subdivision. (A Brief History of Hooghly—Crawford)

রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ১ আগষ্ট ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ধমান জেলার রায়না থানার **সাহলালপুর মৌজা** বর্ধমান-সদর মহকুমা হইতে আলাদা করিয়া হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমাভুক্ত করা হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় জেলা আইনের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই এলাকা বদল করা হয়।

'আকবরনামা' নামক গ্রন্থে "জাহানাআবাদ"-এর উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ধমান হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত প্রাচীন বাদশাহী রাস্তার পাশে অবস্থানের জন্য মুসলমান রাজত্বে জাহানাবাদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে বিহারের শাসনকর্তা মান

সিংহ উড়িষ্যা অভিযান করিবার জন্য বর্ধমান হইয়া জাহানাবাদে আগমন করেন এবং বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া এই স্থানে অবস্থান করেন।

"Man Singh cantoned his troops here, waiting till the end of the rains would enable him to take the field." (Akbarnama, Elliot. Vol. VI)

জাহানাবাদ নামকরণ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, প্রাচীনকালে জাহান শা নামে এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ফকির এইস্থানে বাস করিত। সেই ফকির দেহরক্ষা করিলে, তাহার অনুরক্ত শিষ্য ও ভক্তগণ উক্ত ফকিরের নামানুসারে এই স্থানের নাম জাহানবাদ রাখেন। গয়া জেলায় জাহানাবাদ বলিয়া একটি স্থান থাকায় ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত কলিকাতা গেজেটের এক বিজ্ঞপ্তিতে (Government Notification No. 36 J. D. Dated 19th April 1900) যাহাতে দুইটি এক নামের স্থানের জন্য আর গোলযোগ না হয়, তজ্জন্য এই স্থানের নাম পরিবর্তন করিয়া স্থানীয় প্রতাপশালী মিঞাদের আরাম বাগা নামক একটি বাগানের নামানুসারে জাহানাবাদ আরামবাগে পরিণত হয়। "The name which means the garden of ease, refers to a garden of Miyans once the most influential family in the place." District Handbook of Hooghly—A. Mitra.

মোগল রাজত্বকালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় আরামবাগে মুসলমান সৈন্যদের ছাউনি ফেলা হয়; সেই সময় হইতেই এখানে প্রধানতঃ মুসলমানেরা বসতি স্থাপন করে। পূর্বে আরামবাগ একটি গণ্ডগ্রাম ছিল: কয়েক ঘর মুসলমান, সুবর্ণবণিক ও ব্যগ্রক্ষত্রিয় এই অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসী। আরামবাগের পাশ দিয়া দ্বারকেশ্বর নদ প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্বে আরামবাগ হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বালি দেওয়ানগঞ্জ নামক স্থানে সরকারী অফিস ও আদালত ছিল। বালি দেওযানগঞ্জ সিল্কের কাপড় ও পিতল-কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু আরামবাগ মহকুমা সহর হইবার পর সমস্ত অফিস-আদালত বালি দেওয়ানগঞ্জ হইতে স্থানান্তরিত হয়। সেজন্য আরামবাগ প্রসারলাভ করিলেও বালি দেওয়ানগঞ্জের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত স্থানে প্রতি সপ্তাহে দুইবার হাট হইত এবং জলপথে নৌকা দিয়া সমস্ত জিনিস বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইত।

"A big 'hat' is held in Dewanganj twice a week. Silk and cotton cloths are woven in this place and its neighbourhood, but the manufacture is declining." (Hooghly District Gazetteer)

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে আরামবাগ পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় ইহা সতেরটি গ্রাম লইয়া গঠিত হয় এবং ইহার আয়তন ছিল মাত্র তিন বর্গমাইল। "Arambagh, is really a congeries of villages and has been constituted a municipality, as being the head quarters of a subdivision rather than a place with urban characteristics" Hooghly District Gazetteer. করদাতার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭৫০ জন। সেই সময় মহকুমা শাসক পদাধিকারবলে পৌরসভার সভাপতি হইতেন। তখন নির্বাচন প্রথা প্রচলিত হয় নাই বলিয়া কমিটির দশজন

সভ্যের মধ্যে দুইজন এক্স-অফিসিও ও আটজন মনোনীত সভ্য হইতেন। যুগান্তরে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গে পৌরশাসন ও আরামবাগের ইতিকথা নামক পুস্তকে (পৃঃ ৭) সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন আরামবাগে মহকুমা শাসকরূপে কাজ করেন তখন তিনিও পদাধিকারবলে আরামবাগ পৌরসভার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন বলিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ তিনি জাহানাবাদে মহকুমা শাসকরূপে কোন দিন আসেন নাই। দুর্গেশনন্দিনীতে এই মহকুমার ঐতিহাসিক স্থান গড়মান্দারণের বিষয় লিখিত আছে বলিয়া শ্বেতপ্রস্তরে আরামবাগের আদালত-গৃহে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। উকিল নবগোপাল বসু আরামবাগ পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত সভাপতি।

বঙ্কিমচন্দ্র আরামবাগে ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে সঠিক জানিবার জন্য ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশ করি। কিন্তু কেহই পত্রের উত্তরে কিছু জানান নাই।[1] বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন এইরূপ কয়েকজন পণ্ডিত

---

[1] বঙ্কিমচন্দ্র জাহানাবাদে ছিলেন কি না?

মহাশয়, সম্প্রতি আমার হুগলী জেলার ইতিহাসের ২য় সংস্করণের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে আরামবাগের বিভিন্ন গ্রাম পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। সেই সময় সকলেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আরামবাগ মহকুমার হাকিম ছিলেন বলিয়া আমায় বলেন।

আরামবাগ আদালতের যে কক্ষে বসিয়া তিনি বিচার করিতেন, বর্তমানে তাহার বাহিরের দেওয়ালে ইংরাজিতে একখানি শ্বেতপ্রস্তরে "এই স্থানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহকুমা শাসক ছিলেন এবং ইহার অনতিদূরে গড়মান্দারন তাঁহার উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর পটভূমিকা" ছিল বলিয়া উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। আরামবাগের পূর্বনাম ছিল জাহানাবাদ।

বঙ্কিমচন্দ্রের যতগুলী জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, কোথাও তিনি যে জাহানাবাদে ছিলেন তাহার উল্লেখ নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' অন্তর্ভুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। উহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকার্যের একটি তালিকা তাঁহার কর্মজীবনের সুরু হইতে (৭ আগষ্ট ১৮৫৮) অবসর গ্রহণ (১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১) পর্যন্ত লিখিত আছে। (পৃষ্ঠা ২৭—৩২) উহা হইতেও তিনি যে কখনও জাহানাবাদে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। 'বঙ্কিম জীবনী' 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' বা 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক গ্রন্থগুলিতেও জাহানাবাদের উল্লেখ নাই। কিন্ত পদাধিকারবলে বঙ্কিমচন্দ্র জাহানাবাদ পৌর সভার সভাপতি ছিলেন, ইহাও আমাকে অনেকে বলিয়াছেন এবং আরামবাগের কথা নামক পুস্তকেও লিখিত আছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের Hooghly District Gazetteer নামক পুস্তকে লিখিত আছেঃ

This fort is the scene of the story "Durgesa-Nandini" by the celebrated Bengali novelist, Bankim Chandra Chatterjee, who was sub-divisional officer of Jahanabad about 20 years ago. (Page 289).

বঙ্কিমচন্দ্র জাহানাবাদে ছিলেন কি না, এই সম্বন্ধে কেহ জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, সম্পাদক বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন, ২, কালী লেন

ব্যক্তির সহিত (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) এই বিষয়ে কথাবার্তা বলিয়া আমি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র কখনই জাহানাবাদে ছিলেন না। কারণ তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি স্মরণার্থে আরামবাগ কোর্টে যে ফলক উৎকীর্ণ আছে তাহাতে লেখা আছেঃ

MANDARAN FORT IS THE SCENE OF THE STORY
"DURGESA NANDINI"
By
BANKIM CHANDRA CHATTERJI
WHO WAS SUB-DIVISIONAL OFFICER OF JAHANABAD
(ARAMBAGH) ABOUT 1892

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত বলিয়া কথিত আদালতগৃহ ও শ্বেতপ্রস্তরে লিখিত স্মৃতিফলকের আলোকচিত্র গ্রন্থে দেওয়া হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতে গড় মান্দারণের ঘটনা লিখিত আছে। কি ঘটনা হইতে দুর্গেশনন্দিনীর উৎপত্তি তাহার বিবরণ বঙ্কিমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাহা দিয়াছেন তাহা এইরূপ ঃ

"আমাদের খুল্ল পিতামহ একশত আট বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন.. তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা শুনিতাম তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্তর্গত; উহা প্রায়ই বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের অবসানের কথা। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড় মান্দারণের ঘটনা শুনিয়াছিলেন যদিও ঐ ঘটনা আকবরশাহ বাদশাহের সময় ঘটিয়াছিল, তথাচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদশাহদিগের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজ ঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চল যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিম্বদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজ ঠাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন এবং মান্দারণের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে, উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। রাজপুত কুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার-ঊনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পর দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল।" (বঙ্কিম-প্রসঙ্গ)

আরামবাগ চতুর্থ শ্রেণীর সহর; ইহার লোকসংখ্যা ১৯০১ হইতে ১৯৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কিরূপ ছিল, নিম্নে তাহা লিখিত হইল। ইহাকে সহর বলিলে সহরের অবমাননা করা হয়। এইরূপ অবহেলিত সহর পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও নাই।
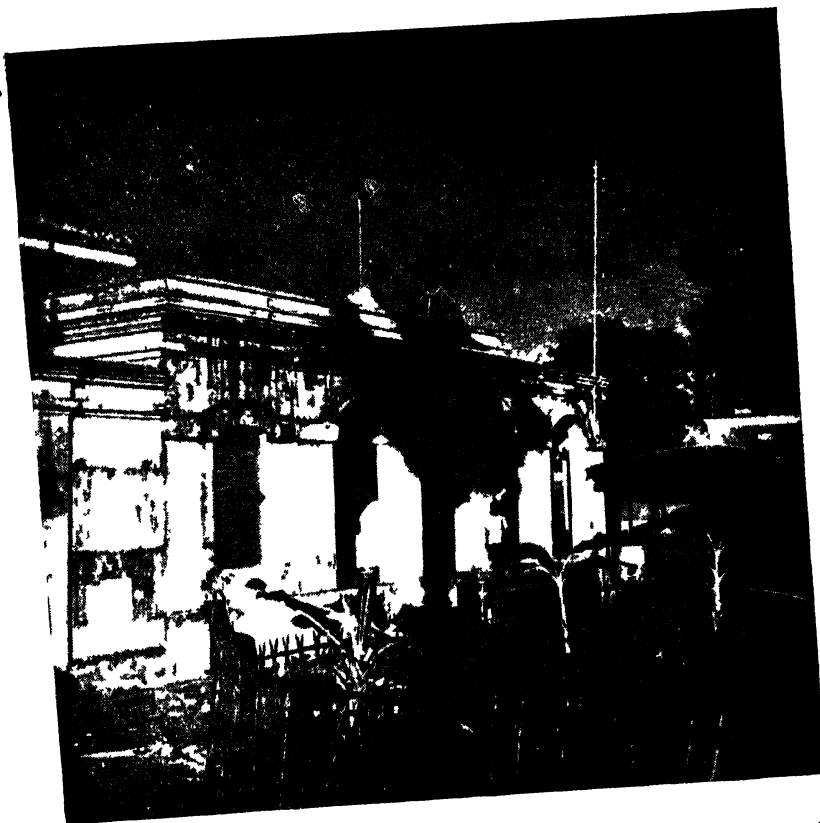
আবামবাগেব এই আদালতগৃহে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিফলক উৎকীর্ণ আছে (পৃঃ ১৩৩৬)
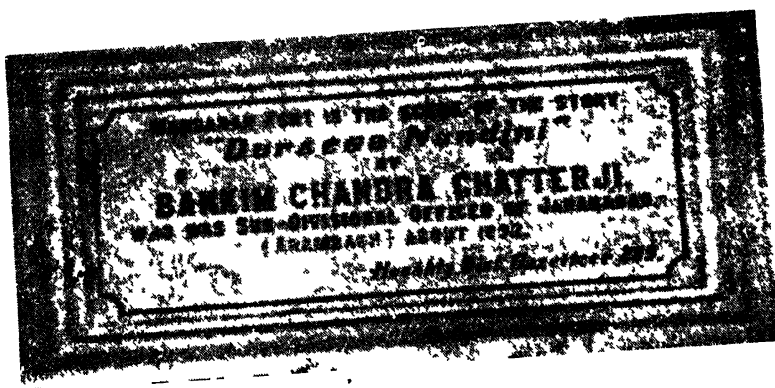
স্মৃতিফলকের আলোকচিত্র (পৃঃ ১৩৩৬)
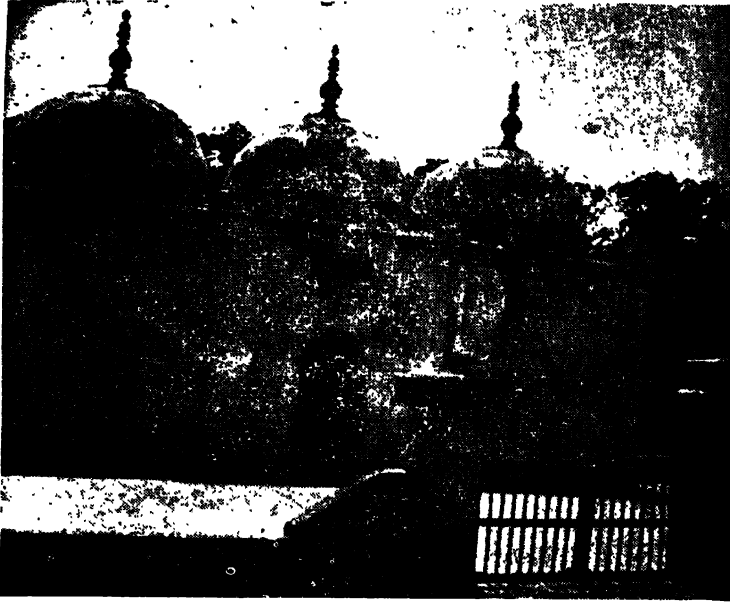
আরামবাগের প্রাচীন মসজিদ (পৃঃ ১৩৪৬)

রামমোহন স্মৃতিসৌধ—আরামবাগ (পৃঃ ১৩৪৭)
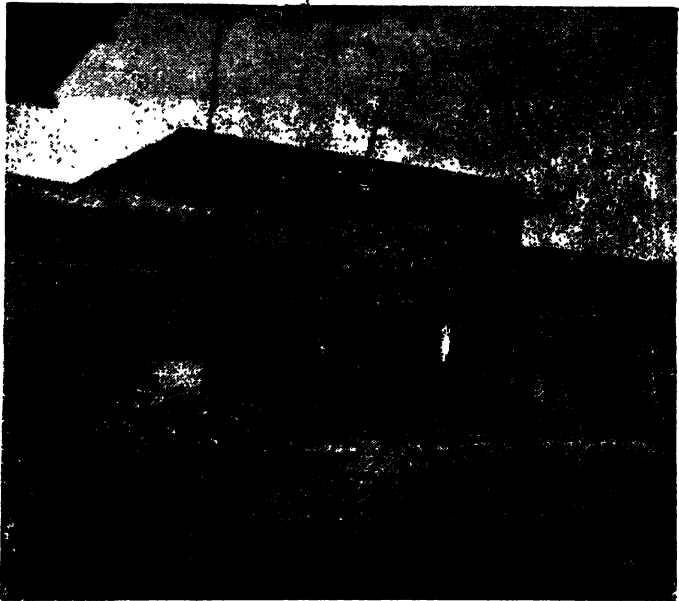
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (পৃঃ ১৩৪২)

রাজা জ্যোৎস্নাকুমার মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ১ঃ
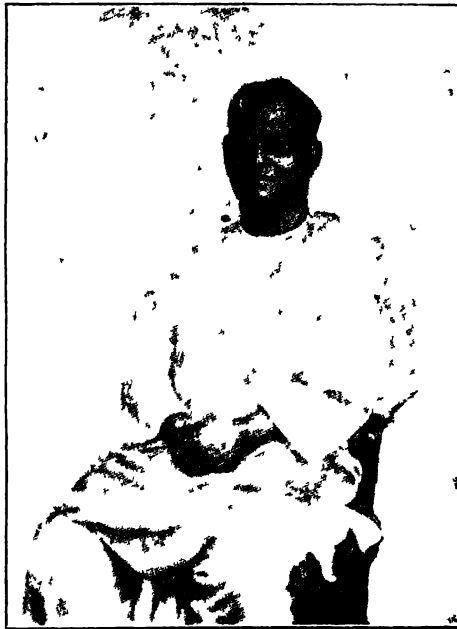
শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত (পৃঃ ৭৫২)

রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী (পৃঃ ১১৭৫)

আশুতোষ মিত্র (পৃঃ ১০৯৬)

আরামবাগের জনসংখ্যা

	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
১৯০১	৮,২৮১	৪,১৯৪	৪,০৮৭
১৯১১	৮,০৪৮	৪,০৬১	৩,৯৮৭
১৯২১	৭,৮৫৭	৪,১১১	৩,৭৪৬
১৯৩১	৭,৪৬১	৩,৯১৩	৩,৫৪৮
১৯৪১	৮,৯৯২	৪,৭৬৬	৪,২২৬
১৯৫১	১১,৪৬০	৬,১৩৯	৫,৩২১
১৯৬৩	১৬,৫৬০	৯,০৪২	৭,৫১৮

আরামবাগ মহকুমা চারটি থানা লইয়া গঠিত। ইহাদের নাম আরামবাগ, পুরশুড়া, গোঘাট ও খানাকুল। এই স্থানে পূর্বে সাতটি গড় ছিল, এখন নিম্নোক্ত পাঁচটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে "ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে" ২য় খণ্ডে লেখা আছেঃ

In the high lands there are various old garhs or forts of the Petty Jungle Rajas of which little is left but the site.

গড় মান্দারণ—রাজা মন্দারের গড় নামে খ্যাত। শালেপুরের গড়—রাজা শালিবাহনের গড় নামে খ্যাত। গড়বাড়ির গড়— রাজা রণজিৎ সিংহের গড় নামে খ্যাত। নন্দনপুরের গড়—বেড়বাড়ির গড় নামে পরিচিত। হেলারচকের গড়—কেয়ামাদির গড় নামে পরিচিত।

আরামবাগ সহরের সহিত নিম্নোক্ত চারটি প্রাচীন রাস্তা যুক্ত হইয়াছে। অন্যান্য রাস্তার নাম ৯১-৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১। রাণী অহল্যাবাঈ রোড বা ওল্ড বেনারস রোড (উত্তরপাড়া—শিয়াখালা—চাঁপাডাঙ্গা—মায়াপুর—আরামবাগ—ঘাটাল)

২। ওল্ড নাগপুর রোড (আরামবাগ—কামারপুকুর—ওন্ডা—বাঁকুড়া)

৩। আরামবাগ মেদিনীপুর বাদশাহী রোড।

৪। উড়িষ্যা বর্ধমান রোড (বর্ধমান—মান্দারণ—চন্দ্রকোণা—মেদিনীপুর—দাঁতন—জলেশ্বর)

আরামবাগ মহকুমার চারটি থানার জনসংখ্যা

[১৯৩১ খৃষ্টাব্দ]

	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
আরামবাগ	১,১৬,২১৪	৫৮,৩৭৪	৫৭,৮৪০
পুরশুড়া	৭৩,৮৮৫	৩৭,৬০১	৩৬,২৮৪
গোঘাট	১,২৪,৫১২	৬২,২৭৯	৬২,২৩৩
খানাকুল	১,৭৬,৮৫৩	৮৭,৮২১	৮৯,০৩২

আরামবাগের অবদান ও আবেদন

আরামবাগ মহকুমায় এখনও কোন রেলপথ হয় নাই, ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গে ইহাই একমাত্র মহকুমা যেখানে রেলপথে যাইবার আজও কোন উপায় নাই।

আরামবাগ মহকুমায় রাধানগরে যুগ-প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব-স্থান, ঘরগোয়াল গ্রামে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের জন্মস্থান, পূর্বে বনমালীপুরে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদি বসবাস ছিল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় আরামবাগ মহকুমার মধ্যগামী অহল্যাবাঈ রোড দিয়া পদব্রজে কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন। উক্ত রাজপথের মধ্যে পুড়শুড়া ও চাঁপাডাঙ্গার মধ্যবর্তী ঘাটে বর্ষাবিক্ষুব্ধ দামোদর নদের উত্তাল তরঙ্গ সন্তরণে পার হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অচলা মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। পুড়শুড়ার এগার মাইল দূরে পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে বীর-সাধক শ্রীশ্রীঅভিরাম গোস্বামীর পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত রণজিৎ রায়ের দীঘি। আরামবাগ শহরের চার মাইল পশ্চিমে গোঘাটে বিদ্যাসাগর জননী পুণ্যবতী ভগবতী দেবী ও সুপণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান। গোঘাটের চার মাইল পশ্চিমে হিন্দু-মুসলমান সৈন্য সমাবেশোজ্জ্বল, ঐতিহ্যময় গড়মান্দারণ এবং তন্নিকটবর্তী গ্রামে 'দুর্গেশনন্দিনীর' মধু মিলনতীর্থ শৈলেশ্বরের শিব-মন্দির। ইহার এক মাইল উত্তরে কামারপুকুরে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-স্থান। কামারপুকুরের আধ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হরিসভায় ভূমিলক্ষ্মীর বরপুত্র অন্ন-জল-দাতা প্রাতঃস্মরণীয় মাণিকরামের আবির্ভাব-স্থান এবং জনসাধারণের পানীয় জলের জন্য তাঁহার উৎসর্গীকৃত সুপেয় ও সুগভীর 'শুকসায়ের'। 'শুকসায়েরের' এক মাইল পশ্চিমে বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটী গ্রামে যুগধর্মমাতা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর আবির্ভাব-স্থান। এই সমস্ত মহাপুরুষ ও মনীষিগণের পূত আবির্ভাব-স্থান দর্শনের জন্য দেশ-বিদেশের দর্শকগণের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ জন্মে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই মহকুমায় কোন রেলপথ ও অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগসহ যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকায় দর্শকগণের আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। রেলপথ এবং নিয়মিত যানবাহনের অভাবে প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির সহিত জনসাধারণের অন্তর্বাণিজ্য ও সহজসাধ্য যাতায়াত সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হইতেছে ; এমন কি, কৃষিজ, পশুজ ও মৎস্যজ প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য থাকা সত্ত্বেও কোন শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। অধিকন্তু উক্ত মহকুমা নদীমাতৃক ও উর্বর ভূমিবিশিষ্ট হইয়া ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলসেচ ব্যবস্থার অভাবে অজন্মাহেতু বাসীন্দাগণের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে।

তারকেশ্বর হইতে হুগলী জেলার কৃষিপ্রধান মহকুমা আরামবাগের মধ্যদিয়া (ভায়া আরামবাগ, কামারপুকুর ও জয়রামবাটী হইয়া) বিষ্ণুপুর পর্যন্ত পথটির দূরত্ব মাত্র ৪৫ মাইল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে উহাতে রেলপথ করিবার প্রথম পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তাহার পর দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর বেশী অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রেলপথ হয় নাই। এই দূরত্ববিশিষ্ট রেলপথটি নির্মিত হইলে চুঁচুড়া সদর সহর ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে ও জনকল্যাণমূলক

কার্যের প্রধান সহায়ক হইবে। প্রস্তাবিত এই রেলপথ দিয়া কলিকাতা এবং তৎসংলগ্ন বাণিজ্য ও শিল্পাঞ্চলসমূহে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রদেশের কৃষিজ ও অন্যান্য পণ্য ন্যূনতম ব্যয়ে ও ন্যূনতম সময়ে সরবরাহ হইলে পল্লী অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে। এখন উহা কেন্দ্রীয় রেল বোর্ড ও পরিকল্পনা পরিষদের বিবেচনাধীন আছে। প্রস্তাবিত রেলপথটি যাহাতে অগ্রাধিকার লাভ করিয়া অনতিবিলম্বে নির্মিত হয়, তাহার জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পরিষদ ও রেল বোর্ডের সুবিবেচনা প্রার্থনা করিতেছি।

এই রেলপথ সম্বন্ধে ৩২৫-৩২৭ পৃষ্ঠায় মানচিত্রের সহযোগে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রেলপথ করিতে যদি অর্থাভাবে দেরী হয় তাহা হইলে সত্বরে তারকেশ্বর হইতে আরামবাগ পর্যন্ত রেল লাইনটি সম্প্রসারিত করিলে আপাততঃ জনসাধারণের কষ্টের লাঘব হয় এবং দূরত্ব ৪৫ মাইলের মধ্যে প্রায় ৩০ মাইল কমিয়া যায়।

॥ দুর্ভিক্ষ ॥

হুগলী জেলা তথা সমগ্র বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষ মহামারী মন্বন্তর একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ সাল) এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৩৫০ সাল) মধ্যবর্তী সময়ে এই দেশে আরো অনেকগুলি ছোটখাটো দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইয়াছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে হুগলী জেলা কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ ৬৫১-৫৩ বিবৃত হইয়াছে। ইহার পর ১২৭২-৭৩, ১২৮০-৮৩, ১২৯১-৯২, ১২৯৮-৯৯ এবং ১৩০৪-০৭ সালের দুর্ভিক্ষে হুগলী জেলা তথা আরামবাগ মহকুমা ও মেদিনীপুর জেলা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১২৭২-৭৩ সালের দুর্ভিক্ষে (১৮৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দ) আরামবাগের পীড়িত জনগণের সেবায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যথাশক্তি নিয়োগ করিয়া হাজার হাজার নরনারীর প্রাণ রক্ষা করেন।*

বর্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ সি. টি, মনট্রিসর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২০ মার্চ তারিখের এক পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যে পত্র দেন, তাহা এইরূপঃ

"..to express to you the warm acknowledgment of Government for your generous exertions in relieving the poor during the recent scarcity in the Hooghly District."

এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার আর এক সুসন্তান যদুনাথ তর্করত্ন "দুর্ভিক্ষ দমন নাটক" রচনা করিয়া "দেশীয় সন্তানগণ দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে

---

*ইহার পর শতবর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে ১৩৭৪ সালে আরামবাগের জনসাধারণ অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাইতেছে। সর্বত্রই অভাবের এক করুণ চিত্র, চালের জন্য হাহাকার। আজ আর বিদ্যাসাগর নাই—প্রাণ রক্ষা করিবে কে? এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইলঃ—

আরামবাগ শহরে ধানের মণ ৫০ টাকা এবং এক কেজি চালের দাম ২·১০ টাকা। ২।১ কেজির বেশি চাল কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। চারদিকে হাহাকার। অনশন, অর্ধাশন আরম্ভ হইয়াছে।

যে ভূমিকা গ্রহণ করেন" তাহা বিবৃত করেন। উক্ত নাটকে একটি চরিত্রের মুখ দিয়া নাট্যকার বলেনঃ "জাহানাবাদ মহকুমার জন্য আপনারা ভাবিত হইবেন না। উহা সুগৃহীতনামা দয়ারসাগব শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি, তিনি তাহার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান আছেন। তাঁহার যত্ন ও চিৎকারধ্বনিতে রাজকর্মচারীদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।"

এই নাটকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক জাড়া নিবাসী রায় মহাশয়ের চেষ্টায় এবং আরামবাগের তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের যত্নে ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, শ্যামবাজার ও খানাকুলে অন্নছত্র স্থাপিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ক্ষীরপাইর, ঈশ্বরচন্দ্র রায় চন্দ্রকোণার, উমেশচন্দ্র রায় রামজীবনপুরের ও শম্ভুচন্দ্র বায় শ্যামবাজারে অন্নছত্র স্থাপন কবিয়া দরিদ্র ব্যক্তিগণকে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করেন।

এই নাটকে আরামবাগের তৎকালীন অবস্থা তথা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আকাশ-ছোঁয়া দাম এবং সাধারণ মানুষের উপর তাহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার কথা কিভাবে বর্ণিত আছে, নিম্নের কয়েক লাইন হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

চাল ডাল ক্রমেই হতেছে অগ্নিমূল।
ছোট বড় সব ঘরে হল অপ্রতুল॥
কত লোক ঘব ছাড়ি কত দিকে ধায়।
নাহি মানে জাতি পোড়া পেটের জ্বালায়॥
জননী মমতাহীন সন্তানে বেচিছে।
জঠর জ্বালায় কত অনর্থ করিছে॥

হুগলী জেলার গেজেটিয়ারে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ওম্যালিসাহেব বলেনঃ

The scarcity and distress were severest in the west of the district, in thana Jahanabad, where the failure of the corps was most general, and where there was a large non-agricultural population of the weaver caste. In August relief centres were opened at seven places in the Jahanabad subdivision, and in September two more were opened at Pandua and Mahanad in the east of the district.

ঝড় ও ভূমিকম্প বিগত একশতাব্দীর মধ্যে আরামবাগের ক্ষতিও এস্থানে উল্লেখযোগ্য। ৫ অক্টোবর ১৮৬৪ ও ১৫ অক্টোবর ১৮৭৪ এই দুইটি ঝড়ে এই অঞ্চলে বহু গবাদি পশু ও লোকক্ষয় এবং অনেক গৃহ পতিত হয়। ইহা ছাড়া মুসলমান রাজত্বে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ১১ ও ১২ তারিখে হুগলী জেলায় যে প্রলয়ঙ্কর ঝড় ও জল হয়, তাহাতে বিশ হাজার নৌকা ডুবিয়া যায় ও তিনলক্ষ নরনারী জীবন হারায় ।

বিহারের তৎকালীন গভর্ণর মানসিংহ ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে যখন উড়িষ্যা অভিযানের জন্য অগ্রসর হন, তখন তিনি ভাগলপুর ও বর্ধমান হইয়া উড়িষ্যার সীমান্তে তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া আরামবাগে উপস্থিত হন। কিন্তু বর্ষার জন্য তিনি আব অগ্রসর হইতে না পারায় আরামবাগে বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সৈন্যদের লইয়া এই স্থানে অবস্থান করেন।

আরামবাগে ১৮০৩, ১৮১১, ১৮৫২, ১৮৫৩ ও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে বহু ঘরবাড়ি পড়িয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ১৪ই জুলাই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে নিয়ালী গ্রামের ত্রিকোণমিতিক স্তম্ভ ধূলিস্যাৎ হইয়া যায়। এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ জুনের ভূমিকম্পে বাড়ি পড়া ছাড়া কিছু লোকক্ষয় হয়।

বন্যা আরামবাগের উন্নতির একমাত্র অন্তরায়। পূর্বে প্রতি বৎসর এই স্থানে বন্যা হইত এবং চাষ আবাদ নষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হইত। বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদীতে বাঁধ না দেওয়া ও যত্রতত্র রেললাইন প্রস্তুত করাব ফলেই যে এইরূপ বন্যা হয় তাহা পূর্বে ৪৮-৫০ ও ৭২-৭৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আরামবাগ ও থানাকুল এই দুইটি থানাই বন্যায় সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই জন্য এই দুইটি প্রাচীন জনপদ কালক্রমে নগন্য স্থানে পরিণত হইয়াছে। বন্যা সম্বন্ধে ওম্যালী সাহেব গেজেটিয়ারে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্যঃ

The part of the district most liable to scarcity consists of thanas Aıambagh and Khanakul, which are exposed to the floods of the Damodar almost every year.

এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিতে' যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এইরূপঃ

জাহানাবাদ মহকুমার অন্তঃপাতী ক্ষীরপাই রাধানগর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি গ্রামে অধিকাংশ তাঁতির বাস। তাঁতিরা বস্ত্র বয়ণ ব্যতীত অন্য কোন কার্য করিতে অক্ষম। সুতরাং যে অবধি বিলাতি কলের কাপড় হইয়াছে, তদবধি তন্তুবায়গণের অবস্থা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। যেরূপ কাপড় ইহারা ২॥ টাকা জোড়া বিক্রয় করিত, সেইরূপ কলের কাপড় ১॥ বা ১ টাকা বারো আনা জোড়া বিক্রয় হইতেছিল, সুতরাং তৎকালে ইহাদের বস্ত্র বিক্রয় হইত না। ঐ সময়ে টাকায় পাঁচ সের চাউল বিক্রয় হইত, তাহাও সকল সময়ে দুষ্প্রাপ্য। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই তিন মাস অনেকেই ঘটী, বাটী, ও অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করে।

পরে চাউল ক্রয়ে অপারক হইয়া কেহ কেহ বুনো ওল কচু খাইয়া দিনপাত করে এবং নানা প্রকার কষ্টভোগ করিয়া অনাহারে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। শত শত ব্যক্তি সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া পেটের জ্বালায় কলিকাতায় প্রস্থান করে ও তথায় পথে পথে ভিক্ষা করিয়া উদরপূর্তি করিত। ৭৩ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে এ প্রদেশের অর্থাৎ জাহানাবাদ মহকুমার প্রায় অশীতি সহস্র লোক অন্নাভাব প্রযুক্ত কলিকাতায় যাইয়া তথাকার অন্নছত্রে ভোজন কবিত। তৎকালে কেহ জাতির বিচার করে নাই। জননী সন্তানকে পথে ফেলিয়া দিয়া কলিকাতা প্রস্থান করেন। অনেক কুলকামিণী জাত্যাভিমানে জলাঞ্জলী দিয়া জন্মান্তরিতা হয়। চতুর্দ্দিকেই হাহাকার শব্দ, কেহ কাহারও প্রতি দয়া করে নাই, সকলেই অন্নচিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছিল।

অগ্রজ মহাশয় (বিদ্যাসাগর) বীডন সাহেব ও অন্যান্য সাহেবকে অনুরোধ করায় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেব স্থানে স্থানে অন্নছত্র স্থাপন জন্য ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটবাবুকে

(ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র) আদেশ করেন। তিনি ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, শ্যামবাজার থানাকুল প্রভৃতি এই কয়েকটি বিখ্যাত ও বহুজনাকীর্ণ গ্রামে গবর্ণমেণ্টের অন্নছত্র স্থাপন করেন। কার্যদক্ষ বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনন্যকর্মা ও অনন্যমনা হইয়া এ প্রদেশের সম্ভ্রান্ত দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ পূর্বক যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করিয়া উক্ত অন্নছত্রের সাহায্যার্থ প্রদান করেন। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ পর্যন্ত গবর্ণমেণ্টের অন্নছত্রের কার্য চলিল। ইহাতে দরিদ্রলোকেরা ভোজন করিয়া প্রাণরক্ষা করে।

বর্গীর অমানুষিক অত্যাচার, ম্যালেরিয়ার ভয়াবহ আক্রমণ ও দামোদরের ভীষণ বন্যায় আরামবাগ তাহার সমস্ত ঐতিহ্য হারাইয়া পড়ো জঙ্গলে জায়গায় পরিণত হইয়াছে। পূর্বে যেখানে প্রাচুর্যের প্লাবন ছিল, বর্তমানে শিল্পসমূহ বিনষ্ট হওয়ায় আজ সর্বত্র হতশ্রীভাব সমস্ত মহকুমাকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। মুসলমানদের একটি প্রাচীন মসজিদ ছাড়া আরামবাগ সহরে আর কোন প্রাচীন নিদর্শন নাই। মসজিদের শীর্ষে উহা নির্মাণের তারিখ লিখিত আছে। কিন্তু উহা এত অস্পষ্ট যে, উহার পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব।

এই অঞ্চলে বর্গীর অত্যাচার সম্বন্ধে মহারাষ্ট্র পুরাণে যাহা লিখিত আছে, তাহা এইঃ

কোন কোন গ্রাম বরগি দিলা পোড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম শুন মন দিয়া॥
চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর আর দিগনগর।
খিরপাই পোড়ায় আর বর্ধমান সহর॥
নিমগাছি সেড়গা আর সিমইলা।
চণ্ডিপুর শ্যামপুর গ্রাম আনাইলা॥
জেই মাত্রে পুনরপি ভাস্কর আইল।
তবে সরদার সকলকে ডাকিয়া কহিল॥
স্ত্রী-পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলয়ার খুলিয়া সব তাহারে কাটিবা॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল।
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা সত সত কৈল॥

আরামবাগ মহকুমায় এখন তেইশটি বসতিহীন গ্রাম আছে, উহার বিবরণ ৬৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় লোকক্ষয় ও দেশত্যাগে গ্রামগুলির আজ এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে আরামবাগ সম্বন্ধে লিখিত আছেঃ Arambagh is distinctly rural in appearance, the houses being mainly 'kutcha' and most of the roads unmetalled, and it has no large trade or industry.

পূর্বে আরামবাগে টেলিগ্রাফ অফিস ছিল না; তারবার্তা প্রেরণ করিবার জন্য বেঙ্গাই নিবাসী মুন্সী হেরামতুল্লা সরকারের হস্তে দশ হাজার টাকা প্রদান করেন। পরে তারবার্তা প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হয়।

ম্যালেরিয়া মহামারী যাহা 'বর্ধমান জ্বর' বলিয়া কথিত উহাতে এই স্থান কিরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহার একটি বিবরণ তৎকালীন পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইলঃ

"স্বয়ং যমরাজ বুঝি হুগলী জেলার এই সমস্ত গ্রামগুলি ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে—তাই ভীষণ ম্যালেরিয়া-রাক্ষস করাল-বদন-ব্যাদান করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামগুলি হইতে অহোরাত্র ভীষণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইতেছে। এই ক্রন্দন-ধ্বনির সঙ্গে শৃগাল-কুকুরের বিকট রবের কি ভীষণ সমাবেশ। ঘরে বাহিরে শবদেহ—শ্মশানে শবদেহ, পুষ্করিণীতে শবদেহ, পথে ঘাটে মাঠে যে দিকে চাহিবে কেবল শবরাশি। চারিদিকে পচা শবদেহের উৎকট দুর্গন্ধ; এই ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী ভাদ্র মাসের শেষ-ভাগে আগমন করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে হুগলী জেলার অধিকাংশ গ্রাম একেবারে ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিয়াছিল।" (মানব চিত্র—রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়)

১লা জুলাই ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে হরিপাল, চণ্ডীতলা ও বালি দেওয়ানগঞ্জে ইউনিয়ন কমিটি হয়। কমিটির আয় কতকটা খোয়াড় ও কতক জেলা বোর্ডের সাহায্য হইতে হইত। আরামবাগে আদালত ও গোঘাটে থানা স্থাপন হইবার পূর্বে বালি দেওয়ানগঞ্জে থানা ও আদালত ছিল। আরামবাগে আদালত স্থানান্তরিত হইবার পরেও বালিতে একটি মুন্সেফী আদালত ছিল। কালাচাঁদ গোস্বামী নামে একজন সিদ্ধপুরুষ বালিতে বাস করিতেন: তাঁহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী আজও প্রচলিত আছে। তাঁহার দন্ত, পাদুকা, কৌপীন প্রত্যহ পূজা হয়। বালিতে তাঁহার সমাধি মন্দির আছে। উক্ত স্থানে প্রতি বৎসর উৎসব হয়; উৎসবের উচ্ছিষ্ট অন্নভোজন করিতে বহু দেশ-দেশান্তর হইতে রোগী আসে। এই অন্ন ভোজন করিলে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ ১৩৫৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে আরামবাগে প্রসিদ্ধ দেশকর্মী আশুতোষ দাসের স্মৃতিরক্ষার্থে 'আশুতোষ চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র' খোলা হইয়াছে। এই চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে চোখের ছানীতে অস্ত্রোপচার করা হয়। ডাঃ দাসের বিষয় ১১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আরামবাগ মহকুমা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি: তাই তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে আরামবাগ সহরে "রামমোহন স্মৃতিসৌধ" নির্মিত হইয়াছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ২৮শে মে তারিখে ভারতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন সম্পাদক কালা বেঙ্কট রাও এই স্মৃতিসৌধের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তৎকালীন হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীঅতুল্য ঘোষ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। ইহার মধ্যে সভা-সমিতির জন্য একটি হলঘর আছে। এতদ্ব্যতীত "রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার" এই ভবনে অবস্থিত। পাঠাগারের ক্লাব, খেলাধুলা বিভাগ ও নাট্য বিভাগ আছে। পাঠাগরের কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর গান্ধী-জয়ন্তী, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, রামমোহন স্মৃতি উৎসব; বসন্তোৎসব, বর্ষামঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত করেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে আরামবাগে "জ্ঞানেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী" নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই লাইব্রেরী আরামবাগবাসীর জ্ঞানপিপাসা

মিটাইয়াছে। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর জ্ঞানেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী রামমোহন রায় পাঠাগারে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বেঙ্গল লাইব্রেরী ডিরেক্টরী হইতে জানা যায় যে, সেই সময় এই লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ছিল ১৫৮০। আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটি হইতে অর্থসাহায্য ছিল ২৪৲ টাকা। যে মহাত্মার স্মৃতিরক্ষার্থে জ্ঞানেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাঁহার নাম চিরদিনের মত লুপ্ত করিয়া দেওয়া সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

আরামবাগ সহরের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোহর; অনেকটা চন্দননগরের ন্যায়। চন্দননগরকে ভাগীরথী পূর্বদিকে যেরূপ বেষ্টন করিয়া আছে, দ্বারকেশ্বরও আরামবাগকে সেইরূপ বলয়াকারে পশ্চিমদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। কিন্তু জীর্ণ কাঁচা বাড়ী, কাঁচা নর্দমা ও কর্দমাক্ত রাস্তা প্রাকৃতিক মনোহারিত্বকে বিস্মৃত করাইয়া দেয়। দ্বারকেশ্বর নদ পার হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর যাইতে হয়। দূরত্ব মাত্র পাঁচ মাইল। দ্বারকেশ্বর নদীর উপর এক হাজার বাহাত্তর ফুট দৈর্ঘ্য একটি পাকা স্থায়ী সেতু সম্প্রতি নির্মিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নামানুসারে ইহার নাম রাখা হইয়াছে **রামকৃষ্ণ সেতু।** রাত্রে আলোকমালায় সুশোভিত এই সেতু এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে।

আরামবাগ পৌরসভা পার্শ্ববর্তী আঠারটি গ্রাম লইয়া গঠিত। ইহার আয়তন প্রায় আট বর্গ মাইল। এই সহরে পূর্বে কেরোসিন তেলের আলো ছিল; ১৯৫৫ সাল হইতে ইলেকট্রিক আলো হইয়াছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। আরামবাগের রাস্তা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত—"বর্ষাকালে কর্দমাক্ত, অন্যকালে ধূলিসিক্ত।" মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে পায়খানার কোন ব্যবস্থা নাই এবং সহরের জল নিকাশেরও কোন সুব্যবস্থা নাই। এখন সহরের মধ্যে পিচের ভাল রাস্তা হইয়াছে। কিন্তু গ্রামের অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং। ট্যাক্সের হার আরামবাগে হুগলী জেলার মধ্যে নিম্নতম ছিল।

আরামবাগে উচ্চ বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র আছে; নাই কেবল ভাল রাস্তাঘাট ও যানবাহনের কোন সুবন্দোবস্ত। সেজন্য বর্ষাকালে কলিকাতা হইতে এই ৪৫ মাইল পথ অতিক্রম করিতে বহু সময় লাগে। এই চির অবহেলিত আরামবাগের দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

আরামবাগ মহকুমার আয়তন ৪১২ বর্গমাইল। ইহার আকৃতি অনেকটা ত্রিভূজের মত। ইহার উত্তর-পশ্চিমে বিষ্ণুপুর মহকুমা ও বর্ধমান সদর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের কিছু রূপ-নারায়ণ ও দ্বারকেশ্বর এবং বাকি অংশ ঘাটাল ও মেদিনীপুর সদর মহকুমা দ্বারা বেষ্টিত। মহকুমার ভূমি সর্বত্র এক নয়। গোঘাট থানার পশ্চিমাংশ অসমতল এবং কিছু আবার উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। এই থানা পূর্বে দামোদর পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর এবং দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদী দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া প্রতি বৎসর বর্ষাকালে বন্যায় গোঘাটের নিম্নভূমি প্লাবিত হইয়া যায়।

॥ গৌরহাটি ॥

গৌরহাটি আরামবাগ থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ইহার আয়তন দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল ও প্রস্থে তিন মাইল। এই স্থানে বহু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। আরামবাগ শহর হইতে এই গ্রামের দূরত্ব প্রায় নয় মাইল; আরামবাগ হইতে বন্দর পর্যন্ত রাস্তাটি এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। গৌরহাটি ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে বাইশটি গ্রাম আছে। ইউনিয়নের লোকসংখ্যা ৯ হাজার ৬ শত ৫১ জন।

প্রাচীনকালে গৌরহাটির তাঁতের কাপড় বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল; এখনও এই গ্রামে বহু তাঁতী বাস করে এবং তাঁতের কাপড় তৈয়ারী হয়। এখানকার প্রস্তুত কাপড় হাওড়া হাটে বিক্রয়ার্থে চালান যায়।

গৌরহাটিতে সোমবার ও শুক্রবার হাট বসে। হাটতলায় প্রতি বৎসর লক্ষ্মীপূজার পরদিন হইতে চারদিন যাবৎ খুব সমারোহের সহিত হরিসভা উপলক্ষে কীর্তন ও একটি মেলা হয়। সংকীর্তন ও মেলা উপলক্ষে চতুস্পার্শ্বস্থিত গ্রাম হইতে এই স্থানে বহু লোক সমাগম হয়। রথযাত্রা উপলক্ষেও গৌরহাটি গ্রামের মেলার প্রসিদ্ধি আছে।

এই গ্রামে নৈশবিদ্যালয়, মধ্য ইংরাজী, উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়. দাতব্য চিকিৎসালয়, ডাকঘর, সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠান আছে। গ্রামের উন্নতীকল্পে শ্রীবলাইচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, শ্রীসাতকড়িচরণ সিংহরায় ও ডাঃঅতুলচন্দ্র কুণ্ডুর নাম উল্লেখযোগ্য। এই স্থানের অধিকাংশ লোক কৃষিকাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ধান, পাঠ, ও কলাই। গৌর-হাটির বর্তমান জনসংখ্যা ৩,৭৭৯ জন।

গৌরহাটি ইউনিয়নের অধীন ভবানীপুর গ্রামে শাখামাল পীরের একটি মেলা হয়। গৌরহাটি মৌজায় অগ্নিকোণে ডিহিপুকুরে প্রতি বৎসর ১৪ই হইতে ১৬ই মাঘ পর্যন্ত এই তিন দিন পীরের মেলা উপলক্ষে আশে-পাশের গ্রাম হইতে বহু মুসলমান পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য জমায়েত হয়।

গৌরহাটির তাঁতের শাড়ী ও চাবিতালার আজও সুনাম আছে।

গৌরহাটির নিকট মাধবপুর ইউনিয়নের মধ্যে কানপুর গ্রামে কনকেশ্বর শিব খুব জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত। কনকেশ্বর শিবের গাজন ও কালুরায়ের মেলায় বহু জন-সমাগম হয়। কানপুরের লোকসংখ্যা ৮০৫ জন। এইগ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

মাধবপুর গ্রামের রায় বংশ প্রাচীন জমিদার বংশ; ইহারা রাজা রণজিৎ রায়ের বংশধর। ইহাদের প্রাচীন হিন্দুধর্মোক্ত নানা ক্রিয়াকলাপাদি ও অতিথিসেবার কথা আজও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। মাধবপুর গ্রামের লোকসংখ্যা ৩৬২ জন। এই ইউনিয়নের কৃষ্ণ-বল্লভপুর গ্রামে তাঁতশিল্পের কাজ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

তিরোল ॥ আরামবাগ মহকুমায় আরামবাগ থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। তিরোল ইউনিয়নের মধ্যে পনেরটি গ্রাম আছে; এই ইউনিয়নের লোকসংখ্যা ৭ হাজার ২

শত ৩৩ জন। এই ইউনিয়নের মধ্যে তিরোল একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রাম। তিরোলের লোকসংখ্যা ১৬৬২ জন। তিরোল গ্রামের কালীমাতা এই অঞ্চলে জাগ্রতা দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তিরোলের পাগলের বালা মস্তিস্কবিকৃতি রোগে অব্যর্থ প্রতিষেধক বলিয়া প্রখ্যাত। ১০৯০ সালে তিরোলের ত্রিলোচন বিদ্যাবাগীশ এই কালী প্রাপ্ত হন বলিয়া শুনা যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুক্তারাম চক্রবর্তী স্বপ্নে পাগলের অসুখ হইলে লোহার বালা হাতে পরাইয়া দিলে সারিয়া যাইবে বলিয়া একটি মন্ত্র পান। সেই সময় হইতে তিরোলের পাগল রোগের বালা গ্রহণ করিবার জন্য সর্বধর্মাবলম্বীর লোকের এই স্থানে সমাবেশ হয়।

তিরোল ইউনিয়নের মধ্যে আরামবাগ হইতে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ব্যতীত আর কোন রাস্তা না থাকায় এই অঞ্চলে যাতাহাতের এখনও খুব অসুবিধা আছে।

তিরোল গ্রামে কুটির শিল্প হিসাবে বাঁশ পেতে ঝুড়ি, কুলা, ধুচুনী প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। এই গ্রামে সোমবার ও শুক্রবারে পূর্বে খুব বড় একটি হাট বসিত। বর্তমানে হাটটি খুব ছোট হইয়া গিয়াছে।

তিরোলের মিত্রবংশ প্রসিদ্ধ বংশ বলিয়া খ্যাত। এই বংশের মনসারাম মিত্র বর্ধমান কালেক্টারের পেশকার ছিলেন। বর্ধমানের কুমার প্রতাপচাঁদকে জাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে ঐতিহাসিক মোকদ্দমা হয়, মনসারাম মিত্র সেই মামলায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রতাপচাঁদকে জাল প্রতিপন্ন করিতে সাহায্য করেন। এই মামলায় প্রতাপচাঁদ তাঁহার জমিদারী হইতে বঞ্চিত হন এবং কারাবাস করেন। মনসারাম ইহাতে বহু অর্থ অর্জন করেন। তিরোলে তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তিনি জলকষ্ট নিবারণের জন্য গ্রামে একটি পুস্করিণী খনন করান, উহা "সরবেশ" নামে খ্যাত।

এই গ্রামে কাটারি, বঁটি প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। সোনা রুপার গহনা প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েকঘর স্বর্ণকার গ্রামে এখনও আছে।

॥ বালি-দেওয়ানগঞ্জ ॥

বালি-দেওয়ানগঞ্জ ॥ আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অন্তর্গত বালি ইউনিয়নের মধ্যে বালি ও দেওয়ানগঞ্জ প্রসিদ্ধ গ্রাম; আরামবাগ মহকুমার মধ্যে পূর্বে এইরূপ সমৃদ্ধশালী পল্লী আর দ্বিতীয় ছিল না। সুদূর অতীতে নয় ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থাতেও এইরূপ শিল্পপ্রধান ব্যবসাক্ষেত্র ও ইহার সমৃদ্ধি যে কোন শহরের লোভনীয় ছিল। ১২৬০ সালের পূর্বে এক বালি-দেওয়ানগঞ্জে ত্রিশ হাজারের অধিক লোক বসবাস করিত। তন্মধ্যে ছয় হাজারের অধিক তন্তুবায়ের বাস ছিল। এই গ্রামের আটটি বাজার বা স্বয়ংসম্পূর্ণ পটী তখন বয়নশিল্প, রেশম শিল্প, বাসন শিল্প এবং শিল্প শিক্ষাশ্রম প্রভৃতিতে সুসমৃদ্ধ ছিল।

ক্রফোর্ড সাহেব 'হুগলী মেডিক্যাল গেজেটিয়ারে' লিখিয়াছেন যে দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিমে অবস্থিত দেওয়ানগঞ্জ রেশম কারবারের প্রধান স্থান ছিল। দেওয়ানগঞ্জে প্রস্তুত সিল্কের কাপড় তখন জলপথে ঘাটাল দিয়া কলিকাতায় যাইত এবং তথা হইতে উহা ইউরোপে রপ্তানী হইত।

॥ ১০১ ॥

ফুরফুরার প্রাচীন মসজিদ (পৃঃ ১৩২৪)
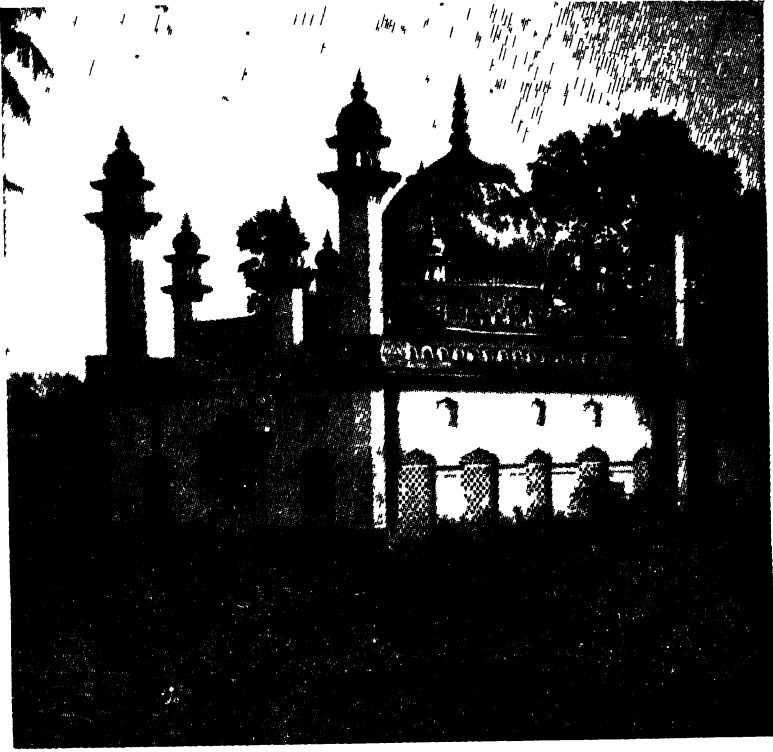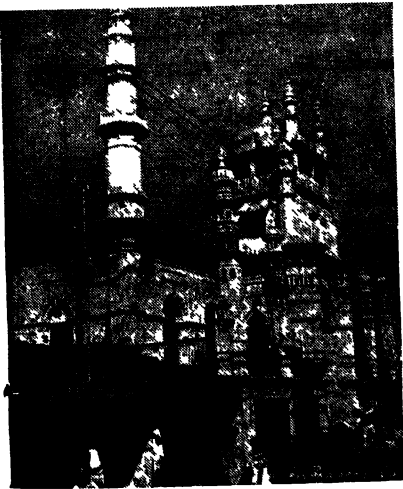
রিষড়ার বড়মসজিদ, ১৮৭০ খৃঃ স্থাপিত (পৃঃ ১২১৪)

শিবমন্দির—রিষড়া (পৃঃ ১২১৬)

সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির—রিষড়া (পৃঃ ১২১৫)
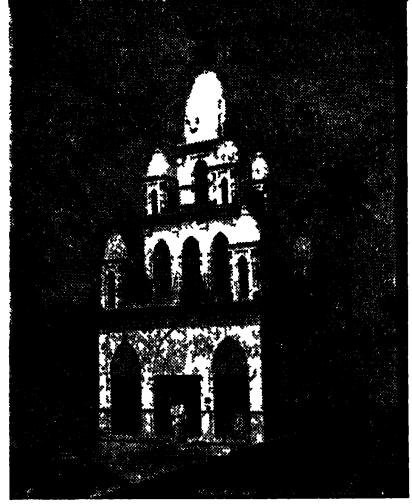
গৌড়ীয-মঠ—রিষড়া (পৃঃ ১২১৬)
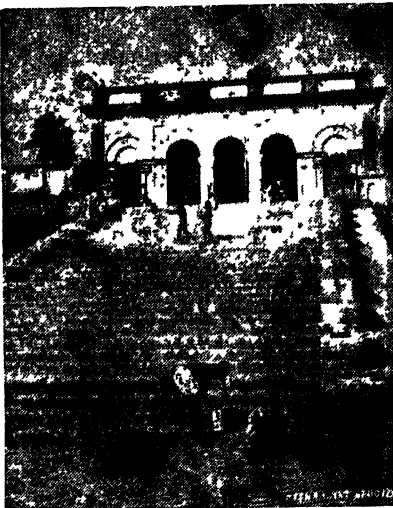
তিলকরার দাঁ ঘাট—রিষড়া (পৃঃ ১২১৬)
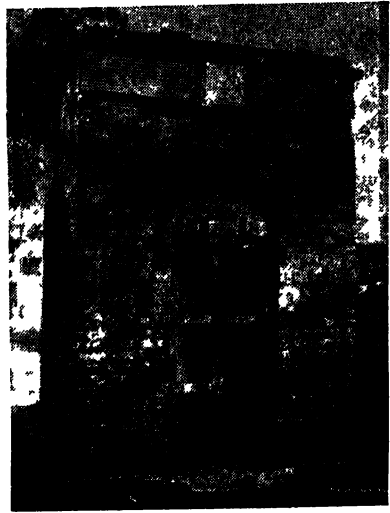
কাল্‌রায়ের মন্দির—রিষড়া (পৃঃ ১২১৭)

হেষ্টিংসেব 'বিষড়া-হাউস" (পৃঃ ১২১৩)
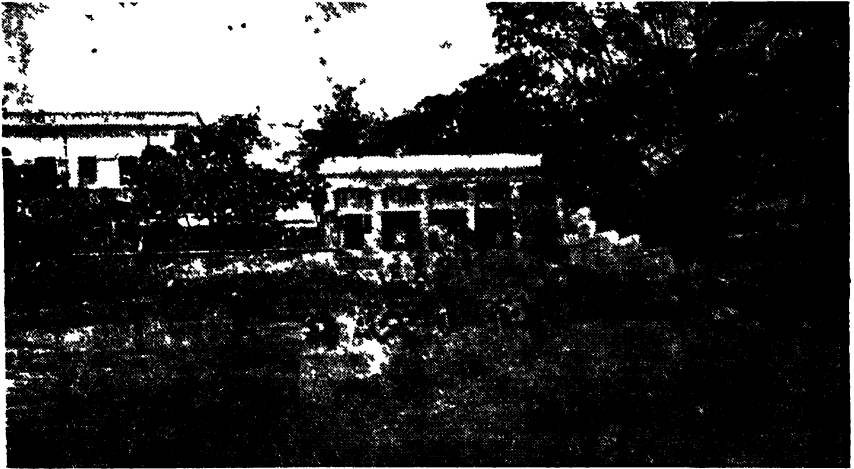
বিশ্বম্ভব সেনেব ঘাট—বিষড়া (পৃঃ ১২১২)

[বিষড়াব আলোকচিত্রগুলি পৌব-সভাপতি
ডাঃ নাবায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়েব সৌজন্যে প্রাপ্ত]
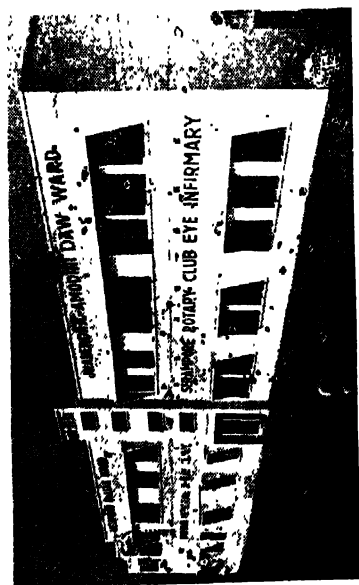
রিষড়া সেবা সদন (পৃঃ ১২১৮)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়—রিষড়া (পৃঃ ১২১৪)

পার্থসারথি মন্দির—রিষড়া (পৃঃ ১২১৬)
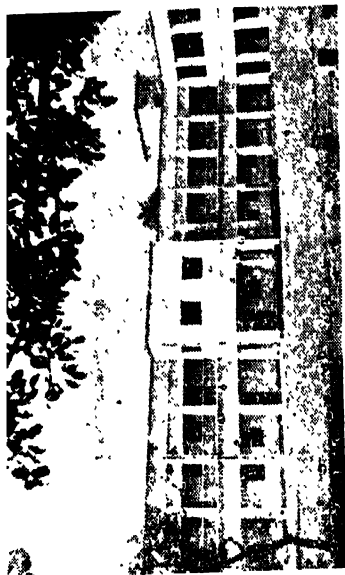
শ্রীমানী ঘাট, অদূরে অর্ধনারীশ্বর মন্দির (পৃঃ ১২১৬)

Dewanganj on the west bank of the Darakeswar in Goghat Thana, was the seat of an important silk trade which was financed from upper India to which the silk manufactured was transported on camels, and exported from Ghatal to Calcutta, and thence to Europe.

বালি বলিয়া পূর্বে শ্রীরামপুর মহকুমায় একটি পল্লী ছিল বলিয়া আরামবাগের বালি 'বালি-দেওয়ানগঞ্জ' ও শ্রীরামপুরের বালি 'বালি-উত্তরপাড়া' বলিয়া বহির্জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ বালি ও দেওয়ানগঞ্জ দুইটি পল্লী বলিয়া সরকারী কাগজ পত্রে লিখিত হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে একই পল্লীর দুইটি পাড়া বলিলে ঠিক বলা হয়। যেমন বালির উত্তর পল্লীর নাম উত্তরপাড়া। শ্রীরামপুরের বালি এখন হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত।

বালির পূর্বনাম 'মকদমনগর' ছিল; মকদম পীরের একটি ক্ষুদ্র আস্তানা অদ্যাপি এই গ্রামে আছে। একবার দ্বারকেশ্বর নদের প্রবল বন্যায় বালির ঘরবাড়ি, হাট বাজার সমস্ত ভাঙিয়া যায় ও গ্রামের সমস্ত স্থান বালি চাপা পড়িয়া যায়। সেই সময় শালিবাহন রাজার দেওয়ান জগৎসিংহ মকদমনগরের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হন এবং তিনি বহু ব্যয়ে গ্রামের সমস্ত বালি সরাইয়া নগরটি পুনরুদ্ধার করেন এবং এই নগরের দক্ষিণে একটি গঞ্জ বা বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। এই দিগন্ত বিস্তৃত বালুকাময় স্থানটি সেই সময় হইতে 'বালি' নাম ধারণ করে এবং দেওয়ানজীর চেষ্টায় যে স্থানে গঞ্জ স্থাপিত হয় সেই স্থান 'দেওয়ান-গঞ্জ' বলিয়া প্রখ্যাত হয়। বালি ইউনিয়নের মধ্যে জগৎসিংহের নামে 'জগৎপুর' বলিয়া একটি গ্রাম অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহার জনসংখ্যা ৪ শত ৪ জন।

ইংরাজ রাজত্বকালে এই বালির বয়নশিল্প, রেশমশিল্প, বাসনশিল্প প্রভৃতি কুটীরশিল্প ব্যতীত বালি এই অঞ্চলের অন্যতম শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল। এই গ্রামে তখন শতাধিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আটজন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের টোল ছিল এবং দেশ-দেশান্তর হইতে ছাত্রগণ তথায় অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। টোল প্রভৃতি শিক্ষায়তনগুলি ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পল্লীবাসীগণও প্রকৃত শিক্ষার অভাবে জ্ঞান-হীন হইয়া পড়ে।

কালাচাঁদ গোস্বামী নামে এক সিদ্ধপুরুষ বালিতে বাস করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা এই অঞ্চলে শুনিতে পাওয়া যায়। দেহান্তরের পর তিনি বৃন্দাবনে তাঁহার এক পরিচিত ব্যক্তিকে সশরীরে দর্শন দিয়া তাঁহার ব্যবহৃত দন্ত, খড়ম ও কৌপীন তাঁহাকে দেন। উক্ত জিনিষগুলি আজও প্রত্যহ পূজা করা হয়। বালিতে তাঁহার সমাধি-মন্দিরে প্রতি বৎসর সমারোহের সহিত একটি উৎসব হয় এবং ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য মহোৎসবের পর উচ্ছিষ্ট অন্ন রোগীগণ ভোজন করেন।

কালাচাঁদের সমসাময়িক আর একজন মুসলমান সিদ্ধমহাপুরুষের নামও এই অঞ্চলে খুব প্রসিদ্ধ। তাঁহার নাম আজম খাঁ পীর। কিম্বদন্তি যে দ্বারকেশ্বরে ভীষণ বন্যার সময় তিনি হাঁটিয়া নদী পার হইতেন। অভীষ্ট ফল লাভের জন্য তাঁহার নামে লোকে সিন্নী মানত করে।

বালিতে অসংখ্য প্রাচীন দেবমন্দির আছে। বালির ঘোষেদের রাসের মেলা এই অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ মেলা। ঘোষেদের শ্রীশ্রীদামোদর জীউর রাস উৎসব উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী যাত্রা, গান ও আতসবাজী পোড়ান হয়। ঘোষেদের এই ঠাকুরের নামে বহু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। হুগলীর গঙ্গাতীরে বাবুঘাট এই ঘোষবংশের অক্ষয় কীর্তি।

বালির **মঙ্গলা মন্দির** ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন। মন্দিরে কোন প্রস্তরফলক নাই। মন্দিরের গঠনশৈলী ও কলানৈপুন্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের ত্রয়োদশ রত্নের মধ্যে কয়েকটি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। মন্দিরের বিভিন্ন দেওয়ালে পোড়ামাটির যে সব কারুকার্য আছে সেগুলি পোড়ামাটিশিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রতিটি মূর্তি ও তার ভঙ্গিমা অপূর্ব শিল্পসুসমায় মণ্ডিত, কিন্তু এই সব মূর্তিগুলি নোনা লাগিয়া ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

দুর্গামন্দির জোড়বাংলা মন্দির; কিন্তু ইহার বিশেষত্ব মন্দিরের চুড়ায় একটি গম্বুজের উপর নয়টি রত্ন আছে। পোড়ামাটির শিল্পকলার দিক হইতে মন্দিরের গায়ে যে সব নিদর্শন আছে, সেগুলি নানা ধরনের। কোনটি ইতিহাস বর্ণিত কোন দৃশ্য। কোনটি বা সমসাময়িক সমাজের বিশেষ কোন বর্ণনা। শিল্পনৈপুন্যের দিক হইতে এই চিত্রগুলি অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। এই মন্দির সম্বন্ধে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির গ্রন্থে আছেঃ

The most curious is the Durgamundir, which consists of a Jorbangala temple with a 9-ratna on top as a tower ; this has a row of large terracotta figures about 2 feet high across the facade.

পোডামাটি শিল্পকলার দিক হইতে বালির **পঞ্চরত্ন দামোদর মন্দির** ও ইহার পশ্চাতে **দুর্গামন্দিরটিও** উল্লেখযোগ্য। দুর্গামন্দির ভগ্ন হওয়ায় ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছে। ইহার ইঁটে যে সব কারুকার্য ছিল সেগুলি পরিপক্ক হস্তের নিদর্শন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু দামোদরের মন্দিরে অলঙ্করণ খুব বেশী না থাকিলেও মূর্তিগুলির ভঙ্গিমা শিল্পসুসমায় শ্রীমণ্ডিত।

প্রতি বৎসর বিজয়াদশমীর দিন ও পরবর্তী অষ্টম দিবসে শ্রীশ্রীশীতলা মাতার স্থানেও একটি মেলা হয়; ইহা রথের মেলা বলিয়া খ্যাত। সেই জন্য শীতলা মাতার পূজা ও নগর সংকীর্তন এই স্থানের একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। দশমীর দিন বালিব মালিপাড়ায় শীতলাতলা হইতে একটি কারুকার্যখচিত পিতলের রথ উত্তর মুখে বালির হাটতলায় যায় এবং অষ্টম দিবসে উহা পুনরায় মালিপাড়ায় ফিরিয়া আসে। এই রথ বুনি নামে একটি স্ত্রীলোক তৈয়ারী করিয়া দেয়।

বালি ও দেওয়ানগঞ্জে পূর্বে প্রভূত গুটিপোকাব চাষ হইত এবং হস্তচালিত তাঁতে রেশম সুতা ও সিল্কের কাপড় প্রস্তুত হইয়া উহা দেশে বিদেশে রপ্তানী হইত তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ধনী ব্যবসায়ী ও দালালগণ দরিদ্র চাষীদের দাদন দিয়া এই স্থানের সিল্কের ব্যবসায়ে সেই সময় লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেন। ক্রফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, এই ব্যবসায়ে উত্তর ভারতের অর্থ নিয়োজিত ছিল (which was financed from upper India) এবং এই সকল মধ্যব্যবসায়ীগণও লক্ষ লক্ষ টাকা এই ব্যবসায়ে

উপার্জন করিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও পরে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। এই গ্রামের শিবনারায়ণ মিশ্র একজন প্রসিদ্ধ কুঠিয়াল ছিলেন; তিনি এই সিল্কের ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেন। তাঁহার প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকা আজও তাঁহার ঐশ্বর্যের প্রতীক স্বরূপ বালিতে দণ্ডায়মান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই ব্যবসায়ে লাভ দেখিয়া সিল্কের কারখানা স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করায় উহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। This trade was almost killed by the establishment of the East India Company silk factories. (Hughli Medical Gazetteer)

হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখিত আছে Silk and cotton cloths are woven in this place and its neighbourhood, but the manufacture is declining.

পূর্বে এই স্থানে ও রাধাবল্লভপুর, সুদনগঞ্জ, জগৎপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে খুব ভাল দেশী কাগজ প্রস্তুত হইত। যাহারা কাগজ প্রস্তুত করিত তাহাদের 'কাগজী' বলিত। এখনও বহু 'কাগজী' এই অঞ্চলে বসবাস করে কিন্তু কাগজ-শিল্পও এখন রেশমশিল্পের ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এইস্থানে নীলের চাষ হইত। নীলকুঠীর ভগ্নাবশেষ এখনও গ্রামে আছে।

পিতলের ঘড়া, ঘটি, কলসী, বালতি প্রভৃতি এই স্থানে পূর্বে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া বিভিন্ন হাটে ও বাজারে বিক্রয় হইত। বর্তমানে এই শিল্পটি এখনও বালি, কলাগাছিয়া, দেওয়ানগঞ্জ, জগৎপুর, উদয়রাজপুর প্রভৃতি গ্রামে কিছু কিছু আছে। এই স্থান হইতে নির্মিত পিতলশিল্পের দ্রব্যাদি কলিকাতার মোকামে এখন বিক্রয়ার্থ চালান যায়। কাঁচামাল ও উপযুক্ত অর্থসাহায্য পাইলে এই কুটির শিল্পটির ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নতি হইবে।

এই অঞ্চলে বহু মালাকারের বাস ছিল: তাহারা শোলার নানাবিধ দ্রব্য যথা বিবাহের টোপর, দেবদেবীর জন্য শোলার গহনা প্রভৃতি তৈয়ারী করিত। বর্তমানে উহাদের বহু বংশ নষ্টশিল্প ও অভাবের তাড়নায় এবং ১২৬০ সালের ম্যালেরিয়ায় লোপ পাইয়াছে।

বালিতে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার নবগৃহ নির্মাণের জন্য শ্রীতিনকড়ি লহরী দশ হাজার টাকা মূল্যের দশ বিঘা জমি এবং শ্রীমাণিকচন্দ্র রায়, শ্রীফকিরচন্দ্র পাল, শ্রীযুগলকিশোর অধিকারী, শ্রীরাঘবচন্দ্র ঘণ্টেশ্বরী প্রভৃতি অর্থ সাহায্য করেন। বালির বর্তমান লোকসংখ্যা ১ হাজার ৩ শত ৯১ জন

এখন বালির নষ্টশিল্পের পুনরুদ্ধার ও শিক্ষা দীক্ষায় শিল্পে বাণিজ্যে বালির পূর্ব গৌরব অর্জন করিতে সাহায্য করিবার জন্য স্বাধীন সরকার ও কলিকাতায় প্রবাসী হুগলী জেলার প্রত্যেক অধিবাসীর যত্নশীল হওয়া উচিৎ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার শ্রীমাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে ঘাটাল স্টীমারে বন্দর নামক স্থানে অবতরণ করেন এবং তথা হইতে দ্বারকেশ্বর দিয়া বালি দেওয়ানগঞ্জে আসিয়া তিন দিন অবস্থান করেন। বালিতে ঠাকুরের আগমন চিহ্নিত করিয়া রাখিবার জন্য এই স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হয়।

বালি ইউনিয়নের মধ্যে দীঘড়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম হুগলী জেলার শেষ প্রান্তে অবস্থিত; ইহার দক্ষিণে মেদিনীপুর

জেলা আরম্ভ হইয়াছে। মির্জাপুর, দামোদরপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের লোক হুগলী জেলায় বাস করিলেও মেদিনীপুর জেলায় গিয়া জমি চাষ করে।

বালি ইউনিয়নে **গোহালখাঁড়া** গ্রামে মদনমোহন চৌধুরী নামে একজন দয়ালু জমিদার বাস করিতেন। এই গ্রামের জনসংখ্যা ৩ শত ৩০ জন। ধার্মিক ও প্রজাবৎসল বলিয়া তাঁহার খুব সুনাম ছিল। প্রজাদের জল কষ্ট নিবারণের জন্য তিনি 'সায়ের' নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন; তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। তাঁহার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তিনি খাজনা আদায় করিবার জন্য ঢোল সহরৎ করিলেই প্রজাগণ আসিয়া তাঁহাকে খাজনা দিতেন। আজও গ্রামে তাঁহার নামে এই প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছেঃ "ঝা, গুড় গুড় বাজনা—মদন চৌধুরীর খাজনা।"

দেওয়ান জগৎসিংহের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত **জগৎপুর** গ্রামে শ্রীশ্রীজগৎতারিণী দেবী জাগ্রতা দেবী বলিয়া এই অঞ্চলে কথিত হইয়া থাকে। দেবী কালীমূর্তি, প্রতি বৎসর সংক্রান্তিতে এই স্থানে একটি মেলা বসে। এই দিন বিশ্বকর্মা পূজার দিন যেরূপ ঘুড়ি উড়ান হয়. সেইরূপ বালকবৃন্দ এই স্থানে ঘুড়ি উড়ায়। ঘুড়ি উড়ান এই মেলার একটি বিশেষত্ব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুই দিন এই জগত্তারিণী মন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলেন। জগৎপুর গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। দ্বারকেশ্বর নদের যে স্থান হইতে ঝুম-ঝুমি বা শঙ্করী বাহির হইয়াছে, সেই ত্রিমোহনার পশ্চিমে জগৎপুরকে নদনদী বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া আছে। এখন নদী বালুকাময় হইয়া যাওয়ায় অধিকাংশ সময় নদীতে জল থাকে না। বালির দক্ষিণে **দামোদরপুর** গ্রাম। এই গ্রামে কাটারি, বঁটি, লাঙ্গলের ফাল প্রভৃতি এখনও প্রস্তুত হয়। এই স্থানের অধিকাংশ ব্যক্তির জীবিকা চাষের দ্বারা নির্বাহ হয়। এই গ্রামে চাঁদশাহ নামে এক ফকির বাস করিতেন। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার কবর হয়। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় তিন দিন এই স্থানে মেলা হয়। তাহার কবরস্থানে সিন্নি মানত করিলে ব্যাধিমুক্ত হয় বলিয়া বহু লোক উক্ত স্থানে সিন্নি দেয়। গ্রামে এখন কোন মুসলমান নাই; হিন্দুগণই উৎসব পরিচালনা করেন। এই গ্রামের জন-সংখ্যা ১ শত ৭৬ জন।

॥ শ্যামবাজার ॥

আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অন্তর্গত **শ্যামবাজার** একটি প্রাচীন গ্রাম। এই নামে একটি ইউনিযন বোর্ড আছে। শ্যামবাজার ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৪ হাজার ৯ শত ৫৮ জন। এই ইউনিয়নে বেলডিহা, পাণ্ডুগ্রাম ও শ্যামবাজার উল্লেখযোগ্য গ্রাম।

শ্যামবাজারে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষামূলকভাবে মিউনিসিপ্যাল ইউনিয়ন ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী গঠিত হয়; কিন্তু মিউনিসিপ্যাল ইউনিয়নের কার্য সুবিধামত না হওয়ায় ১৮৮৫ সালে উঠিয়া যায়। তসর ও তাঁতের কাপড়ের জন্য এই গ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক সিল্কের কারখানা বালি দেওয়ানগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তসর শিল্পের কাজ এই গ্রাম হইতে উঠিয়া যায়। বর্তমানে তাঁতের কাপড় কিছু কিছু প্রস্তুত হয়। এই স্থানের তাঁতের কাপড় হাওড়ার হাটে ও মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুরে বিক্রয় হয়। আবলুস কাঠের সুন্দর খেলনা গ্রামে তৈয়ারী হয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামবাজারে নটবর গোস্বামীর গৃহে সংকীর্তন শুনিতে আসিতেন বলিয়া "শ্রীশ্রীসারদা দেবী" নামক গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইলঃ

শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্তনরঙ্গ ও উহার আকর্ষণী শক্তি দেখিতে অভিলাষী হইয়া রামকৃষ্ণ শ্যামবাজারে তিন অহোরাত্র সংকীর্তন-বিলাসে মত্ত হইয়াছিলেন।

শ্যামবাজারে শ্রীশ্রীগঙ্গাধরজীউ নামক শিবঠাকুর গ্রাম্য দেবতারূপে পূজিত হন। পূর্বে এই স্থানে চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা হইত। এই গ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যা ২১৪৬ জন।

পাণ্ডুগ্রামে সাধক আউলচাঁদ গোস্বামীর আবির্ভাব হয়। তাঁহার তিরোধান উপলক্ষে অনন্ত চতুর্দশী তিথি হইতে বার দিন ধরিয়া পূজা ও মহোৎসব হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া গ্রামে নারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারীর হরিবাসর উপলক্ষে একটি মেলাও উল্লেখ্য। গ্রামে বহু প্রাচীন মন্দির আছে। শ্যামসুন্দরজীউর বিগ্রহ খুব সুন্দর। ইহা পাঁচশত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়।

বেলডিহা গ্রামে 'ধর্মমঙ্গল' রচয়িতা মাণিক গাঙ্গুলী জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামে তারাজুলি নদীর ধারে পৌষ সংক্রান্তিতে একটি মেলা হয়। এই গ্রামের লোকসংখ্যা ৬৫৩।

বেলডিহাতে এখনও তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হয়। 'ধর্মমঙ্গলে' মাণিক গাঙ্গুলী বলেনঃ

বাঙ্গাল গাঙ্গুলী গাঞিঃ বেলডিহায় ঘর।
পিতামহ অনন্তরাম পিতা গদাধর॥

ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁহার গৌড়ের ইতিহাসে 'ধর্মমঙ্গল' গ্রন্থ ১৪৭০ শাকে রচিত হয় বলিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার রচনা হইতে মাণিক গাঙ্গুলীর অনেক কথা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন বেলডিহা গ্রামে মাণিক গাঙ্গুলীর বাস ছিল। মাণিক গাঙ্গুলী বেলডিহার বাঁকুড়া রায়, গোপালপুরের কাঁকড়া বিছা, শ্যামবাজারের দলুরায়, বৈতালের ঝকভাই, বেতারের কেতিরেশ্বর প্রভৃতি দেবতার বন্দনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অনার্য দেবতাকে হিন্দুরা নিজেদের দেবতা করিয়া লইয়াছেন। ধর্মমঙ্গলের গানে খোল ও খঞ্জনীর ব্যবহার হইত। গায়েন নূপুর পায়ে চামর হাতে গান করিতেন। কেমিক্যাল স্বর্ণের গহনা চলিত না। মাণিক গাঙ্গুলীর সময় ধর্মের গান ইতর লোকেই করিত। ব্রাহ্মণেরা ইহার গান করিতেন না।

॥ বদনগঞ্জ ॥

বদনগঞ্জ আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান। এই স্থানটি পূর্বে তসর ও সিল্কের ব্যবসায়ের জন্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল। বদনগঞ্জে কালীপূজার সময় বহু প্রাচীন কাল হইতে একটি উৎসব চলিয়া আসিতেছে। প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবার এই গ্রামে হাট বসে। এই স্থানে কাঠের তৈয়ারী বোতাম, বেলুন (ময়দা বেলিবার), রুল প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। পূর্বে খুব ভাল হুঁকার নলিচা বদনগঞ্জে তৈয়ারী হইত এবং তাহা বহু দূর দেশে পর্যন্ত চালান যাইত। এই গ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যা ১৪৮৯ জন।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্তা আউলিয়া মনোহর দাস এই গ্রামে বাস করিতেন। তিনি বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার 'দিনমণি চন্দ্রোদয়' ও 'পদসমুদ্র' নামক গ্রন্থ সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে

তিনি পদসমুদ্র নামক সুবৃহৎ বৈষ্ণব সঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থের পদসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। তিনি পন্ডিত ছিলেন, বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহ করেন তন্মধ্যে 'নির্যাস-তত্ত্ব' অন্যতম। পদকর্তা জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, তাঁহার সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন। মনোহর দাস শ্রীমদ নিত্যানন্দ প্রভুর সহধর্মিণী শ্রীমতী জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, সাধনবলে তিনি খুব দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেন এবং সখীভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেন। বদনগঞ্জে ইহার সমাধি আছে এবং প্রতি বৎসর মকরসংক্রান্তিতে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি উদ্বোধনার্থে তথায় একটি মেলা হয়। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখিতে তিনি কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। সেই জন্য সোনামুখিতে মনোহর দাসের পাঠ আজও আছে এবং রামনবমী তিথিতে তথায় প্রতি বৎসর একটি মেলা হয়।

১৬০০ শকে তিনি বদনগঞ্জ হইতে অন্তর্হিত হন। তাঁহার অন্তর্ধানের পর রঘুনাথ নামক জনৈক ভক্ত তাঁহার বদনগঞ্জের সমাধিটি নির্মাণ করিয়া দেন।

বদনগঞ্জ এই নামে চব্বিশটি গ্রাম লইয়া এই অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ড আছে। ইউনিয়নের লোকসংখ্যা ৯ হাজার ৬ শত ৬৯ জন। বদনগঞ্জ হইতে ১৩০৭ সালে "বঙ্গীয় রহস্য" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইত।

॥ পশ্চিমপাড়া ॥

আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অন্তর্গত **পশ্চিমপাড়া** একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই স্থানের অধিকাংশ ব্যক্তি কৃষিকাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। পূর্বে শিল্পের জন্য এই অঞ্চল খুব প্রসিদ্ধ ছিল; বর্তমানে তাঁতের কাপড় কিছু কিছু এখনও তৈয়ারী হয় এবং এই স্থানের প্রস্তুত কাপড় হাওড়ার হাটে বিক্রয়ার্থে চালান যায়। গ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যা ৮ শত ৩৭ জন।

এই গ্রামে একমাত্র ফাল্গুন মাসে একটি মেলা ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া যায় না; তবে বাংলার দুইজন প্রাচীন কবি খেলারাম চক্রবর্তী ও রামদাস আদক এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিযা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে এই স্থানের নাম আছে।

খেলারাম চক্রবর্তী 'ধর্মমঙ্গল' প্রণয়ন করিয়া প্রখ্যাত হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ আটটি পালা গীতে সম্পূর্ণ; কিন্তু অষ্টমঙ্গলা প্রভৃতি শেষের পদগুলি কীটের দ্বারা বিনষ্ট হওয়ায় কবির পিতা মাতার নাম প্রভৃতি পরিচয়গুলি পাওয়া যায় না। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য ১৪৪৯ শকে পৌষ মাসে আরম্ভ হইয়াছিল। কবি দেব-দেবীর বন্দনায় লিখিয়াছেনঃ

ভূবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম কবিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥
হে ধর্ম এ দাসের পূরাও মনস্কাম।
গৌড় কাব্যে প্রকাশিত বাঞ্ছে খেলারাম॥
তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয়।
অষ্ট মঙ্গলায় দিব আত্মপরিচয়॥

॥ রামদাস আদক ॥

রামদাস আদক আরামবাগ মহকুমার হায়াৎপুর গ্রামে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি শেষ জীবনে পশ্চিমপাড়া গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পিতার নাম রঘুনন্দন আদক। সেই সময় এই সমস্ত অঞ্চল ভুরসুট পরগণনার অন্তর্গত ছিল। তখন ভুরসুটের রাজা ছিলেন প্রতাপনারায়ণ রায়। রামদাস পিতার একমাত্র সন্তান।

একদিন রঘুনন্দনের অনুপস্থিতিতে তাহার এক শত্রু হায়াৎপুরের তহশীলদার চৈতন্য সামন্তকে দিয়া বাকি খাজনার চক্রান্তে কিশোর রামদাসকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায় পরে তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করে। রামদাসের আকৃতিতে কারারক্ষীর মন নরম হয় এবং রামদাসকে গোপনে মুক্তি দেন। রামদাস গৃহে ফিরিয়া যাইলে পুনরায় গ্রেপ্তার হইবার ভয়ে পদব্রজে তাহার মাতুলালয় গোরুটি গ্রামে যাত্রা করেন এবং পথে নানা শুভ লক্ষণ দেখেন। পথের দুই পাশে যত গ্রাম পড়ে, তাহারও উল্লেখ ধর্মমঙ্গলে আছে।

ক্ষুধা তৃষ্ণার কাতর হইয়া রামপ্রসাদ যখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন, তখন ব্রাহ্মণ বেশী ধর্ম স্বর্ণ ঝারিতে গঙ্গাজল আনিয়া তাহাকে পান করিতে দিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। তাহার পরের ঘটনা কবি অনাদিমঙ্গল বা ধর্মপুরাণে এইভাবে লিখিয়াছেন ঃ

জলপানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি।
ধর্মের সঙ্গীত গাও, কিছু শুনি আমি॥
পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া।
গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া॥
খেলাচ্ছলে ধর্মপূজা কর্ম কাণ্ডহীন।
জানিনা ধর্মের গীত, তায় অর্বাচীন॥

ইহার পর মূর্খ রামদাস দিব্য পুরুষের অনুগ্রহে শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। পাড়াবাগনান গ্রামে সিপাইয়ের বেশে ধর্মঠাকুর রামদাসকে দেখা দেন বলিয়া কথিত আছে।

আজ হতে রামদাস কবিবর তুমি।
জাড়গ্রামে কালুরায় ধর্ম হই আমি॥
আসবে জুড়িবে গীত আমার সোঙরণে।
সঙ্গীত কবিতা ভাষা আসিবে বদনে॥
এত বলি ঠাকুর ধরিয়া ডান কর।
মহামন্ত্র লিখে দেন দ্বাদশ অক্ষর॥

১৬২৬ খৃষ্টাব্দে রামদাসের 'ধর্মমঙ্গল' প্রথম হায়াৎপুরে গীত হয়। তাহার রচিত গ্রন্থ, অনাদিমঙ্গল বা ধর্মপুরাণ প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাহার পুত্রের নাম ছিল বলাইচাঁদ আদক। পশ্চিমপাড়া গ্রামে তাঁহার বংশধরগণ এখনও আছেন।*

হিন্দুধর্মের কঠোরতায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ তখন অন্য ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য

---

* কবি রামদাস আদকের আবাসস্থল পশ্চিমপাড়া গ্রামে কবির বংশধরগণের প্রদত্ত ভূমিখণ্ডে ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ সালে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করিয়াছেন।

হয়; ঠিক সেই সময় ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব হয় এবং অসংখ্য হিন্দু সন্তানের সেই জন্য ধর্মান্তর গ্রহণ বন্ধ হইয়া যায়। রামদাস আদক এই ধর্মঠাকুরের প্রচারক বা প্রাচীন কবি হিসাবে কেবল প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই; তিনি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের পরধর্ম গ্রহণের হাত হইতে বাঁচাইয়া গিয়াছেন। গ্রামে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

শোঙালুক ॥ হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত ভাঙ্গামোড়া ইউনিয়নের মধ্যে **শোঙালুক** একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম। প্রাচীনকালে এই স্থানে দেবী সিংহ নামে এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন। স্থানীয় লোকে তাঁহাকে মুগতই রাজা বলিয়া অভিহিত করেন এবং একটি জায়গায় গ্রামের লোক তাঁহার বাস্তুভিটা ছিল বলিয়া বলে। রাজার মল্লিকা নামে এক কন্যা ছিল; রাজকন্যা-প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী এখন 'মল্কে পুকুর' নামে খ্যাত। পুকুর বর্তমানে মজিয়া গিয়াছে। এই পুকুরের উত্তরদিকে রাজার প্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। এই পুষ্করিণী খননকালে একবার কয়েকটি সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে এখানে রাজবাড়ীর কোন প্রাচীন নিদর্শন দেখা যায় না। এই গ্রামের অনতিদূরে ভাঙ্গামোড়া গ্রামে ঐতিহাসিক অম্বিকাচরণ গুপ্তের বাসস্থান ছিল; তিনিও তাঁহার হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ় নামক গ্রন্থে এই হিন্দু রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

শোঙালুক গ্রামের শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ খুব প্রাচীন দেবতা বলিয়া খ্যাত এবং এই স্থানের গোস্বামীগণও খুব প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর গোপীনাথ জীউর মেলা উপলক্ষে গ্রামে বহু লোকের সমাগম হয়। মেলা পাঁচশত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

"শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীবেদগর্ভপ্রভুর নিম্নতম বংশে শ্রীল আউলিয়া গোস্বামী সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। উঁহার এবং তাঁহার সহধর্মিণীর সমাজ হুগলী জেলার শোঙালুকে শ্রীশ্রীগোপীনাথের মন্দিরে আছে। তারকেশ্বর হইতে শোঙালুক তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

এখানকার অধিকাংশ ব্যক্তি কৃষিকাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এই গ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যা ২ হাজার ৯ শত ৩৩ জন। শোঙালুক ও ভাঙ্গামোড়ার মধ্যে বাখরপুর গ্রামে মহাপ্রভুর সপ্তদশ শ্রীপাটের অন্যতম পাট **রজনী পণ্ডিতের** শ্রীপাট অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। বৈষ্ণবদিগের নিকট এই গ্রাম একটি বৈষ্ণব-তীর্থরূপে পরিগণিত।

॥ ভাঙ্গামোড়া ॥

আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানার অন্তর্গত ভাঙ্গামোড়া একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। তারকেশ্বর হইতে দুই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। ইহার পূর্ব নাম ছিল মদনমোহনপুর। কিম্বদন্তী যে, সুদূর অতীতে বাৎসল্যভাবের জনৈক সাধক তাঁহার বাৎসল্যের আধার মদনমোহনকে স্নেহ-ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং মদনমোহনকে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রামটি মদনমোহনপুর বলিয়া খ্যাত হয়। প্রাচীনকালে এই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া সম্মিলিত আশে-পাশের গ্রামে প্রায় পঞ্চাশটি চতুষ্পাঠি গড়িয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃতির নিষ্ঠুর বিবর্তনে এক সময় দামোদরের প্রবল বন্যায় মদনমোহনপুর ভাঙ্গিয়া-মুড়িয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সেই দুঃখ দুর্ঘটনার স্মারকরূপে পরবর্তীকালে মদনমোহনপুরই 'ভাঙ্গামোড়া' হয়।

ভাঙ্গামোড়ার ভাল নাম ভঙ্গমোড়া। এই নামে একটি ইউনিয়ন বোর্ড আছে। ইউনিয়নের লোকসংখ্যা ৯ হাজার ৫ শত ২ জন, পূর্বে ভাঙ্গামোড়া সংস্কৃত চর্চার একটি কেন্দ্রস্থল ছিল। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, গুপ্তিপাড়া বংশবাটীর ন্যায় এই গ্রামেও দেশ-দেশান্তর হইতে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতে আসিত। এখনও পূর্ব গৌরবের সাক্ষীরূপ দুইটি চতুষ্পাঠি ভাঙ্গামোড়ায় বিদ্যমান আছে।

মহাপ্রভুর পার্ষদগণ বঙ্গদেশে দ্বাদশ পাঠ ও সপ্তদশ শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সপ্তদশ শ্রীপাঠের মধ্যে ভাঙ্গামোড়া অন্যতম। এই সম্বন্ধে 'পাঠ পর্যটনে' লিখিত আছেঃ

ভাঙ্গামোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্বান বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান॥

পণ্ডিত সুন্দরানন্দ ঠাকুর এই ভাঙ্গামোড়াতে বাস করিতেন। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-তীর্থ নামক গ্রন্থে ভাঙ্গামোড়া সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে। তাহা এইরূপঃ

ইহা শ্রীঅভিরাম শিষ্য রজনী পণ্ডিত, মুকুন্দরাম পণ্ডিত ও সুন্দরানন্দ পণ্ডিতের শ্রীপাঠ। শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ সেবা ও শ্রীমুকুন্দ পণ্ডিত সোনাতলি গ্রামে শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহের সেবা করিতেন, পরে রজনী পণ্ডিত উক্ত শ্রীবিগ্রহকে নিকটবর্তী গ্রাম রাঘবপুরে লইলে মুকুন্দ পণ্ডিত উপরোক্ত শ্রীমদনমোহন জীউর সেবা করিতে থাকেন। শ্রীসুন্দরানন্দের তিরোভাব পৌষী শুক্লাষ্টমীতে।

ভাঙ্গামোড়া দ্বাদশ তিলিপ্রধান গ্রাম হইলেও এই স্থানের বৈদ্য বংশীয় গুপ্তগণ গ্রামের গৌরব এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রারম্ভিক যুগে তখনকার পাণ্ডিত্যের প্রধান উৎস ছিলেন এই গুপ্তগণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের বাস্তুভিটা পর্যন্ত আজ ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের বংশধরগণ সকলেই বেশ অবস্থাপন্ন, এখন কলিকাতায় বাস করেন।

দ্বাদশতিলিগণ সকলেই ব্যবসায়াদি করিয়া খুব অর্থশালী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শেঠ চৌধুরীগণ শীর্ষস্থানীয়। এই স্থানের কুমুদকান্ত শেঠ-চৌধুরী ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে ভাঙ্গামোড়ায় বার মাসে তের পার্বণ অনুষ্ঠিত হইত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে গ্রামের প্রাচীন দেবতা বাঁকুড়া রায় ধর্মঠাকুরের গাজন উৎসব খুব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইত; এই অঞ্চলে উহা খুব প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানে গ্রামের এই সকল প্রাচীন আনন্দ বিষয়ক উৎসবগুলি সিনেমার জন্য প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ভাঙ্গামোড়ার ভীম কবিরাজের পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও রোগ নির্ণয়ের জন্য খ্যাতি এক সময় সমগ্র হুগলী জেলায় ব্যাপ্ত ছিল। তাঁহার রোগনির্ণয় সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা আজও জেলার সর্বত্র প্রচলিত আছে। এতদ্ভিন্ন ভাড়ামোড়ায় মোক্তার রাধিকাপ্রসাদ শেঠ ও শিক্ষক পণ্ডিত বিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য উচ্চ আদর্শ ও কর্তব্যপরায়ণতার জন্য এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বর্তমানে ভাঙ্গামোড়ায় ত্রিপুরাচরণ পালের অর্থানুকুল্যে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এডভোকেট শ্রীপঞ্চানন পালের পরিচালনায় অল্পদিনের মধ্যেই ইহার ইহার আশানুরূপ উন্নতিও হইয়াছে। ত্রিপুরাবাবু তাঁহার মাতামহ কেদারনাথ চিনা মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

॥ অম্বিকাচরণ গুপ্ত ॥

আধুনিককালে যে সকল স্মরণীয় পুণ্যাত্মার প্রচেষ্টায় ভাঙ্গামোড়ার প্রসিদ্ধি তন্মধ্যে অম্বিকাচরণ গুপ্তের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অম্বিকাবাবু ১৩২১ সালে বাঙ্গলাভাষায় সর্বপ্রথম 'হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়' নামে হুগলী জেলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়া তিনি 'চিন্তা' নামে একখানি মাসিকপত্র এবং ১২ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষকতা করিতেন এবং এই অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষার অগ্রদূত ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ভাঙ্গামোড়ায় বিদ্যালয়, পোষ্টাফিস, বাজার, রাস্তাঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সেই সময় ভারতের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলনের জন্য ভাঙ্গামোড়ায় আসেন। তিনি ভাঙ্গামোড়া হইতে 'হিতবোধ' নামে মাসিক পত্র প্রকাশ করেন।

তাঁহার ভ্রাতা কবিরাজ বিজয়াচরণ গুপ্ত কুচবিহারের রাজবৈদ্য এবং কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার 'বনৌষধি দর্শন' নামক গ্রন্থ আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় যুগান্তর আনিয়াছে। অম্বিকা বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানদাচরণ গুপ্ত আরামবাগের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও জনপ্রিয় উকিল ছিলেন।

ভাঙ্গামোড়া গ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যা ১ হাজার ২ শত ২৯ জন। এই ইউনিয়নের অধিকাংশ লোকই কৃষিকাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। আলু ও পাট এই স্থানের প্রধান কৃষিজাত ফসল। এই ইউনিয়নের মধ্যে খুসীগঞ্জে পূর্বে একটি হাট বসিত।

ভাঙ্গামোড়ার প্রাচীন দেবতা বাঁকুড়া রায় সম্বন্ধে কবি সহদেব চক্রবর্তী লিখিত ধর্মমঙ্গল কাব্যে লিখিত আছেঃ

"বন্দিব বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গামোড়ায় স্থিতি।
অনুপম গুণধাম অনন্ত মুরতি॥"

এই গ্রামের বৈভব ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি পূর্বের মত আজ আর না থাকিলেও এই গ্রাম বিবিধ জনমঙ্গলকর কার্যের জন্য বর্তমানে একটি আধুনিক প্রগতিশীল উন্নত গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

॥ আনুড় ॥

গোঘাট থানার অন্তর্গত কামারপুকুর ইউনিয়নের মধ্যে আনুড় একটি ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম। এই গ্রামের **বিশালাক্ষী মাতা** জাগ্রতা দেবী বলিয়া কথিত। নানাপ্রকার কামনা পূরণের জন্য বহু দূর হইতে ভক্তগণ আসিয়া দেবীর পূজা দিয়া থাকেন। দেবীর কোন মন্দির নাই, বিশালাক্ষী আকাশের নীচে মুক্তপ্রান্তরে অবস্থান করেন। বর্ষাতাপাদি হইতে রক্ষার জন্য গ্রামের রাখাল বালকেরা প্রতিবৎসর একটি সামান্য আচ্ছাদন করিয়া দেন। গ্রামের রাখাল বালকগণই দেবীর প্রিয় সঙ্গী। পার্শ্বস্থ ভগ্নস্তূপ দেখিয়া একসময় এই স্থানে মায়ের একটি মন্দির ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। পরবর্তীকালে এই স্থানে ইষ্টক নির্মিত মন্দির নির্মাণ করিতে কেহ সফলকাম হন নাই। এই স্থানে শ্মশান অবস্থিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিশালাক্ষী দেবীর নিকট প্রায়ই আসিতেন। শ্মশানে তান্ত্রিক সাধকের প্রতিষ্ঠিত একটি পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। গ্রামে বৃহস্পতিবার ও রবিবার হাট বসে এবং বিশালাক্ষী মায়ের স্থানে বাৎসরিক মেলা একটি উল্লেখ্য অনুষ্ঠান।

কামারপুকুর

"হুগলী জেলার গ্রাম কামারপুকুর।
সৎ দ্বিজ-কুলে জন্ম হল শ্রীপ্রভুর॥"

হুগলী-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর জেলার প্রায় সন্ধিস্থলে কামারপুকুর একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইলেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মে এই নগণ্য স্থান আজ পৃথিবীর নিকট সুপরিচিত এবং ভারতবাসীর নিকটও ইহা অন্যতম তীর্থক্ষেত্র রূপে প্রখ্যাত। এই তীর্থস্থান কেবল ভারতের নয়, সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণ পর্যন্ত এই তীর্থ দর্শনার্থে কামারপুকুরে সমাগত হন। গ্রামের চতুর্দিকে শস্যাদি পূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র এবং ভূতির খাল নামক একটি ক্ষুদ্র জলধারা বিসর্পিত গতিতে উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া অনতিদূরে আমোদর নদে মিলিত হইয়াছে বলিয়া গ্রামখানির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে।

কামাবপুকুর আজ বিশ্বের তীর্থক্ষেত্র; রামায়ণের মত কামারপুকুরের কাহিনী চির-নূতন। তাঁহার আবির্ভাবে ও চরণ ধূলির পরশে এই স্থান আজ বাঙ্গালীকে প্রাণ দেয়, শক্তি দেয়, জ্ঞান দেয়. বিদ্যা দেয়, বাঙ্গালীকে নব নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। তিনি মর্ত্যে জীব উদ্ধারের জন্য উদাত্ত কণ্ঠে যে বাঁশি বাজাইয়া ছিলেন, তাহা গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে সাগরে ঝঙ্কার দিয়া, সমগ্র বিশ্বে উথলিয়া উঠিয়াছিল। দেশের বিবিধ প্রকার সমাজ-সমস্যা সমাধানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের নাম তাই আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরভাস্বর হইয়া আছে। ইহারা ধর্মের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার নাই; কেবল ভাষা নয়, সে পরম জ্ঞানই বা আমার কোথায়? তাই তাঁহার ভক্ত কর্তৃক রচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে সর্বাগ্রে আমাদের ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলী তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছিঃ—

দণ্ডী হয়ে ভ্রম নাই পথে পথে জটাচীর বেশে,
প্রচার করনি, কোন নব ধর্ম তুমি দেশে।
গ্রন্থ পাঠে শিক্ষাপীঠে কোন জ্ঞান করনি অর্জন,
কর্মক্ষেত্রে কোলাহলে কোনদিন করনি গর্জন।
অসভ্য পূজারী ছিলে এ সুসভ্য বঙ্গের দেউলে,
অমার্জিত মাতৃভাষা পুঁজি ছিল তব কণ্ঠমূলে।
কোন মহাশক্তি তায় পুঞ্জীভূত ছিল ভগবান,
লভিল ভারতভূমি যাতে মুক্তি পথের সন্ধান?
এ দেশে সাহিত্য, ধর্ম, লোকযাত্রা, সমাজ, সংসার,
সবারি মাঝারে দেখি সঞ্চারিত শকতি তোমার।
দীনতার ছদ্মতলে কোন্ শক্তি এনেছিলে বহি'
নিঃশব্দে জিনিলে তুমি সারা দেশ স্থাণু হয়ে রহি।
ধর্মের কঙ্কালে নব-কলেবর করিয়া গঠন,
তব কথামৃত তায় সঞ্চারিল—নবীন জীবন!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব

হুগলী জেলায় এই কামারপুকুর গ্রামে ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন বুধবার, শুক্লপক্ষ, দ্বিতীয়া তিথিতে চন্দ্রমণিদেবীর গর্ভে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রমণি দেবীর পূর্বে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা হইয়াছিল,—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র সন্তান। সর্বকনিষ্ঠ কন্যার নাম সর্বমঙ্গলা। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এই কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম রাখিয়াছিলেন গদাধর।

বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বের কোটি কোটি নর-নারীর হৃদয়মন্দিরে স্বয়ং ঈশ্বররূপে পূজিত। এই মহাপুরুষের পিতা ও মাতা পরমপুণ্যাত্মা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমণি দেবী, উভয়েই প্রাতঃস্মরণীয় ও পরম ভক্তির পাত্র। তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে উক্ত আছেঃ

চাটুয্যে শ্রীক্ষুদিরাম জনক তাঁহার।
তেজস্বী ব্রাহ্মণ অতি শুদ্ধ নিষ্ঠাচার॥
নিজে যেন সেই মত ভার্যা গুণবতী।
মূর্তিমতী দয়া যেন গঠন আকৃতি॥

এই চাটুয্যে পরিবার বশানুক্রমে অত্যন্ত নৈষ্ঠিককুলীন ও রামভক্ত ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রে ইহাদের ভক্তি-বিশ্বাস পুরুষ-পরম্পরায় অবিচল। এই জন্যই ইহাদের সকলেরই নামের সঙ্গে 'রাম' সংযুক্ত দেখা যায়। পুঁথির কথায়ঃ

রামপদে রতিমতি রামগত প্রাণ।
রামনামে বংশগত সকলের নাম॥
মাণিকরামের পুত্র ক্ষুদিরাম নাম।
প্রভুর জনক যাঁর রঘুবীর প্রাণ॥
তাঁর পুত্র শ্রীরামকুমার রামেশ্বর।
পরে প্রভু রামকৃষ্ণ আগে গদাধর॥
রামলাল শিবরাম মধ্যমের ছেলে।
দিবারাত্র করে নৃত্য রামনাম বলে॥

রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ দুই সহোদরের নাম ছিল,—রামকুমার ও রামেশ্বর ও ভগ্নীর নাম ছিল কাত্যায়নী। রামকৃষ্ণের বয়স যখন সাত বৎসর তখন তাঁহার পিতা ক্ষুদিরাম দেহত্যাগ করেন। ক্ষুদিরামের দেহত্যাগের পর সংসারের ভার তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই পুত্র রামকুমার ও রামেশ্বরের উপর পড়িল। দুই ভাই তখন সংসার চালাইবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, কিন্ত উপার্জন তেমন না হওয়ায় সংসারে বড়ই টানাটানি হইতে লাগিল। সংসার ঘাড়ে পড়িবার পর রামকুমারের কিছু ঋণও হইয়া পড়িল। কেমন করিয়া এই ঋণ শোধ করিবেন, কেমন করিয়া সংসারে আবার সচ্ছলতা আনিবেন রামকুমারের তখন তাহাই একমাত্র চিন্তা হইল। তিনি অনেক চিন্তার পর কলিকাতায় গিয়া অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করিবেন স্থির করিলেন এবং একটা শুভ দিন দেখিয়া জননীর পদধূলি লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির—কামারপুকুর (পৃঃ ১৩৭৫)

শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যা
সাং কামারপুকুর

শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তাক্ষর (পৃঃ ১৩৭৬)
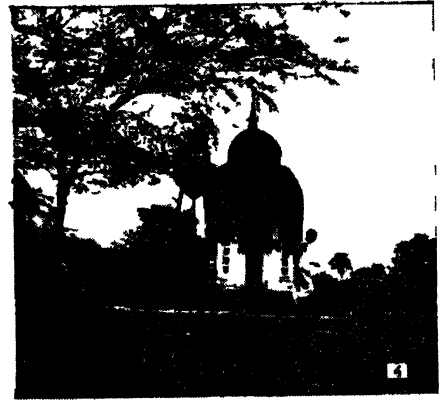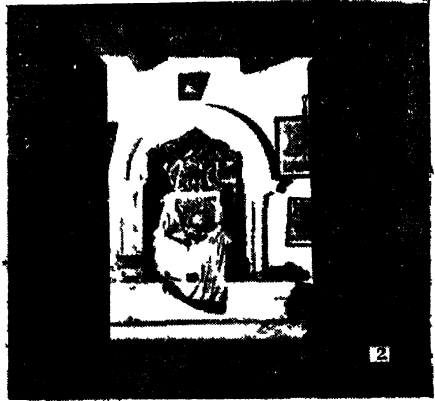
১। মাতৃমন্দিব, জযবামবাটী (পৃঃ ১৩৭৯), ২। মন্দিবে শ্রীমাযেব তৈলচিত্র (পৃঃ ১৩৭৯), ৩। লাহাদেব পঞ্চচূড শিবমন্দিব, কামাবপুকুব (পৃঃ ১৩৭৭), ৪। যুগীদেব শিবমন্দিব, কামাবপুকুব (পৃঃ ১৩৭৬), ৫। সিংহবায বংশেব অতিথিভবন, মাকালপুব (পৃঃ ৯৩৭); ৬। সত্যআশ্রমে স্বামী অভযানন্দেব প্রস্তবমূর্তি ভদ্রেশ্বর (পৃঃ ১০৪৩)।
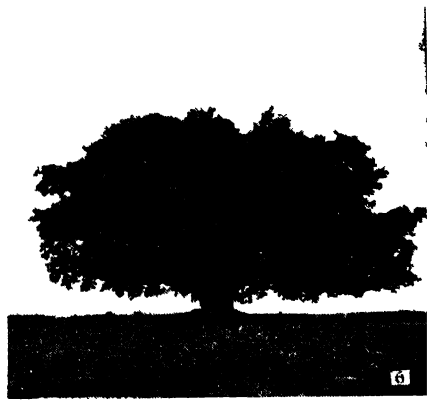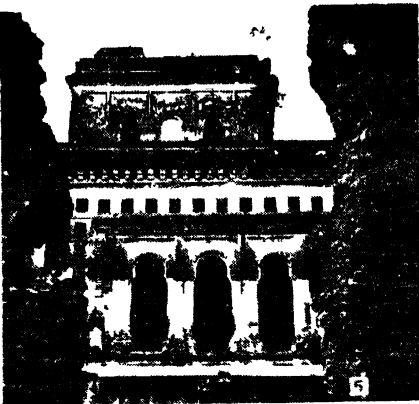
১। মন্দিবে শ্রীবামকৃষ্ণেব মর্মবমূর্তি (পৃঃ ১৩৭৫), ২। শ্রীবামকৃষ্ণেব জন্মভিটা (পৃঃ ১৩৭৫), ৩। ধনী কামাবণীব মন্দিব (পৃঃ ১৩৭৮), ৪। বঘুবীবেব মন্দিব (পৃঃ ১৩৭৬), ৫। বিষ্ণুমন্দিব পশ্চাতে লাহাদেব বাড়ি (পৃঃ ১৩৭৭), ৬। শ্রীবামকৃষ্ণেব বিশ্রামস্থান, আড়াইশত বৎসবেব প্রাচীন বটগাছ (পৃঃ ১৩৭৭)।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরের একাংশ (পৃঃ ১৩৭৫)
(দুলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস সাহা, সুধীরকুমার মিত্র (লেখক) ও বলরাম সাহা দণ্ডায়মান)

অম্বিকাচরণ গুপ্ত (পৃঃ ১৩৬৬)
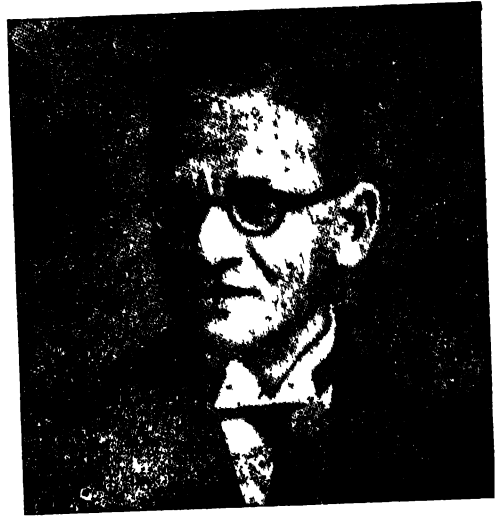
যতীন্দ্রনাথ বসু (পৃঃ ১৩৮৪)

কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া রামকুমার ঝামাপুকুরে একটি টোল খুলিলেন। তখন রামকৃষ্ণের বয়স চৌদ্দ বৎসর। রামকুমার কলিকাতা আসিবার পর তাহাদের বাটীর গৃহ-দেবতা রঘুবীরের পূজা রামকৃষ্ণই করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ সে সময়ে তাঁহাদের গ্রাম্য পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিতেছিলেন বটে, কিন্তু লেখা পড়ায় তাঁহার আদৌ ঝোঁক ছিল না। তাঁহার কণ্ঠটি ছিল অতি সুমিষ্ঠ। অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি গান গাহিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। রামকৃষ্ণেরও কোন বাচবিচার ছিল না, আদর করিয়া তাঁহাকে যে ডাকিত, তাহারই বাড়ী গিয়া তাঁহার মধুর গানে তাহাদের একেবারে মোহিত করিয়া দিতেন।

রামকৃষ্ণের বয়স যখন সতের বৎসর তখন রামকুমার ভ্রাতার লেখাপড়া গ্রামে কিছুই হইতেছে না দেখিয়া, রামকৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। রামকুমার চেষ্টার কোনই ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, বাল্যকাল হইতেই রামকৃষ্ণের ধর্ম বিষয় ভিন্ন অপর কোন বিষয়েই মন বসিত না।

রামকৃষ্ণ কলিকাতায় আসিবার কিছুদিন পর, কলিকাতার জানবাজার নিবাসী রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র দাসের বিধবা পত্নী রানী রাসমণি কলিকাতা হইতে তিন মাইল দূরে দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে গঙ্গাতীরে কয়েক বিঘা জমি কিনিয়া এক ঠাকুর বাড়ী নির্মাণ করিলেন ও তথায় কালী ও রাধা-গোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া যথাবিহিত পূজার ব্যবস্থা দিবার জন্য যাবতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া বলিলেন, 'রাণী কৈবর্ত্ত,— কাজেই কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ পূজা করিতে পারে না।"

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এই মত শুনিয়া রাণী সত্যই বড় মর্মাহত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-গণের মতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। নিশ্চয়ই শাস্ত্রে ইহার কোন ব্যবস্থা আছে ভাবিয়া রাসমণি দেশ-বিদেশে পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা চাহিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। ক্রমে এই কথা রামকুমারের কানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তখনই ব্যবস্থা দিয়া পাঠাইলেন যে, রাণী গুরুকে তাঁহার ঠাকুর বাড়ী দান করুন, তাহা হইলে কালী ও রাধা-গোবিন্দের পূজার কোন বাধাই থাকিবে না। রামকুমারের এই ব্যবস্থা পাইয়া রাণী রাসমণির আর আনন্দের সীমা রহিল না। অবিলম্বেই রামকুমারের ব্যবস্থা অনুসারে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার একটি দিন স্থির হইল এবং রাণীর বিশেষ জেদাজেদিতে রামকুমারকেই সেই কাজের ভার লইতে হইল।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ সালে মহা ধুমধামের সহিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত রামকৃষ্ণও দক্ষিণেশ্বরে মহোৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন—কিন্তু কৈবর্ত্তের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করা ধর্মসংগত নহে ভাবিয়া তিনি সে দিন বাজারে গিয়া মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া খাইয়াছিলেন।

ঠাকুর বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াই রামকুমার অব্যাহতি পাইলেন না,—রাণীর জেদা-জেদিতে পড়িয়া বিগ্রহের পূজার ভারও তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইল। রামকৃষ্ণ কৈবর্ত্ত প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীতে প্রথম থাকিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন,—কিন্তু রামকুমার যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে ইহা অন্যায় নহে, তখন আর তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। সেই হইতে রামকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত দক্ষিণেশ্বরেই বাস করিতে লাগিলেন। রাণী

তাঁহার জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের উপর ঠাকুর বাড়ীর তত্ত্বাবধানের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণের সরল মূর্তিখানি দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং ঠাকুর সেবার কোন একটা কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ প্রথমে ঠাকুর সেবার কাজেই হাত দিতেন না। শেষে ভ্রাতার অনুরোধে ও মথুরবাবুর জেদাজেদিতে বাধ্য হইয়া ঠাকুরের বেশকারীর পদ গ্রহণ করিলেন। বেশকারীর পদ গ্রহণ করিবার পর হইতেই রামকৃষ্ণের প্রাণের ভিতরটা কেমন যেন এলোমেলো হইযা যাইতে লাগিল। মাকে বেশ পরাইতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, মায়ের স্বরূপ মূর্তি দেখিবার জন্য দিন দিন তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময় সামান্য কয়েক দিনের পীড়ায় রামকুমার দেহত্যাগ করিলেন। রামকুমারের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণের উপরেই কালীপূজার ভার পড়িল। কয়েকদিন পূজা করিতে করিতেই রামকৃষ্ণের কেমন যেন ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি ঠাকুর বাড়ীর যেখানে সেখানে ধূলায় পড়িয়া 'মা-মা' বলিয়া গভীর আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। পূজার সময় পূজা করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তিনি নৈবেদ্য কাক-বিড়ালকে খাওয়াইয়া দেন, আর কেবলই 'মা-মা' করিয়া কাঁদিতে থাকেন। ঠাকুর বাড়ীর সকলে রামকৃষ্ণের এই অবস্থা দেখিয়া স্থির করিলেন, রামকৃষ্ণ বদ্ধ পাগল হইয়াছেন। এ সংবাদ মথুরবাবু ও রাণী রাসমণি অবিলম্বেই পাইলেন। তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রামকৃষ্ণের কার্যকলাপ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিলেন, —রামকৃষ্ণ সাধারণ পাগল নহেন, তাঁহার পাগলামির ভিতর এমন একটি জিনিস আছে, যাহা সাধারণ পাগলের ভিতর নাই। তিনি যে একজন মহাপুরুষ—তিনি যে সত্য সত্যই মায়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, এটুকু বুঝিতেও রাণী রাসমণির বিলম্ব হইল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে তাঁহার মন্দির-প্রতিষ্ঠা সার্থক হইল।

দিন দিন রামকৃষ্ণের অবস্থা এমন হইল যে, তাঁহার দ্বারা মায়ের পূজা হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তখন তাঁহাকে যে দেখিত সেই ভাবিত, তিনি একেবারে বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছেন। চন্দ্রমণি দেবী পুত্রের এই অবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, মথুরবাবুও রামকৃষ্ণের মাতার ইচ্ছার কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রামকৃষ্ণকে কামারপুকুরে পাঠাইয়া দিলেন। কামারপুকুরে আসিয়া রামকৃষ্ণ কিছু প্রকৃতিস্থ হইলেন। চন্দ্রমণি দেবী আত্মীয়-স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রের একটি বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। কামারপুকুরের নিকটে জয়রামবাটি গ্রামে রামকৃষ্ণের বিবাহ স্থির হইল। ঐ গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার একটি পাঁচ বৎসরের কন্যা ছিল, তাহারই সহিত রামকৃষ্ণের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া আবার তাঁহার ভাবান্তর হইল, আবার তিনি 'মা-মা' বলিয়া পাগল হইলেন। এই সময় একজন সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি তন্ত্রশাস্ত্রে অদ্বিতীয়া পন্ডিত ছিলেন। ইনি রামকৃষ্ণকে দেখিয়াই মহাপুরুষ বলিয়া চিনিলেন এবং তাঁহাকে

তন্ত্র প্রণালীতে সাধন-শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সন্ন্যাসিনীর নিকট রামকৃষ্ণ তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে তোতাপুরী স্বামী পরমহংস পরিব্রাজক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং রামকৃষ্ণকে দেখিয়াই বেদান্ত সাধনার শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া চিনিতে পারেন; তোতাপুরীর নিকটেই রামকৃষ্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণকালে তিনিই তাঁহার নাম রামকৃষ্ণ। এইভাবে বার বৎসরের ভিতর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ভারতবর্ষে যত প্রকার ধর্মমত প্রচলিত আছে, তাঁহার সবগুলিতেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন যে সাধনা আরম্ভ করিতেন একেবারে তখন সেই সাধনায় বিভোর হইয়া পড়িতেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে একজন মহাপুরুষ, অতি শীঘ্রই এ কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার হিতোপদেশ শুনিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে জড় হইতে লাগিল। ভাবের প্রাবল্যে মাঝে মাঝে তাঁহার সমাধি হইত। ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ তিনি মহাসমাধিতে নিমগ্ন হন। সে সমাধি আর তাঁহার ভাঙ্গে নাই। মহাপুরুষ চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু আজও তাঁহার শত সহস্র ভক্ত শিষ্য তাঁহার হিতোপদেশগুলি সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করিতেছেন।

কিম্বদন্তী যে, মানিক রায় নামক এক রাজা প্রাচীনকালে এই গ্রামে বসবাস করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আম্রবাগান ও আমোদর ব্যতীত অন্যান্য কোন নিদর্শন বর্তমানে দৃষ্ট হয় না। পূর্বে গ্রামে অনেক বড় দীঘি ও পুষ্করিণী ছিল; কিন্তু কালের অপ্রতিহত প্রভাবে বর্তমানে উহা মজিয়া যাইতেছে। এই গ্রামে বহু সমাধি মন্দির ও দেউল ছিল, কিন্তু একমাত্র 'হালদার বংশ' ও রামানন্দ শাঁখারীর ভগ্ন দেউল ব্যতীত অন্যগুলি ধূলিসাং হইয়া গিয়াছে। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও এক সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ছিল এবং গ্রামের আর্থিক অবস্থা পূর্বে খুব ভাল ছিল। তুতির খাল গ্রামের দক্ষিণ দিক ধৌত করিয়া কুলু কুলু স্বরে আমোদর নদের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রবাহিত হইত। গ্রাম-বাসিগণের দেহে সুন্দর স্বাস্থ্য ও গৃহে ধন ও ধান্য সম্পদে পরিপূর্ণ থাকিত। কিন্তু প্রলয়ঙ্করী মহামারী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামের যাবতীয় সৌন্দর্য বিনষ্ট করিয়া গ্রাম-বাসিগণকে নিঃস্ব করিয়া দেয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দের আগমনে অত্যল্প-কালের মধ্যেই গ্রামখানি শ্রীমণ্ডিত ও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ॥

রামকৃষ্ণদেব যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, উহা ঢেঁকিশালরূপে ব্যবহৃত হইত। জন্মস্থানটির ঠিক উপরেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দের পরিচালনায় এবং ভক্তবৃন্দের সহায়তায় রামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি সমন্বিত প্রস্তর মন্দির ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১১মে তারিখে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই দিন হইতে যথাবিধি বিগ্রহ পূজিত হইতেছে। জন্মগ্রহণকালীন পরিবেশের স্মারকরূপে বিগ্রহের বেদীর সম্মুখভাগে একটি ঢেঁকি চুল্লি ও প্রদীপ খোদিত করা হইয়াছে। **শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির** শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কর্তৃক পরিকল্পিত। ইহা ছাড়া প্রশস্ত নাটমন্দির, অতিথিভবন চিকিৎসালয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার প্রভৃতি নির্মিত হওয়ায় কামারপুকুর এখন শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কামারপুকুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষ **স্বামী সারদেশ্বরানন্দ** (নলিনী মহারাজ) শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কর্মদক্ষতায় ও উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ও বিভিন্ন ধরণের দশটি প্রতিষ্ঠান কামারপুকুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩ নভেম্বর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন।

মহামারীর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ পর্যন্ত এই গ্রামে একটি সরকারী চিকিৎসালয় খুলিয়া বাখা হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় মহামারীতে গ্রামখানি উজাড় করিয়া দেয়। সরকারী বিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, আরামবাগের মধ্যে এইরূপ মৃত্যুহার অন্য কোন গ্রামে দেখা যায় নাই। মহামারীর বিস্তারিত বিবরণ ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ্রামেব মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, তাঁতি, জেলে প্রভৃতি নানা জাতীয় লোকের বসাত আছে। এখানে ভূতির খাল ও বুধুই মোড়ল নামে শ্মশান আছে। এই গ্রামে জেলা বোর্ডের একটি বাংলো আছে ইহা ছাড়া কৃষি পরিদর্শকের অফিস, স্যানিটাবি ইন্সপেক্টরের অফিস আছে। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনে পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উৎসব হয। এবং হুকা ও আবলুস কাঠের নলের জন্য কামারপুকুর প্রসিদ্ধ। বর্তমানে কযেকটি ভগ্ন ও জীর্ণ মন্দির এবং জঙ্গলাকীর্ণ ইষ্টক স্তূপাদি গ্রামের পূর্ব সমৃদ্ধির কথা জনসাধারণকে কেবল স্মরণ করাইয়া দেয়।

॥ শ্রীশ্রীরঘুবীরের মন্দির ॥

ঠাকুরের পিতৃদেব ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গৃহদেবতারূপে রঘুবীর শিলাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। পূর্বে মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনিযুক্ত একটি ঘরে রঘুবীর থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণকালে রঘুবীরের মন্দিরও ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। কিন্তু উহার দৈর্ঘ, প্রস্থ ও অবস্থিতি-স্থান ঠিক পূর্বের মতই আছে। এই মন্দিরে শিলারূপী রঘুবীর ছাড়া রামেশ্বর শিব, শিতলাদেবী, গোপালমূর্তি ও আরও একটি নারায়ণশিলা আছেন।

লাহাবাবুদের চন্ডীমন্ডপের সামনে বিস্তৃত নাটমন্দির পূর্বে সকালে ও বিকালে একটি পাঠশালা চলিত। রামকৃষ্ণদেব বাল্যে এই পাঠশালায় পড়িতেন। লেখাপড়া তাঁহার বেশী দূর অগ্রসর না হইলেও তাঁহার হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল। তিনি "সুবাহু" ও "যোগাদ্যার"পালার যে অনুলিপি করিয়াছিলেন তাহা বেলুড় মঠে সংরক্ষিত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভিটার উপর তাঁর আমলের তিনটি চালাঘর এবং তাঁহার স্বহস্তে রোপিত একটি আম গাছ অদ্যাবধি বর্তমান আছে। এইগুলি ভক্তগণের হৃদয়ে ঠাকুরের পুণ্যলীলার মধুর স্মৃতি জাগাইয়া তোলে।

॥ যুগীদের শিবমন্দির ॥

কামারপুকুরে যুগীদের শিবমন্দির একটি প্রাচীন দেবস্থান। চন্দ্রমণি দেবী এই মন্দিরে পল্লীর ধনীকামারণীর সহিত কথা কহিবার সময় এক দিব্যদর্শন করেন এবং তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কিছু কারুকার্য আছে।

॥ লাহাবাবুদের বাড়ী ॥

পূর্বে গোস্বামী বংশ কামারপুকুরের জমিদার ছিলেন পরে লাহাবাবুদের হাতে জমিদারী চলিয়া যায়। লাহাবংশের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলার বহু স্মৃতি বিজড়িত আছে। ধর্মদাস লাহার সহিত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল এবং ধর্মদাসের অর্থ সাহায্যে গদাধরের অন্নপ্রাশনে ক্ষুদিরাম গ্রামের সকলকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন। লাহাবাবুদের বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপ জীর্ণ হইলেও এখনও প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে। লাহাবাবুদের বংশধরগণ এখন দেবালয়ের আশে পাশে আলাদা আলাদা বাড়ি করিয়া বাস করিতেছেন। লাহাবাবুদের বাড়ির দক্ষিণদিকে **সীতানাথ পাইনের বাড়ি।** এই বাড়িতেও রামকৃষ্ণের বিশেষ যাতায়াত ছিল এবং তথায় রামায়ণ মহাভারত পাঠ ও গান করিবার সময় রামকৃষ্ণের বহু ভাবাবেশ হয়। রামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে ধন্য এই সব গৃহ চিহ্নিত করিয়া রাখিলে ভাল হয়।

কামারপুকুরে লাহাবাবুদের বিষ্ণুমন্দিরের গায়ে কুড়িটি দেবদেবীর সুন্দর টেরাকোটা মূর্তি কারুকার্যখচিত ইঁটে অংকিত আছে। দুই দিকে পাঁচটি করিয়া দশটি এবং মাথার উপর লম্বাভাবে দশটি মূর্তি আছে। মাথার উপর গণেশজীউর মূর্তি আছে। ইহা ছাড়া শ্রীরামচন্দ্র, মহাবীর হনুমান, মহাদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, দুর্গা ও শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিগুলি উল্লেখ্য। লাহাদের **পঞ্চচূড় শিবমন্দির** এখন ভগ্নাবস্থায়। ইহাকে সংরক্ষণ করা কর্তব্য।

ভূতির শ্মশান॥ এই শ্মশানে এবং বুধুই মোড়লের শ্মশানে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে দিব্যোন্মত্ততায় অবস্থানকালে দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় ধ্যান-ধারণা ও সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিতেন। ভূতির শ্মশানে একটি প্রাচীন বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে। তিনি তাহার নীচে বসিয়া জপতপ করিতেন। এই বটগাছ আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

হালদারপুকুর॥ পূর্বে এই পুস্করিণীর জলে কামারপুকুরের সকলে স্নান-পান ও রন্ধনাদি করিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যস্মৃতির সহিত এই পুকুর বিশেষভাবে জড়িত বলিয়া ভক্তগণ এই স্থানে আসিলেই এই পুকুরে স্নান অবগাহণ করিয়া থাকেন। স্ত্রী-পুরুষদের জন্য এই পুকুরে দুইটি বাঁধান ঘাট আছে।

গোপেশ্বর শিবমন্দির॥ রামকৃষ্ণের জন্মস্থানের পূর্বদিকে গোপেশ্বর শিবের মন্দির অবস্থিত। ইহা খুব প্রাচীন মন্দির। স্থানীয় জমিদার গোস্বামী বংশীয়দের কোন পূর্বপুরুষ কর্তৃক ইহা নির্মিত হয়। কেহ কেহ সুখলাল গোস্বামী ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মত প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যখন দিব্যোন্মাদ অবস্থা হয়, তখন তাঁহার মাতা শ্রীমতী চন্দ্রমণী পুত্রের আরোগ্য কামনায় গোপেশ্বর মন্দিরে 'হত্যা' দেন এবং তথায় মুকুন্দপুরের শিবের নিকট 'হত্যা' দাও—মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন।

মুকুন্দপুরের শিব মন্দির॥ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এই মন্দির অবস্থিত। গোপেশ্বর শিবের প্রত্যাদেশ অনুসরণ করিয়া চন্দ্রমণী দেবী এই মন্দিরে 'হত্যা' দিয়া সুফল লাভ করেন বলিয়া এদবধি বহু নর-নারী এই মন্দিরে ব্যাধিমুক্ত হইবার জন্য হত্যা দেন।

॥ ধনী কামারণীর মন্দির ॥

ধনী কামারণী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হইতেই ধাত্রীমাতারূপে অপার্থিব স্নেহে তাঁহাকে লালনপালন করেন। উপনয়নের সময় অগ্রজ রামকুমার ও আত্মীয়স্বজনের বিরোধিতা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ ধনী কামারণীকে ভিক্ষা-মাতারূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার বাস্তুভিটায় ১৩৫২ সালে একটি ছোট মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে "শিশু গদাধরকে কোলে করিয়া ধনী কামারণী উপবিষ্টা" এই চিত্রখানি স্থাপনা করা হইয়াছে। এই মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি প্রতিকৃতির নিত্যপূজা হয়। ধনী কামারণীর বাস্তুভিটায় যে মন্দির নির্মিত হইয়াছে তাহাতে একখানি প্রস্তরফলকে নিম্নোক্ত কথাগুলি লেখা আছেঃ

এই মাতৃমন্দির
পিতা ৺সত্যচরণ দাস ও মাতা কিরণময়ীর স্মৃতিরক্ষার্থে
তদীয় পুত্রদ্বয় রাধাচরণ দাস ও কালীচরণ দাস (কর্মকার)
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল।
২১শে ফাল্গুন সন ১৩৫২ সাল

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিদ্যামহাপীঠ প্রতিষ্ঠায় **"আনুড় জনশিক্ষা সংসদ"** ত্রিশ বিঘা জমি দিয়া সহায়তা করেন। পরে এই ত্রিবার্ষিক ডিগ্রী কলেজের জন্য আরও ত্রিশ বিঘা জমি দানস্বরূপে পাওয়া যায়। গ্রামে এইধরণের আবাসিক মহাবিদ্যালয় একটি গৌরবের জিনিষ। আনুড় নিবাসী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরূপে ইহার ক্রমোন্নতিতে যেভাবে সহায়তা করিতেছেন তাহাও উল্লেখ্য। এই শিক্ষালয়ের বিষয় ৩৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ তরুণ সংঘ একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। ইহাদের চেষ্টায় প্রতিবৎসর 'রামকৃষ্ণ মেলা' হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছোট মন্দিরও ইহাদের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিদ্যামহাপীঠ সংলগ্ন রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সংঘ কর্তৃক প্রত্যহ পূজিত হয়। মন্দিরের সামনে শ্বেতপ্রস্তরে উৎকীর্ণ নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা আছেঃ

নটবরচন্দ্র কুণ্ড তস্য পুত্র
গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ডুর স্মৃতিকল্পে
তস্যা পত্নী শ্রীমত্যা ক্ষুদিবালা কুণ্ডু
কর্তৃক এই প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইল।
২৭ ফাল্গুন ১৩৬৫ সাল

কামারপুকুরের অর্ধক্রোশ উত্তরে হরিশোভা গ্রামে বিখ্যাত **মাণিক রাজা** (মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) নামক ধনাঢ্য ব্যক্তি সগৌরবে বাস করিতেন। তাঁহার সুখসায়ের, হাতিসায়ের প্রভৃতি দীঘিসকল ও প্রান্তর মধ্যস্থিত ভূতির খালের পশ্চিমে সাধারণের উপভোগ্য বিস্তীর্ণ আম্রকানন এখনও তাহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। এই বাগানটি ছিল বালক অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের ও তাঁহার সহচরদের ক্রীড়াভূমি। মাণিক রাজার প্রাসাদোপম ভগ্ন অট্টালিকা আজও আছে। তিনি দানশীলতার জন্য এই অঞ্চলে প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও এই গ্রামে বাস করেন। অনেকে হরিশোভাকে ভূরসুবো বলিয়া থাকেন।

স্বামী প্রেমানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' নামক একখানি পুস্তক ১৩৩১ সালে প্রকাশ করেন। উহা ১৩২০ সালে উদ্বোধন পত্র হইতে পুনঃমুদ্রিত হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বহুমুখী বিদ্যালয় ভবনও কামারপুকুরের গৌরবের বস্তু। মিশনের নিয়মানুযায়ী এই বিদ্যালয় পরিচালিত হয় এবং ইহার সুরম্য ভবন ও ছাত্রাবাস এবং নিয়মানুবর্তিতা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে।

কামারপুকুরের নিকট **ইন্দিরা** গ্রামে প্রসিদ্ধ দেশকর্মী প্রমথনাথ রায় ১৩০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার চেষ্টায় গোঘাট থানায় রামকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্য সাত বার তাহাকে কারাবাস করিতে হয়। কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ সেবাসংঘের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৩৪৪ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

॥ জয়রামবাটী ॥

বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার সন্ধিস্থলে কামারপুকুর হইতে তিন মাইল পশ্চিমে অধুনা বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহধর্মিণী শ্রীমতী সারদামণি দেবীর জন্মে এই স্থান আজ বিশ্বের সর্বত্র পরিচিত। ১৩২৯ সালে শ্রীশ্রীমা, যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথায় ঠাকুরের ভক্তগণ কর্তৃক একটি সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছে, উহা 'মাতৃমন্দির' বলিয়া খ্যাত। জয়রামবাটীর স্বর্গীয় রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাই পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী। এই মহীয়সী নারী চিরব্রহ্মচারিণীরূপে স্বামীর ধর্মানুগামিনী ছিলেন। তাঁহার পবিত্রতম জীবনযাত্রার প্রণালী বাংলার নারী-সমাজের আদর্শ-স্বরূপ। বাংলার পুরুষ শক্তিরূপিণী নারীকে আবার মহামায়ারূপে পূজা করিতে শিখিয়া স্বসং ধন্য হইতেছে জাতিকে নবভাবে গঠিত করিয়া তুলিবার অবকাশ দিতেছে। পরমহংসদেবের সাধনা যে ব্যর্থ হয় নাই, জয়রামবাটী পল্লীতে মাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার ভক্তগণ অব্যর্থ প্রমাণ দিয়াছেন। যে গৃহে রামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, জীবনের অনেক কাল যেখানে যাপন করিয়াছিলেন, সেই পল্লীকুটীরকে পবিত্র তীর্থ মনে করিয়া রামকৃষ্ণের ভক্ত সেবকগণ তথায় বহু ব্যয়ে নূতন মন্দির নির্মাণ করাইয়া তথায় মাতৃ-মন্দিরে পূজা অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশদেশান্তর হইতে শত শত ভক্ত, সেবক ও অনুরাগী পল্লীর উৎসবক্ষেত্রে-মন্দির প্রতিষ্ঠার যজ্ঞে যোগদান করিয়া-ছিলেন। বহু বহু শতাব্দীর পর বাংলার পল্লী প্রান্তরে নারী-শক্তির, মাতৃপূজার উদ্বোধন-মন্ত্র বাঙ্গালীর কণ্ঠে নূতন সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদের মত এই নারী পূজার মন্ত্র—মাতৃনামগান সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিবে কি? বাঙ্গালী নারী জাতিকে মা বলিয়া ডাকিতেও যেন এখন কুণ্ঠা বোধ করে, নারী জাতিকে মাতৃভাবে চিন্তা করিতেও অধঃপতিত বাঙ্গালী যেন ভুলিয়া গিয়াছে। এই বোধনমন্ত্র সমগ্র বঙ্গে ব্যপ্ত হইয়া বিলাস ব্যসন ক্লিষ্ট, আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে নারী শক্তি পূজায় অবহিত করিয়া তুলিবে কি? নারী জাতিকে আবার মা বলিয়া ভাবিতে ও ডাকিতে শিখাইবে কি? হিন্দু যতদিন শক্তি পূজায় অবহিত ছিল, ততদিন সে তাহার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাধান্যও রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। বিশেষ বাঙ্গালী-হিন্দু দশপূজার পূজাই তাহার

প্রধান পূজা বলিয়া মনে করিত। মা দশপ্রহরণধারিণী—আবার মা বরাভয়প্রদায়িনী।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে সেইজন্য গীত হইয়াছিলঃ

বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি—তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।”
হিন্দুর পুরাণে কীর্তিত হয় যে কাজ দেবতার সাধ্যাতীত হইয়াছিল দেবী তাহাই সম্পন্ন করিয়া, অনাচার দানব নষ্ট করিয়া ত্রিভুবন নিঃশঙ্ক করিয়াছিলেন। বাংলার রামপ্রসাদ মা নামে অজ্ঞান হইতেন বাঙালী কি সেই মাতৃমন্ত্র কখনও ভুলিতে পারে?

জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরে মায়ের নিত্যপূজা যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীমা যে কুটীরে বাস করিতেন এবং পরবর্তীকালে তাঁহার বাসের জন্য যে গৃহ নির্মিত হইয়াছিল, তাহা স্মৃতিস্বরূপ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। নাটমন্দিরে প্রতিবৎসর জগদ্ধাত্রী পূজা বিধিপূর্বক সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে জাগ্রতা সিংহবাহিনী দেবী আছেন। এই দেবীর নিকট হত্যা দিয়া শ্রীমা নিজের দুরারোগ্য রোগের ঔষধ লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া মায়ের পুণ্যস্পর্শে ধন্য তালপুকুর ও বিশাল দীঘি এখনও বর্তমান। জয়রামবাটীর উত্তর ও পূর্ব প্রান্ত দিয়া আমোদর নদ দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। শ্রীমা উহাতে স্নান করিয়া গঙ্গাস্নানের আনন্দ অনুভব করিতেন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দ এই স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি [illegible] বিদ্যায়তন গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই গ্রামে ঠাকুরের অনেক মধুর স্মৃতি [illegible] আছে।

॥ বনমালীপুর ॥

বনমালীপুর একটি প্রাচীন স্থান। [illegible] এখানে এক সময় বসবাস করিতেন। আরামবাগ সহরের ছয় মাইল উত্তর পূর্ব কোণে [illegible] নিকটে এই গ্রামখানি অবস্থিত। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদিনিবাস এই গ্রামে ছিল। কিন্তু তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দের অপমানসূচক কথায় ব্যথিত হইয়া দেশত্যাগ করিলে, তাঁহার স্ত্রী পিত্রালয় বীরসিংহ গ্রামে বসবাস করেন। এই সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বরচিত চরিত কথায় লিখিয়াছেন ঃ

'বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হইয়াছে কিন্তু এই গ্রাম আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্ব-পুরুষদের বাসস্থান নহে। জাহানাবাদের ঈশান কোণে, তথা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে বনমালীপুর নামক যে গ্রাম আছে উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্বপুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান।

কুমারগঞ্জ গ্রামের নিকটে আগাইগড়ে প্রাচীনকালে এক রাজা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। আগাই গ্রামের চতুর্দিকে পরিখাবেষ্টিত গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজার কি নাম ছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। বর্তমানে ইহা একটি সামান্য গ্রাম।

খানাকুলের নিকট সেনহাট গ্রামে ১৯৯২ সালে ভক্তবর বিশ্বম্ভর পানি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত জগন্নাথ মঙ্গল সঙ্গীতমাধব, প্রেমসম্পুট ভক্তগ্রন্থমালা গ্রন্থ গৌড়ীয় সাহিত্যের অলঙ্কার বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে আদৃত।

সাতমাসা গ্রামে অধিকারীদের শিবমন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। কিন্তু পঙ্কর ধসিয়া যাওয়ায় মন্দিরটি হেলিয়া পড়িয়াছে। শীঘ্রই উহা পড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

খানাকুল-কৃষ্ণনগর

খানাকুল-কৃষ্ণনগর হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান; বহু ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ ও ন্যায়-স্মৃতি-তন্ত্রের পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করায় ইহা বঙ্গের প্রাচীনতম পল্লীগুলির মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। অক্ষ্যাংশ ২২°৪৩´ উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৮৭°৫২´ পূর্বে অবস্থিত। এই স্থানের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বহুমুখী প্রতিভার জন্য বঙ্গদেশে বিশেষভাবে পরিচিত। যাদবেন্দ্র চৌধুরী ও তাঁহার পৌত্র বংশীধর চৌধুরী সপ্তদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে নারাণ ঠাকুরের সহায়তায় এই অঞ্চলের তিনশত গ্রাম লইয়া খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা সেই সময় সমগ্র বাংলায় একটি আদর্শস্থান বলিয়া গণ্য হইত। ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে এতবড় শক্তিশালী সমাজ পূর্বে আর কোথাও ছিল না। বংশীধর চৌধুরী খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজ স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন ও পণ্ডিতগণকে আনাইয়া এই স্থানে বসবাস করান। একমাত্র নবদ্বীপ ছাড়া এত পণ্ডিত ব্যক্তির বাস বাংলায় আর কোন জেলায় ছিল না বলিয়া খানাকুলকে তৎকালে দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলা হইত। রাধানগরের প্রসিদ্ধ সর্বাধিকারী বংশের আদি রত্নেশ্বর সর্বাধিকারীকে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের পূর্বোক্ত চৌধুরী বংশ সর্বপ্রধান কুলীন বলিয়া কন্যাদান করিবার নিমিত্ত আনয়ন করেন। ক্ষুদ্র পল্লী রাধানগরও ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান এই খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের অন্তর্গত। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় সর্বাধিকারী বাড়ির পাশে নিজ আবাসভূমি নির্মাণ করেন। বন্যার ভীষণ প্লাবনে ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এই সমাজ এখন শ্রীহীন হইলেও তাহার অতীতের স্মৃতির সহিত অনেক মহাপুরুষ ও পণ্ডিতের নাম এবং তাঁহাদের কীর্তিগাথা আজও ভারতের ইতিহাসে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া আছে।

হুগলী জেলার গেজেটিয়ারে ওম্যালী সাহেব খানাকুলের সমাজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

Khanakul is inhabited by many families of higher castes, specially Brahmans and Kayasthas, a sure sign that it is an old place. The Brahmans of Khanakul formed a distinct Samaj, noted for their learning and studies in grammar and astronomy.

খানাকুলে অভিরাম গোস্বামীর ন্যায় স্মার্ত, কণাদের ন্যায় নৈয়ায়িক, আগমবাগীশের ন্যায় তান্ত্রিকসাধক, রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় কর্মী এই স্থানকে অলংকৃত করিয়াছিলেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজ চতুর্দশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী এই একশত বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হয় বলিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। খানাকুল-উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অভিরাম গোস্বামী ১৩১৬ শকে এই স্থানে আবির্ভূত হন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বে তিনি এই দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। মহাপ্রভুর পূর্বে বৈষ্ণবগণ সহজিয়া ভাবের ছিল, পরে ঐ পন্থের বৈষ্ণবগণ চৈতন্যধর্মে মিশিয়া যান। বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ ২২৫-২২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

॥ অভিরাম গোস্বামী ॥

অভিরাম গোস্বামী খুব উৎসাহী পুরুষ ছিলেন এবং আপন শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা বহু স্থানে বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করিয়া বৈষ্ণবধর্মের খুব প্রচার করেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের বহু স্থানে আজও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক মন্দির বিদ্যমান আছে। তাঁহার জীবনী নানারূপ অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের শাখাভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি দ্বাদশ গোপালের **প্রথম গোপাল** ছিলেন।

অভিরাম মুখ্যশাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ট তুলি যে কাঁশল বাঁশী॥

অভিরামের কৃপায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদরজ খানাকুল-কৃষ্ণনগরে পড়িয়াছিল, তাই অপব্যবহৃত শক্তিতে এই স্থান আজও শক্তিমান। বাংলা দেশে দ্বাদশ পাঠের মধ্যে হুগলী জেলায় যে চারটি শ্রীপাঠ আছে তার মধ্যে খানাকুল অন্যতম। এই সম্বন্ধে পাটপর্যটনের উক্তিঃ

অভিরাম পূর্বে সুদাম খানাকুলে স্থিতি।
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম খ্যাতি॥

কৃষ্ণনগরের নিকট পূর্বে কাজীপুর নামে এক গ্রাম ছিল; অভিরামের আগমনের পর উহা শ্রীপাঠ খানাকুল বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'বৈষ্ণবাচার দর্পণে' অভিরাম সম্বন্ধে আছেঃ

গৌড়দেশে খানাকুল নিবাস প্রচার।
বত্রিশ বোঝা কাষ্ঠের হয় বংশী যাহার॥

অভিরাম শাখা নির্ণয়ে তাঁহার চব্বিশ জন প্রধান শিষ্যের নাম ধাম উল্লিখিত আছে। তাহার মধ্যে কৃষ্ণদাস ঠাকুর ও যদুনাথ হালদারের ন্যায় তৎকালীন সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ অভিরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যায়। যদু হালদারের বিগ্রহ অভিরাম গোস্বামীর গোপীনাথ জীউর মন্দিরে অদ্যাপি সেবিত হয়। পাটপর্যটনে তাঁহাদের সম্বন্ধেও লেখা আছেঃ

খানাকুল কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস।
কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ॥
রাধানগরে বাস যদু হালদার।
হিরামাধব দাস স্থিতি অনন্তসাগর॥

॥ গোপীনাথজীউর মন্দির ॥

অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথজীউ ও তাঁহার বিরাট মন্দির একটি দর্শনীয় জিনিষ। এইরূপ সুবৃহৎ মন্দির বঙ্গদেশে খুব অল্পই আছে। **শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর** বিগ্রহ একখানি কষ্টিপাথরের উপর খোদিত। অভিরাম সর্বপ্রথম একখানি খড়ের ঘরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান মন্দির ১২১৯ সালে নির্মিত হয়। এই মন্দিরের দক্ষিণে পুরাতন **নবরত্ন মন্দির** বিরাজিত। ইহা ১১৮১ সালে নসীরাম সিংহ নির্মাণ করিয়া দেন। নাট-মন্দির হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার 'ধীবরমণ্ডলী' ১২৬৩ সালে নির্মাণ করিয়া দেন। পরে উহা ভগ্ন হইলে উক্ত ধীবরগণের বংশধরগণ ১৩২০ সালে উহা পুনরায় সংস্কার করিয়া দেন। মন্দিরগাত্রে একখানি প্রস্তরফলকে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছেঃ

শ্রীশ্রী'গোপীনাথ জীউ জয়তি
চেতুয়া দাসপুর মান্দারণ খানাকুল ও বালী দেওয়ানগঞ্জ
তিন পরগণা ধিবরমণ্ডলী কর্তৃক
সন ১২৬৩ সালে এই মন্দির নির্মিত হয়।

শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর শ্রীমূর্তি একখানি কষ্টি প্রস্তরের উপর খোদিত। প্রস্তরখানিতে বস্ত্রহরণ-লীলার চিত্রও উৎকীর্ণ—নিম্নে যমুনা প্রবাহিতা, উচ্চে পর্বতে ধেনু চরিতেছে, কদম্ববৃক্ষোপরি শ্রীগোপীনাথ বংশীধ্বনী করিতেছেন, গোপীগণ চতুর্দ্দিকে বস্ত্র ভিক্ষা করিতেছেন। চিত্রের পরিকল্পনা এইরূপ।

কথিত আছে, উপাস্য শ্রীকান্তকে হারাইয়া প্রথমে অভিরাম ঠাকুর দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোথাও তাঁহার হৃদয়-দেবতার দেখা পাইলেন না। কোন বিগ্রহে সর্বব্যাপী তাঁহার শক্তি নিহিত করিলেন। সাধকের প্রণাম জাগ্রত বিগ্রহ ভিন্ন কে সহ্য করিতে পারে? অভিরাম দেবমূর্তি দেখিলেই দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করেন, আর সেই প্রণামরূপ দণ্ডাঘাতে বিগ্রহ চূর্ণ হইয়া যায়। কথিত আছে, রাধানগরে সর্বাধিকারীদিগের বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাকান্ত তাঁহার এই অসহ্য প্রণামের তাড়নায় শালগ্রাম শীতলকায় হইলেন। সেই হইতে তিনি **শীতলানন্দ** নামে খ্যাত। অভিরামের **জয়মঙ্গল চাবুক** শ্রীপাঠে সংরক্ষিত আছে।

মন্দিরের মধ্যে গোপীনাথের বিগ্রহ ছাড়া বলরাম, মদনমোহন, গোপাল ও অভিরাম ঠাকুরের মূর্তি আছে। এইরূপ সুরম্য মন্দির ও মন্দিরগাত্রে ইণ্টর কারুকার্যখোদিত অসংখ্য দেবমূর্তি দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ প্রশস্ত নাটমন্দির সংলগ্ন মন্দির খুব কম আছে। অভিরামের শিষ্যের বংশধরগণ অদ্যাপী পূজা ভোগরাগ ও উৎসবাদি যথাবিধি নির্বাহ করিতেছেন। গোপীনাথের রাসমঞ্চ দেখিতে খুব সুন্দর। রাসের সময় বিগ্রহ এইস্থানে আনা হয়। এবং রাসের মেলায় দেশ দেশান্তর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর দেবদর্শন করিতে আসিয়া কিছুদিন এই স্থানে বাস করেন। শ্রীপাঠে ৩৬ ঘর অভিরামবংশীয় গোস্বামীর বাস। বর্তমানে যাঁহারা সেবাকার্য করেন, তাঁহাদের নাম ১৪০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হুগলী জেলার গেজেটিয়ারে এই মন্দির সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা উল্লেখ্যঃ

A large temple, surrounded by a dozen smaller ones, stands on the river bank ; it is dedicated to Gopinath, and was visited by the poet Bharat Chandra Ray about 1751 A.D.

॥ ঘণ্টেশ্বর মহাদেব ॥

খানাকুলের **ঘণ্টেশ্বর শিবের** খ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কাণা দ্বারকেশ্বর বা কাণা নদীর ধারে এই বিরাট মন্দির আজও দণ্ডায়মান আছে। স্থাপত্যশিল্পে এই মন্দির একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই স্থানে শ্মশান অবস্থিত। শ্মশানে দাহ-কার্যের জন্য ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের জন্য দুইটি স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। বাঙ্গলা দেশের কোথাও শ্মশানে এইরূপ জাতিভেদের ব্যবস্থা লেখকের নয়নগোচর হয় নাই। ঘণ্টেশ্বর মন্দিরের ডানদিকের শ্মশানের নাম ব্রহ্মশ্মশান ও বামদিকেরটি সাধারণ শ্মশান।

ঘণ্টেশ্বরদেব অনাদি স্বয়ম্ভু—এই বিরাট শিবলিঙ্গ কাহারও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। কোন স্মরণাতীত কাল হইতে যে ইহার মহিমা প্রকটিত হইয়া আসিতেছে, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন কীর্তিমালায় সুশোভিত এই স্থানে শ্মশানকালী, বিশালাক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, ষষ্ঠী-ঠাকুরাণী, ধর্মঠাকুর, ক্ষুদিরায় ও গৌর-নিতাই বিরাজমান থাকায় ইহা এমনি রমণীয় যে, সেই জন্য ইহাকে 'গুপ্তকাশী' বলা হইত। ঘণ্টেশ্বরকে 'গুপ্তকাশীর পতি বলিয়া' বর্ণনা করা হইয়াছে—'গুপ্তকাশীধাম-পতিং ভজ ঘণ্টেশ্বরম্'।

ঘণ্টেশ্বর লিঙ্গের কথা "মহালিঙ্গাষ্টন তন্ত্রে" লিখিত আছে। "ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশী রত্নাকর নদীতটে।" পূর্বে এই নদী খুব বেগবতী ছিল এবং ইহার নাম ছিল রত্নাকর। কিম্বদন্তী যে, অভিরাম গোস্বামীর কৌপীণ ভাসিয়া যাওয়ায় তাঁহার অভিশাপে রত্নাকর নদীর বেগ কমিয়া ইহা কাণা নদীতে পরিণত হয়। গেজেটিয়ারে এই সম্বন্ধে লেখা আছে ঃ

A large temple of Ghanteswar Siva, standing by the river bank, is in danger of being cut away by the deepened stream.

শ্রীমদ বটুক বাবাজীর নির্দেশেই ঘণ্টেশ্বরের বিরাট মন্দির উবিদপুরের মটুক কারক নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু অর্ধনির্মিত অবস্থায় তিনি পরলোকগমন করিলে কানাইলাল দে মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। মন্দিরে ঘণ্টেশ্বরের বিরাট মূর্তি ছাড়া কালভৈরবের মূর্তি আছে। কিম্বদন্তী যে প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্বে ঘণ্টে-শ্বর দেবের সেবায়েত স্বপ্নাদেশে মাঘ মাসের এক অকাল বন্যায় কালভৈরব মূর্তি প্রাপ্ত হন এবং উহাকে ঘণ্টেশ্বরেব পাশে স্থাপন কবিতে তিনি আদিষ্ট হন। তদবধি মাঘ মাসের দশমীর পরদিন ভৈমী একাদশীতে ও শিবরাত্রী উপলক্ষে এই স্থানে দুইটি বৃহৎ মেলা হয়।

মন্দিরের পুরোভাগে বিশাল নাটমন্দির ও নহবৎখানা এবং বামদিকে অন্যান্য দেবালয়-গুলি স্থানটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে। মন্দিরের উত্তর ও পশ্চিম দিক বেষ্টন করিয়া রত্নাকর বলয়াকারে প্রবাহিত হয়। এই স্থানে বহু সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। স্বামী অনুপনারায়ণ, সুদামচন্দ্র ব্রহ্মচারী, ঈশানচন্দ্র দেব ও বটুক বাবাজীব নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। স্বামী ভৈরবচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী যমুনা দেবী সর্বপ্রথম ঘণ্টেশ্বর দেবের সেবার ভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হন। পরে দশরথ বটব্যাল সেবার ভার পান। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি এই সেবাকার্যে ব্রতী আছেন। দেবতার কোন ভূসম্পত্তি নাই সাধারণের দানে দেবপূজা নির্বাহ হয়। দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য ঘণ্টেশ্বর দেবের স্বপ্নাদ্য ঔষধ সেবায়েতগণ দিয়া থাকেন। এই বংশে প্যারিমোহন বটব্যালের পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি ছিল। তাঁহার পুত্রের নাম সীতারাম বটব্যাল সাহিত্যরত্ন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস হ্যাণ্ডবুকে ঘণ্টেশ্বরেব মন্দির সম্বন্ধে লেখা আছে ঃ

The temple of Ghanteswarsiva is the most famous temple of this place.

॥ রামমোহন স্মৃতি সৌধ ॥

রাধানগরের রাজা রামমোহন রায়ের ভবন তাঁহার বংশধর বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিলে রাধানগরের অন্যতম সুসন্তান স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বসু নিজ অর্থে তাহা ক্রয় করিয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে উহাতে তাঁহাব স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তথায় দেশবাসীর চেষ্টায়
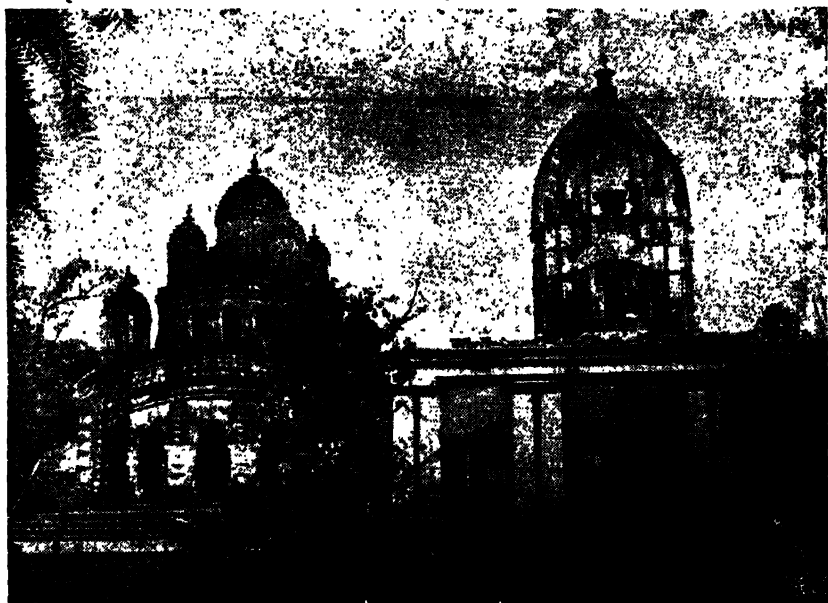
নবরত্ন ও গোপীনাথজীউর মন্দির—কৃষ্ণনগর (পৃঃ ১৩৮০)
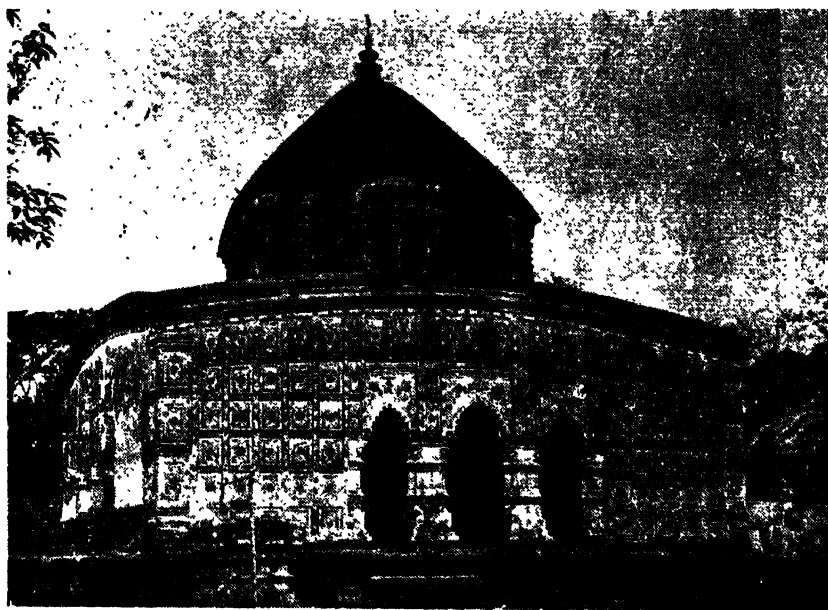
রাধাবল্লভজীউর মন্দির—কৃষ্ণনগর (পৃঃ ১৩৮৭)

যদুনাথ সর্বাধিকারী (পৃঃ ১৩৯০)

ডঃ সূর্যকুমার সর্বাধিকারী (পৃঃ ১৩৯১)

অসমাপ্ত রামমোহন স্মৃতিমন্দির—রাধানগর (পৃঃ ১৩৮২)

ঘণ্টেশ্বর দেবের মন্দির—খানাকুল (পৃঃ ১৩৮১)

॥ ১১২ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর বিগ্রহ (পৃঃ ১৩৮১)

"রামমোহন স্মৃতি সৌধ" নির্মিত হইয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে বর্তমানে উহার অবস্থা অতীব শোচনীয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি মন্দির নির্মাণের জন্য প্রথম কমিটি হয়।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্মৃতিমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্ধ-শতাব্দী অতীত হইয়া যাইলেও এখনও স্মৃতিমন্দিরটি রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী সমাপ্ত হয় নাই। স্মৃতিমন্দিরে লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম স্থাপন করা হইবে বলিয়া দানপত্রে উল্লেখ থাকিলেও, দাতার অভিলাষ পূরণের কোন উদ্যোগ আজও হয় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি সংরক্ষণ করিবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান আছে—উহার সভাপতি ডঃ কালিদাস নাগ ও সম্পাদক রাধানাথ ঘোষ। এই সংরক্ষণ সমিতিকে রামমোহনের স্মৃতি-রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিতেছি।

যতীন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি সৌধটি ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল তারিখে একটি দানপত্র দ্বারা হুগলী জেলা বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত করেন। দলিলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই:

(১) যতীন্দ্রনাথ বসু ৫৮ একর জমি তৎসহ রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি সৌধ, একটি পুকুর হুগলী জেলা বোর্ডের হাতে রামমোহনের স্মৃতি রক্ষার জন্য অর্পণ করিয়াছেন।

(২) উক্ত স্মৃতি সৌধ হুগলী জেলা বোর্ড সংস্কার করিবে।

(৩) উক্ত স্মৃতি সৌধে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান ও স্মৃতিভবন খোদিত হইবে।

(৪) জনসাধারণের সুবিধা অনুযায়ী পুকুরটি ভরাট অথবা কাটাই করিবে।

(৫) প্রতি তিন বৎসর অন্তর দলিলের সর্ত অনুযায়ী বোর্ড রাজা রামমোহন স্মৃতি রক্ষা কমিটি গঠন করিয়া রাজার স্মৃতি রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করিবে।

হুগলী জেলা বোর্ড দলিলের এক বর্ণও পালন করেন নাই এবং ভবিষ্যতে করিবার সম্ভাবনা নাই। আজ বহু বৎসর অতীত হইল একখানি পাথরে খোদাই করিয়া কোথায় রামমোহনের জন্ম হইয়াছিল বা ভবনটির নাম যে রামমোহন স্মৃতি সৌধ তাহাও লিখিত হয় নাই। সুতরাং রামমোহনের সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার রক্ষা করিলে রাজার জন্মস্থানে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষিত হইবে, নচেৎ কিছুই হইবে না।

কৃষ্ণনগরে যাদবেন্দু রায় প্রতিষ্ঠিত **রাধাবল্লভজীউর মন্দির** প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। বর্তমান মন্দির ১৬১৮ শকাব্দে মাধবপুরের রায় বংশীয়গণ করিয়া দেন। পুরাতন মন্দির নসিরাম সিংহ করিয়া দেন। এই স্থানে মেলায় বহু জনসমাগম হয়।

কৃষ্ণনগর নামে আরও দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে আছে বলিয়া অন্যান্য স্থান হইতে পৃথকভাবে চিহ্নিত করিবার জন্য ইহাকে খানাকুল-কৃষ্ণনগর বলা হয়। অন্য গ্রাম দুটির নাম জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর (হুগলী) ও গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

॥ সর্বাধিকারী বংশ ॥

দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ তোগলকের নিকট হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে সর্বাধিকারী বংশের আদি সুরেশ্বর বসু **'সর্বাধিকারী'** উপাধি ধন, মান, বুদ্ধি প্রভৃতি সর্ববিষয়ের অধিকারী বলিয়া তিনি সর্বাধিকারী হন। সর্বাধিকারী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ্বর সম্বন্ধে মেজর ডাঃ ওয়ালস্ মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাসে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য:

The founder of the Subadhikary family was Sureswar who was appointed, in the beginning of the Fifteenth Century, Diwan of Orissa. Sureswar Subadhikary administered that Province very succesfully under the Imperial Court of Delhi. He revived the hereditary title of "Subadhikary" which means the "head of all classes" in point of wealth, rank, caste and descent from the Emperor of Delhi, Mahammed Shah (Toghlok) in consideration of his political position as Diwan or Governor of Orissa. (History of Murshidabad District).

॥ সর্বেশ্বর বসু ॥

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ এই স্থানের সর্বাধিকারী মহাশয়েরা সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ বসু বংশ। তাঁহারা মাইনগরের বসু। মূল দশবথ বসু হইতে তিনি ১২ নম্বরে তিনি উড়িষ্যায় যান এবং সেখানকার স্বাধীন হিন্দু রাজাব সর্বাধিকারী হন। সেটা কোন শতাব্দী তাহা কোথাও লেখা নাই। তবে ১২ নম্বর হইলে ১২০০ হইতে ১৩০০ মধ্যে সম্ভব। ইহার পূর্বেই জগন্নাথের মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল, সেটা বোধ হয় ১০৩৮ হইতে ১১১৮ পর্যন্ত। তাঁহার পর ভোগের ও পূজার বন্দোবস্ত। তাহাতে অনেক পুরুষ লাগে। মাইনগরের সর্বেশ্বর বসু মহাশয়, বোধ হয় এই সময়েই উড়িষ্যার অথবা জগন্নাথক্ষেত্রের সর্বাধিকারী হন। কারণ জগন্নাথ-মন্দিরে তাঁহার ও তাঁহার বংশধরগণের অনেক অধিকার এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁহারা তাঞ্জামে চড়িয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন। ছাতা মাথায় দিয়াও প্রবেশ করিতে পারেন। এটা কিন্তু একটা বড় রাজসম্মান। মন্দিরের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে এ সকল অধিকার পাওয়া যায় না। এই সময়ে তাঁহারা উড়িষ্যার রঘুনাথপুরের তালুক পান। ঐ তালুকের সত্ত্ব এখনও সর্বাধিকারী বংশ ভোগ করিতেছেন। তবে অনেক ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। সর্বাধিকারীরা অনেক পুরুষ ধরিয়া রঘুনাথপুরে বাস করিতেছিলেন। ঊনিশ পর্যায় রত্নেশ্বর বসু সর্বাধিকারীকে আনিয়া যাদবেন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কন্যা সম্প্রদান করেন এবং কৃষ্ণনগরে বাস করান। তাঁহার আর দুই ভাইও এই সময়ে আসিয়া কৃষ্ণনগরে বাস করেন।

সর্বাধিকারী মহাশয়েরা যখন উড়িষ্যার রাজার কর্মচারী ও জগন্নাথ-মন্দিরের সেবক ছিলেন তখন যে তাঁহারা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা এখনও বৈষ্ণব ধর্মে পরম আস্থাবান্। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় খানাকল-কৃষ্ণনগর সমাজের অনেক কথাই লিখিয়াছেন, তাহাতে আপনারা অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে সর্বাধিকারী বংশের **রামনারায়ণ মুন্সী** কলিকাতায় আসিয়া খুব পসার প্রতিপত্তি করেন। তিনি একবার ভূ-কৈলাসের ভূ-সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিয়া বিশেষ যশোলাভ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র **মথুরামোহন সর্বাধিকারী** মিউটিনির পূর্ব বৎসর হাঁটিয়া তীর্থ করিতে যান এবং মিউটিনি শেষ হয় হয় এমন সময় ফিরিয়া আসেন। তাঁহার এই তীর্থভ্রমণের এক বিবরণ আছে। ঐ বিবরণ ১৮৫৮ সালে লেখা হয়। উহা গদ্যে লেখা এবং একখানি বড় বই। এত বড় এবং এমন সুন্দর গদ্যে লেখা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বাঙ্গলা ভাষায়

আর আছে কি না সন্দেহ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **যদুনাথ** পায়ে হাঁটিয়া বদরিকাশ্রম, জ্বালামুখী প্রভৃতি তীর্থস্থানের বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। কোথায় কি কি পুণ্য কার্য করিতে হয়—কোথায় কিরূপ থাকিবার স্থান পাওয়া যায়, এ সব কথা বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় বেশ পরিষ্কার করিয়া লেখা আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই 'তীর্থ-ভ্রমণ' প্রকাশ করিয়াছেন। যদুনাথ সর্বাধিকারীর ছেলেরা সকলেই সুপরিচিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী** মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন, আমরা তাঁহার কাছে পড়িয়াছি। তাঁহাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিয়া আসিয়াছি। তাঁহার সদ্‌গুণসমূহের অনুকরণ করাই জীবনের সার বস্তু বলিয়া মনে করি। ২য় সূর্যকুমার সর্বাধিকারী নিজে ত স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন, তাহার পর 'পুত্রে-যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।'—তাঁহার পুত্রেরা সকলেই কৃতী। দেববাবু ও সুরেশ ত জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির বিষয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সুরেশ অল্পভোগী ছিল, অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল। আমি তাহাকে অতি অল্প বয়স হইতেই জানিতাম। সে যে কাজেই লাগিত প্রাণপণে তাহা সুসিদ্ধ করিত। কি অস্ত্র-চিকিৎসায়, কি অন্য চিকিৎসায় তাহার মত তাহার সময়ে আর কয়জন ছিল? তাহার পর এই যে 'বেঙ্গলী কোর' এটা ত সেই করিয়া গিয়াছে। সে পরলোকগত হইয়াছে; আমরা পরলোকে তাহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

যদুনাথ সর্বাধিকারীর আব এক পুত্র (৪র্থ) **রাজকুমার সর্বাধিকারী** ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে সর্বপ্রথমেই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার পাইয়া রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবং সংস্কৃতের অধ্যাপকতা করিয়াই জীবনের অধিকাংশ কাটাইয়া গিয়াছেন। তাহার উপর রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ত একজন পাইওনিয়ার। কত কাজ যে করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

পূর্বে রঘুনাথপুরে ইঁহাদের আদিনিবাস ছিল। এই জমিদারী হইতে তাঁহার বার্ষিক আয় ছিল দুই লক্ষ টাকা। খানাকুল কৃষ্ণনগরের চৌধুরী বংশের সহিত রত্নেশ্বর সর্বাধিকারী বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং চৌধুরীদের বিশেষ চেষ্টায় রত্নেশ্বর সর্বাধিকারী রঘুনাথপুর ত্যাগ করিয়া রাধানগরে আসিয়া বাস করেন তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। এই বংশের **রামনারায়ণ মুন্সী** সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ফারসী রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া তিনি "মুন্সী" উপাধি প্রাপ্ত হন। সর্বাধিকারীদের 'মুন্সীচালা' তাঁহারই কীর্তি। রামমোহন বাল্যকালে মুন্সীচালায় শিক্ষা লাভ করেন। কায়স্থসমাজে নিজবংশের কৌলিন্য বর্ধিত করিবার জন্য তিনি 'নবরঙ্গকুল' করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তদবধি তাঁহারা 'নবরঙ্গী' নামে অভিহিত হন। খিদিরপুরে মুন্সীবাগান তাঁহারই নামে প্রসিদ্ধ। ১১৫৩ সাল হইতে ১২৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

He established a Persian School at Radhanagore for the free education of the poor. (History of Murshidabad District).

মথুরামোহন রামনারায়ণ মুন্সীর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১১৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৫৪ সালে পরলোকগমন করেন। পিতার আমলে তাঁহাদের কুলদেবতা রাধাকান্তজীউর মন্দিরের যে নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়, তিনি তাহা সমাপ্ত করেন। মন্দিরে রাধাকান্ত ও শালগ্রাম আছেন। অভিরাম ঐ শিলাকে প্রণাম করেন, কিন্তু তাহাতে শিলা ভগ্ন না হইয়া

শীতল হন। সেইজন্য উহার নাম হয় **শীতলানন্দ।** মন্দিরে এই কথাগুলি লেখা আছেঃ

শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত দেব ঠাগর জিউর
শ্রীমন্দির ১৭৬২ সকে সমাপ্ত হইল
সন ১২৪৭ সাল ৩০ কার্তীক

চারণকবি মনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী শীতলানন্দ ও রাধাকান্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

কুলেশ সর্বাধিকারী ইষ্টদেব নয়নাভিরাম।
হে শিলা শীতলানন্দ রাধাকান্ত তোমায় প্রণাম॥

তাঁহার পৌত্র **যদুনাথ সর্বাধিকারী** রামমোহনের জন্মের পরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের সমস্ত তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া **'তীর্থভ্রমণ'** নামে একটি গদ্য গ্রন্থ ১২৬০ সালে রচনা করেন বলিয়া আধুনিক বাংলা ভাষার প্রবর্তক বলিয়া খ্যাত। এই পুস্তক সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেনঃ শুধু সাহিত্য রসিকদের কাছে নয়, ঐতিহাসিকের কাছেও যদুনাথের রোজনামচা মূল্যবান বই। যদুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র **প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী** অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী, সংস্কৃত, ইতিহাস, দর্শন ও অংকশাস্ত্রে তিনি অতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার রচিত পাটীগণিত ও বীজগণিত অতি সুপ্রসিদ্ধ আদি পুস্তক। তিনি অংক ভাষার প্রথম বাংগলা পরিভাষা প্রচলন করেন। 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার উপকারিতা' সম্বন্ধে সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষার প্রবন্ধ লিখিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং তিনি বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে যে প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সর্বাংশে গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের তিনি সদস্য ছিলেন। প্রসন্নকুমার সম্বন্ধে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের সমাবর্তনে উপাচার্য স্যার উইলিয়াস হান্টার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বলেনঃ

But chiefly we lament the loss of Babu Prasanna Kumar Sarbadhikary, the erudite Principal of the Sanskrit College, the conscientious custodian and spirited defender of its previous maunscripts, the ingenious Mathematician who transplanted the Arithmetic and Algebra of Europe into Vernaculars of Bengal.

দীনবন্ধু মিত্র সুরধুনী কাব্যে প্রসন্নকুমার সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

মহামতি প্রসন্নকুমার মহাশয়।
বিদ্যা বিস্তারিতে দেশে প্রফুল্ল হৃদয়॥
মিষ্টভাষী বিচক্ষণ স্বভাব গম্ভীর।
বাংলায় অংকশাস্ত্র করেছে বাহির॥
যোগ্যবর প্রিন্সিপ্যাল সংস্কৃত কলেজে।
দেবগণ মাঝে যেন দেবরাজ রাজে॥

প্রসন্নকুমার সম্বন্ধে ডাঃ ওয়ালস লিখিয়াছেনঃ

Prasanna Kumar was truly a great man, great and noble in the true sense of the word. He was an eminent scholar of European fame

in his time..but also for his rare social services, as evidenced by his expending most of his earnings throughout a period of half a century for all sorts of public life good in establishing schools, feeding the poor, mitigating the suffering of the people in various ways, and doing all that lay in his power to advance the cause of humanity by every means.

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রসন্নকুমারের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিতেন এবং তিনি বিদ্যা-সাগরের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। তিনি ঢাকা কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্বে কোন কায়স্থকে উক্ত পদ দেওয়া হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় গোঁড়া ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধতা সত্বেও তিনি অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন। রাধানগর গ্রামে তিনি 'প্রসন্নকুমার সেমিনারী' ও 'এ্যাংলো সংস্কৃত স্কুল' দুইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব বিদ্যালয়ের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। এবং সংস্কৃত কলেজের আদর্শে ইহা পরিচালিত হইত। জ্যোতিষশাস্ত্রেই তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মেজ ভাই দেশবিখ্যাত ফেকাল্টি অফ মেডিসিনের সর্বপ্রথম ভারতীয় ডিন ও কলেজ অফ সার্জনসন ও ফিজিসিয়ানস-এর প্রতিষ্ঠাতা **ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী।** সূর্যকুমার কলিকাতার একজন খ্যাতনামা অগ্রগণ্য চিকিৎসক ছিলেন। ১২৩৭ সালে তাঁহার জন্ম হয়। বাংলাভাষার উপরে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল এবং দয়া দাক্ষিণ্য ও দানধ্যানাদির জন্য তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি 'গভর্নমেন্ট ও ভারতীয় প্রজার সম্পর্ক' বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় যে সন্দর্ভ লেখেন তাহাতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কৃতি আটপুত্র রাখিয়া দেহরক্ষা করেন। জ্যেষ্ঠ ভারতসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রায় বাহাদুর সত্যপ্রসাদ ডাক্তার, দ্বিতীয় স্যার দেবপ্রসাদ কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এটর্নি, তৃতীয় কৃষ্ণপ্রসাদ কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট ও বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশক চতুর্থ দেশবিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ও কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ মেয়ো হাসপাতালের হাউস-সার্জেন ও শিবপুর পাশ্চার ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক, পঞ্চম নগেন্দ্রপ্রসাদ ভারতে বিদেশী খেলার প্রবর্তক ও ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসো-সিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং এটর্নি, ষষ্ঠ বিনয়প্রসাদ উকিল, সপ্তম কবি মণীন্দ্র-প্রসাদ বিবাহে পদ্য লেখার প্রবর্তক ও কনিষ্ঠ সুশীলপ্রসাদ ব্যারিষ্টার ও ক্রীড়াকুশলী। ইহারা সকলেই দান দয়া ও অমায়িকতার জন্য সর্বজনাদৃত।

সর্বাধিকারী বংশে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন **স্যার দেবপ্রসাদ** তাহাদের অন্যতম। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এম-এ ও তারপর এটর্নিশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তিনি ভারত রাষ্ট্রীয় সভার প্রথম সদস্য ও সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মী ছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই দেশাত্মবোধের শিক্ষা নেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

হন। ইহা ছাড়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বহু বর্ষ সভ্য ছিলেন। দুইবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ বিলাত যান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট প্রভৃতির মূলে তাহাব অনেক দান ছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহার পরম অনুরাগ ছিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের অবস্থা পর্যালোচনা করিতে যান। কংগ্রেসের তিনি একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি 'লিগ অফ নেসনে' প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অদ্বিতীয় অস্থি চিকিৎসক সুরেশপ্রসাদের পুত্র ডাঃ কনক সর্বাধিকারী রোটারী ক্লাবের সেক্রেটারী ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ।

রাধানগরের সর্বাধিকারী বংশ চিরদিন সাহিত্যানুরাগী। যদুনাথ সর্বাধিকারী তীর্থ-ভ্রমণ ছাড়া 'সঙ্গীত লহরী' নামে আর একখানি পুস্তক রচনা করেন। ১২৭০ সালের ১৫ আষাঢ় উহা মুদ্রিত হয়। তীর্থযাত্রা হইতে ফিরিয়া তিনি রাধানগরে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-জীউর কোজাগরী পূর্ণিমায় স্বতন্ত্র রাসের ব্যবস্থা করেন। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, উক্ত সঙ্গীত লহরীতে অনেক পরমার্থ গীতিকা সন্নিবিষ্ট আছে। তাঁহার রচিত একটি গান উদ্ধারযোগ্যঃ

রাগিনী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান

হরি তোমায় কাতরে ডাকি বারম্বার।
বিষয় বিষ করে পান, কণ্ঠ রোধ হয় আমার॥
রসনা অবশ হয়ে, নামামৃত তেয়াগিয়ে।
বিষপানে মত্ত হয়ে, ডুবালে এবার॥
ষড়চক্র করি ভেদ, ষড়রিপু কর ছেদ।
যদুর ঘুচে মনের খেদ, যদি ভবে কর পার॥

যদুনাথের মধ্যম ভ্রাতা **বৈকুণ্ঠনাথ** ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে 'ঊষাহরণ' নামে গীতিনাট্য রচনা করেন এবং উহা রাধানগরে অভিনয় হয় বলিয়া স্যর দেবপ্রসাদ লিখিযাছেন। বৈকুণ্ঠনাথের আগে কোন বাঙ্গালী আধুনিক নাটক নাটিকা বা গীতিনাট্য রচনা করেন নাই। ঊষাহরণের একটি সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

সখি আমাতে কি আমি আছি।
ভোলানাথের কৃপাতে পেয়ে প্রাণনাথে পুনঃ হারায়েছি॥
স্বপ্নে করে সেই নাগরের সঙ্গ
করিলাম কত রসের
পরে নিদ্রাভঙ্গ হল রসভঙ্গ বিচ্ছেদ-সাগরে ডুবেছি॥

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বলেন যে, ইহার কিছু পরে সর্বাধিকারী বংশীয় অন্যতম বংশধর গোপীমোহন (রামনারায়ণের ৩য় পুত্র) 'ভক্তিতরঙ্গিণী' নামে একখানি গীতিনাট্য রচনা করেন। গোপীমোহন আরও দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থদ্বয়ের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ তরঙ্গ-লীলা' ও 'ধ্রুব চরিত্র'। তাঁহার রচনার নিদর্শন এইঃ

পথে পথে চলে যায়, ডাকে ঘন ঘন।
কোথা আছ এস পদ্মপলাশলোচন॥

যদুনাথের তৃতীয় পুত্র **আনন্দকুমার** সাবজজের কর্ম করিয়া পেনসন পান। সংস্কৃত ও ইংরাজীতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার পত্নী **হেমাঙ্গিনী সর্বাধিকারী** রচিত দুই-খানি উপন্যাস আছে। উহাদের নাম 'মাতার উপদেশ' ও 'মনোরমা'। প্রথম পুস্তক ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় পুস্তক ২০ আষাঢ় ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়।

রাজকুমার লক্ষ্মৌ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃত ও আইনের (১৮৬৪-১৮৮৪) অধ্যাপনা করিতেন। পরে তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও সাপ্তাহিক হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের সম্পাদক হন। ১৮৮০ সালের 'ঠাকুর আইন' সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতামালা আইনজীবীদের কাছে বিশেষ আদরণীয়। তিনি স্কুল বুক সোসাইটিতে ব্যাকরণ প্রবেশিকার তৃতীয় ভাগ প্রনয়ণ করিয়া পুরস্কার পান। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি রমাপ্রসাদ রায়ের যত্নে 'ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী' প্রকাশ করেন। তাঁহার সহধর্মিনীও বিদুষী মহিলা। তাঁহার 'হরিনামা-বলী' নামক পঞ্চাশৎ গীতিকার একখানি বই আছে।

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর পত্নী **সুরঙ্গিনী দেবী** 'তারাচরিত' নামে একটি নাটক রচনা করেন। ইনিই বাঙ্গলাদেশের প্রথম বাঙ্গালী মহিলা লেখিকা ছিলেন। এই নাটক প্রকাশিত হইলে বাঙ্গলার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সুরঙ্গিনীর কনিষ্ঠা কন্যা **রাণী জ্যোতির্ময়ী দেবী** (শোভাবাজারের মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সহধর্মিনী) সুলেখিকা ছিলেন। তাঁহার স্বামী পবলোকগমন করায় হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ পূর্বক 'মালা' ও 'সাজি' নামে যে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন উহা পরবর্তীকালে লেখনীর সারবর্তা গুণে স্কুলপাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহা ছাড়া তাঁহার আরো দুইখানি পুস্তক আছে। সুরঙ্গিণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা **ইন্দুমতী বিশ্বাস** (দশঘরা লালবিহারী বিশ্বাসের সহধর্মিনী) 'দুঃখমালা' নামক শোকগাথা ও 'বিরাটনন্দিনী' নামক নাটক রচনা করেন। সর্বাধিকারী বংশের বধু ও কন্যাগণকে অষ্টাদশ শতক হইতেই সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় শিক্ষিতা করা একপ্রকার বাধ্যতামূলক ছিল এবং বলা বাহুল্য সেই জন্যই এই বংশে এত কীর্তিমান ও যশস্বী লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যের মুখোজ্জ্বলকারী এই বংশের আরও কয়েক জনের নাম ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। হুগলীর অন্যান্য সাহিত্যসেবিগণের বিষয় সাহিত্য-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

সত্যপ্রসাদ সর্বাধিকারী—সাহিত্য রত্নম, **দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী**—প্রবাসীর পত্র, দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্যকাহিনী, উচ্ছাস, স্মৃতিরেখা Thoughts and Problems, Notes and extracts **নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী**—ঝঞ্ঝা, ভিনীষিও বণিক, ওথেলো, যেমন চাও তেমন, চণ্ডীর অনুবাদিত নাটিকা "সুরথ", ফুটবল, **মনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী**—জলপ্লাবন, নবীনের সংসার, শুভকর্মে গদ্য ও পদ্য, মানস সরোবর, শিক্ষা বিস্তার, প্রফুল্ল নির্মাল্য ইত্যাদি **সুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী**—বিজলী, সতীরাণী **মনুজ সর্বাধিকারী**—মনোতোষিণী, ভৈরব-শিঙা, ডমরু, সংকেত. বেণু, বিভীষিকা, ডিটেকটিভ দীপক দত্ত, সাভারকর, কথা; **মৃণাল সর্বাধিকারী**—মর্মমুকুর ও বহু পাঠ্যপুস্তক, **মুকুর সর্বাধিকারী**—রাষ্ট্রীয় দর্শন

বিজয় সর্বাধিকারী (বেরী সর্বাধিকারী বলিয়া খ্যাত)—Cricket & Worlds Cricket.

এই প্রখ্যাত বংশ সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন বঙ্গ-গৌরবে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ্যঃ বিদ্যার ও যশের গৌরবে এমন গৌরবান্বিত বংশ বাংলা দেশে আর বেশী নাই বলিলেই হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় এককালীন ছয় জন সদস্য বাংলার আর কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। সর্বাধিকারী বংশের প্রসন্নকুমার, সূর্যকুমার, রাজকুমার, দেবপ্রসাদ, সুরেশপ্রসাদ ও জ্যোতিঃপ্রসাদ, এই ছয়জনই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সদস্য হইয়া বাংলা দেশে শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। এই বংশে তিনজন গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক সর্বাধিকারী বংশের প্রতিভাধর ব্যক্তিদের সম্বন্ধে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিত 'খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজ ও রাধানগরের সর্বাধিকারী' (পুরোহিত ১৩০১) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ১৩৩১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রাধানগরে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ. সুধীরকুমার মিত্রের 'রাজকুমারী কৃষ্ণকমলিনী' সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষের 'ক্রীড়াসম্রাট' নগেন্দ্রপ্রসাদ' পান্নালাল দত্তের Memoir of Father of Indian Football N. P. Sarbadhikari, সুশীলকুমার সর্বাধিকারীর 'সতীরাণী' পাঠ করিলে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

এই গ্রামে ঘণ্টেশ্বর শিব আছেন বলিয়া বহু দূর দেশ হইতে যাত্রিগণ সমাগত হয়। আরামবাগের মধ্যে খানাকুলের হাট সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং পিতলের বাসন, কাপড়, সিল্ক, চাউল, তরিতরকারি প্রভৃতির জন্য এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে ৫৫০ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে বলিয়া এইখানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

সিল্কের জন্য, এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। রেশম ও তসর এইখানে পর্যাপ্ত পরিমানে উৎপন্ন হইত। বালি দেওয়ানগঞ্জে রেশম ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ছিল। খানাকুলে কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট বাস করিত। উহার বিষয় ১২৭ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে। "The East India Company had large *aurungs* or factories for these textures at Khirpai and Radhanagar and we find that in 1759 Mr. Watts, Resident of the Guttaul complained that the *gomostas* of Connakool had detained some silk winders who were indebted to him."—District Gazetteers.

খানাকুলের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বঙ্গদেশে বিশেষ ভাবে খ্যাত। প্রাচীন কালে এই ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই অঞ্চলের কোন ব্যক্তিই রঘুনন্দনের দায়ভাগের মতে চলিতেন না। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এক সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য খানাকুল-কৃষ্ণনগর বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। খানাকুলের পণ্ডিত ঠাকুর নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনন্দনের মত খণ্ডন করিয়া এই স্থানে নিজ মত সংস্থাপিত করেন। তাঁহার সংকলিত স্মৃতির নাম "স্মৃতিসর্বস্ব"। কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীতে এই গ্রন্থখানি বর্তমানে সংরক্ষিত আছে। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানের পণ্ডিতগণ পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতেন। পঞ্জিকা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে

২৭৩-২৭৮ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর কিছু লেখা হইল না। ১২২৫ সালের ১৭ ফাল্গুন সমাচার দর্পণের নিম্নোক্ত সংবাদটি উল্লেখ্যঃ

"পঞ্জিকা—এতদ্দেশে নবদ্বীপ ও মৌলা ও বারইখালি ও বাকলা ও খানাকুল ও বজরাপুর ও বালি ও গণপুর এই সকল গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয় ইহার মধ্যে কতক আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে সকল পঞ্জিকা আইলে আগামী বৎসরের গ্রহণাদি ছাপান যাইবেক।

খানাকুলের নিকটবর্তী বেড়াবাড়ী গ্রামে পণ্ডিত চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা দ্রব্যময়ী দেবী একজন বিদ্যাবতী মহিলা ছিলেন এবং তাহার টোলে বহু ছাত্র অধ্যায়ন করিত। এই বিদুষী মহিলা সম্বন্ধে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' হইতে উদ্ধৃত হইলঃ

"খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত বেড়াবাড়ী গ্রাম নিবাসি...শ্রীযুত চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতি দ্রব্যময়ী দেবী...বালিকা কালে বিধবা হইয়া পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের টোলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সাতখানা মূল সাতখানা টীকা এবং অভিধান পাঠ সমাপ্ত হইলে চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার স্বকন্যার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কাব্যালঙ্কার পড়াইলেন এবং ন্যায় শাস্ত্রের কিয়দংশও শিক্ষা দিলেন, পরে দ্রব্যময়ী গৃহে আসিয়া পুরাণ মহাভাগবতাদি দেখিয়া হিন্দুজাতির প্রায় সর্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইলেন, এইক্ষণে দ্রব্যময়ীর বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর পুরুষেরা বিংশতি বৎসর শিক্ষা করিয়াও যাহা শিক্ষা করিতে পারেন না, দ্রব্যময়ী চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে ততোধিক শিক্ষা করিয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার বৃদ্ধ হইয়াছেন, সকল দিন ছাত্রগণকে পড়াইতে পারেন না, তাঁহার টোলে ১৫।১৬ জন ছাত্র আছেন, দ্রব্যময়ী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার টোলে ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়াইতেছেন, তাঁহার বিদ্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ অধ্যাপকেরা অনেকে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন, সকলে পরাজয় মানিয়া গিয়াছেন, দ্রব্যময়ী কর্ণাটরাজার মহিয়সীর ন্যায় যবনিকান্তরিতা হইয়া বিচার করেন না, আপনি এক আসনে বৈসেন, সম্মুখে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বসিতে আসন দেন, তাঁহার মস্তক এবং মুখ নিরাবরণ থাকে, তিনি চার্বঙ্গী যুবতী, ইহাতেও পুরুষদিগের সাক্ষাতে বসিয়া বিচার করিতে শঙ্কা করেন না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালীন অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার তুল্য সংস্কৃত ভাষা বলিতে পারেন না, গৌড়িয় ভাষায় বিচারেতেও পরাস্ত হয়েন, দ্রব্যময়ীর ভাব দেখিতে বোধ হয় লক্ষ্মী কিম্বা সরস্বতী হইবেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তি প্রকাশ পায় এ স্ত্রীলোককে দেখিবার জন্য কাহার উৎসাহ না হয় এবং তাঁহার আহারাচ্ছাদনাদির সাহায্যার্থ কোন দয়াশীল মহাশয় ব্যাগ্র হইবেন না, প্রত্যক্ষের অপলাপ নাই, যাঁহার ইচ্ছা হয় বেড়াবাড়ী গ্রামে যাইয়া দ্রব্যময়ীকে দেখুন, তাঁহার সহিত বিচার করুন আমরা দ্রব্যময়ীর বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে যাহা লিখিলাম যদি ইহার এক বর্ণ মিথ্যা হয় তবে আমারদিগকে মিথ্যাজল্পক বলিবেন, এরূপ সতী বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক কেহ লীলাবতীর পরে এদেশে জন্ম গ্রহণ করেন না।"

কৃষ্ণনগর খানাকুলের দুই মাইল দক্ষিণ দিকে দ্বারকেশ্বর নদ অবস্থিত এবং ইহা খানাকুলের সহিত অংগাঙ্গিভাবে জড়িত এবং 'খানাকুল-কৃষ্ণনগর' বলিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে

খ্যাত। ইহার নিকটে নাপতিপাড়া গ্রামে **ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের** আদি নিবাস ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ ৫০৯ ও ৬১৫ পৃষ্ঠায় বিবৃত আছে।

বহু প্রাচীন শিব মন্দির এই স্থানে ভগ্নাবস্থায় আছে। হুগলী জেলাবোর্ড এই স্থানের অনতিদূরে গোপালনগর গ্রামে একটি বাংলো নির্মাণ করিয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য খানাকুল প্রসিদ্ধ ছিল; এবং এই সমাজ সমগ্র বাঙ্গলায় আদর্শস্থান বলিয়া গণ্য হইত। অদ্যাপি কয়েকটি টোল এখানে আছে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। প্রাচীন স্থান হইলেও অদ্যাবধি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এই স্থানে কিছুই করেন নাই। বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত দ্বাদশগোপালের **প্রথম গোপাল** শ্রীমদ অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাঠ এই স্থানে অবস্থিত। কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী বিরচিত অভিরাম লীলামৃতে ইহার চরিতাখ্যায়িকা বিবৃত আছে এবং শ্রীচৈতন্যাবতারে ইনি অভিরাম গোপাল ও শ্রীদামের অবতার বলিয়া পূজিত হন। কিম্বদন্তী যে, ইঁহারই অভিশাপে রত্নাকর নদীর তেজ কমিয়া গিয়া 'কানানদী' বলিয়া পরবর্তীকালে খ্যাত হয়। ইহার শিষ্য কৃষ্ণদাস ঠাকুরও এই স্থানে বাস করিতেন। অভিরামের বিষয় ১৩৮০ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।

॥ গোবিন্দ অধিকারী ॥

প্রসিদ্ধ পাঁচালী ও যাত্রাকার **গোবিন্দ অধিকারী** এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি 'কালীয়দমন' প্রভৃতি বারখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার জন্মস্থান লইয়া মতভেদ আছে। জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত বাহিরগড়ে স্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে একটি 'নাটমন্দির' নির্মাণ করিয়াছেন। উহার বিষয় ১২৯৫ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে। কিন্তু খানাকুল-কৃষ্ণনগরের অধিবাসিগণ তিনি খানাকুলের সন্তান ও এইস্থানে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন! প্রাচীন গ্রন্থাদিতে "তিনি খানাকুলের সন্নিকট জঙ্গীপাড়া গ্রামে বৈরাগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন" (বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক) বলিয়া লেখা আছে. দুই 'কৃষ্ণনগর' নামই সম্ভবতঃ বিভ্রাট ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। কেহ কেহ খানাকুল-কৃষ্ণনগরে তাঁহার 'পৈত্রিক বাসস্থান' এবং জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর তাঁহার 'মাতুলালয়' বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। বহু অনুসন্ধান করিয়াও এ বিষয়ে সঠিক কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। তবে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের 'সেন্সাস হ্যাণ্ডবুকে' খানাকুল-কৃষ্ণনগরের মধ্যে লেখা আছেঃ

It is the birth place of the folk poet Govinda Adhikari, Sir Debprasad Sarbadhikary, Bhupen Basu etc.

১৩৩০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এই স্থানের প্রাচীন কথার যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার অংশবিশেষ এই স্থানে উল্লিখিত হইল ঃ

এক সময় এই কৃষ্ণনগর বিশাল নদীগর্ভে বিলীন ছিল। এই নদী রামগড় হইতে উৎপন্ন হইয়া রূপনারায়ণ নদে পতিত হইত। ইহার দৈর্ঘ্য বহুযোজনব্যাপী ও ইহার প্রশস্ততাও যথেষ্ট ছিল। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এই নদীর একপার্শ্বে পাতুল ও অন্যপার্শ্বে ধামলা অবস্থিত ছিল। মধ্যে অগাধ জলরাশি। সুদৃঢ় ও সুবৃহৎ নৌকা সাহায্যে এই জলরাশি অতিক্রম করিতে হইত। বর্তমান খানাকুল গ্রামে যে ঘণ্টেশ্বর মহাদেবের মন্দির, তাহারই পাশ দিয়া এই স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইত। শুনা যায় নবীন রত্নাকর (অর্থাৎ

এখানে রত্নাকর নামে যে নদী বর্তমান) এবং বহুদূরব্যাপী রড়াখাল ("রত্নাকরের" অপভ্রংশ "রড়া") আমাদের পুরাতন রত্নাকর বিলোপের চিহ্ন। আরও এরূপ কিম্বদন্তী, শুনা যায় যে, কৃষ্ণনগরের উত্তরে যে স্থান এক্ষণে মাজপুর নামে অভিহিত, সেখানে তৎকাল মধ্যমপুর নামে এক সমৃদ্ধ নগর ছিল। নৌকা সাহায্যে পণ্যাদি আমদানি রপ্তানি হইত। নদী হইতে গ্রামের উদ্ভব হইলে কোন কোন স্থানে পণ্যবাহী জলযানের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণনগরের উত্তর-পূর্ব নাংড়ীক্ষেত্র নামক স্থানে ভূগর্ভে প্রোথিত মাস্তুল, এবং ঐ স্থানের প্রায ৩ মাইল দক্ষিণে ভগবতীতলা নামক স্থানে পুষ্করিণী খননকালে নৌকার অনেক অংশ পাওযা গিয়াছে।

পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে খানাকুলের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে খ্যাত ছিলেন। দেশ-দেশান্তর হইতে ছাত্রগণ তাঁহার টোলে পড়িতে আসিত।

পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণের হস্তাক্ষর

১১৯৯ সালে তাঁহার জন্ম এবং ১২৭০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার হস্তলিপি এখানে প্রদত্ত হইল। বিশ্বনাথের পিতা পণ্ডিত হরিনারায়ণ সার্বভৌম একজন বিখ্যাত শাস্ত্রব্যবসায়ী

ছিলেন। বিশ্বনাথের পুত্র ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চুঁচুড়ায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চাকল্পে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া পিতার নামে "বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফাণ্ড" এবং "বিশ্বনাথ চতুস্পাঠী" নামে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বিশ্বনাথ তর্কভূষণ পৃথিবী যে গোলাকার ইহা ইংরাজদের আবিস্কার বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিলে তর্কভূষণ মহাশয় হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করেন যে, ইংরাজ জাতি জন্মগ্রহণ করিবার বহু পূর্বে ভারতীয় ঋষিগণ পৃথিবী যে গোলাকার তাহা আবিষ্কার করেন। 'গোলাধ্যায়' নামক পুথিতে লেখা আছে—

"করতল-কলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলম" ইহার অর্থ "যাঁহারা হাতের মধ্যে আগত আমলা-ফলের মত পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া জানেন"। পৃথিবীর আকার গোল, এবং তাহা সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, এই তথ্য প্রাচীন ভারতে প্রথম আবিস্কৃত হইয়াছিল। পৃথিবীর আহ্নিকগতির আবিস্কর্তা **আর্যভট্ট** খৃষ্টীয় চতুর্থশতকে জন্মগ্রহণ করেন।

পণ্ডিত বিশ্বম্ভর ন্যায়রত্ন ইনি মহামহোপাধ্যায় দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থের সহপাঠী ছিলেন। গৌরহাটির মাধব ন্যায়রত্নের টোলে ইহারা প্রথমে অধ্যয়ণ করেন। ঘাটাল নিমতলা সংস্কৃত সমিতির তিনি সভ্য ছিলেন। স্মৃতি ন্যায় ও ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কালীদাস তর্কসিদ্ধান্ত, ধর্মদাস শিরোমনি, ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার, রামদাস বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতের টোল ও ছাত্রাবাস কৃষ্ণনগরে ছিল। গোপাল চূড়ামণি ভাগবতের সুন্দর ব্যাখ্যা করিতেন। সোনাটিকরির কালীপদ সার্বভৌমের টোল ছিল। নারায়ণ ঠাকুর বংশের বর্তমান-জীবিত প্রবীন ব্যক্তিদ্বয় সুরেশচন্দ্র ও রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বংশের অন্যতম কৃতি সন্তান অধ্যাপক রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

॥ যাদবেন্দু সিংহ রায় চৌধুরী ॥

যাদবেন্দু সিংহ রায় চৌধুরী গৌড়ের নিকট টাণ্ডাননার লুটপাট করিয়া বহু মসজিদ ধ্বংস করেন বলিয়া নবাব গিয়াসুদ্দিন তাঁহাকে নির্দয়ভাবে নিহত করেন। সেই সময় মুসলমানগণ হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিত বলিয়া যাদবেন্দু প্রতিশোধ লইবার জন্য উহাদের প্রত্যুত্তর দেন। যাদবেন্দুর পূর্বপুরুষ মহানাদে বাস করিতেন বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। জর্জ কেম্প ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যাদবেন্দুকে নিহত করা সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

'The great banner of Jadavendu Singh exhibited a crimson sun on a battle plain. Jadavendu Singh before the Nawab Giyusuddin as fearlessly haughty and insolent. Nawab ordered his tongue to be cut out for his blasphemy on Islam and finally put him to death outside the mosque with the most excruciating tortures.'

যাদবেন্দুর পৌত্র বংশীধর চৌধুরী খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের স্থাপয়িতা। তাঁহার প্রপৌত্র অনন্তরামের পুত্র বিশ্বেশ্বর চৌধুরী কায়স্থ সমাজে সপ্তদশপর্যায়ে কুলীনদিগের কুল একযায়ী করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় "সত্যনারায়ণের কথা" রচনা করেন: উহাতে তাঁহাদিগের কুলপরিচয় বিস্তারিতভাবে লেখা আছে।

রামমোহন রায়ের কুলদেবতা রাজরাজেশ্বরের দোলমঞ্চ—রাধানগর
(পৃঃ ১৪১১)
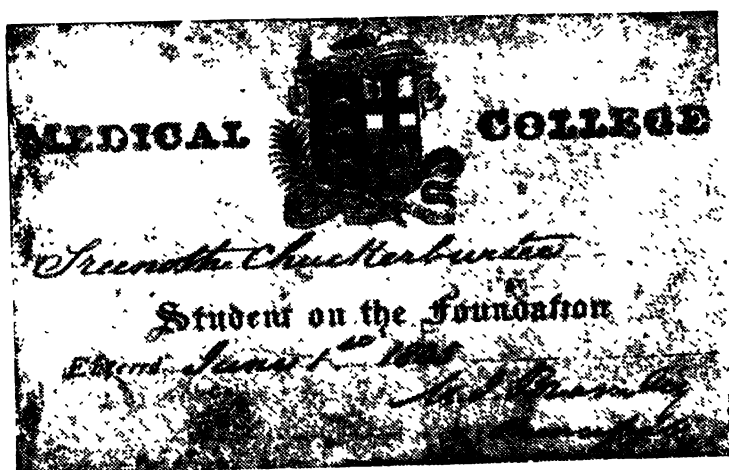
মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে ছাত্রদিগকে প্রদত্ত সার্টিফিকেট (পৃঃ ১২০৬)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধিকারী পরিবারের ছয়-জন 'ফেলো':

দণ্ডায়মান:

সুরেশপ্রসাদ, দেবপ্রসাদ, জ্যোতিঃপ্রসাদ

উপবিষ্ট:

সূর্যকুমার, প্রসন্নকুমার, (ছবি), রাজকুমার

(পৃঃ ১৩৯৪)

নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

(পৃঃ ১৩৯১)

কবি মনুজ সর্বাধিকারী

(পৃঃ ১৩৯৩)

ডঃ ত্রৈলক্যনাথ মিত্র (পৃঃ ১২২৩)

রমাপ্রসাদ রায় (পৃঃ ১৪২৩)

যোগীন্দ্রনাথ বসু (পৃঃ ২৬২)

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (পৃঃ ১৩৯০)

ডাঃ সত্যপ্রসাদ সর্বাধিকারী
(পৃঃ ১৩৯১)

কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী
(পৃঃ ১৩৯১)

পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সংগৃহীত পুস্তকে "সত্যনারায়ণের কথা" নামক পুস্তকের যে অনুবাদ* উদ্ধৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উল্লিখিত হইলঃ

"পীরের কৃপায় সাধু সুখেতে নিবসে।
ধন ধান্য বৃদ্ধি হয় দিবসে দিবসে॥

হরিধ্বনি কর সবে জয় কোলাহল।
সমাপ্ত হইল সত্যপীরের মঙ্গল॥

গড় মান্দারণ দেশ অধিপতি মহাশয়।
পুণ্যবান শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র সিংহ রায়॥

তাঁহার তনয় কৃষ্ণরাম আর গোবিন্দ।
ভক্তিভরে পূজে তাঁর চরণারবিন্দ॥

কৃষ্ণরাম সুত হন বংশীধর।
তৎপুত্র আনন্দরাম গুণের সাগর॥

তাঁহার তনয় বিশ্বেশ্বর সিংহ কহে।
শ্রীনাথ শ্রীগুরুদেব পদ সরোরুহে॥

গোবিন্দ পদারবিন্দ কাশী করি আশ।
অনুবাদ করি গ্রন্থ করিলা প্রকাশ॥"

যাদবেন্দ্রর আদিবাস জাহানাবাদের নিকট গড়মান্দারণে বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেখানে কিছুদিন বাস করিবার পর ধামলায় আসেন। ধামলার নিকট এক স্থানে তিনি ঈশ্বরী সারদাদেবীর পাষাণময়ী মূর্তি স্থাপিত করেন। ঐ দেবীর নামানুসারে এক্ষণে ঐ গ্রাম সারদা নামে অভিহিত। এই সময় রত্নাকর নদী ক্রমশঃ মজিয়া এক অতি বিস্তৃত ভূভাগের সৃষ্টি হয়। এই নূতন উৎপন্ন দেশে বাস করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মধ্য বয়সে কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। তিনি পরম ধার্মিক ও ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। নবাবের একজন প্রধান কর্মচারী বলিয়া তাহাব প্রতাপ বা বৈভব কম ছিল না, কিন্তু তিনি সামান্যভাবে জীবন যাপন করিতেন। বিলাসিতা বা অনর্থক ব্যয়বাহুল্য কিছুই তাঁহার ছিল না। তাঁহার উৎসব আনন্দ ছিল দেবপূজায় এবং দেবতাকে নিবেদিত ভোগের প্রসাদে দরিদ্রনারায়ণের সেবায়। কিম্বদন্তী এই যে, তিনি একদিন স্বপ্ন দেখেন, যেন তাঁহার অভীষ্ট দেবতা প্রত্যাদেশ করিতেছেন, "যাদবেন্দ্র তুই এই রমণীয় দেশে আমারই মূর্ত্যন্তর রাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা কর, নবাবের তোরণ-স্তম্ভের প্রস্তর হইতে ঐ মূর্তি প্রস্তুত করাস।" ক্ষণেক পরেই দেবমূর্তি অন্তর্হিত ও যাদবেন্দ্রর নিদ্রাভঙ্গ হইল। পর দিনই তিনি শ্রীমূর্তি গঠনের জন্য প্রস্তর সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে মন্দির নির্মাণেরও সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বেই প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া তিনি সুদক্ষ ভাস্করা দ্বারা

---

* বিশ্বেশ্বর রচিত সংস্কৃত 'সত্যনারায়ণের কথা' তাঁহার অধস্তন বংশধর কাশীনাথ চৌধুরী কর্তৃক পয়ারে রচিত হইয়া ২১ বৈশাখ ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয়।

সুচারু দেবমূর্তি নির্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। মূর্তি নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে কিন্তু মন্দির তখনও অর্ধনির্মিত। এরূপ অবস্থায় তাঁহার শত্রুপক্ষ নবাবকে সংবাদ দিল যে, যাদবেন্দ্র তাঁহার তোরণস্তম্ভ হইতে বহুমূল্য প্রস্তর লইয়া তৎস্থানে অন্য প্রস্তর বসাইয়া দিয়াছে। তৎক্ষণাৎ নবাবের একেবারে চরম আদেশ হইল, "হস্তী দ্বারা যাদবেন্দ্রর মুণ্ড ছিন্ন করিয়া আন।" হস্তিপক পরিচালিত মদমত্ত হস্তী আসিয়া শ্রীমন্দিরের বহির্ভাগস্থ প্রাঙ্গণে যাদবেন্দ্রর মুণ্ড ছিন্ন করিল। ভূতলে পতিত হইবামাত্র ছিন্নমুণ্ড বলিয়া উঠিল, "বড় সাধ রইল মনে, রাধাকান্ত রাধাবল্লভকে বসাতে পারুলমনি নবরতনে।" তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যে, নয়চুড়াবিশিষ্ট নব-মন্দিরে শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা করেন। এই অলৌকিক ব্যাপার শ্রবণে নবাব বিস্ময়বিমূঢ় হইলেন এবং পরে বিদ্বেষ ভুলিয়া তাঁহার পুত্র কৃষ্ণরামকে পিতৃপদাভিষিক্ত করেন। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁহার সম্বন্ধে এই মত প্রচলিত যে, তিনি কোনরূপে মন্দির নির্মাণকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন মাত্র। নবাবের ভয়ে পিতার অভিপ্রায় মত মন্দিরটিকে নয়চুড়া-মণ্ডিত বা সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারেন নাই। যাদবেন্দ্রর এই মন্দির এখনও বিদ্যমান এবং মন্দিরাভ্যন্তরে মধুর মনোমোহন শ্রীমূর্তি আজিও বিরাজিত। এই মন্দিরের বিষয় ১৩৮৭ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে।

যাদবেন্দ্রর পৌত্র গুণগ্রাহী বংশীধর বহুদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ কুলীন আনাইয়া তাঁহাদের বাসের জন্য কৃষ্ণনগরে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্ধারিত করিয়া দেন। এক স্থানে বন্দ্যোপাধ্যায়গণকে, অন্যস্থানে ভট্টাচার্যগণকে, কোথাও বা চক্রবর্তীগণকে, এইভাবে বসবাস করাইয়া ক্রমশঃ তাঁহাদের বংশীয় বাঁড়ুয্যেপাড়া প্রভৃতি এক একটি পাড়ার সৃষ্টি করিলেন। তন্তুবায় প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের বাসস্থানও বংশীধর বৃত্তাকারে স্থাপিত করেন।

তাঁহার বংশধরগণ সকলেই মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র শিবচরণ ৯ শত বিঘা ভূমি ও ৯টী পুষ্করিণী দান করিয়াছিলেন। এই জলাশয় এখনও বিদ্যমান আছে, যদিও সংস্কারাভাবে ইহাদের অবস্থা শোচনীয় এবং যৎসামান্য জল আছে তাহাও জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ। রাজা রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র খানাকুল কৃষ্ণনগরের চৌধুরী মহাশয়দিগের জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য নবাব কর্তৃক প্রেরিত হন। কারণ, তাঁহারা সুবিধা বুঝিলেই নবাবের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করিয়া কর প্রদান বন্ধ করিয়া দিতেন। উক্ত চৌধুরী বংশই এখানকার প্রাচীনতম জমিদার। তাঁহারা কতদূর তেজস্বী ছিলেন তাঁহার পরিচয় পূর্বেই পাওয়া গিয়াছে। সর্বাধিকারী বংশ তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এই স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। সর্বাধিকারীদিগের পূর্বপুরুষ রত্নেশ্বর প্রথম এখানে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন।

কৃষ্ণদাস ঠাকুর ও যদু হালদারের ন্যায় ব্যক্তিগণ যে অভিরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও এ অঞ্চলে অভিরামের প্রভাব বুঝা যায়। উক্ত দুই মহাত্মার কোন বংশধর এখন জীবিত নাই। যদু হালদারের পূজিত শ্রীবিগ্রহ অভিরামের গোপীনাথ মন্দিরে সেবিত হইতেছেন। গোপীনাথের মন্দির হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে **কৃষ্ণদাস ঠাকুরের শ্রীপাঠ** ছিল বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ গ্রন্থে লিখিত আছে। কিন্তু উক্ত শ্রীপাঠ এখন লুপ্ত হইয়াছে।

॥ নারায়ণ ঠাকুর ॥

খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর এ অঞ্চলের অন্যতম গৌরব। তিনি কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সঠিক জানা যায় না। 'অভিরাম-লীলামৃতের' ৭ম পরিচ্ছেদ উদ্ধৃত তাঁহার বাণী অনুসারে তাঁহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক বলা যাইতে পারে। তিনি কাশীধামের বিচার-সভায় এইভাবে নিজের পরিচয় দেনঃ

"গোপীনাথো মহাপ্রভুর্বিজয়তে যাত্রাভিরামো মহান্, গোস্বামী শতবাহ্য দরুমুরলীং কৃত্বা সমবাদয়ং যং ব্রুয়ুর্ব্রজবাসিবৈষ্ণবগণাঃ শ্রীগুপ্তবৃন্দাবনম্ তস্মিন্ শ্রীমতি চারুকৃষ্ণনগরে বাসোমদীয়োঽধুনা।"

স্মার্তরঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের মধ্যে যে যে স্থানে অযৌক্তিকতা আছে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, সে সকল তিনি খণ্ডন করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম "স্মৃতি-সর্বস্ব।" তিনি প্রায় তিন শত গ্রাম লইয়া প্রভূত শক্তিশালী খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজ প্রতিষ্ঠাকার্যে বংশীধর রায়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিমপারে এত বড় সমাজ আর কোথাও নাই; তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন গভীরদর্শী মনীষী ছিলেন। ইহার পিতা শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার সন্নিকট বালীগ্রামে বাস করিতেন। নারায়ণ ঠাকুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈশবেই মাতৃহীন হওয়ায় কিছুদিন মাতামহ চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের আলয়ে প্রতিপালিত হন। নয় দশ বৎসর বয়সে একমাত্র সহোদরার মৃত্যুর পর তিনি বিদ্যালাভের জন্য কাশীধাম গমন করেন। তথায় ১৮ বৎসর বাস করিয়া বেদবেদান্ততর্ক-মীমাংসাদি নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কাশীতে অধ্যয়ন শেষ হইলে তিনি প্রয়াগাদি নানাতীর্থ ও বিদ্বজ্জনসেবিত মিথিলাদি নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া অবশেষে কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হন। কৃষ্ণনগরের সন্নিকটস্থ রামনগর গ্রামে রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নামে এক অতি সুপণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার সহিত ঐ স্থানে ইঁহার প্রথম আলাপ ও শাস্ত্রীয় বিচারাদি হয়। তখন রাজেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বহুদর্শী বিচক্ষণ প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া বুঝিতে পারেন ও তাঁহাকে এস্থানে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সময়ে যাদবেন্দুর পৌত্র বদান্য বংশীধর কৃষ্ণনগর-সমাজ স্থাপন নিমিত্ত নানাদেশ হইতে সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ কুলীনগণকে আনাইয়া এস্থানে বাস করাইতেছিলেন। শুনা যায়, পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রনাথ তাঁহারই আনীত। তিনি নবাগত মহাপুরুষের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও কৌলীন্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে বাস করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। নারায়ণ ঠাকুর তাহাতে স্বীকৃত হন ও চৌধুরী বংশের গুরু পঞ্চানন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। দানগ্রহণে পাতিত্য জন্মে বলিয়া তিনি দানগ্রহণে কোন ক্রমেই সম্মত হন নাই। অবশেষে বংশীধর ভূমি ও বাসস্থানাদি তাঁহার গুরুকে অর্পণ করেন এবং তিনি পরে কন্যা বিবাহের যৌতুকস্বরূপে ঐ সমস্ত বিষয় জামাতা নারায়ণ ঠাকুরকে দান করেন।

সকলে শাস্ত্রেই তাঁহার অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বপ্রথমে তিনি 'সারাবলী' নামে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ণ করেন। ১৫৮৬ শকে 'ধাতু-রত্নাকর' নামে আর একখানি পুস্তক বচনা করেন। ইহাতে ধাতুরূপ অতি সুন্দরভাবে ছন্দে লিখিত হয়। ইহা ব্যাকরণ-শিক্ষার্থীর অবশ্যপাঠ্য। অতঃপর তিনি অশৌচ ব্যবস্থাবলী শ্লোকনিবদ্ধ

করিয়া 'শুদ্ধিকারিকা' নামে এক পুস্তক লেখেন। তাঁহার 'সবচন নির্বাচন স্মৃতিসর্বস্ব' তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। "খানাকুল কৃষ্ণনগর মত" বলিয়া যে মত প্রচলিত এবং বাঙ্গলার বহুলোক আজও যে মতাবলম্বী তাহা নারায়ণ ঠাকুরেরই প্রবর্তিত। সে মত প্রচলিত সঙ্কীর্ণ ও রঘুনন্দনের স্মার্ত্ত মতের স্থানে স্থানে বিরোধী হইলেও বিচার যুক্তি ও যথার্থ শাস্ত্রমর্মসম্মত এবং সহৃদয়তারূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

'বেদান্তবাদ' নামে তিনি শেষ বয়সে একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বেদান্তদর্শনের সারমর্ম ও নিজের ধর্মমত অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার একখানি গ্রন্থও ছিল।

॥ কণাদ তর্কবাগীশ ॥

এ অঞ্চলের অন্যতম গৌরবস্তম্ভ কণাদ তর্কবাগীশ বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, ইনি 'ভাষারত্নের' মঙ্গলাচরণে আপনাকে সিদ্ধান্তমঞ্জরীর গ্রন্থকার জানকীনাথ চুড়ামণির ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, যথা,—

"চূড়ামণিপদাম্ভোজভ্রমরীভূতমৌলিকা সংক্ষিপ্য শ্রীকণাদেন ভাষারত্নংবিতন্যতে।"

কণাদ তর্কবাগীশ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হইয়া "মণিব্যাখ্যা" নামে চিন্তামণির টীকা রচনা করেন। ইনি কৃষ্ণনগরের ভট্টাচার্যবংশের আদি পুরুষ। বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী জোগ্রাম কুলীনগ্রাম হইতে বংশীধর রায় ইঁহাকে আনয়ন করেন। ইঁনি একজন সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও শক্তি-উপাসক ছিলেন। বাসনা শ্যামামূর্তি স্থাপিত করিয়া পঞ্চমুণ্ডের আসনে আসীন হইয়া তন্ত্রোক্তমন্ত্রে দেবীপূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ইনি "মহর্ষিকণাদ" নামে অভিহিত। ইঁহার বংশধরগণের মধ্যে হরিদাস তর্কালঙ্কার ও তারকনাথ তর্করত্ন সমধিক বিখ্যাত হন। রাধানগর গ্রাম সিদ্ধ আগমবাগীশের বাসস্থান। রত্নাকর নদীতটে ঘটেশ্বর মহাদেবের নিকট এক তন্ত্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী আগমন করেন। **সিদ্ধ রত্নগর্ভ** আগমবাগীশ মহাশয় তাঁহার নিকট মন্ত্র দীক্ষিত হইয়া বহু বৎসর কঠোর সাধনার পর সিদ্ধিলাভ করেন। ইনিও মহর্ষি কণাদের ন্যায় তান্ত্রিক ও শক্তি উপাসনা করেন। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, কোন সময়ে রত্নগর্ভ কারণ-বারি লইয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার আচরণে হতশ্রদ্ধ হইয়া মদ্যপ ব্রাহ্মণজ্ঞানে তাঁহাকে ঘৃণার সহিত তিরস্কার করেন। জিতক্রোধ সিদ্ধ রত্নগর্ভ মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ, আপনি অশান্ত হইবেন না। যাহা দিতেছি, হস্ত প্রসারিত করিয়া গ্রহণ করুন" এই বলিয়া তাঁহার হস্তে দুগ্ধ ঢালিয়া দেন। ব্রাহ্মণ নিশ্চয় জানিতেন যে, পাত্রে সুরা ছিল, তাহার এরূপ রূপান্তরে তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন। আগামবাগীশ প্রান্তরমধ্যে ত্রিকোণ গৃহে কালিকামূর্তি ও পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করেন। উহা রাধানগরের প্রান্তরে এখনও বর্তমান। শুনা যায়, ইঁহার বাক্যমাত্রেই অনেক দুরারোগ্য রোগী রোগমুক্ত হইয়াছেন। ইনি অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করায় সিদ্ধ আগমবাগীশ নামে প্রসিদ্ধ হন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, যে, "খানাকুল কৃষ্ণনগর ১৪০০ হইতে ১৫০০ পর্যন্ত একশত বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হয়। এখানে অভিরাম

গোপাল পুরাণ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন পরে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলে তাঁহার সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া যান। তিনি খুব উৎসাহী পুরুষ ছিলেন; তিনি আপন শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা নানাস্থানে বিষ্ণু মন্দির স্থাপন করিয়া ও তাহার নিত্য সেবার ব্যবস্থা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম খুব প্রচার করিয়া যান। খানাকুল কৃষ্ণনগরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রামে এইরূপ অনেক মন্দির আছে। তাঁহার পর কণাদ তর্কবাগীশ মিথিলায় পড়িয়া আসিয়া 'তত্ত্বচিন্তামণি-টীকা' লিখেন। তাঁহার শিষ্য বাঁড়ুয্যে ঠাকুর এক নূতন স্মৃতির মত চালাইয়া যান। তাহার পর রত্নেশ্বর আগমভূষণ তান্ত্রিক মত প্রচলন করেন। সুতরাং একশ বা দেড়শ বৎসরের মধ্যে এই সমাজে বৈষ্ণবশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র সবই প্রচলিত হয়। সমাজটি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করিয়া উঠিতে থাকে।"*

॥ ভূপেন্দ্রনাথ বসু ॥

জন্ম ঃ ১৮৫৯ খৃঃ; মৃত্যু ঃ ১৯২৪ খৃঃ। এঁর আদিনিবাস হুগলী জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগর। কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে ইনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ইনি কিছুদিন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও পরে তার সভাপতি হন। সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাতাশজন কমিশনার সহ ইনি ১৮৯৮ সালে মিউনিসিপ্যালটি ত্যাগ করেন এবং জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। ইনি তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯১৪ সালে মান্দ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ইনি সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। পর বৎসর ইনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন। ১৯১৭ সালে ইনি ভারত সচিবের মন্ত্রণাসভার বেসরকারী সদস্য হিসাবে ইংলণ্ডে যান। ইনি কিছুকাল সহকারী ভারত সচিব হিসাবেও কাজ করেন। ১৯২২ সালে ইনি ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে জেনেভা বৈঠকে যোগদান করেন এবং পর বৎসর রয়্যাল কমিশনের সদস্য মনোনীত হন। ঐ কমিশনের কাজ শেষ হলে ইনি বাংলা সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্য হন। স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হন। (জীবনী অভিধান)

॥ খানাকুল-কৃষ্ণনগর জ্ঞানদা ইন্সটিটিউসন্ ॥

আরামবাগ মহকুমার মধ্যে প্রাচীন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিদ্যানিকেতনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র স্বর্গীয় প্যারীমোহন রায়ের সহধর্মিণী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবীর স্মৃতি-বিজড়িত এই বিদ্যালয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতী ছাত্র এই বিদ্যামন্দির হইতে সগৌরবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বর্তমানে ইহা সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়। এখন এই বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছে। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র চৌধুরী ইঁহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কল্পে স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাস এবং ক্রীড়া প্রাঙ্গন অত্যন্ত মনোরম। আধুনিক সরঞ্জামপূর্ণ বিজ্ঞানাগার এই বিদ্যালয়ের প্রধান আকর্ষণ।

---

* রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ

॥ খানাকুল-কৃষ্ণনগরের মেলা ও উৎসব ॥

খানাকুল থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত 'গোপীনাথের মন্দির' ও যাদবেন্দ্র সিংহরায় প্রতিষ্ঠিত 'রাধাবল্লভের মন্দির'—প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। এই মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিবৎসর সমারোহ সহকারে রাস-পূর্ণিমা, দোল-পূর্ণিমা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ও জন্মাষ্টমীর মেলা হয়। রাসযাত্রার মেলায় তিনদিন যাবৎ যাত্রাভিনয় ও নাটকাভিনয় হয় এবং এই মেলায় যে 'অন্নকূট' হয় তাহা সুপ্রসিদ্ধ। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা-সপ্তমীতে শ্রীমদ্ অভিরাম গোস্বামী প্রচলিত 'মহোৎসব' উপলক্ষে বিরাট মেলা হয় এবং গোপীনাথের নাট্যমন্দিরে তিনদিন ব্যাপী কীর্তন গান হয়। এই উৎসবের শেষদিনে দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা ও নগর সংকীর্তন হয়। যাত্রীগণের জন্য এখানে যাত্রীনিবাস আছে। মন্দিরে প্রবেশের বাম দিকে একটি বহু প্রাচীন **সিদ্ধ বকুলগাছ** উচ্চ বেদীর উপর আছে। এই গাছের তলায় অভিরাম গোস্বামী উপবেশন করিতেন বলিয়া 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থে' লেখা আছে।

শ্রীমদ্ অভিরাম গোস্বামীর অধস্তন বংশধরগণ শ্রীসতীশচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীকেনারাম গোস্বামী, শ্রীসাতকড়ি গোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামীগণ বর্তমানে গোপীনাথজীউয়ের সেবাকার্য করিতেছেন। যাদবেন্দ্র সিংহরায়ের অধস্তন বংশধর শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী, দেবপ্রসাদ রায় চৌধুরী, নারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতি রাধাবল্লভজীউয়ের সেবাকার্য পরিচালনা করিতেছেন।

খানাকুল থানার নিকট কোটরা গ্রামে শ্রীমদ অভিরাম গোস্বামীর অন্যতম শিষ্য **শ্রীঅচ্যুত পন্ডিতের শ্রীপাঠ** আছে। সানেশ্বর শিব-মন্দির এই গ্রামের উল্লেখ্য দেবালয়। পন্ডিত মন্মথনাথ রায় এই গ্রামে বাস করিতেন। বাকরপুরে **রজনী পন্ডিতের শ্রীপাঠ** আছে।

হেলালগ্রাম ॥ খানাকুল-কৃষ্ণনগরের এক ক্রোশ উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদের পূর্বে অবস্থিত হেলালগ্রামে অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য **পাখিয়া গোপালের শ্রীপাঠ** ছিল। এখন শ্রীপাঠের উপর একটি ভগ্ন তুলসীমঞ্চ ছাড়া আর কোন স্মৃতিচিহ্ন নাই। প্রাচীন মন্দিরাদির ইঁট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং বিগ্রহও অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থে আছে যে, অভিরাম গোস্বামী এই গোপালকে দন্ড দিবাব জন্য বলেন—অদ্যই তোমাকে পুরীধাম হইতে মহাপ্রসাদ আনিয়া ভক্তগণকে ভোজন করাইতে হইবে। ইহাতে গোপালদাস পক্ষিবৎ উড়িয়া গিয়া মহাপ্রসাদ আনিযা দেন বলিয়া তাঁহার "পাখিয়া গোপাল" নাম হয়।

খানাকুলে ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে **রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়** স্থাপিত হইয়াছে। এই মহাবিদ্যালয় স্থাপনে রাজহাটী নিবাসী নন্দলাল পাল পঁচিশহাজার টাকা দান করেন। শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় এই কলেজের অধ্যক্ষ।

রাধানগর পল্লী সমিতি এই অঞ্চলের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। বহুদিন মন্মথনাথ রায় কাব্যতীর্থ ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৩৩১ সালে এই সমিতির প্রচেষ্টায় রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের 'পঞ্চদশ অধিবেশন' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সম্মেলনে পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মূল সভাপতি, জলধর সেন সাহিত্য-শাখা, খগেন্দ্রনাথ মিত্র দর্শন-শাখা, রমাপ্রসাদ চন্দ ইতিহাস-শাখা, ডঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং সহকারী সভাপতি স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। সম্পাদক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসু ও কিশোরীমোহন গুপ্ত।

খানাকুলের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য **খানাকুল থানা** (হুগলী) **পল্লীউন্নয়ন সমিতি** ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কার্য করিতেছে। ডাঃ কনক সর্বাধিকারী ও রাধানাথ ঘোষ যথাক্রমে ইহার সভাপতি ও সম্পাদক। খানাকুলের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সমিতির সভ্য।

চক্রপুর গ্রামে কালীতলায় প্রতিবৎসর কার্তিকমাসে কালীপূজার সময় মেলা বসে। তিরোলের কালীবাড়ির মত এখানে পাগলের বালা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া জড়ুড়গ্রামে ১লা বৈশাখ ভগবতীমাতার মেলা হয়। ভগবতীমাতার পুকুরে রবিবারে স্নান করিলে খোস, চুলকানি প্রভৃতি সারিয়া যায় বলিয়া প্রতি রবিবার পুকুরে স্নানের জন্য বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

খানাকুল থানার মধ্যে **বালীপুর** গ্রামে পৌষ সংক্রান্তিতে প্রতিবৎসর গঙ্গাপূজা উপলক্ষে পাঁচ দিন ধরিয়া মেলা হয় **উদনা গ্রামে** সৈয়দ হামজারের জন্মস্থান। তাঁহার রচিত গ্রন্থ "আমীরহামজা উমরআম্বিয়া জৈতন" মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাত। বালীপুর চর্মশিল্পের কাজের জন্য প্রসিদ্ধ। এই স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

আটঘরা ইউনিয়নে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পাণীর আমলে নির্মিত **"সাহেবের বাঁধ"** বলিয়া খ্যাত দুই মাইল লম্বা একটি বাঁধ আছে। এই বাঁধ জগন্নাথপুর গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া জাকড়ি ও চক্রসেনোটিকরি গ্রামের মধ্য দিয়া কেদারপুর পর্যন্ত গিয়াছে। আটঘরা ও হেলান গ্রামে **পীর সাহেবের** মেলা হয়। এই দুইটি গ্রামের জনসংখ্যা ৬৫৯ এবং ১,২৯৩ জন।

কিশোরপুর গ্রামে দোলের সময় মেলা হয়। তাঁতের কাপড় এই স্থানে প্রস্তুত হয়। **ময়াল** গ্রামে রথের মেলা উপলক্ষে বহু জনসমাগম হয়। এই দুইটি গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তি কৃষিকার্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। **ঘোষপুরে** প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে চারদিন ধরিয়া মেলা হয়। **ঠাকুরাণীচক** হাটতলায় পৌষসংক্রান্তিতে মেলা উপলক্ষে যাত্রা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়। এই অঞ্চলে তাঁতশিল্প ও মৃৎশিল্পের কাজ দেখিতে পাওয়া যায়।

খানাকুল থানার অন্তর্গত লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে আজীবন ব্রহ্মচারী **প্রাণকৃষ্ণ মিত্র** জন্মগ্রহণ করেন। দেশের কাজে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরে আদিবাসীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি পরলোকগমন করেন। লাঙ্গুলপাড়া গ্রামের জনসংখ্যা ৬৫৪ জন।

রমাপ্রসাদ সাধারণ পাঠাগার—খানাকুল থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর প্রাচীন গ্রন্থাগার। ভারত-পথিক রাজা রামমোহনের পুত্র স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ রায়ের স্মৃতি-বিজড়িত এই গ্রন্থাগারে ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভ্রমণ কাহিনী, উপন্যাস—ইত্যাদিতে সর্বসমেত পুস্তক সংখ্যা তিন হাজারেরও অধিক। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন। জেলা-শাসক কুক সাহেব মন্তব্য করেনঃ

It is the first Village Library I have seen since coming to India...

বর্তমানে এই পাঠাগার রুরেল লাইব্রেরী স্কীমের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। এই পাঠাগার স্থাপনে শ্রীযুত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীহীরালাল ভট্টাচার্য গ্রন্থাগারের সম্পাদক এবং শ্রীধনঞ্জয় গোস্বামী গ্রন্থাগারের সহকারী সম্পাদক।

জাগানি সংঘ—এই অঞ্চলের একটি পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। **বাংলা ১৩৫১ সালে স্থাপিত।** বর্তমান সদস্য সংখ্যা দুই শতাধিক। মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে সেবামূলক কর্ম, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর তৎপরতা, বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠান, কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, গঠনমূলক কর্ম, বন্যাত্রাণ, শিক্ষা-সম্প্রসারণে সহায়তা এবং জাতীয় উৎসব-প্রতিপালন ইত্যাদির জন্য মহকুমার সর্বত্র সমাদৃত। স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এই সংঘের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। শ্রীমাণিকলাল ভট্টাচার্য, শ্রীধনঞ্জয় গোস্বামী, শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী শ্রীশুকদেব সাহা প্রভৃতি ঊনিশ জন সদস্য লইয়া এই সংঘের বর্তমান কর্ম-পরিষদ গঠিত।

আজাদ্ হিন্দ্ স্পোর্টিং ক্লাব—আরামবাগ মহকুমার অন্যতম বৃহত্তম ব্যায়ামাগার। বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায় ইহার উদ্বোধন করেন। পূর্বভারতশ্রী অভিরাম বসু (রাধানগর) এই ব্যামাগারের দেহীগণকে নিয়মিত নির্দেশ দান করেন। স্থানীয় অঞ্চলের শতাধিক দেহী এই ব্যায়ামাগারে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেহ চর্চা করিয়া থাকেন। জয়দেব গোস্বামী, তারাপদ সাহা, সনাতন রায় চৌধুরী প্রভৃতি এই ব্যায়ামাগারের উদীয়মান দেহী।

॥ উমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥

খানাকুল ইউনিয়নের মধ্যে রামনগর গ্রামে ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও দার্শনিক পণ্ডিত **উমেশচন্দ্র বটব্যাল** ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দেশের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রেমচাঁদ রাঁয়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া দশ হাজার টাকা পুরস্কার পান। তাঁহার পিতার নাম দুর্গাচরণ বটব্যাল ও মাতার নাম প্রসন্নময়ী দেবী। এই প্রতিভাসম্পন্ন বিনম্র পণ্ডিত মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার রচিত সাংখ্যদর্শন ও বেদপ্রবেশিকা নামক গ্রন্থাবলী বিদগ্ধসমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে চিত্রাভিনেতা প্রদীপকুমার বটব্যাল ভারতে সুপরিচিত। উমেশচন্দ্রের ভ্রাতা **অতুলচন্দ্র বটব্যাল** গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনার্থে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন।

রামমোহনের পৌত্র হরিমোহন রায় হোরমিলার কোম্পাণীর ষ্টীমার সার্ভিস প্রবর্তনে নির্ভীক চিত্ততার পরিচয় দেন। ইহা ছাড়া রাধানগরের বসু ও সর্বাধিকারী বংশে ভারত বিখ্যাত যে সব ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত

অধ্যক্ষ কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্তের আদি নিবাস খানাকুল কৃষ্ণনগর। তাঁহার পিতা স্বর্গত কৃষ্ণদাস গুপ্ত একজন সদাশয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। কবিরাজ কিশোরীমোহন প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রেও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও জ্ঞান ছিল। দৌলতপুর কলেজের তিনি ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া তিনি বিভিন্ন প্রকারে মানবতার সেবা এবং মহাপ্রভুর নাম ও প্রেম প্রচার করেন।

কৃষ্ণনগরের তিন মাইল উত্তরে অবস্থির সেকান্দরপুরের স্বর্গীয় জমিদার রায় বাহাদুর ক্ষিরোদপ্রসাদ পাল, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী এই স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অনুকুলচন্দ্র লাহা স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনার্থে ১৫ হাজার টাকা দেন।

॥ রাজা রামমোহন রায় ॥

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অভ্যুদয়ের সংগে সংগে যে সকল মহাপুরুষ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নব্যভারতের শঙ্করাচার্য রাজা রামমোহন রায়ের নাম স্মরণ করিতে হয়। তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের জনক ও যুগস্রষ্টা এবং ভবিষ্যৎ মানবসমাজের একজন অগ্রদূত।

রাধানগর একটি গণ্ড গ্রাম হইলেও রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান হিসাবে এই স্থান জগদ্বিখ্যাত। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সহিত ক্ষুদ্র রাধানগর গ্রাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। খানাকুল থানার মধ্যে দুইটি রাধানগর আছে। একটি পশ্চিম-রাধানগর রামমোহনের জন্মস্থান; আর একটি ছত্রশাল-রাধানগর, পশ্চিম-রাধানগরের তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

বর্তমানে এই রত্নাকর নদীর পূর্বতীরে রাধানগর ও পশ্চিমে কৃষ্ণনগর অবস্থিত। এই রাধানগরে সমাজ সংস্কারক ভারতের মন্ত্রদাতা যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় যে গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, সেই গৃহ আজ ধূলিস্যাৎ হইয়াছে; তথায় কেবল একটি উচ্চ বেদী নির্মাণ করিয়া তাঁহার জন্মস্থান চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছে। রাজার কুলদেবতা রাজরাজেশ্বরের **দোলমঞ্চ** এবং বামে তুলসীমঞ্চ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। দোলমঞ্চের চিত্র দেওয়া হইল।

রামমোহনের পিতা রামকান্ত শ্রীরামপুরের পণ্ডিত শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যের কণ্যাকে বিবাহ করেন। রামমোহনের বংশ 'বৈষ্ণব' এবং ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন শাক্ত; তাই বৈষ্ণব-শাক্তের ঘোর দ্বন্দ্ব আবাল্য দেখিয়া সর্বধর্মসমন্বয়ের তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রামমোহন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২২মে রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন।* রামমোহন বিশেষ সম্পন্ন পরিবারে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃ-পিতামহ সকলেই বিষয়ী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি বিষয়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অল্প বয়স হইতেই বিষয় বুদ্ধিতে প্রবীণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরজীবনে শাস্ত্রালোচনায়, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে যেমন আমরা তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাই, তেমনই অর্থোপার্জন, মোকদ্দমা ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণেও তাঁহার তীক্ষ্নবুদ্ধি দেখিতে পাই। এই ক্ষমতা তাঁহার বাল্য-শিক্ষার ফল। রামমোহনের মাতা তারিণী দেবী—তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিশীলা ও নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। রামমোহন তাঁহার চরিত্রের অনেক গুণ তাঁহার মাতার নিকট পাইয়াছিলেন।

রামমোহনের মাতা শেষবয়সে পুরীধামে যাইয়া বাস করেন এবং প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির দর্শন করিতেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করিলে "ক্যালকাটা জার্নালে" [May 13th, 1822] তাঁহার মৃত্যুসংবাদ এইভাবে বাহির হয়ঃ

Died on the 21st of April at Khettru (*Juggernaut*) where she has resided for two years, the Mother of Dewan Ram Mohan Roy; and her obsequies were to be performed on the 4th of May (1822).

---

* কোন কোন গ্রন্থে তাঁহার জন্ম ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া লেখা আছে। কিন্তু বৃষ্টলে তাঁহার সমাধি স্তম্ভে উৎকীর্ণ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ আছে বলিয়া উহাই আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

রাজা রামমোহন রায়ের জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ১২৯৮ সালের ১লা ফাল্গুন তারিখের "সাহিত্য" পত্রে রাজা রামমোহন রায়ের মাতৃভক্তি বিষয়ে লিখিয়াছেনঃ

তাঁহার মাতৃভক্তির এক দৃষ্টান্ত দিব। তদুপলক্ষে রামমোহনের জননীর চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া আমাদের পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিয়া লইবেন, রামমোহন, স্বভাবের দৃঢ়তা গুণটি মাতৃদেবীর সকাশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ গুণের প্রভাবেই তিনি উত্তরকালে নির্বন্ধাতিশয় সহকারে সকল কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সীমার মধ্যে রাধানগর গামে রামমোহন ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন। উহাই তাহার পৈতৃক ভূমি। ঐ গ্রামে সর্বসাধারণ জ্ঞাতির দেবালয় ছিল।

ঐ দেবালয়ের মধ্যে দিয়া জ্ঞাতি সকলের যাতায়াতের পথ ছিল. তখনকার এইরূপ নিয়ম ছিল যে কেহ ঠাকুর বাড়ীর মধ্যে দিয়া আপন বাড়ী যাইতেন, বিনামা বা কাষ্টপাদুকা উন্মোচন করিতে হইত। কেবল পাদুকা উন্মোচন করিলেই পরিত্রাণ পাইবার যো ছিল না। তথায় প্রবেশদ্বারে যে গোময় রক্ষিত থাকিত তাহাতে পাদস্পর্শ করিয়া প্রবিষ্ট হইতে হইত। একদা রামমোহন বিদেশ হইতে আসিয়া, মাতার সহিত সাক্ষাতের জন্য, রাধানগরের বাটীতে গিয়াছিলেন। তিনি ইজার চাপকান পরিয়া আসিয়া ছিলেন, সুতরাং পাদুকাসহ দেবমন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশোদ্যত হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার জননী স্বীয় দ্বিতলগৃহের ছাদের উপর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি বিধর্ম হয়েছ, অমন ছেলেব মুখ দেখতে নেই। আমি তোমার প্রণাম লইব না।" এই সময় রামমোহনের মত পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। কথাগুলি রামমোহনকে শুনাইয়া বলা হইতেছিল। মাতৃভক্ত পুত্র ইতস্ততঃ করিয়া ঐ অসমসাহসিক অধ্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর মোজা চাপকান ইজার খুলিয়া, গোময়ে চরণ স্পর্শ করিয়া, দেবালয়ের সীমায় প্রবেশ করিলেন। পরে যথাবিধানে জননীর নিকটে গিয়া চরণ বন্দনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। বর্তমান ব্রাহ্মণগণ এই ঘটনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন। তখনও তিনি রীতিমত একেশ্বরবাদী নহেন; চিরপোষিত প্রাচীন মত ও পরিবর্তনাবস্থা অর্থাৎ নূতন মত, এই উভয়ের সন্ধিস্থলে তিনি যৎকালে দণ্ডায়মান ছিলেন, এই ঘটনা সেই সময়ের।"

রামমোহন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতাতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। এ সময়ে তিনি ধর্ম ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি নিজে এক ও অভিন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন ও বলিতেন, এইরূপ ধর্মই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত। রামমোহন সংস্কৃতশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। সে-সময়ে বাঙ্গালাদেশে বেদ, উপনিষদ প্রভৃতির চর্চা ছিল না বলিলেই হয়। রামমোহনই প্রথম এই সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া হিন্দুদের প্রকৃত ধর্ম ও দর্শন কত উন্নত তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রাচীন দর্শন পাঠ রামমোহনের ধর্মমত প্রবর্তনের একটি কারণ।

রামমোহন আরবী ও ফারসী ভাষায়ও এমন সুপণ্ডিত ছিলেন যে, সকলে তাঁহাকে মৌলবী রামমোহন রায় বলিত। ইহা ছাড়া ইংরাজী, ফারসী, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তিনি প্রথম যে

গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন, তাহা আরবী ও ফারসী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তকটির নাম—**তুফান-উল-মুয়াহ্‌হিদীন**। উহা ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময় হইতেই রামমোহনের ধর্মমত পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছিল।

রামমোহন আমাদের সকল উন্নতি ও সুখ সৌভাগের বিধায়ক একথা বলিতে পারা যায়। তাঁহার পূর্বে আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। তাঁহার সময় প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয়। তিনি নিজ ব্যয়ে নানাবিষয়ে পুস্তক লিখিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন।

রামমোহনের যেরূপ পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মতের প্রসার ছিল। সেজন্য তিনি কোন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়া ধর্ম, সমাজ, শাস্ত্র, বাংলাভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলনই তিনি সর্বপ্রথম আরম্ভ করেন। রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি তাঁহার এই ধর্মমত প্রচার করিবার জন্য চারি প্রকার পথ অবলম্বন করিলেন—(১) পুস্তক প্রকাশ (২) কথোপকথন ও আলোচনা (৩) সভা-স্থাপন (৪) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

কলিকাতাতে আসিয়া তিনি "আত্মীয়সভা" স্থাপন করেন। এই সভায় বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা, ব্রহ্মসংগীত প্রভৃতি হইত। পরে ব্রহ্মোপাসনার জন্য তিনি একটি সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০ আগষ্ট। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু সে সময়ে লোকে এই সভাকে ব্রহ্মসভা বলিত।

ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারে ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি অনেক মহৎ কার্য করিয়া গিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে—সহমরণ প্রথা-নিবারণের জন্য আন্দোলন সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই আন্দোলনের প্রথম ব্যখ্যাতা ও আচার্য। এই সম্বন্ধে বিবরণ ২০৯-২১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিক এই প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন।

বাংলা ভাষার উন্নতি ও প্রচারের জন্য রামমোহন যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সে যুগে বাংলা-গদ্যে সংস্কৃত শব্দের খুব বাহুল্য থাকিত। সেজন্য সাধারণ লোকের উহা বুঝিতে কষ্ট হইত। রামমোহন এই রীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি বাংলা রচনা যাহাতে সাধারণ বোধগম্য হয় তাহার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য তাঁহার নিজের লেখাও আজকালকার বাংলা গদ্যের তুলনায় বেশী সংস্কৃতবহুল ও আড়ষ্ট। তবু তিনি সে-যুগের যে একজন বিশিষ্ট বাংলা গদ্য-লেখক, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে সাহিত্যপ্রসঙ্গে ৩৪০-৪৩২ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

বাঙ্গালীদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ব প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দেব ১৫ই নভেম্বর যাত্রা করিয়া, পর বৎসরের ৮ই এপ্রিল লিভারপুল সহরে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। দিল্লীর নামে মাত্র সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের দূত স্বরূপ তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। দিল্লীর কাছে কতকগুলি জমীদারীর রাজস্বে অধিকার আছে বলিয়া বাদশা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন, সেই আবেদন নিষ্ফল হওয়ায় দিল্লীশ্বর তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। মোগল বাদশাহের প্রদত্ত উপাধির জন্যই আমরা তাঁহাকে "রাজা রামমোহন" বলিয়া থাকি।

সেই সময়ে দিল্লীশ্বরের দৌত্য ব্যতীত সহমরণ-প্রথা রহিত করিবার বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুরা যে আপীল করিয়াছিলেন, রামমোহন বিলাতে গিয়া ঐ সকল বিষয়েও নিজের মতামত ব্যক্ত করেন ও যাহাতে এদেশের শাসনপ্রণালীর বিধি-ব্যবস্থা ভাল হয় তাহার জন্য চেষ্টা করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামমোহন কি ধর্ম জীবনে, কি রাষ্ট্রীয় জীবনে, কি সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কারে দেশে এক অভিনব যুগ আনয়ন করিয়া অমর-কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কারণ তাঁহার বাণী—The true way of serving God is to good to man আজ পৃথিবীর সর্বদেশেই গ্রহণ করিয়াছে।

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস" গ্রন্থে রামমোহন সম্বন্ধে বলেনঃ

"Fifty years after this, Raja Ram Mohan Roy was born in Hooghly and from this time on, the present national history of India begins. When Ram Mohan Roy first sowed this seed of nationalism, the whole of Bengal, was in the hands of the English....and the whole of India has been just going to be under their clutches culturally, politically and economically.

Ram Mohan did not forego his national dress even while in London. He took with his Brahmin cook and his old servant Haridas and did not give up his national convention, even at the banquet on invitation from the French Emperor Louis Philip. It is Ram Mohan who was the pioneer to draw the picture of Independent India of to day. He wanted to see our land as an "Independent India, Friend of the United Kingdom, and Ireland and enlightener of Asia."

নারী জাতির মুক্তির জন্য তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম, প্রচলিত সমাজের সংকীর্ণ বিধান ভাঙিয়া কুললক্ষ্মীদের মুক্ত আলো ও হাওয়ার পরশ দিবার জন্য তাঁহার প্রাণপাত আয়াস, অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া বিদ্রূপ করিবার জন্য বাঙলার সর্বত্র তখন এই গানটি প্রচলিত হইয়াছিল দেখিতে পাওযা যায়ঃ

"সরাই মেলের কুল
বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্বনাশের মূল,
ওঁ তৎ সৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল
ও শালা জেতের দফা করলে রফা
মজালে মোদের তিন কুল।"

॥ রামমোহনের সমাধি মন্দির ॥

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে বিলাতে যে স্থানে সমাহিত করা হয় উক্ত সমাধি স্থানের দুর্গতির বিষয় মিঃ জন ম্যাকে নামক একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক ৮ই জানুয়ারী ১৮৪২
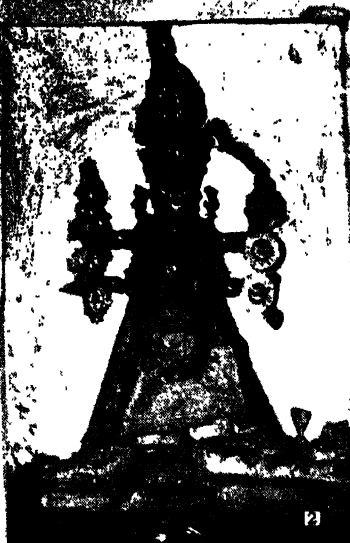
১ রায়বংশের শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়—দশঘরা (পৃঃ ৮২২), ২ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা—পাউনান (পৃঃ ৮৬৪), ৩ শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউ—রাজবলহাট (পৃঃ ১৩০১), ৪ শ্রীশ্রীপরমেশ্বর শ্যাম-সুন্দর—আঁটপুর (পৃঃ ১৩২৭), ৫ শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউ—গোস্বামী-মালিপাড়া (পৃঃ ৮৫০)
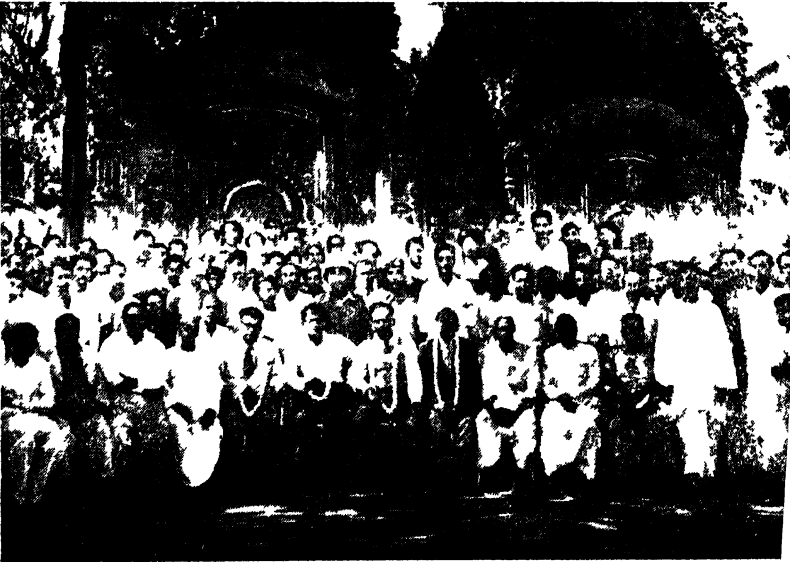
পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন দেবী চিত্তেশ্বরী (পৃঃ ১২০০)

দশঘরার প্রসিদ্ধ রথ (পৃঃ ৮২২)

রাধাগোপীনাথজীউ—দশঘরা (পৃঃ ৮২১)
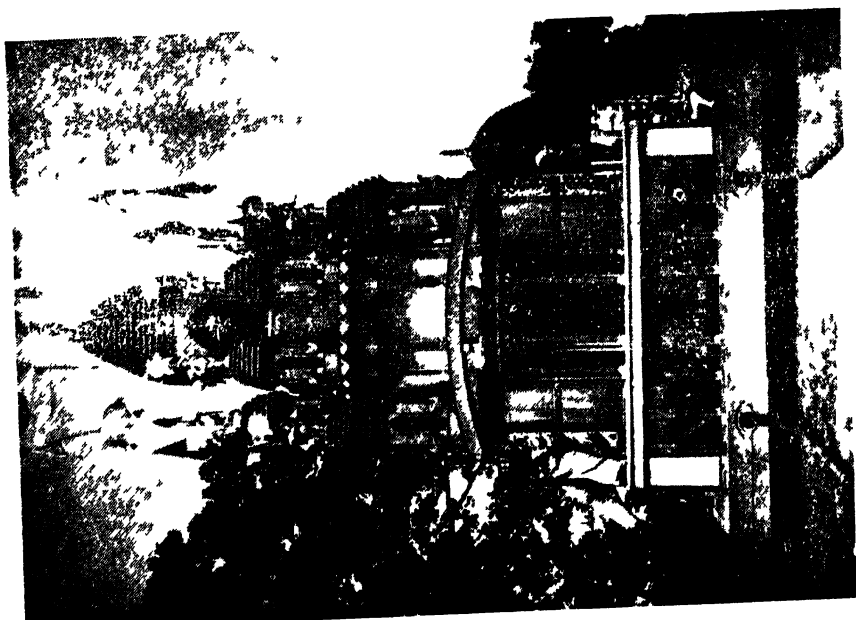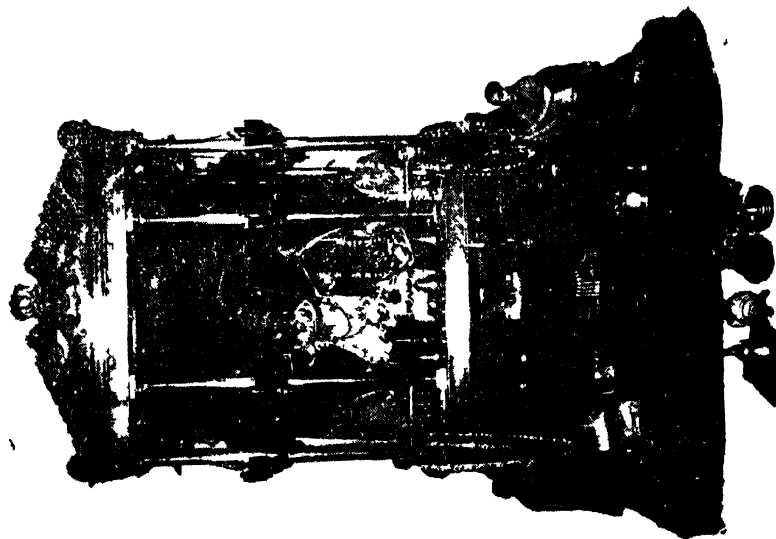
খৃষ্টাব্দের "ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া" পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, প্রসিদ্ধ রচনা লেখক জন ফষ্টারের সহিত আমি যখন দেখা করিতে যাইতাম, তিনি তখন "স্টেপেলটন গ্রোভে" বাস করিতেন। তাঁহার বাটির ঠিক পার্শ্বেই রামমোহন রায়ের কবর ছিল। তিনি রামমোহনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং তাঁহার অশেষ গুণকীর্তন করিতেন। তিনি বলিতেন, যেখানে রামমোহনের কবর ছিল, তাহা অন্য কে একজন কিনিয়া লইয়াছে—বর্তমানে কবরের চিহ্নমাত্র নাই। যাহা হউক, দ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত বৎসরের ৯ই জানুয়ারী বিলাত যাত্রা করেন এবং ১০ই জুন তারিখে লণ্ডনে উপনীত হইয়াই উক্ত স্থান হইতে রামমোহন রায়ের মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া যান এবং "আর্নোস-ভেল" নামক স্থানে একটি সমাধি মন্দির করিয়া দেন।

বৃষ্টলে রাজা রামমোহনের সমাধি মন্দিরে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছেঃ

BENEATH THIS STONE
REST THE REMAINS OF RAJA RAMMOHUN ROY BAHADUR
A CONSCIENTIOUS AND STEADFAST BELIEVER IN THE
UNITY OF THE GODHEAD;
HE CONSECRATED HIS LIFE WITH ENTIRE DEVOTION
TO THE WORSHIP OF THE DIVINE SPIRIT ALONE.

To great natural talents he united a through mastery of many languages, and early distinguished himself as one of the greatest scholars of his day.

His unwearied labours to promote the social, moral and physical condition of the people of India, his earnest endeavours to suppress idolatry and the rite of suttee, and his constant zealous advocacy of whatever tended to advance the glory of God and the welfare of man, live in the grateful remembrance of his countrymen.

This tablet records the sorrow and pride with which his memory is cherished by his descendants.

He was born in Radhanagore, in Bengal, in 1774, and died at Bristol, September 27th, 1833.

লণ্ডনের ঠাকুর সোসাইটি রাজা রামমোহনের দেহাবশেষ ভারতবর্ষে প্রেরণের বহু বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও তাঁহার দেহাবশেষ ভারতে আসে নাই।

আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুপ্ত রামমোহনের সমাধি সম্বন্ধে লেখেনঃ

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর, ক্লিপটনে কুমারী কেসেলের গৃহে তখন মৃত্যুর পদধ্বনি। শতাব্দীর অন্ধকারের অচলায়তন ভেদ করে যে আলোর সূর্য একদিন ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছিল তাঁর আঁধার ভাঙ্গার মশাল হাতে নিয়ে, মৃত্যুর ফুৎকারে তাহা তখন নির্বাপিত প্রায়. ১৩০ বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে ব্রিষ্টলের এক নির্জন পল্লীতে ভারতের নবযুগের প্রবর্তক বাঙ্গালী রামমোহন রায় রাত্রি

প্রায় দুটোর সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। সেদিন তাঁর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজার আত্মীয় রাজারাম, পাচক ব্রাহ্মণ রামরতন মুখোপাধ্যায়, ভৃত্য রামহরি এবং ইংরেজ মহিলা ও পুরুষের মধ্যে কুমারী কার্পেনটার; তার পিতা, বঙ্গবন্ধু ডেভিড হেয়ারের দুইজন বংশধর ও জনেট নামে জনৈক ইংরেজ মহিলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। জনেট রাজার রোগশয্যায় সেবাশুশ্রূষাও করেছিলেন বলে জানা যায়। মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পরে ১৮ই অক্টোবর কুমারী কেসেলের বিস্তৃত গৃহপ্রাঙ্গণ সংলগ্ন স্টেপেলটোন গ্রোভে রাজার নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে একদিন যে জীবনের সূচনা হয়েছিল মাত্র ৫৯ বৎসরেই তা সকলের অগোচরে নিঃশব্দে ঝরে পড়লো। তাঁর কাজ এবং প্রতিভার পরিমাপ করতে গিয়ে সত্যই বিস্মিত হতে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ রাজা রামমোহন রায়কে বর্তমান যুগের প্রবর্তক বলে অভিহিত করেছেন। পলাশী যুদ্ধের মাত্র সতের বছর পরে জন্মগ্রহণ করেও তিনি যে অগ্রগামী চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা ভাবলে আজও বিস্মিত হতে হয়। অত বড় বিরাট একটা প্রাণ, অসামান্য প্রতিভার তিরোধানকে কেন্দ্র করে স্বদেশ অথবা বিদেশে সেদিন কোন চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়নি। দেশীয় ও বিদেশীয় মাত্র পনেরো-ষোলজন পুরুষ ও মহিলা তাঁর সমাধির সময়ে উপস্থিত ছিলেন। সমাধিকালে কোন ধর্মানুষ্ঠান বা প্রার্থনা হয়নি। সকলে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে শেষ অভিবাদন জানিয়েছিলেন।

দশটি বছর ষ্টেপলটোন গ্রোভের নির্জন পরিবেশে এল্‌ম বৃক্ষের ছায়ার নীচে রাজার সমাধি প্রায় অবহেলিত অবস্থায় ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজার মৃত্যুর দশ বছর পরে ইংলণ্ড যান এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে ষ্টেপলটোন গ্রোভ পরিদর্শন করেন। তিনি কুমারী কেসেলের সম্পত্তির মধ্যে রাজার সমাধি রাখা পছন্দ করলেন না। সমাধিটির সর্বসাধারণের দর্শনীয় একটি সাধারণ স্থানে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করে নিজ অর্থব্যয়ে সমাধিটি ষ্টেপলটোন গ্রোভ থেকে আরনোজভেল সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে এলেন। পরের বছর তাঁরই চেষ্টায় ভারতীয় শিল্পের আদর্শে একটি মন্দির নির্মিত হয়।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় সমাধিমন্দির নির্মিত হল বটে, কিন্তু সেই মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের কোন সুবন্দোবস্ত না থাকায় কালক্রমে তা জীর্ণ হয়ে এল. আঠাশ বছর পরে বরাহনগর নিবাসী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে গেলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাজার সমাধিমন্দিরের জীর্ণ অবস্থা দেখে তিনি ব্যথিত হলেন এবং শুনতে পেলেন যে, রাজার প্রতি অনুরাগী ইংরেজ পুরুষ ও মহিলারা মন্দির সংস্কারের আয়োজন করছেন। কিন্তু ভারতের নবযুগের প্রবর্তকের সমাধিমন্দির বিদেশীদের দ্বারা সংস্কৃত হবে সেটা তাঁর বিসদৃশ মনে হল। বিলেত থেকে দেশীয় সংবাদপত্রে দেশবাসীর কাছে মন্দির সংস্কারের জন্য আবেদন করেন। তাঁর আবেদনে রাজার উত্তরাধিকারীরা কেশবচন্দ্র সেনের হাতে পাঁচশত টাকা দান করেন। এই অর্থ কুমারী কার্পেন্টারের কাছে পাঠান হলে ১৮৭২ সালে মন্দির সংস্কার করা হয়, কিন্তু কালের প্রবাহে আবার জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। সতের বছর পরে ১৮৮৮ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং পরে দুর্গামোহনবাবু রাজার পৌত্রের কাছে মন্দির সংস্কারের অনুরোধ জানালে রাজার পৌত্র পাঁচশত টাকা পাঠিয়ে দেন। সেই অর্থে পুনরায়

মন্দির সংস্কার করা হয়। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় শশিপদবাবু একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেই প্রস্তাবে তিনি বলেন যে, যদি পনেরোশত টাকা এককালীন দান সংগ্রহ করে মূলধনস্বরূপ ব্যাংকে জমা রাখা যায়, তাহলে তার সুদও প্রতি দশ বছর অন্তর পাঁচশত টাকা হতে পারে এবং সেই টাকা মন্দিরের সংস্কার কাজের জন্য খরচ করা যেতে পারে। কিন্তু শশিপদবাবুর সেই প্রস্তাব শেষপর্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। তবে ১৮৯৯ সালে ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজ বৃত্তিধারী—শ্রীশশধর হালদার রাজার সমাধি মন্দিরের জীর্ণ অবস্থা বর্ণনা করে সংস্কারের জন্য ম্যাঞ্চেষ্টার পত্রিকায় এবং বিলেতের কোন কোন কাগজে চিঠি লিখেওছিলেন বলে জানা যায়।

তারপর দীর্ঘকাল অতীত হয়ে গিয়েছে। বাংলার তথা ভারতের অগণিত সুসন্তান—কত মশালবাহী মহাপথিক; ব্রিষ্টলে ভারত পথিক রামমোহনের সমাধি প্রান্তে তাঁদের অন্তরের প্রণতি নিবেদন করে এসেছেন। ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে কত ভাঙ্গা-গড়ার ঝড় উঠেছে। সেই ঝড়ে কত পথিকের পায়ের চিহ্ন ধূসর পাণ্ডুর হয়ে মহাকালের বুকে মিলিয়ে গিয়েছেঃ কিন্তু রামমোহনের আরব্ধ কাজের ধারা আজও অব্যাহত আছে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারী 'সমাচার দর্পণ' পত্রে "রাজা রামমোহন রায়ের ষ্টেপলটন স্থানে এক উদ্যানের মধ্যে কবর হইয়াছে তাঁহার পোষ্যপুত্র ও ভৃত্যবর্গ ও ইংলণ্ডীয় ক-একজন সাহেব তৎসময়ে উপস্থিত ছিলেন" বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১ মার্চ ১৮৩৪ "রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সংবাদ" শীর্ষক একটি কবিতা উক্ত কাগজে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি এইরূপঃ

কুমারিকা খণ্ডমধ্যে বিদ্যাসিন্দু ছিল।
কালরূপ ভাস্করের করে সুখাইল॥
বেদান্ত শাস্ত্রের অন্ত নিতান্ত এবার।
স্তব্ধ হইয়া শব্দশাস্ত্র করে হাহাকার॥
অলংকার হইলেন আকার রহিত।
দর্শন দর্শিত হীন হইল নিশ্চিত॥
বেদ উপনিষদের ঘুচিল সূচনা।
যন্ত্রণা যন্ত্রিত অন্য অন্য শাস্ত্র নানা॥
ইংলণ্ডীয় শাস্ত্রে আর আরবি পারসি।
না রহিল পারদর্শি অন্য এতাদৃশি॥
ব্রহ্ম উপাসকগণ আচার্যবিহীন।
হায় হিন্দুস্থান দেশ হইল নেত্র হীন॥
পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যার সর্বশাস্ত্রে অতি।
রাজা রামমোহন বলি বাখানে ভূপতি॥
যা হতে প্রকাশ দেশে নানা বেদ বিধি
হরিলেক কালচোর হেন গুণনিধি॥

বারশত চল্লিশ সনে ইংলন্ডীয় দেশে।
রবিবার আশ্বিনের দ্বাদশ দিবসে॥
মান্দ্রাজের যন্ত্রে করে এই ক্ষুদ্রাঙ্কিত।
তদৃষ্ট প্রকাশ করি হইয়া খেদিত॥

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনের উদ্দেশ্যে যাহা বলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

॥ রামমোহনের উপাসনাগৃহ ॥

রঘুনাথপুর শ্মশানক্ষেত্রের পাশে রাজা রামমোহন রায়ের উপাসনাগৃহ রাজ্য সরকার সম্প্রতি ক্রয় করিয়াছেন। এই বিষয়ে একটি সংবাদ ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাপি উক্ত স্থানে কিছুই হয় নাই। শ্রীঅমল হোমের বিশেষ চেষ্টায় রাজ্য সরকার কর্তৃক এই উপাসনাগৃহ কেনা হয়।

হুগলীর রাধানগর হইতে দেড়মাইল দূরে রঘুনাথপুর শ্মশানক্ষেত্রের পার্শ্বে অবস্থিত রাজা রামমোহন রায়ের উপাসনাগৃহটি সংলগ্ন ৩০ বিঘা জমি সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। ঐ স্থানে একটি সংস্কৃতি এবং শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের কথা স্থির হইয়াছে।

বাঙ্গলা তথা ভারতের বরেণ্য সন্তান এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ রাজ্য সরকার তাঁহার স্মৃতিবিজড়িত বাসগৃহ ও জমি ক্রয় করিয়া ঐ স্থানে সংস্কৃতি ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

রামমোহন রায় নিজে নির্জনে উপাসনার জন্য ঐ স্থানটি বাছিয়া লন এবং ঐ স্থানে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া উহাতে 'ওঁ তৎসৎ' এবং 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই দুইটি মন্ত্রশব্দ খোদিত করিয়া রাখে। ঐ জমি ও জীর্ণ বাসগৃহটি রাজা রামমোহন রায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কর্তৃক কয়েক বৎসর পূর্বে ৯ হাজার টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছে। ঐ জমির বর্তমান মালিকের নিকট হইতে রাজ্য সরকার উহা কিনিতে মনস্থ করিয়াছেন।

॥ রমাপ্রসাদ রায় ॥

রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র ব্যবস্থাপক সভার প্রথম বাঙ্গালী সদস্য, গভর্ণমেন্টের প্রথম বাংগালী লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সার ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতি-রূপে মনোনীত **রমাপ্রসাদ রায়** যে কীর্তিস্তম্ভ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরদিন অম্লান থাকিবে। রামমোহনের সময় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া বাল্যাবস্থায় রাজার প্রথম বিবাহ হয়। এবং আট বৎসর বয়সের সময় তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। পরে তিনি বর্ধমান জেলার কুড়মণ পলাশী গ্রামে শ্রীমতী দেবী নাম্নী এক বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপরে তাঁহার জীবদ্দশাতেই তিনি ভবানীপুরের মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী উমা দেবীকে বিবাহ করেন। রামমোহন যখন মাতা তারিণী দেবী কর্তৃক পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া রাধানগরের নিকট রঘুনাথপুরে পত্নী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদকে লইয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময় ১২২৪ সালের ১২ শ্রাবণ তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং পরে পারস্য ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হন। হুগলীতে অবস্থানকালে তিনি কিছুদিন কালেক্টরের কার্য করেন। এই সম্বন্ধে টয়েনবি সাহেব হুগলীর ইতিহাসে লিখিয়াছেনঃ ইহার পূর্বে আর কোন দেশবাসী এইরূপ সমগ্র জেলার শাসনভার প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর অবসর গ্রহণ করিলে তিনি লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক সরকারী উকিল নিযুক্ত হন।

বাঁশবেড়িয়ায় রমাপ্রসাদ রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়ে মিলিয়া একটি উচ্চ ইংবাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের বিষয় ৭১১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি বহু বিবাহ যাহাতে রদ হয়, তাহার জন্য বিশেষ সাহায্য করেন। প্রতিভায়, মনস্বীতায় ও মনের উদারতায় তৎকালে তিনি ছিলেন অনন্য।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের নূতন বিধি অনুসারে এই দেশে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক সর্বপ্রধান ধর্মাধিকরণে বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে দিন তাঁহার নিয়োগপত্র আসিল (১৮ শ্রাবণ ১২৬৯) সেই দিন তিনি পরলোকযাত্রা করেন। 'বহু বিবাহ' পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেনঃ লোকান্তর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় এই সময়ে এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন এবং নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। তাঁহার সম্বন্ধে দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়াছেনঃ

আইন পারগ রমাপ্রসাদ প্রবর।
সাধিতে স্বদেশ হিত ছিলেন তৎপর।
প্রথমে বিচারপতি সেই বিজ্ঞ হয়,
অস্তমিত হ'ল কিন্তু না হতে উদয়।
অভিষেক দিনে গেল শমন ভবনে,
কোথা রাম রাজা হয় কোথা গেল বনে।

॥ পাতুল ॥

আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানার অন্তর্গত পোল ইউনিয়নের মধ্যে পাতুল একটি বহু পুরাতন গ্রাম। এই ইউনিয়নের মধ্যে পোল, রাধাবল্লভপুর ও রায়বাড় গ্রামও উল্লেখযোগ্য। পোল ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ৮ হাজার ৭ শত ৯৮ জন।

বহু প্রাচীনকালে এই স্থান সমুদ্রের অংশ ছিল। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পর্তুগীজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন রডা জলপথে এই দিক দিয়া যাতায়াত করিতেন বলিয়া তাহার নামানুসারে পাতুলের পূর্বদিকস্থ খাল "রড়াখাল" নামে অভিহিত হইয়াছে। এক সময় এই খালে অগাধ জলরাশি ছিল। সেই জন্য অকুল পাথারের অপভ্রংশ চলিত কথায় পারতল অর্থাৎ তলের পর অতল হইতে পাতুল নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই খালের মাটি খননকালে বহুবার বিবিধ প্রকার জলজন্তুর কঙ্কাল পাওয়া যায়।

পাতুলের প্রাকৃতিক শোভা মনোরম; ইহার পূর্বদিকে রড়ার খাল ও খানাকুল-কৃষ্ণনগর। পশ্চিমে গৌরহাটি ও ঘোষপুর ইউনিয়ন। উত্তরে রাধাবল্লভপুর এবং দক্ষিণে পোল গ্রাম। এই গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিক উচ্চ এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক নিম্ন ছিল, কিন্তু দামোদরের বন্যায় পূর্বদিকও ক্রমশঃ উচ্চ হইতেছে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা পুণ্যশ্লোকা ভগবতী দেবীর মাতুলালয় পাতুলে ছিল। ভগবতী দেবী এই গ্রামে মাতুলালয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হন বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বরচিত চরিতকথায় বলিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা এইরূপঃ—

"পাতুল নিবাসী মুখুটি পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের কন্যা গঙ্গার বিবাহ হয় গোঘাটের রামকান্ত তর্কবাগীশের সঙ্গে। সেই ঘরে ভগবতীর দেবীর জন্ম। কিন্তু তিনি পিত্রালয়ে প্রতিপালিত না হইয়া মাতুলালয় পাতুলে প্রতিপালিত হন।"

পূর্বে পাতুল সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল এবং ১৮৮৫ সালে এই স্থানে দশটি টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল। বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতী দেবীর মাতামহ পণ্ডিত পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার বাড়ীতে টোল ও অতিথিশালা ছিল। পরে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের যুগে উহা গ্রাম্য পাঠশালায় পরিণত হয় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্যকালে পাতুলে থাকাকালীন উক্ত পাঠশালায় পড়িতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মীয় পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি পাতুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অনেকগুলি পুস্তক আছে; তন্মধ্যে "মৃচ্ছকটিক নাটক" সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় 'বসন্তসেনা' নামে রূপান্তরিত করিয়া তিনি বাংলা ভাষার যে সম্পদ বাড়াইয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন 'পল্লীমঙ্গল' নামে তাঁহার আর একখানি পুস্তকও উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় কলিকাতায় সর্বপ্রথম যে নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়, **মধুসূদন বাচস্পতি** তখন উহার একজন অধ্যাপক ছিলেন।

পাতুলের মাণিকেশ্বর শিব বহু প্রাচীন ও জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত। এই শিবের কাছে হত্যা দিলে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাওয়া যায় বলিয়া এই মন্দিরে দেশ-দেশান্তর হইতে বহু যাত্রীসমাগম হয়। শিবতলায় চৈত্র সংক্রান্তিতে প্রতি বৎসর খুব ধুমধামের সহিত গাজন উৎসব হয়।

পাতুল শিবতলায় বহু প্রাচীনকাল হইতে বারোয়ারী কালীপূজার অনুষ্ঠান হয়। এই পূজা রাধানগরের সুবিখ্যাত তান্ত্রিক আগমবাগীশ বংশের ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ করিতে সাহস করেন না। পাতুলে বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রতি বৎসর চার-দিনব্যাপী মহাসমারোহের সহিত হরিনাম সংকীর্তন হয়। এই হরিসভা শতাধিক বৎসরের পুরাতন। ইহা ছাড়া ফাল্গুন মাসে ঘণ্টাকর্ণ পূজা উপলক্ষে এই গ্রামে তিন দিন ধরিয়া একটি মেলা হয়। এই মেলায় স্থানীয় ফ্রেন্ডস্ ড্রামাটিক ইউনিয়ন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ প্রতি বৎসর অভিনয় করেন। এই গ্রামে অভিনয়ের খুব চর্চা আছে। পাতুল মহামায়া ক্লাব নামে একটি অবৈতনিক যাত্রার দলও এই স্থানে আছে।

পাতুলে ঘণ্টাকর্ণ মিলনমন্দিরে ১৩২২ সালে ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, মনোমোহন ঘোষ, বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তী ও বিভূতিভূষণ হাজরার প্রচেষ্টায় একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। গ্রামের মধ্যে এইরূপ স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ খুব অল্পই দেখা যায়। এই গ্রামের শিল্পীগণের মধ্যে কানাই হাজরা, শৈলেন্দ্রনাথ পাল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের এক সময় অভিনয়ের জন্য খুব সুনাম ছিল। তাঁহাদের সুঅভিনয় এই লেখকেরও দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আরামবাগের উকিল গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় পাতুলে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রকুমার চৌধুরীর প্রচেষ্টায় গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়; সেই সময় প্রিয়নাথ মণ্ডল বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ভূমিদান এবং মনোমোহন ঘোষ অর্থ সাহায্য করেন। মনোমোহন বাবু খেলাধূলা ও নাট্যাভিনয়ে নিজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং গ্রামে ফুটবল ক্লাব ও স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

হুগলী জেলার বিশিষ্ট জনসেবক হরিপালের ডাঃ আশুতোষ দাসের স্মৃতিরক্ষার্থে অগ্রণী তরুণ সঙ্ঘের পরিচালনায় ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে গ্রামে "আশুতোষ গ্রন্থাগার" স্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রামে পাতুল গণেশবাজার নারীসমিতি নামে একটি মহিলা সমিতি আছে। শ্রীমতী হরিমতি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উক্ত মহিলা সমিতিতে একটি সূচীশিল্প শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হয়। এই শিক্ষা কেন্দ্রে মেয়েদের নানা প্রকার শিল্পকাজ, গৃহকাজ, সুতাকাটা, জাতীয় সঙ্গীত, রোগীর সেবা ও নিরক্ষর মহিলাদের আক্ষরিক শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই গ্রামে নয়াদল যুবক সঙ্ঘ, অগ্রণী তরুণ সঙ্ঘ, সবুজসাথী কিশোর সঙ্ঘ, নারী সমিতি, শিশু ও মাতৃমঙ্গল সমিতি, কংগ্রেস কার্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আছে। পাতুলের জনসংখ্যা ২ হাজার ৩ শত ৯৭ জন। এই স্থানের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। ব্রাহ্মণ, তিলি, সদ্গোপ, বাগ ক্ষত্রিয় ও দুলেদের বাসই সর্বাধিক। এই গ্রামের বেশীরভাগ লোকই কলিকাতায় চাকুরী বা ব্যবসায়াদি করেন। পূর্বে তন্তুবায়, স্বর্ণকার কর্মকার প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পীবৃন্দ ছিল, কিন্তু বর্তমানে কর্মকার ব্যতীত আর কেহই জাত ব্যবসা করেন না।

পাতুল গ্রামে শরীর চর্চার জন্য ব্যায়ামাগার এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ইহা ছাড়া গ্রামে পোষ্টআফিস, ইউনিয়ন বোর্ড কার্যালয় ও কংগ্রেস ভবন আছে। গ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অন্যান্য গ্রামেরও অনুকরণযোগ্য।

বর্তমানে পাতুল একটি ক্ষুদ্র ও নীরব গ্রাম হইলেও তাহার প্রাচীন ঐতিহ্য অবজ্ঞেয় নহে। এই গ্রাম বহু মহাপুরুষের পদধূলিতে ধন্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাল্যজীবনের অনেক স্মৃতি এই গ্রামের সহিত জড়িত আছে। তাহার পরিচয় তাঁহার ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন "বিদ্যাসাগর জীবন চরিতে" লিখিয়াছেন "১৭৩৫ শকে খানাকুল কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে পাতুল গ্রাম নিবাসী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের দৌহিত্রী ও রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দুহিতা ভগবতী দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের পাণিগ্রহণ-বিধি সমাধা হইল। রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় জাহানাবাদ মহকুমার পশ্চিম গোঘাট গ্রামে বাস করিতেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বাটীতেই তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। ছাত্রগণকে অন্ন দিয়া শিক্ষা দিতেন। পাতুলের **পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ** অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার টোল ছিল, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় প্রত্যহ অতিথি অভ্যাগত লোকসমূহকে ভোজন করাইতেন। প্রদেশের সকল লোকই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। ইঁহার জেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম রামধন তর্কবাগীশ, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ শিরোমণি, কনিষ্ঠ বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার এই চারি পুত্র ছিলেন। সকলেই গুণবান ও দয়ালু ছিলেন। বিদ্যাবাগীশের দুই কন্যা ছিল. জ্যেষ্ঠা গঙ্গামণি দেবী, দ্বিতীয়া তারাসুন্দরী দেবী। জ্যেষ্ঠা গঙ্গামণির গর্ভে দুই কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠার নাম লক্ষ্মীমণি দেবী। রামকান্ত প্রতি রাত্রে শ্মশানে বসিয়া জপ করিতেন ও সংসারের সকল বিষয়ে ঔদাস্যবলম্বন করেন ও প্রব্রজ্যার ব্রত গ্রহণ করেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া করঞ্চ গ্রাম হইতে কন্যা গঙ্গামণি ও তাঁহার দুইটি কন্যাকে পাতুল গ্রামে আনয়ন করেন। পঞ্চানন তর্কালঙ্কার ও রাধামোহন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ইহাদিগকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন, তাঁহাদের যত্নে বীরসিংহ নিবাসী ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ভগবতী দেবীর বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল।"

পোল ইউনিয়নের মধ্যে পোল গ্রামের জনসংখ্যা সর্বাধিক। ইহার জনসংখ্যা ৪ হাজার ৩ শত ১৫ জন। এই গ্রামে **ঔপন্যাসিক নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য** জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যা ৪৫ খানি। পিতার নাম **পীতাম্বর ভট্টাচার্য**। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি নবোধন, কথাকুঞ্জ প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেন। ইহা ছাড়া জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রের অভিধান 'চিন্তামণি' নামক গ্রন্থের মূলসহ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া পীতাম্বর যশস্বী হন। তাঁহার পুত্র নারায়ণচন্দ্রও ঔপন্যাসিক ছাড়া একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। এই গ্রাম প্রাচীনকালে লৌহশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

পোল গ্রামে প্রসিদ্ধ পাটব্যবসায়ী **কালাচাঁদ মান্না** ১২৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গঙ্গারাম মান্না। গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষকদের স্থায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা তাঁহার জনসেবার অন্যতম নিদর্শন। তিনি পোল, পাতুল ও নরেন্দ্রপুরের মধ্যস্থলে জলকষ্ট নিবারণের জন্য কুড়ি বিঘা জমির উপর একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন। হিন্দু-ধর্মোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাদি করিবার জন্য তিনি এই অঞ্চলের লোকদের প্রায়ই ভোজনে আপ্যায়িত করিতেন! পোল-পাতুলের রথও তিনি নির্মাণ করিয়া দেন। ১৩৩৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। পোল গ্রামে কুটিরশিল্পের মধ্যে তাঁত ও বংশ শিল্পের কাজ এখনও হয়।

॥ অনন্তনগর গান্ধী আশ্রম ॥

খানাকুল হইতে একমাইল দক্ষিণে **অনন্তনগর** নামে একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি চাষীপ্রধান। দরিদ্র মুসলমান চাষীর সংখ্যাই বেশী। এই গ্রামে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ গঠন-কর্মী শ্রীব্রজগোপাল অধিকারী মহাত্মা গান্ধীর গঠনকর্মের অনুসরণে একটি সংস্থা স্থাপন করেন, নাম দেন **"গান্ধী-আশ্রম।"** আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান যজ্ঞে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি গঠনমূলক কার্যের মধ্য দিয়া দেশসেবার প্রকৃত সুযোগ গ্রহণ করেন। সেই হইতে অম্বর পরিশ্রমালয়, ঘানি শিল্প, তাঁত ও চরকা প্রভৃতির মাধ্যমে এখানে একটি গঠনকর্ম পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং গ্রামবাসীগণ গান্ধীজীর অনুসারিত পথে চলিয়া গঠন কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় একশত বিঘার একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া তাহার পূর্ব ও উত্তর পাড়ে সুদৃশ্য মনোরম পরিবেশে এখন একটি সুন্দর আশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে। উক্ত পুষ্করিণীর চতুর্দিকে বহু জমি উদ্ধার করিয়া এখন যে কেবল চাষ চলিতেছে তাহা নয়, মধুমক্ষিকা পালন হইতেছে এবং চরকা, তাঁত, ঘানি প্রভৃতি কুটির-শিল্পের কাজও চলিতেছে। সম্প্রতি সরকার এই পুষ্করিণীর উত্তর দিকে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করিয়া এই অঞ্চলের হাজার হাজার বিঘা জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অধিকারী মহাশয়ের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া অভয় আশ্রম একটি শাখাকেন্দ্র ঐ আশ্রমে খুলিয়াছেন তাহার মাধ্যমে এই অঞ্চলে গঠনমূলক কাজগুলি ভালভাবে চলিতেছে।

খানাকুলে পাঁচটি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ আছে। এইগুলির নাম **ঘণ্টেশ্বর** (উবিদপুর), **ভূতনাথ** (সেনপুর), **মানিকেশ্বর** (পোল), **শীতলেশ্বর** (কেটদল) ও **সানেশ্বর** (সাহানপুর)। সাহানপুরে সানেশ্বর মন্দির দুইটি নবীনকৃষ্ণ বসু কর্তৃক নির্মিত। একটি মন্দিরে "শকাব্দ ১৭৪৮—সন ১২৩৩ সাল" ও আরেকটিতে "শকাব্দ ১৭৫০—সন১২৩৫ সাল" উৎকীর্ণ আছে। এই স্থানে **"ছ' মন্দির"** নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মন্দিরগুলির এখন ভগ্নাবস্থা। বীরলোক গ্রামের প্রসিদ্ধ **সিংহবাহিনী** মন্দির তেঁতুলেব খাঁয়েদের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। খাঁ বংশ দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য খ্যাত।

রাজহাটি ইউনিয়নের মধ্যে **জড়ুড়** গ্রামে **ভগবতীর মেলা** উল্লেখ্য। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ এই মেলা হয়। রামমোহন রায়ের পূর্বপুরুষ দেবীর মন্দির নির্মাণ ও একটি পুস্করিণী খনন করিয়া দেন। রাজহাটি হাটতলায় **বিশালাক্ষ্মী দেবীর** মন্দির আছে। এই গ্রামে **বদ্রেশ্বর শিব** আছেন। গাজনের সময় এইস্থানে একটি মেলা হয়। গ্রামে প্রত্যহ বাজার বসে। আটঘরার অন্তর্গত **গৌরাঙ্গপুরে** রথের মেলায় বহু জনসমাগম হয়।

নতিবপুর ইউনিয়নে ভৈরবপুরে **ভৈরবীমাতা** একটি উঁচু স্তুপের উপর আকাশতলে বিরাজ করিতেছেন। দেবীর মন্দিব করিলে দেবী কুপিতা হন্ বলিয়া কোন মন্দির হয নাই। পূর্বে এই গ্রাম সমুদ্র উপকলবর্তী ছিল বলিয়া কথিত হয়। পূজা ও উৎসবের কোন নির্দিষ্ট দিন নাই। দেবীর প্রত্যাদেশ হইলে পূজা হয়।

আরামবাগ মহকুমাব যশাড গ্রামে ১২৫২ সালে **হাজি শেখ সবিরুদ্দিন** জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পনের বৎসর বযসে ব্যবসা করিবার জন্য গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসামে যান এবং তথায় ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ অর্জন করেন। দান ও দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য ইনি স্বগ্রামে ও গৌহাটীতে খ্যাত হন। ইনি যশাড ও হেয়াতপুর গ্রামে দুইটি মসজিদ স্থাপন করেন।

ইঁহার প্রতিষ্ঠিত 'শেখ ব্রাদার্স' অদ্যাপি গৌহাটীতে বিদ্যমান আছে। কবিরুদ্দিন ও ইব্রাহিম নামে তাঁহার দুইটি সহোদর ভাই ছিল—উক্ত ভ্রাতৃগণকে তিনি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৩৩৩ সালে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

নন্দনপুর ॥ খানাকুলের অন্তর্গত জগৎপুর ইউনিয়নে নন্দনপুর ও বন্দর দুইটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম। নন্দনপুরে মাটির হাঁড়ি, বাঁশের চুপড়ি ধুচুনী, লাঙ্গলের ফাল, কোদাল এবং শোলার নানাপ্রকার জিনিষপত্র এখনও গ্রামীন শিল্প হিসাবে তৈয়ারী হয়। নন্দনপুরে রথতলায় প্রতিবৎসর মাঘীপূর্ণিমায় ধর্মের-রথ চালিত হয়। এবং সেই জন্য নন্দনপুরে সপ্তাহব্যাপী মেলা ও নানারূপ উৎসবাদি হয়। এই গ্রামে **রামরাম চক্রবর্তী** নামে একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তাঁহার কালীবাড়ি যেখানে ছিল, উহা এখন কালীরডাঙ্গা নামে খ্যাত। গ্রামে **যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়** ও তাঁহার পুত্র **প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হইলেও জনসেবার জন্য এই অঞ্চলে খ্যাতিলাভ করেন। প্রমথবাবু জগৎপুর ইউনিয়ন বোর্ডের বহু বর্ষ সভাপতি ছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় ও রূপচাঁদ ভুক্তার অর্থানুকুল্যে গ্রামে **নন্দনপুর রূপচাঁদ একাডেমি** নামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় ইংরাজ সরকার তাঁহার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে ভয়ানক অসুস্থতার জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেও ১৯৪২ সালে ১৩ জ্যৈষ্ঠ তিনি পরলোকগমন করেন। গ্রামে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা কর্তব্য।

রূপচাঁদ ভুক্তা এই গ্রামের আর এক কৃতি ব্যক্তি। ১২৬৪ সালে ইহার জন্ম হয়। পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ভুক্তা। দরিদ্রের সন্তান বলিয়া লেখাপড়া শিখিবার সৌভাগ্য হয় নাই, কিন্তু লক্ষ্মীর কৃপায় পিসতুত ভাই কালাচাঁদ মান্নার সহিত পাটের ব্যবসা করিয়া যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন তেমন গ্রামের উন্নতিকল্পেও তিনি বহু অর্থ দান করেন। ১৩১১ সালে নন্দনপুর রূপচাঁদ একাডেমী তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া গ্রামের ধর্মের মন্দির, শীতলা মন্দির প্রভৃতি কয়েকটি মন্দিরও তাঁহার অর্থে নির্মিত হয়। নন্দনপুরে ধর্মের রথও তিনি করিয়া দেন। গ্রামে পূর্বে হাট ছিল না। তাঁহার চেষ্টায় এই স্থানে হাটের প্রবর্তন হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া পুত্রকামনায় আরো দুইবার বিবাহ করেন। কিন্তু পুত্র হয় নাই। তৃতীয়ার গর্ভে চারিটি কন্যা রাখিয়া ১৩৩৪ সালে তিনি গতাসু হন। আদমসুমারির তালিকা অনুযায়ী নন্দনপুরের জনসংখ্যা ২,২৭৩ জন।

বন্দর ॥ রেশমের কাপড়ের জন্য এই গ্রাম পূর্বে খ্যাত ছিল। খানাকুলের মধ্যে ঘোড়াদহ, কাকনান, ধান্যঘোরী, বন্দর প্রভৃতি গ্রামে রেশম পোকার চাষ হইত। গ্রামে রবার্ট চেরিয়াল নামে এক ইংরাজের রেশম কুঠির বাড়ি এখনও আছে। চেরিয়াল সাহেবের পরে লালবিহারী দত্ত ও তাহার পর বৃন্দাবন দত্ত ব্যবসা চালান। এই অঞ্চলে পূর্বে কখনও বন্যা হইত না। কিন্তু ১৩২০ সালে হঠাৎ এই স্থানে প্রবল বন্যা হওয়ায় তুঁত চাষ নষ্ট হওয়ার জন্য পোকার চাষও বন্ধ হইয়া যায়। এবং রেশম কুঠির কাজও ১৩২১ সাল হইতে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়। রেশম কুঠির পাশে এখন সিনেমা হাউস হইয়াছে। এই স্থানে দ্বারকেশ্বর নদ ও মেদিনীপুরের শিলাই নদী একত্র হইয়া রূপনারায়ণ নাম ধারণ করিয়াছে।
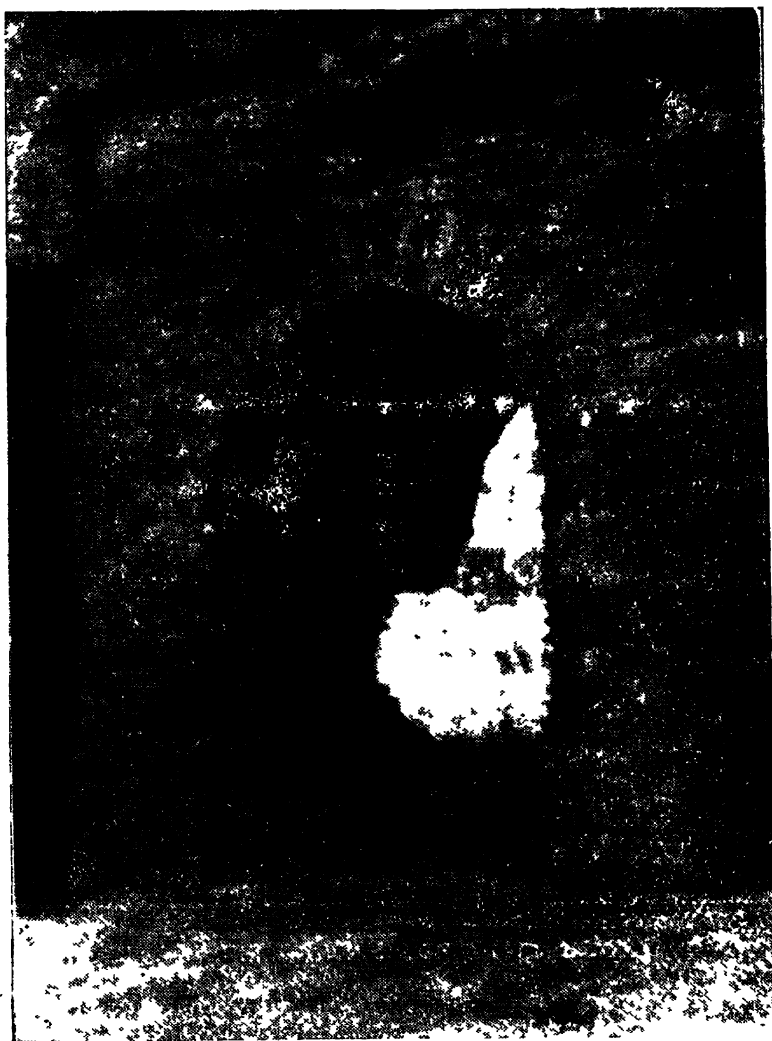
বাজনুয়ার মসজিদের তোরণ (পৃঃ ১৪৩৯)
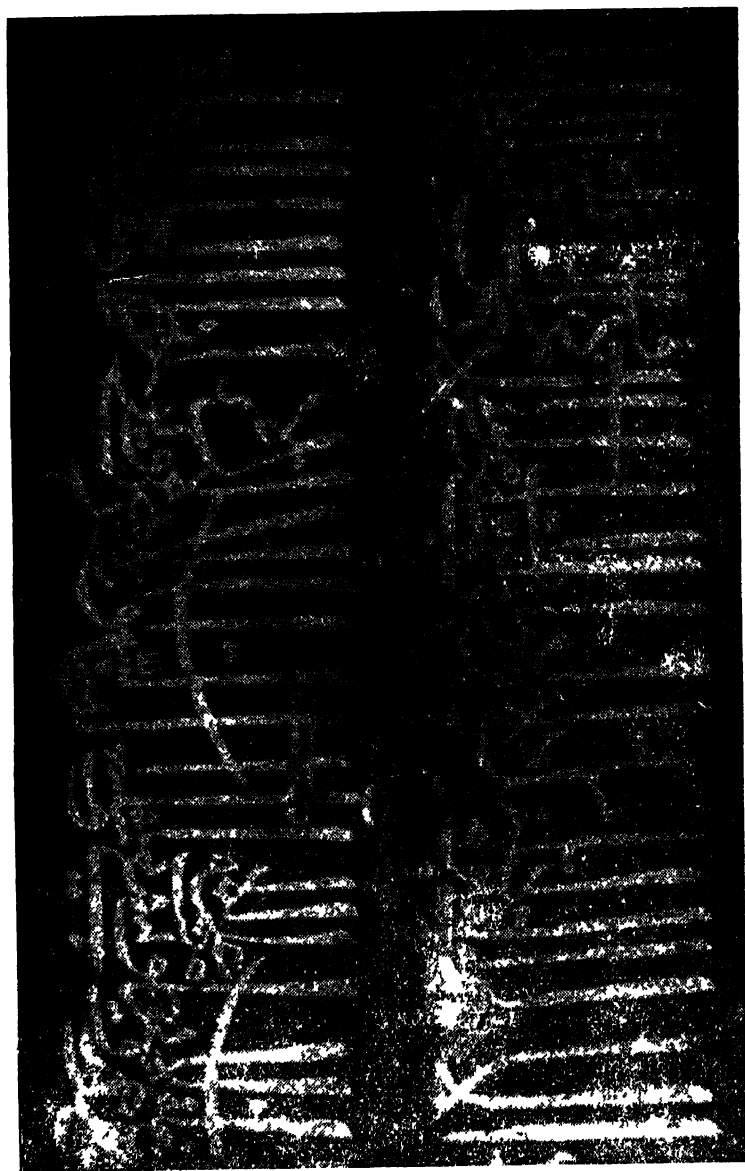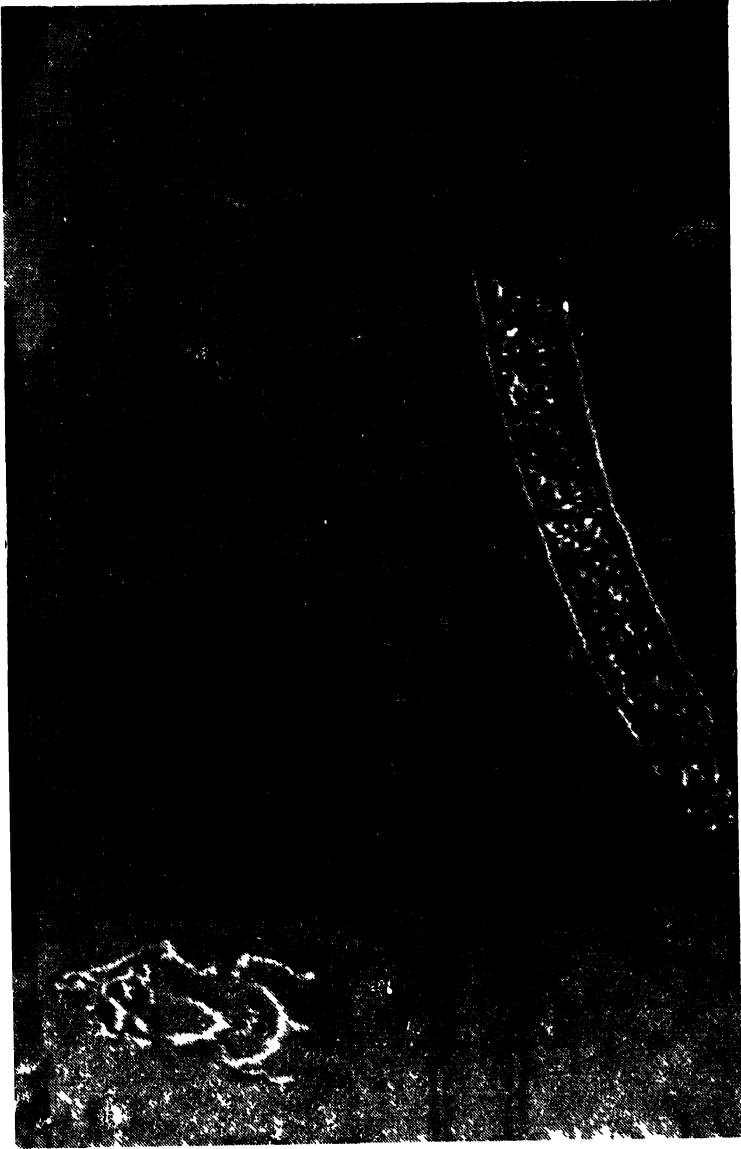
মায়াপুরে প্রাপ্ত আরবী শিলালিপি -ইহার পশ্চাতে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত আছে (পৃঃ ১৪৫৬)

মাযাপুরে প্রাপ্ত আরবী শিলালিপির পশ্চাতে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি (পৃঃ ১৪৫৬)

সানবান্দীর তোরণ (পৃঃ ১৪৩৮)

ত্রিবেণীর কালীবাড়ি (পৃঃ ১৩৫০)
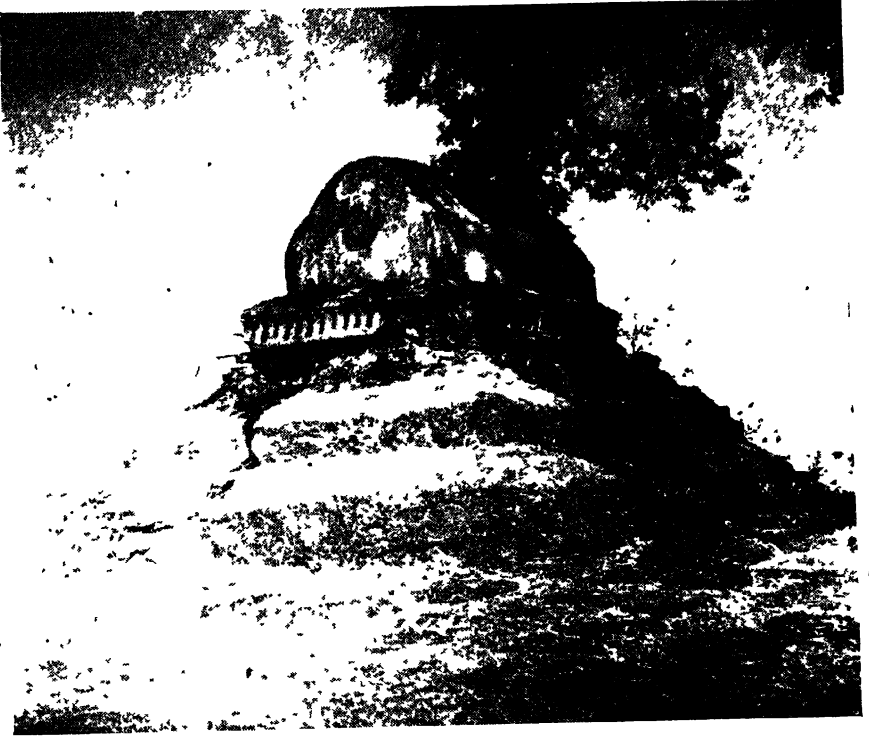
ত্রিশ ফুট প্রাচীরের উপর ইসমাইল গাজীর সমাধি—গড়-মান্দারণ (পৃঃ ১৪৪২)

নিস্তারিণী কালীমন্দির—সেওড়াফুলি (পৃঃ ১২০১)

শৈলেশ্বর শিবমন্দির--কাঁটালী (পৃঃ ১৪৩৭)
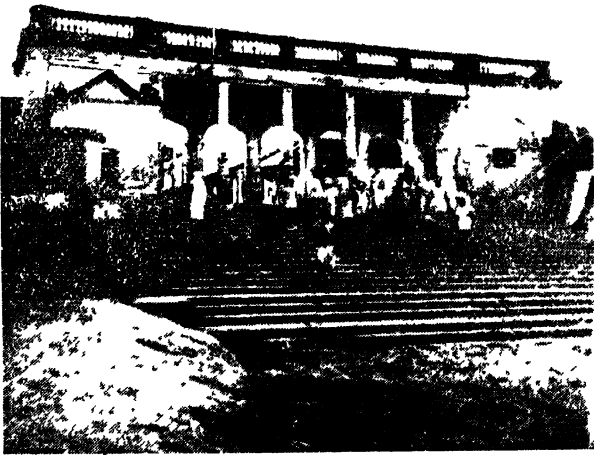
নিমাইতীর্থের ঘাট—সেওড়াফুলি (পৃঃ ১২০৮)

আমোদর নদ--গড় মান্দারণ (পৃঃ ১৪৪৩)

মধুসূদন গুপ্ত (পৃঃ ১২০৬)

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (পৃঃ ১৪১২)

রঘুনাথ দাসগোস্বামী (পৃষ্ঠা ৭৫৪)

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (পৃঃ ৭৮৫)

॥ গোঘাট ॥

গোঘাট আরামবাগ শহর হইতে ছ' মাইল দূরে অবস্থিত। গোঘাটের রথ খুব প্রসিদ্ধ। এই রথ আষাঢ় মাসে রথযাত্রার পরিবর্তে দুর্গাপূজার সময় বিজয়া দশমীর দিন চালান হয়। গ্রামে উচ্চ মাধ্যমিক ইংরাজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল আছে। ইহা ছাড়া গ্রামে থানা, কৃষি পরিদর্শকের অফিস, পোস্ট অফিস ও রেজিস্ট্রি অফিস আছে। এই গ্রামে **ভগবতী দেবী** জন্মগ্রহণ করেন। এই সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেনঃ

ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ-চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তর্কভূষণ মহাশয় গোঘাট নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই ভগবতী দেবীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। গোঘাটের বর্তমান জনসংখ্যা ২,১৯১ জন।

গোঘাটের অন্তর্গত নবাসন গ্রামে একটি ত্রিকোণমিতিক জরিপস্তম্ভ আছে। ইহা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। এইরূপ স্তম্ভ দিলাকাস, হায়াৎপুর ও মোবারকপুরে আছে। সম্প্রতি ইহার উপরিভাগের কিছু অংশ পড়িয়া গিয়াছে। স্তম্ভের আলোকচিত্র ৩৪ নম্বর প্লেটে দেওয়া হইয়াছে। নবাসন গ্রামে আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে একটি মেলা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। নবাসন গ্রামের জনসংখ্যা ৮১৪ জন।

গোঘাটের অন্তর্গত **মদনমোহনপুরের** প্রাচীন শিবমন্দিরটিও উল্লেখ্য। এই মন্দির কাহার দ্বারা নির্মিত তাহা জানা যায় না। মদনমোহনপুরের বর্তমান লোকসংখ্যা ৪৬০।

॥ কাঁটালী ॥

কাঁটালী এই অঞ্চলের পূর্বে একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। **শৈলেশ্বর শিব** এই গ্রামের জাগ্রত দেবতা। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে শৈলেশ্বর শিবের উল্লেখ আছে। আর এই মন্দিরে বীরেন্দ্র সিংহের সহিত তিলোত্তমা ও আয়েষার প্রথম সাক্ষাত হইয়াছিল। শৈলেশ্বর তলায় চড়কের সময় মেলায় এখনও বহু জনসমাগম হয়। দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য দূরদেশ হইতে যাত্রিগণ শৈলেশ্বর শিবের কাছে 'ধর্না' দেয়। পূর্বে তারকেশ্বরের বিরাট মন্দিরের মত শৈলেশ্বরের মন্দির ছিল। কিন্তু মন্দিরের অন্যতম সেবায়েত বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী কয়েক বৎসর আগে মন্দির ভাল করিয়া সংস্কার করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা বাবদ অর্থাদি ও কৃষকদের নিকট হইতে ধান গাছ প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। পরে তিনি মন্দিরটি নূতনভাবে নির্মাণ করিবার পরিকল্পনা করেন এবং সেইজন্য লটারী করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। নূতন মন্দির করিবার জন্য শৈলেশ্বর দেবকে তিনি একটি মাটির কুঁড়েঘরে স্থানান্তরিত করেন। মন্দিরের মধ্যে তখন একটি সুড়ঙ্গপথ ছিল। উক্ত গুপ্ত পথ দিয়া গড়মন্দারণে দুর্গমধ্যে যাওয়া যাইত বলিয়া শুনিয়াছি। মন্দিরের সুড়ঙ্গপথটি বড় একটি পাথর দিয়া সব সময় ঢাকা থাকিত। পঞ্চাশ বৎসর আগে **শৈলেশ্বরের মন্দির** ও পাথর ঢাকা দুর্গপথ দেখিবার অনেকের সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় শৈলেশ্বরের মন্দির আজও হয় নাই এবং সংগৃহীত অর্থ কোথায় গেল তাহা জানি না। সুড়ঙ্গপথটি মন্দির ভাঙ্গিবার সময় রাবিশ পড়িয়া, না হয়

ইচ্ছা করিয়া বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শৈলেশ্বর দেব এখন যে কুঁড়েঘরে অবস্থান করিতেছেন, তাহার দুর্দশা দেখিলে ভক্তের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। উহার আলোক-চিত্র এই গ্রন্থে দেওয়া হইল। শৈলেশ্বরের মন্দির পুনরায় নির্মাণ করিবার জন্য আরামবাগের অধিবাসিগণের নিকট আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। কাঁটালি গ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যা ২৮৩ জন। কামারপুকুরের বিষয় ১৩৬৫ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে।

কাঁটালীগ্রামে **বিশালাক্ষ্মী মাতা** আছেন। তিনিও জাগ্রতা দেবী বলিয়া কথিত। বিশালাক্ষ্মী মাতার রথযাত্রার মেলা উপলক্ষে বহু লোক সমাগম হয়। কাঁটালী ও রামনারায়ণপুর গ্রামে তাঁতশিল্পের কাজ এখনও হয়। এইখানে ভিকদাসের মাঠে ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক 'ঠ্যাঙাড়ে' ছিল। তাহারা মারিয়া-ধরিয়া টাকাকড়ি পথিকের কাছ হইতে কাড়িয়া লইত। ডাকাতির জন্যও এই মাঠের আগে খুব দুর্ণাম ছিল।

॥ ডাঃ যতীশচন্দ্র ঘোষ ॥

সুপরিচিত কংগ্রেস কর্মী ডাঃ যতীশচন্দ্র ঘোষের জন্মস্থান আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত নোকুণ্ডা গ্রামে। তিনি বাল্যকালে ঘাটালে শিক্ষালাভের জন্য যান এবং ছাত্রাবস্থা হইতে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া সারা জীবন সেখানেই কাটাইয়াছেন। ১৯২০ সাল হইতে তিনি প্রত্যেক স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণ করিয়াছেন। কংগ্রেস আন্দোলনে বিশিষ্ট নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিপ্লবী মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় নাই। তিনি কংগ্রেসের বামপন্থী নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থক ছিলেন। ১৯৯৪ সালের ৮ই অক্টোবর তিনি পরলোকগমন করেন।

বার্জ হত্যা মামলায় ডাঃ ঘোষ বহুদিন বিনা বিচারে আটক ছিলেন। ১৯৩৭ সালের শেষ ভাগে গান্ধীজীর আপোষ মতে বাংলায় সন্ত্রাস বন্দিগণ মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে যতীশ-বাবুও মুক্তি পান। ডাঃ ঘোষ বহু জনহিতকর কার্য করিয়াছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাঁহার জীবনের ধর্ম ছিল।

॥ করমানা ॥

গোঘাটের অন্তর্গত করমানা গ্রামের পূর্বনাম ছিল **দীননাথ।** এই গ্রাম মান্দারণের দুই মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যে এখন দুইটি বড় বড় তোরণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। উহার গাত্রে পারস্য ভাষায় উৎকীর্ণ দুইখানি শিলালিপিও আছে। এখানে পূর্বে দশবিঘা স্থান পাঁচিল দিয়া বেষ্টিত ছিল; এখন তোরণ দুইটি ছাড়া পাঁচিল প্রায় সমস্ত ভাঙিগয়া গিয়াছে। পুরাতন উড়িষ্যা রোডের উপর এই বেষ্টিত স্থানে পূর্বে সৈন্যদের বাজার ছিল। উত্তর দিকের তোরণ নির্মাণের সাল "হিজরী ১১৪৩" বা খৃষ্টীয় ১৭৩০-৩১ এবং দক্ষিণের তোরণ "হিজরী ১১৪২" বা খৃষ্টীয় ১৭২৯-৩০ বলিয়া উৎকীর্ণ আছে। তোরণ দুইটি এখনও ঠিক আছে, কিছুই নষ্ট হয় নাই। দক্ষিণ দিকের তোরণের নাম "মুবারক মঞ্জিল"। উত্তর দিকের নাম "সরাই"। এই তোরণ দুইটি "হাতীগলা দরজা" বলিয়া কথিত হয়। যে স্থানে তোরণ দুইটি আছে, ঐ স্থানের নাম সানবাদী।

১৭২৩ খৃষ্টাব্দে (হিজরী ১১৩৬) দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে নবাব সুজাউদ্দীন উড়িষ্যা হইতে বাঙলায় আসিবার পথে দীননাথ গ্রামে শিবির স্থাপন করেন।

এবং এইখানে অবস্থানকালে তিনি বাঙ্গলার নবাব নিযুক্ত হইবার শুভ সংবাদ জানিতে পারেন বলিয়া তাহার স্মারকচিহ্ন স্বরূপ তিনি এই স্থানটি প্রাচীর দ্বারা ঘিরিয়া তোরণগুলি নির্মাণ করান। এই বিষয়ে হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ওম্যালী সাহেব লিখিয়াছেনঃ

It was here that Shuja-ud-din was informed of his appointment as Nawab of Bengal and the gateways were apparently erected in commemoration of the good news.

উত্তরদিকের তোরণে পারস্যভাষায় যাহা লেখা আছে তাহার বঙ্গানুবাদ এইঃ

এই সুরক্ষিত স্থান নবাব আলি ফয়েজ বক্সজাহানের নির্দেশে নির্মিত হইয়াছিল। স্বর্গ হইতে একটি ধ্বনি শ্রুত হইল, যাহাতে উক্ত স্থানে "সরাই মুতাসিন উল মুলুক মালজা-ই-আলম" এইভাবে প্রকাশিত হইল। দক্ষিণ দিকের তোরণের পারস্যলিপির বঙ্গানুবাদঃ

মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে নবাব আসাদ জঙ্গ যখন উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গলায় আগমন করেন তখন তিনি দীননাথ নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেন। সম্রাটের আদেশানুযায়ী তিনি এই পরগণার সর্বত্র শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। এই সুসংবাদে প্রজাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। এই কারণে এই স্থানের নাম হইল "মুবারক মঞ্জিল"। এবং ইহাতে সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। যখন আমি এই রম্যস্থানের উপযুক্ত নামকরণের জন্য ভাবিতে লাগিলাম তখন স্বর্গ হইতে একটি ধ্বনি আমার কানে আসিল "মুবারক মঞ্জিল-ই দৌলত সরাহম"।

কিবা নাম কিবা হল-বল হে আকাশ?
মুবারক মঞ্জিল সৌভাগ্য নিবাস।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের 'ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস হ্যান্ডবুকে' এই সম্বন্ধে লেখা আছেঃ

Two large brick gate ways stand leading into and out of an enclosure extending over 8 or 10 bighas. Remains of the enclosure are still visible and the gates are called Hatigala Darwajas.

॥ বাজুয়া ॥

গোঘাটের অন্তর্গত বাজুয়া গ্রামে নবাব নাসিরুদ্দীনের আমলে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। মসজিদের চারদিক পূর্বে প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছিল। এবং ইহার সামনে একটি তোরণ ছিল। তোরণের উপর একখানি শিলালিপি ছিল। তোরণটি পড়িয়া যাওয়ায় শিলালিপি কলিকাতা মিউজিয়মে সংরক্ষণ করা হইয়াছে। মসজিদের গায়ে পারস্যভাষায় লিখিত আর একখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। উক্ত শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাণের তারিখ "৯৩৮ হিজরী" অর্থাৎ ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ লেখা আছে। এই লিপির বঙ্গানুবাদ এইরূপঃ

যিনি এই জগতে কিছু সুন্দর জিনিষ আনেন, ভগবান বলিয়াছেন যে, তিনি ইহার দশগুণ ফল পান। এই জামি মসজিদের দরওয়াজা রাজপুত্র এবং তাহার পুত্র নাসীরউদ্দীন ওয়াদ্দীন আবুল মনফক্ফর নুসরতশাহ যিনি হুসেন শাহের পুত্র এবং সৈয়দ আসরাফ আল হুসেণীর পৌত্র ছিলেন তাহার সময়ে নির্মিত হইল। ঈশ্বর তাঁহার ও তাহার রাজত্বের উপর করুণা বর্ষণ করুন। মজলিস খানওয়ার ৯৩৮ হিজরায় এই মসজিদ নির্মাণ করেন।

বাজুয়ার দীঘির পাড়ে রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবে মেলা হয়। এই গ্রামে পূর্বে খুব ভাল গামছা তৈয়ারী হইত। ইহার পার্শ্ববর্তী গ্রাম **রঘুবাটতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির** আছে। প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় বিশ্বেশ্বর ঠাকুরের স্থানে সাত দিন ধরিয়া মেলা হয়। মেলায় বহু জনসমাবেশ এখনও হয়। বাজুয়ার বর্তমান জনসংখ্যা ১,৫১৫ জন।

॥ গড়-মান্দারণ ॥

আরামবাগ মহকুমায় গোঘাট থানার অন্তর্গত গড়-মান্দারণ একটি খুব প্রাচীন স্থান। আরামবাগ শহরের চারি ক্রোশ পশ্চিমে এই স্থানটি অবস্থিত। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দুর্গেশ নন্দিনীকে এই মান্দারণের গড়ে বসাইয়া এই স্থানের ঐতিহাসিকত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে দুইটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে; একটি **গড়মান্দারণ** আরেকটি আমোদর নদের পশ্চিমতীরে অক্ষাংশ ২২°৫৩' উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৮৭°৪৩ পূর্বে অবস্থিত নাম **ভিতর-গড়।** মান্দারণের গড়ের উত্তর দিকে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অর্ধমাইলব্যাপী পনের কুড়ি ফুট উচ্চ বড় বড় স্তূপের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান আছে। ইহা মুসলমান অধ্যুষিত এখন একটি সামান্য পল্লীগ্রাম। গ্রামের অনেক মুসলমান অধিবাসী যুদ্ধসংক্রান্ত কার্যের পুরস্কারস্বরূপ এখনও নিষ্কর জমি ভোগ করিতেছেন। গ্রামের জনসংখ্যা ১,৯৬৫ জন। দক্ষিণদিকের স্তূপের উপর একটি মসজিদ আছে কিন্তু ইহার কোন আকর্ষণ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেনঃ "মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল এই জনাই তাহার নাম গড় মান্দারণ হইয়া থাকিবে। নগর মধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত, এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ একখণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক বেষ্টিত হইয়াছিল: তৃতীয় দিকে মানব-হস্ত-নিখাত এক গড় ছিল। এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূল শিরঃ পর্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত: দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গ মূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে এই আয়াস লঙ্ঘ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন: দুর্গের নিম্নভাগমাত্র এক্ষণে বর্তমান আছে, অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে। তদুপরি তিন্তিড়ী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা সকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটা দুর্গ ছিল।"

গড় মান্দারণ বহু পুরাতন স্থান। একাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন ঐতিহাসিক সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে ইহাকে **'অপর মন্দার'** বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আইন-ই-আকবরীতে সরকার **'মাদারুণে'র** উল্লেখ আছে। এই সরকারের ফৌজদার আড়াই শত ঘোড়সোওয়ার এবং সাত হাজার পদাতিক সৈন্য দিয়া দিল্লীশ্বরকে সাহায্য করিতেন। বাঙ্গলার সুলতান এই সময় দিল্লীর অধীন ছিলেন। সরকার মাদারুণ ষোলটি মহালে বিভক্ত ছিল এবং এই মহালগুলির মোট রাজস্ব ছিল ৯৪ লক্ষ ৩ হাজার ৪ শত দাম। মহালগুলির নাম ১৬০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বীরভূম জেলার রাজনগর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ধমানের পশ্চিমাংশ, হুগলী জেলার জাহানাবাদ, হাওড়া জেলার কিয়দংশ

লইয়া মেদিনীপুরের চিতুয়া পর্যন্ত সরকার মাদারুণের সীমা ছিল। আকবরের রাজত্ব-কালে আফগান ও মোগলদের যুদ্ধে ইহা উড়িষ্যাগামী রাজপথের উপর বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহার গুরুত্ব ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে গ্যাস্টালডি, হনড্রিভস, ডি-ব্যারো, এবং ব্লেইভের মানচিত্রে প্রদর্শিত অল্প কয়েকটি স্থানের মধ্যেও মান্দারণের উল্লেখ আছে।

গড় মান্দারণ বহু পুরাতন স্থান কারণ সেন ও পাল রাজগণের আগে রাঢ়ের অধীশ্বর শূর বংশীয় রাজগণের গড়মান্দারণ রাজধানী ছিল। এই শূরবংশীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব-প্রথম রণশূরের নাম শিলালিপিতে পাওয়া যায়। তাঞ্জোরের রাজা রাজেন্দ্র চোল ৯৪৬ শকাব্দে দিগ্বিজয়ে বাহির হন এবং দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূরকে পরাভূত করেন। ৯৪৭ শকাব্দায় উৎকীর্ণ তিরুমল পর্বতলিপিতে এই বিবরণ লিখিত আছে (Vide Hulzch's South Indian Inscriptions, Vol. I) তারপর সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এই বংশের পরবর্তী রাজা লক্ষ্মীশূরের নাম ও তাঁহার রাজধানী 'অপর মন্দারে'র যে উল্লেখ আছে তাহা এইঃ

"শূর ইতি অপর মন্দার মধুসূদন সমস্তাটবিক সামন্তচক্রচূড়ামণি লক্ষ্মীশূর।"

কৈবর্ত-বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য একাদশ শতাব্দীতে বরেন্দ্র অভিযানে যে সকল সামন্তগণ রামপালের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন, **অপর-মন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূর** তাঁহাদের অন্যতম। ইনি "আটবিক" অর্থাৎ বনময় প্রদেশের সামন্তগণের প্রধান ইহাও রামপাল চরিতে লিখিত আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থসাহায্য দিয়া রামচরিতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে বহু প্রাচীন সামন্তগণের রাজ্য ও তাঁহাদের রাজধানী নির্ণীত হইতে পারে।

উড়িষ্যা তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে গঙ্গবংশীয় রাজগণের চেষ্টায় গড়মান্দারণ উড়িষ্যার সহিত যুক্ত হয়। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী হুগলী জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত সপ্তগ্রাম, পাণ্ডুয়া, মহানাদের হিন্দু সামন্তরাজগণকে পরাজিত করিয়া উক্ত স্থানসমূহে মুসলমান অধিকার স্থাপন করিলেও গড়মান্দারণ পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু রাজার অধিকারে ছিল। গড়মান্দারণের অধিপতি রাজা গজপতি সিংহকে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সুলতান রুকনুদ্দীন বরবাক শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী পরাজিত করিয়া এই স্থানে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে ইসমাইল গাজী রাজা গজপতি সিংহের পিতলের (?) দুর্গ ধূলিস্যাৎ করিয়া তথায় এই মাটীর দুর্গ নির্মাণ করেন। গজপতি গঙ্গবংশীয় রাজগণের অধীনস্থ সামন্তরাজা ছিলেন।

চোড়গঙ্গের উত্তরাধিকারিগণের তাম্রশাসন হইতে আরও জানা যায় যে, তিনি মন্দার রাজ্যের রাজধানী **আরম্যানগরী** ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং গোদাবরী হইতে ভাগীরথী পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মন্দার ও আরম্যা নাম দুইটি বর্তমান গড়মান্দারণ ও আরামবাগের সহিত অভিন্ন বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন।

মান্দারণগড়ের সন্নিকটে একটি বৃহৎ প্রাচীন পুস্করিণী আছে। উহার জল দেখিতে কাজলের মত ছিল বলিয়া উহার নাম **'কাজলা দীঘি'**। এই জলাশয়ে ছাদারি-মাদারি নামে পূর্বে দুইটি পোষা কুমির ছিল। কথিত আছে, কেহ কোন কামনা করিয়া তাহাদের খাদ্যোপযোগী হাঁস অথবা পায়রা লইয়া জলাশয়ের ঘাটে তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিলে

তাহারা ঘাটে আসিয়া যাহাদের খাদ্য গ্রহণ করিত, তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইত। এই সম্বন্ধে ১৩০২ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের 'জন্মভূমি' পত্রিকায় "গড়মান্দারণ ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত" এবং ১৩২৬ সালের প্রবাসীতে 'দুর্গেশনন্দিনী নিকেতন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ভিতরগড় হইতে বাহির হইলে কিঞ্চিৎ উত্তর ও পশ্চিমে মান্দারণের গড়ের বিরাট মাটির প্রাচীর দেখা যায়। এই প্রাচীর পনের ফুট হইতে স্থানে স্থানে কুড়ি ফুট পর্যন্ত উচ্চ। প্রাচীরের উত্তর দিক দিয়া আমোদর নদ গড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্ব দিকে প্রায় দক্ষিণ সীমায় বাহির হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে ধ্বংসস্তূপ এখনও বিদ্যমান আছে, ইহা দুইশত বর্গগজ বিস্তৃত এবং ইহার মধ্যস্থলের উচ্চতা প্রায় চল্লিশ ফুটের মত হইবে। এই স্তূপের চারদিকের নিম্নাংশ ল্যাটেরাইট পাথরে এবং উপরাংশ ইঁটের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। এই স্তূপ পূর্বে এরূপ গভীর জঙ্গলাবৃত ছিল যে, তখন ইহার ভিতরে প্রবেশ করা যাইত না। এখন সমস্ত গাছ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। এই স্তূপের সর্বোচ্চ চুড়ায় সমতল ক্ষেত্রে একটি প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত বৃহৎ সমাধি আছে। ইহার নাম **বড় আস্তানা।** ইহা তিন স্তর বিশিষ্ট। প্রত্যেক স্তর দুই ফুট উচ্চ। তৃতীয় স্তরের সর্বোচ্চ ধাপে সমাধিটি অবস্থিত। সমাধিটি ছ'ফুট লম্বা ও তিন ফুট উচ্চ। ইহার উত্তর দিকে দুহাত দূরে একটি ইষ্টকস্তম্ভ আছে, উহাতে প্রদীপ জ্বলে। সমাধির চতুর্দিকে ছোট বড় সুনিপুণ অসংখ্য মাটির ঘোড়া দেখা যায়। জনশ্রুতি সন্তানাদি না হইলে সন্তানের জন্য এবং ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভের জন্য এই সকল মাটির মূর্তি সমাধির পাশে রাখা হয়। এই সমাধি গৌড়াধিপ হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজীব। সমাধির আলোকচিত্র দেওয়া হইল।

বড় আস্তানার এক মাইল উত্তর-পূর্বে ভিতরগড়ে আরও একটি দুর্গের বিশাল স্তূপ এখনও বর্তমান আছে। দুর্গমূলস্থিত সমতলক্ষেত্র এখন স্থানীয় মুসলমানদের গোরস্থানরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। উপরে এক পুরাতন ইদ্‌গা। ঈদের সময় এইখানে বিশেষ জনতা হয় এবং নামাজ পড়া হয়। ইদ্‌গা-সংলগ্ন এক জীর্ণ সমাধি-মন্দিরও গাজীসাহেবের কবর বলিয়া কথিত হয়। ইহার নাম **ছোট আস্তানা।** ইহা বড় আস্তানাব ন্যায় প্রাচীন নয়। কিন্তু দুই জায়গায় গাজী সাহেবের কবর হওয়া কখনই সম্ভব নয়। এই বিষয়ে ব্লকম্যান সাহেবের অনুমান যে বরদা পরগণার রাজা গাজী সাহেবের পূজা মানত করিয়া, বর্ধমানেব রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন; এইজন্য বরদা-রাজ কৃতজ্ঞচিত্তে গাজী সাহেবের নামে এই দরগা স্থাপন করেন! আরামবাগ থানার মধ্যে মান্দারণ বলিয়া আর একটি গ্রাম আছে।

ছোট আস্তানার দরজার উপরে আরবী অক্ষরে খোদিত একখানি প্রস্তর-ফলকে (২ ফুট ৪ ইঞ্চি × ১ ফুট পরিমিত) যে লিপি আছে তাহার মৌলভী আবদুল ওয়ালি কিছু কিছু পাঠোদ্ধার করেন। উহাতে ব্যক্ত হইয়াছেঃ "এই মুবারক ফটক আবুল সুজাফর হুসেন শাহের রাজত্বকালে হিজরী ৯০০ সনে (ইং ১৪৯৫-৯৬) নির্মিত হইল।" পরমেশপ্রসন্ন রায় লিখিয়াছেন এই প্রস্তরলিপি কোনও ইদ্‌গা বা আস্তানার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয় নাই। সম্ভবতঃ কোন রণজয়-দৃপ্ত মোসলেম-নায়কের তোরণদ্বারে ইহা স্থাপিত ছিল। কালক্রমে তোরণ ধ্বংসের পর কোন গৃহস্থের ঘরে রক্ষিত হইয়া অবশেষে কোন অনভিজ্ঞ বংশধর কর্তৃক ছোট আস্তানার ললাটে স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

বড় আস্তানার অনতিদূর দক্ষিণদিকে এক অতুচ্চ ভগ্নস্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহার নাম **"ওড়িয়া-মর্দানা"** সম্ভবতঃ এই ওড়িয়া-মর্দানাই পূর্বোক্ত তোরণদ্বারের ধ্বংসাবশেষ। উড়িষ্যার পাঠান অধিপতি এক ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পাঠান রাজ্যের শেষ সীমা এই মান্দারণে এক বিশাল তোরণদ্বার নির্মাণ করেন।

মন্দার নামক এক প্রকার স্বর্গীয় তরু হইতে এই স্থানের নাম **মান্দারণ** হইয়াছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্নব নগেন্দ্রনাথ বসু, গড়-মন্দারণের অপর নাম **বিঠুর গড়,** মুসলমানদিগের আমলে এইস্থানে মৃত্তিকা নির্মিত একটি গড় ছিল বলিয়া লিখিয়াছেন। সুদূর অতীতকালে ইহা হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল; রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত বর্তমানে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। আরামবাগ হইতে বিস্তৃত ভিকদাসের মাঠের পর নবাসন গ্রামের নিকটে যে জরিপ স্তম্ভ আছে, তথা হইতে মান্দারণের দুর্গের প্রাকার আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রাকার প্রায় চার-পাঁচ মাইল হইবে এবং উচ্চতা স্থানে স্থানে বিশ ফুট হইতে তিরিশ ফুট পর্যন্ত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। আমোদর নদী অদ্যাপি এই দুর্গমূল ধৌত করিয়া পূর্বের ন্যায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইলেও পূর্বেকার সেই স্বচ্ছসলিল এখন আর নাই। সংকীর্ণকায় আমোদরের চিত্র দেওয়া হইল।

হোসেন শাহার সেনাপতি ইসমাইল গাজি মান্দারণের হিন্দু-রাজাকে পরাজিত করিয়া এই স্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই স্থানে হজরৎ ইসমাইলের সমাধির নিকট রক্ষিত শিলালিপিতে "৯০০ হিজরি" (অর্থাৎ ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ আছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে ইসমাইলের দরগা, বর্ধমান জয়ের চিহ্ন স্বরূপ শোভা সিংহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ইসমাইলের সমাধি **"ছোট আস্তানা"** বলিয়া পরিচিত। এই সমাধি মুসলমানদের নিকট একটি পবিত্র স্থান। এই স্থানে দুইটি শিলালিপি এখনও আছে। পূর্বে হাফিজ মিঞা সমাধির যখন তত্ত্বাবধান করিতেন তখন তিনি অর্থের জন্য সমস্ত বড় বড় গাছ কাটিয়া দেন এবং বরশা, তালাচাবি, পাথরের সেল্ফ ও চারটি শিলালিপি পান। হাফিজের আগে সলিমুদ্দীন এই আস্তানা দেখিতেন।

বঙ্গদেশে হুগলী জেলার গড়-মন্দারণে ইসমাইলের দেহ এবং রঙ্গপুর জেলার পীর-গঞ্জ থানার অন্তর্গত কাটাদুয়ার গ্রামে তাঁহার মস্তক সমাহিত আছে বলিয়া স্বর্গীয় রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন। তিনি কাটাদুয়ার গ্রামে ইসমাইল গাজির সমাধি স্থানে একজন ফকিরের নিকট "রিসাদ-উসশুদাহা" নামক একখানি পারস্য গ্রন্থ আবিষ্কার করেন; গ্রন্থখানি উক্ত স্থানে রক্ষিত আছে। উক্ত গ্রন্থানুসারে মান্দারণের রাজা গজপতি বিদ্রোহী হইলে, ইসমাইল রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হয় এবং তিনি রাজা গজপতিকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। কিন্তু পরে ইসমাইল ঘোড়াঘাটে হিন্দু সেনাপতি ভান্দসী রায়ের চক্রান্তে নিহত হন। উক্ত সময়ে গড় মান্দারণ গঙ্গবংশীয় রাজা-গণের অধিকার ভুক্ত ছিল বলিয়া পূর্বোক্ত পুস্তক হইতে জানা যায়। সরকার মান্দারণের অন্তর্গত হানিয়া নামক স্থানে হীরক পাওয়া যাইত বলিয়া আবুল ফজল আইন-ই-আক-বরীতে লিখিয়াছেন। 'রিয়াজ-উস-সালাদিন' গ্রন্থেও মান্দারণে হীরকের খনির উল্লেখ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র রাজা বীরেন্দ্র সিংহকে মান্দারণের অধিপতি বলিয়া দুর্গেশনন্দিনীতে লিখিয়াছেন; কিন্তু উক্ত নামটি কল্পিত বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ যে সময়ের কথা তিনি লিখিয়াছেন, সেই সময় মান্দারণে মুসলমান ফৌজদার ছিল এবং রাজা তোডর মল পাঠান দলপতি দাউদ খাঁর ন্যায় মান্দারণে আসিয়া কিছু কাল অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি মান্দারণ হইতে মেদিনীপুর চলিয়া যান এবং পরে মেদিনীপুর হইতে চেতুয়ায় গিয়া অপেক্ষা করেন। সুতরাং সেই সময় বীরেন্দ্র সিংহ নামক কোন হিন্দু রাজার অধিকার থাকিলে, ইতিহাসে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত। একমাত্র মান্দারণের দুর্গ, শৈলেশ্বর শিব এবং মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের নাম ব্যতীত সমস্তই কল্পিত।

মান্দারণ হইতে মিঃ জন, বীমস কর্তৃক আবিষ্কৃত শিলালিপি পারস্য ভাষায় লিখিত এবং তাহাতে মুসলমান ফৌজদারদের কথা লিখিত আছে; কোন হিন্দুর কথা নাই। মান্দারণ দেখিলে উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের বিজয়প্রয়াসী রাজাদের আক্রমণ নিবারণার্থে, কোন হিন্দুরাজার দ্বারা যে প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই প্রাসাদ ও দুর্গ নিরাপদে রাখিবার জন্য, চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর ও গভীর খাল খনন করা হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে হিন্দু নরপতির এই কর্মক্ষেত্র বন্য পশুপক্ষীর লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখন এখানে পাকাবাড়ি দুরের কথা কোন চালাঘরও নাই।

মান্দারণের একটি তোরণে পারস্য ভাষায় লিখিত নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ ছিলঃ

"বিঘাভর জমিন—কুলাভর ধান"

অর্থাৎ এক কুলা ধান এক বিঘা জমির রাজস্ব ছিল। মুসলমান রাজত্বকালেও সরকার মান্দারণের মাত্র কুড়ি, পঁয়ত্রিশ ও পঁচাশী টাকা যথাক্রমে রাজস্ব ছিল বলিযা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব মান্দারণকে বীরভূমের অন্তর্গত বলিয়া লিখিয়াছেন. কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক; কারণ সরকার মান্দারণের অন্তর্গত স্থান সমুহের নাম ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামগুলি দেখিলে মান্দারণ যে বীরভূমে নয় তাহাই প্রমাণিত হইবে।

মান্দারণ বর্তমানে মুসলমানদের দ্বারা অধ্যুষিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম; ইহার দুই মাইল দূরে পশ্চিমপাড়া নামক গ্রামে 'ধর্মমঙ্গল' প্রণেতা খেলারাম চক্রবর্তী এবং চার মাইল দূরে বেলডিহা গ্রামে মাণিক গাঙ্গুলী জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৫৯-৬০ পৃষ্ঠায় ইহাদের বিষয় লেখা হইয়াছে। উকিল আলি মহম্মদ মান্দারণের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন।

ইসমাইল গাজির সমাধি সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থ List of Ancient Monuments in Bengal যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইলঃ

TOMB OF SHAH ISMAIL GHAZI GANI LASHKAR

GARH-MANDARAN

In this place which is the site of a mud fortress of bygone times there is a brick built tomb, supposed to contain the relics of Shah Ismail Ghazi Lashkar, a Muhammedan saint held in great veneration by the Muhammedan residents of the place. There is likewise a stone-lined entrance leading into the fortress.
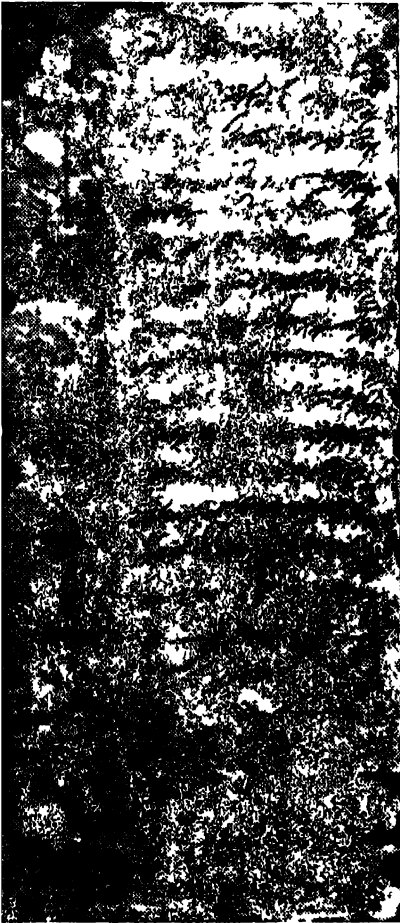
নিস্তারিণী কালী—সেওড়াফুলি
(পৃঃ ১২০১)

সেওড়াফুলির রাজা রাজচন্দ্র রায়ের
বাদশাহী সনন্দ (পৃঃ ১২০০)
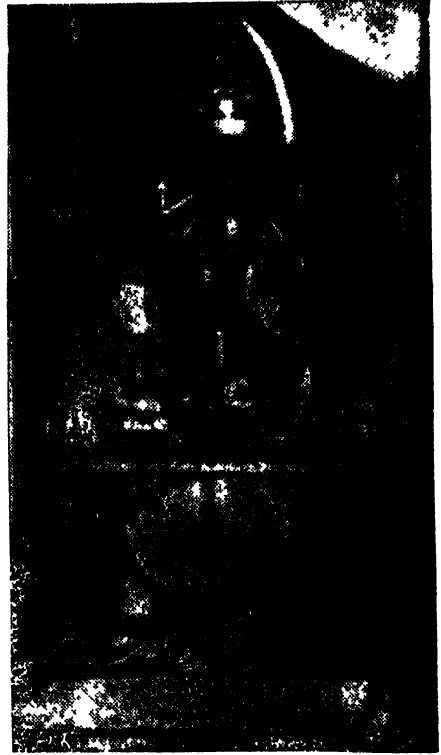
ঘোষ বংশের বিগ্রহ রাধাগোবিন্দজীউ—দশঘরা (পৃঃ ৮২২)
[রথের সময় এই বিগ্রহ রথে আরোহন করেন]

চুঁচুড়ার বরদা সোম প্রতিষ্ঠিত ভাটপাড়া সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

দেবী রাজরাজেশ্বরী—কোন্নগর (পৃঃ ১২২৯)
(মধ্যে দেবী দুর্গা ও দুই পাশে জয়া ও বিজয়া)

ভদ্রেশ্বরের মন্দির—ভদ্রেশ্বর (পৃঃ ১০৪৭)

শিব মন্দির—চাঁদবাটি (১০৮৪)
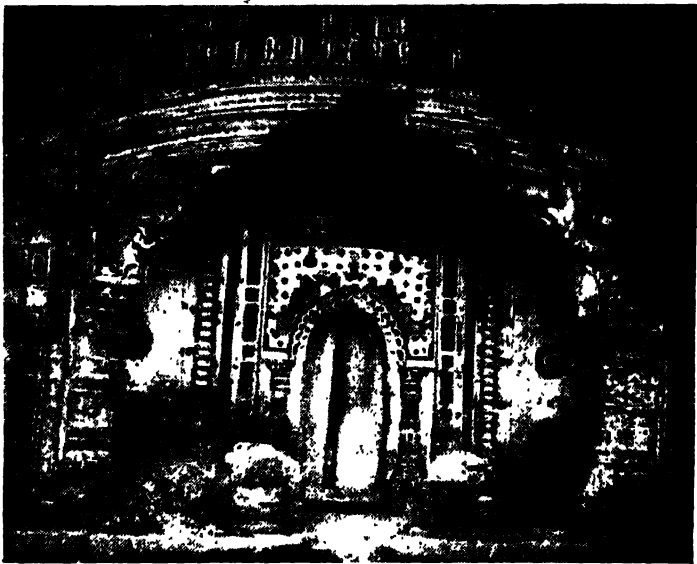
দ্বারিকাচণ্ডীর ভগ্নমন্দির—দ্বারহাট্টা (পৃঃ ১০৮৩)
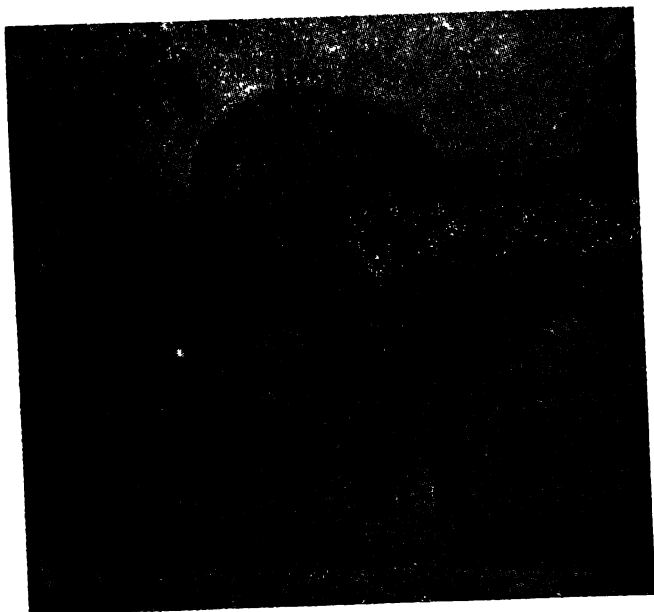
মদনমোহনজীউর মন্দির—শ্রীরামপুর (পৃঃ ১১৬৬

রাজরাজেশ্বরের মন্দির—বারহাট্টা (পৃঃ ১০৮৪)

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৪৫৪)

সারদাচরণ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হুগলী জেলার প্রাচীন মন্দিরের ইষ্টকে ভাস্কর্য-শিল্পের কয়েকটি নমুনা

কুম্ভমূর্তি ধূমপান ছত্রধারিণী

অন্নদাপ্রসাদ সিংহরায় (পৃঃ ৮০৪)

মনোমোহন সিংহরায় (পৃঃ ৯৩৭)

বাধাবল্লভেব মন্দিব--বল্লভপদ্ব (পৃঃ ১১৭২।

জগন্নাথদেবেব মন্দিব –মাহেশ (পৃঃ ১১৮১)
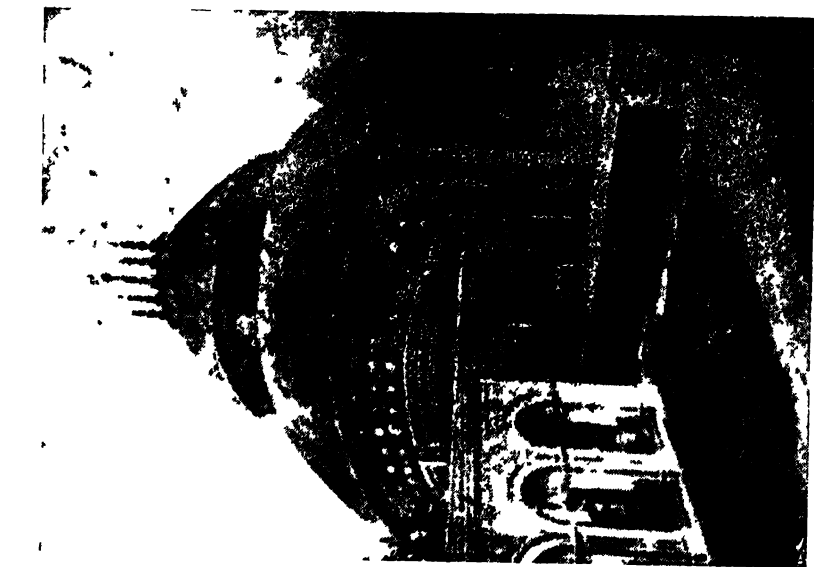
গড় মান্দারণের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে রাঢ়ের হিন্দু রাজবংশের অনেক প্রাচীন ইতিহাস লুক্কাইত রহিয়াছে। কয়েক বৎসর আগে প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রভাসচন্দ্র পাল গড়ের সামান্য একটি অংশ খনন করিয়া মোগল যুগের চারটি তাম্রমুদ্রা আবিষ্কার করেন। উহা হুগলী জেলার প্রত্নশালায় রক্ষিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সত্বর এই অঞ্চলে খনন-কার্য আরম্ভ করিলে অনেক নূতনের সন্ধান পাইবেন একথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।'

১৯১১ খৃষ্টাব্দের 'ডিষ্ট্রিক্ট সেনসাস হ্যাণ্ডবুকে' মান্দারণ সম্বন্ধে লেখা আছেঃ

MANDARAN—About 3 miles west by south of Goghat. It contains the ruins of two forts, the northern one called Gar Mandaran and the southern one Bhitargar.

A little north of the northern ramp lies the ruins of Gar Mandaran. These consists of large mounds, 15 to 20 feet high, covering a space of about half a mile square. On one of the mounds towards the south stands a mosque another remains of a wall.

॥ ঘরগোহাল ॥

আরামবাগ থানার অন্তর্গত মলয়পুর ইউনিয়নের অধীন ঘরগোহাল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ইহা তারকেশ্বর হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে দামোদর নদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত। ইহা একটি কায়স্থ প্রধান গ্রাম এবং বহু শিক্ষিতের বাস। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় পোষ্ট অফিস প্রভৃতি গ্রামে আছে। ধান্য, ইক্ষু, আলু, পাট প্রভৃতি নানারূপ ফসল এখানে প্রচুর হয়। কায়স্থদের মধ্যে মিত্র ও ঘোষ বংশ প্রসিদ্ধ। এই দুই বংশে প্রসিদ্ধ দানবীর পার্বতীচরণ মিত্র ও বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সামাজিক কার্যের জন্য লীগ্ অফ্ নেসান্সের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত **কালী মিত্র** একজন প্রসিদ্ধ সামাজিক কর্মী। বাঁকুড়ার ভূতপূর্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এই গ্রামেরই একজন গ্রামবাসী। এই গ্রামকে পূর্বে আলমবাটি বলা হইত। এই গ্রামের নিকটবর্তী মলয়পুর, শোঁঙালুক, গঙ্গামোড়া, বৈকণ্ঠপুর, রণবাগপুর, দুলালবাটি গ্রাম। কালী মিত্রের লিখিত 'পল্লীগঠনের উপায়' ও দামোদর নদ অতীত ও বর্তমান বিশেষ প্রসিদ্ধ।

॥ স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ॥

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের জন্ম ঘরগোহাল গ্রামে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪। পিতার নাম রামচন্দ্র ঘোষ। গিরিডি, কলিকাতা এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা শেষ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক (১৯১৫-২১) হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের (১৯৫৪-৫৫) পদ অলংকৃত করেন এবং ছাত্রদের উন্নতির জন্য নানান পরিকল্পনা করেন, কিন্তু পুরোপুরি সফল হবার আগেই জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (১৯৫৫) মনোনীত হন। ইনি ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানচন্দ্র স্যার উপাধি পান। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির ইনি অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁহার স্ত্রী **শ্রীমতী নীলিমা দেবী** ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির কাছে পনের হাজার টাকার একটি তহবিল দিয়াছেন। উহার আয় হইতে প্রতি বৎসর বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক আহবান করিয়া উক্ত সংস্থা **জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতার** ব্যবস্থা করিবেন। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রথম বক্তৃতা দেন।

কেশবপুর ও মলয়পুর গ্রামে চড়ক ও দোলপূর্ণিমায় মেলা হয়। এই স্থানের কর্মকারগণ ভাল কুড়াল, কাটারি প্রস্তুত করেন। কেশবপুরে দেশকর্মী ও ব্যবসায়ী শৈলধর ঘোষের বাসস্থান। তিনি বহুবর্ষ হুগলী স্কুল বোর্ডের সহ-সভাপতি ছিলেন।

॥ পুরশুড়া ॥

আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত পুরশুঁড়া থানার মধ্যে ডিহিবাতপুর, ভাঙ্গামোড়া, শ্যামপুর ও পুরশুঁড়া ইউনিয়ন অবস্থিত। দামোদর নদ পুরশুঁড়ার পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার অপর তীরে মার্টিন কোম্পানীর হাওড়া লাইট রেলওয়ের চাঁপাডাঙ্গা স্টেশন। পুরশুঁড়া হইতে তারকেশ্বরের দূরত্ব মাত্র পাঁচ মাইল। পূর্বে এই গ্রামে কোন থানা ছিল না। একটি পুলিস ফাঁড়ি ছিল। আরামবাগ হইতে সমস্ত পুলিসের কার্য সমাধা হইত। তাঁতশিল্প ও লৌহশিল্পের জন্য এই অঞ্চল প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানের **চবগোবর্ধন** গ্রামে মকর সংক্রান্তিতে একটি উৎসব হয়। ইহা ছাড়া **দেউলপাড়া** গ্রামে রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা, **শ্যামপুর** গ্রামে ১লা বৈশাখ চড়কের মেলা, **ঘোলাদিঘরুই** গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কের মেলা ও **ফতেপুরে** পৌষ সংক্রান্তিতে হরিবাসর বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই স্থানের শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্যাদি স্থানীয় হাটে বিক্রয় হয়। এখানকার অধিকাংশ ব্যক্তি কৃষিকাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

পুরশুঁড়ার অন্তর্গত **হরাদিত্য** একটি নগণ্য গ্রাম হইলেও বর্তমানে ইহা কথাসাহিত্যিক শ্রীশশধর দত্তের বাসস্থান বলিয়া সুপরিচিত। তিনি মোহনসিরিজ ও অন্যান্য উপন্যাস লিখিয়া সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার বর্তমান গ্রন্থগুলি সংখ্যা একত্র করিলে প্রায় দুইশত হইবে। তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'শেষ উত্তর', 'যুগের দাবি' ও 'এ যুগের মেয়ে' সিনেমায় প্রদর্শিত হইয়াছে। শোঙালুক ও ভাঙ্গামোড়া সম্বন্ধে ১৩৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ॥

ইনি হুগলী জেলার দীঘড়া গ্রামে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ২০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালের শিক্ষা-দীক্ষার স্থান ছিল গ্রাম্য পাঠশালা। পরপর কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর বর্ধমান মহারাজার স্কুল হইতে তিনি বৃত্তি লাভ করিয়া এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং হুগলী কলেজ হইতে পরবর্তী এফ-এ পরীক্ষায় বৃত্তি পান। অতঃপর এম-এ পরীক্ষায় পাস করিবার পর ইনি কটকস্থিত র‍্যাভেনশ কলেজে তাঁর অধ্যাপক জীবন শুরু করেন। এরপরে কয়েকটি কলেজে অধ্যাপনা করিলেও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত র‍্যাভেনশ কলেজেই তাঁর জীবনের অধ্যাপক জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

এরপর থেকে শুরু হয় তাঁর সাহিত্য-জীবন। এবং তিনি তখন স্থায়ীভাবে বাস করেন বাঁকুড়ায়। ইনি তখন 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতবর্ষ', 'দাসী', 'নব্যভারত', প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। বাংলাভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে তিনি

যথেষ্ট পড়াশুনা করেন এবং এক নূতনদিকের সূচনা করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতিও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই বই সম্পর্কে কয়েকটি পুস্তকও তিনি রচনা করেন। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ', 'রত্নপরীক্ষা', প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্য। ইহা ছাড়াও বাংলা ভাষা ১ম ভাগ ব্যাকরণ, ২য় ভাগ শব্দকোষ, 'চণ্ডীদাস চরিত' প্রভৃতি রচনাগুলি তাঁর রচনার অপরাদিকগুলির পরিচয় বহন করে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়ায় তিনি পরলোকগমন করেন।

॥ মায়াপুর ॥

আরামবাগ থানার অন্তর্গত মায়াপুর একটি খুব প্রাচীন গ্রাম। **দেবী মায়াচণ্ডীর** নামানুসারে এই গ্রামের নাম মায়াপুর হয়। মায়াপুর বেনারস রোডের উপর এবং আরামবাগ শহর হইতে পাঁচ মাইল পূর্বে অবস্থিত। খানাকুলের মধ্য দিয়া জগৎপুরের রাস্তা এই গ্রাম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কবিকঙ্কনের চণ্ডীতে এই গ্রামের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রামে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে **মামুদ শরীফ** নামক এক ডিহিদারের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই গ্রাম সিল্কের ও রেশম বস্ত্রের জন্য খ্যাত ছিল। ডিহিদার শরীফ বংশীয়গণ এখনও এই গ্রামে বাস করেন। বর্ধমানের জ্বর নামক মহামারীতে এই গ্রামের পূর্ব সমৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল, বর্তমানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এবং জনপ্রবাদ যে, উক্ত মসজিদ প্রস্তর নির্মিত ছিল। এই সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে লিখিত আছেঃ

MAYAPUR—Mosque. The site of a Mosque which is according to local tradition was built of stone. (Ancient Monuments in Bengal).

এই মামুদ শরীফের অত্যাচারে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম দামুন্যা গ্রাম ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরে যান। ব্লকম্যান সাহেব হুগলী জেলার ঐতিহাসিক স্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

চুঁচুড়ার পশ্চিমে বায়ড়া পরগণাতে দামোদর নদের দক্ষিণ তীর হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে মায়াপুরে হুসেন শাহ নির্মিত একটি মস্‌জিদ ও পুষ্করিণী এখনও আছে এবং মায়াপুরের বার মাইল উত্তর-পূর্বে হুসেনশাহের স্মৃতিতে শাহ হুসেনপুর নামে একটি গ্রাম আছে। মায়াপুর দামোদরের দক্ষিণ তীর হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে। এখানে গোঁড়া মুসলমানেরা মায়াচণ্ডীর প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল এবং হুশেন শাহ এখানে মৌলানা সিরাজুদ্দিনের মকবারা নির্মাণ করেন। চুনীলাল বসু 'আরামবাগের ইতিকথা'য় বলেনঃ

এখানে মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এবং চতুষ্পার্শ্বে অনুসন্ধান কালে আমি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত বহু ভগ্ন প্রস্তর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সেই সময় উহার নিকটে এক পীরের আস্তানায় আমি একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর দেখিতে পাই। প্রস্তরের একপার্শ্বে আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণের একটি বাণী আছে এবং অপর পার্শ্বে আছে নানা ভঙ্গীতে নরনারীর খোদিত মূর্তি ও কারুকার্য সমূহ। প্রস্তরটি দেখিলেই স্পষ্ট মনে হয় উহা কোন দেবালয়ের ভগ্ন প্রস্তর॥ এই স্থান হইতে কিছুদূরে একটি বৃক্ষতলে আর একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরমূর্তি দেখিতে পাই। উহার অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে কোন দেবীর মূর্তি বলিয়া মনে হয়।

ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, মায়াচণ্ডী নামে কোন এক দেবীর মূর্তি বহু বৎসর

পূর্বে হিন্দুগণ কর্তৃক এখানে পূজিত হইত। দেবীর মন্দিরটি ছিল কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর দ্বারা নির্মিত এবং দেবীর নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম মায়াপুর হয়। তারপর গোঁড়া মুসলমানেরা মায়াচণ্ডীর প্রতিমা ও মন্দির ধ্বংস করে। হুসেনশাহের সময় মস্‌জিদ নির্মাণকালে উক্ত মন্দিরের প্রস্তরগুলি ভাঙিয়া চুরিয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া মস্‌জিদ নির্মাণ এবং মৌলানা সিরাজুদ্দিনের মকবারা নির্মাণের কার্যে লাগান হয়। একটি প্রস্তরের চিত্র দেওয়া হইল।

কোরাণের বাণী লিখিত প্রস্তরটি মসজিদের সম্মুখে ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রস্তরে লিখিত কোরাণের বাণীর বঙ্গানুবাদ আরামবাগের ইতিকথা হইতে প্রদত্ত হইলঃ

"আল্লাহ! তিনি ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বর নাই, চিরঞ্জীব তিনি—স্বয়ং স্বত্ব ও বিশ্বস্বত্তার কারণ তিনি। তন্দ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, নিদ্রাও তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে যাহা কিছু আছে—সে সমস্তের অধিপতি তিনি। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহার সন্নিধানে সুপারিস করিতে সমর্থ-কে আছে এমন ব্যক্তি? তাহাদের সম্মুখ ও পশ্চাতের সমস্তই তিনি অবগত হন এবং তাঁহার ইচ্ছা যতটুকু—তাহা ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের সামান্য অংশেরও অভিব্যাপ্তি তাহারা করিতে পারে না, তাঁহার জ্ঞান স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে—অথচ সে সকলের সংরক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না। বস্তুতঃ তিনিই হইতেছেন মহাসম্ভ্রান্ত মহামহিম।"

বৃটিশ শাসনের প্রথম ভাগে এখানে প্রচুর সিল্ক ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইত। মায়াপুর গ্রামখানি বর্ধমান জ্বরের মহামারিতে ধ্বংস হইয়া যায় তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কেবল এই গ্রামখানি নয় ইহার আশেপাশে প্রায় পঞ্চাশখানি গ্রাম বর্ধমানজ্বর নামক মহামারীতে কিরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহার বর্ণনা মায়াপুরের পাশে সারাবাটী গ্রামের অধিবাসী রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানব চিত্র' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইলঃ

"কি পাপে কাহার অভিশাপে সোনার সারাবাটীর আজ এই দুর্দশা হইল! সারাবাটীর নিকটস্থ মায়াপুর, রসুলপুর, বাঘারচক্‌, হরাদিত্য, বলরামপুর, মোহনপুর, মুথাডাঙ্গা, ধরমপোতা প্রভৃতি পঞ্চাশখানি গ্রাম একেবারে শ্মশানে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে;—স্বয়ং যমরাজ বুঝি হুগলী জেলাব এই সমস্ত গ্রামগুলি ধ্বংস-মুখে প্রেরণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে,—তাই ভীষণ ম্যালেরিয়া রাক্ষসী করাল-বদন-ব্যাদন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সারাবাটী ও তন্নিকটস্থ গ্রামগুলি হইতে ঘরে ঘরে অহোরাত্র ভীষণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইতেছে। এই ক্রন্দনধ্বনির সঙ্গে শৃগাল কুকুরের বিকট রবের কি ভীষণ সমাবেশ।"

"হুগলী জেলার অধিকাংশ গ্রাম এই ম্যালেরিয়া বৎসরে দানবের লীলাভূমি হইয়াছিল। সারাবাটী ও মায়াপুর গ্রাম একেবারে লোকশূন্য হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রাম দুইখানির বোধ হয় চৌদ্দ আনা লোক ম্যালেরিয়ার করালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। পূর্বে সারাবাটী ও মায়াপুর গ্রামের যে শ্রী ছিল এখন তাহার কিছুই নাই।"

হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে মায়াপুর সম্বন্ধে এই কথা লেখা আছেঃ

In the early British days a considerable quantity of silk cloth was manufactured here; but it is now a decadent village, having suffered greatly from the epidemics of Burdwan fever.

মায়াপুরে রবিবার ও বৃহস্পতিবার বিখ্যাত পশুর হাট বসে। এত বড় পশুর হাট জেলার মধ্যে আর নাই। মায়াপুরে জেলা বোর্ডের একটি বাংলো আছে॥ সরাটি-মায়াপুর শ্রীরামকৃষ্ণের মাতা শ্রীমতী চন্দ্রমণিদেবীর জন্মস্থান।

॥ ডিহি বায়ড়া ॥

ডিহি বায়ড়া আরামবাগের দুই মাইল পূর্বে মায়াপুর ইউনিয়নে অবস্থিত একটি সামান্য স্থান বলিয়া পরিগণিত হইলেও, প্রাচীনকালে ইহা একটি হিন্দু রাজার রাজধানী বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নরেন্দ্রনারায়ণ বুন্দেলখণ্ড হইতে এইস্থানে আগমন করিয়া স্বীয় ভুজবলে বহু রাজার উপর প্রাধান্য স্থাপন পূর্বক বায়ড়ায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্রের নাম রাজা জয়নারায়ণ, এবং পৌত্রের নাম রাজা বিজয়নারায়ণ; বিজয়নারায়ণের পুত্র সংগ্রাম সিংহ মুসলমান রাজত্বকালে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার পুত্রের নাম রণজিৎ রায়; তিনি একজন সাধক পুরুষ ছিলেন এবং অদ্যাপি তাঁহার নাম লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এই রাজবংশ জাতিতে সদ্গোপ ছিলেন এবং রণজিৎ রায় প্রত্যেককে ভূরিভোজন করাইয়া এক ছড়া সুবর্ণময় হার উপহার দেওয়ায় তাহার জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে 'প্রতিহার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রণজিৎ রায় স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এবং কিম্বদন্তী এইরূপ যে বিক্রমপুর গ্রামের জাগ্রতা শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী দেবী তাঁহার কন্যার-বেশে রাজবাড়ীতে অবস্থান করিতেন।

ইহা ব্যতীত লোক মুখে আরও শুনিতে পাওয়া যায় যে, জমিদার রণজিৎ রায় বাল্যকাল হইতে শক্তির সাধনা করেন। পরে গুরুর কৃপায় শব-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া মায়ের সাক্ষাৎ পান। এবং জগন্মাতাকে কন্যারূপে পাইবার জন্য বর প্রার্থনা করেন। মা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং তাঁহাকে বলেন, 'আমি যখন যাই যাই বলিব তখন বিরক্ত হইলে আর তোমার গৃহে থাকিব না।' জগন্মাতাকে কন্যারূপে পাইয়া রণজিৎ মহানন্দে বাস করেন।

বায়ড়া গ্রামের দক্ষিণে রণজিৎ রায়ের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে; ইহার ইহার জলকর প্রায় দেড়শত বিঘা। এক সময় এক শাঁখারী আসিয়া রাজার নিকট হইতে একজোড়া শাঁখার মূল্য চাহিল এবং কহিল যে তাহার কন্যা শাঁখা পরিয়া বলিয়া দিয়াছে যে, ঘরের অমুক স্থানে একটি কৌটার মধ্যে তাহার টাকা আছে।

শাঁখারীর কথা শুনিয়া রাজা আশ্চর্য হইয়া গেলেন, কারণ রাজার কোন কন্যা ছিল না। কিন্তু কৌটার মধ্যে শাঁখারীর কথামত টাকা প্রাপ্ত হওয়ায় রাজা বিশেষ আশ্চর্য হইয়া গেলেন, এবং কে যে শাঁখা পরিয়াছে, তাহা তাঁহাকে দেখাইবার জন্য তিনি জেদ ধরিলেন।

রাজার কথামত শাঁখারী কাতরকণ্ঠে দীঘির পাড়ে যাইয়া কন্যাকে ডাকিতে লাগিলেন এবং পূর্বোক্ত রাজকন্যা পুষ্করিণীর মধ্য হইতে শাখা পরা হাত দুইটি রাজাকে দেখাইলেন। তিনি এই দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সেই সময় দৈববাণী হয় যে, অদ্য এই পুষ্করিণীতে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব হইবে, এবং স্নানার্থিগণ গঙ্গাস্নানের ফললাভ করিবে। সেই দিন বারুণী ছিল এবং চকিতের মধ্যে দৈববাণী সর্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল এবং হিন্দুগণ দলে দলে সমাগত হইয়া উক্ত দীঘিতে পুণ্যস্নান করিয়া গেল।

উক্ত সময় হইতে প্রতি বৎসর বারুণী এবং মকর সংক্রান্তিতে বহু লোক এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসে এবং তদুপলক্ষে এই স্থানে বারুণীর সময় একটি প্রকাণ্ড মেলা বসে।

এই সম্বন্ধে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের 'ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস হ্যাণ্ডবুকে' লিখিত আছেঃ

Ranjit Rai's tank at Dihi Bayra is 3 miles to the south-east of Arambag on the road to Arandi. It is a large tank, a quarter of a mile square, to which a quaint and touching legend is attached.

রণজিৎ রায়ের পুত্রের নাম অচ্যুতানন্দ, তাহার পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র। এই রাজবংশের বংশধরগণ বায়ড়া ব্যতীত মাধবপুর, দিঘড়া, সালালপুর প্রভৃতি গ্রামে বর্তমানে বসবাস করেন।

রণজিৎ রায়ের সময় বায়ড়া একটি পরগণা ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির এবং প্রবাদ অদ্যাপি তাঁহার কীর্তির সাক্ষ্যদান করিতেছে। ডিহিবায়ড়ার জনসংখ্যা ১,৪২২ জন।

গড়বাটী ॥ আরামবাগ হইতে পূর্বে এক মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে বিখ্যাত সদ্গোপ রাজা রণজিৎ রায় বাস করিতেন। ইনি বাড়ির চতুর্দিকে গড় নির্মাণ করিয়া এই স্থানের নাম গড়বাটী দিয়াছিলেন। গড়বাটীর দক্ষিণে ডিহিবায়ড়া গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ দীঘি এখনও আছে। রণজিৎ রায়ের বংশধরগণ এখানে এখনও বাস করেন।

লোকমুখে শোনা যায় যে, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় তাঁহার দ্বাপর যুগের সখা শ্রীদাম কলিযুগে অভিরাম নাম (শ্রীচৈতন্যদেবের দেওয়া নাম) গ্রহণ করেন। তারপর তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া একাকী বঙ্গদেশাভিমুখে আগমন করেন। অবশেষে তিনি বীরভূম ও বাঁকুড়ার অধিবাসিগণের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমামৃত দান করিয়া বায়ড়ায় উপস্থিত হন।

বায়ড়ায় উপস্থিত হইবার পর যাহা ঘটিয়াছিল সেই সম্পর্কে বিধুভূষণ ভট্টাচার্য প্রণীত 'অভিরাম গোস্বামী' নামক পুস্তকে বর্ণিত বিবরণ এখানে উদ্ধার করিঃ

অনন্তর অভিরাম গোস্বামী বায়ড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় রণজিৎ রায় নামক একজন মহাশক্তিসাধক রাজা ডিহি বায়ড়ায় রাজত্ব করিতেন। তিনি এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। রাজা রণজিৎ ঐ সরোবরে এক সুদীর্ঘ, বিপুলায়তন 'মালজোট' প্রোথিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। বহুসংখ্যক বলবান ব্যক্তি ঐ 'মালজোট' তুলিয়া দীর্ঘিকা মধ্যে নিহিত করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কিছুতেই উহা উত্তোলন করিতে পারিতেছিল না।

দৈবশক্তিসম্পন্ন অভিরাম ঠিক সেই সময় ঐ স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি এই ব্যাপার দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কিছুক্ষণ সরোবরতীরে দণ্ডায়মান রহিলেন। অতঃপর তিনি যখন দেখিলেন যে, সমবেত ব্যক্তিবর্গ কোনক্রমেই প্রকাণ্ড 'মালজোট' তুলিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি স্বয়ং ঐ কার্য সম্পন্ন করিতে অভিলাষী হইলেন।

অভিরাম তাঁহার মনোগত ভাব প্রকাশ করিলে রাজা রণজিৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন গোবর্ধনধারী কৃষ্ণসখা অভিরাম অবলীলাক্রমে 'মালজোট' উত্তোলন করিয়া সরোবর মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত-শক্তি সন্দর্শন করিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

শেষ

॥ ১৩৭ ॥

অরবিন্দ ঘোষ (পৃঃ ১২২৪)

রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের থামে
পোড়ামাটির চিত্রাবলী
দ্বারহাট্টা (পৃঃ ১০৮৪)
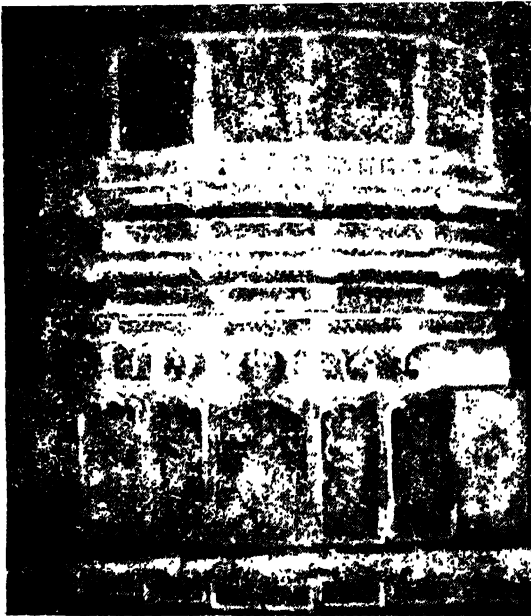
নন্দদুলালজীউর মন্দিরের থামে
দেবী দুর্গা প্রভৃতির পোড়ামাটির
চিত্রাবলী—গড়াপ (পৃঃ ৭৯১)

ভাণ্ডারহাটি হইতে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বর মূর্তি (দশম শতাব্দী)
(পৃঃ ১১৪৮)
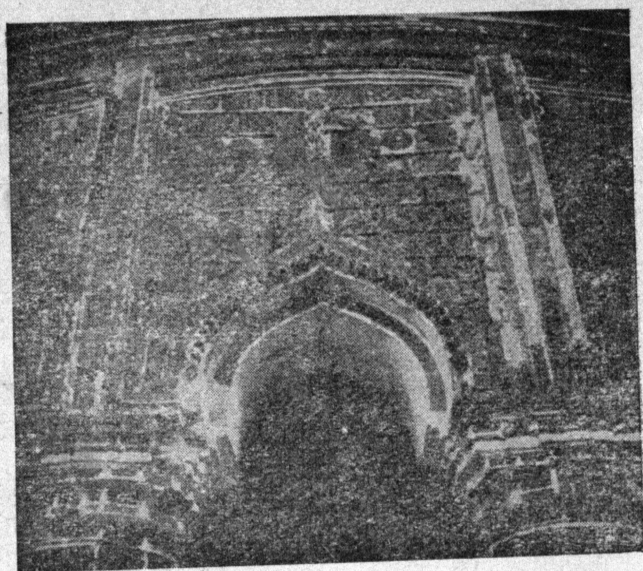
রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের
ানের উপর পোড়ামাটির
—দ্বারহাট্টা (পৃঃ ১০৮৪)

দ্বারিকাচণ্ডী মন্দিরের একখানি
ইঁটের ভাস্কর্যশিল্প—দ্বারহাট্টা
(পৃঃ ১০৮৪)
[লেখক কর্তৃক সংগৃহীত]
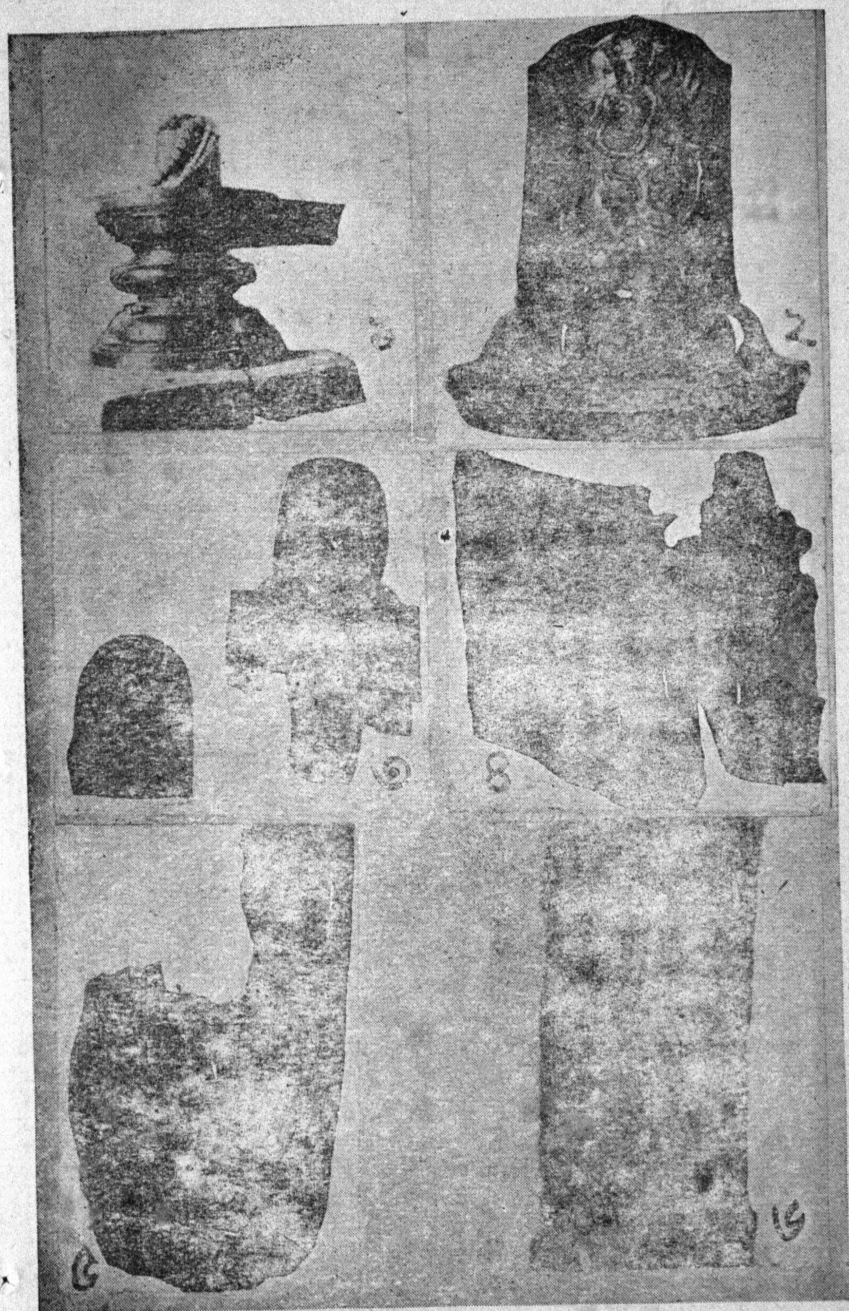
১। রাঘবেশ্বর—বৈদ্যবাটী (পৃঃ ১২০৯), ২। চামুণ্ডা—ভাস্তাড়া (পৃঃ ৮১১)
৩। পার্বতী—সেওড়াফুলি ও বিষ্ণু —মহানাদ (পৃঃ ১১৫২), ৪। বিষ্ণু—দীঘা,
৫। বিষ্ণু—পুনাজগড় (পৃঃ ১১৫২), ৬। পার্শ্বনাথ—পাণ্ডুয়া (পৃঃ ১১৫২)।

১। বিশাল গৌরীপট্ট-মহানাদ, ২। বুদ্ধদেব-রামপুরহাট, ৩। মন্দিরের থাম, ৪। বিষ্ণুমূর্তি—মাদড়া, ৫। বিষ্ণুমূর্তির নিম্নাংশ-দ্বারবাসিনী, ৬। প্রাচীন

সারদাচরণ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হুগলী জেলার প্রাচীন মন্দিরের ইষ্টকে ভাস্কর্যশিল্পের কয়েকটি নমুনা
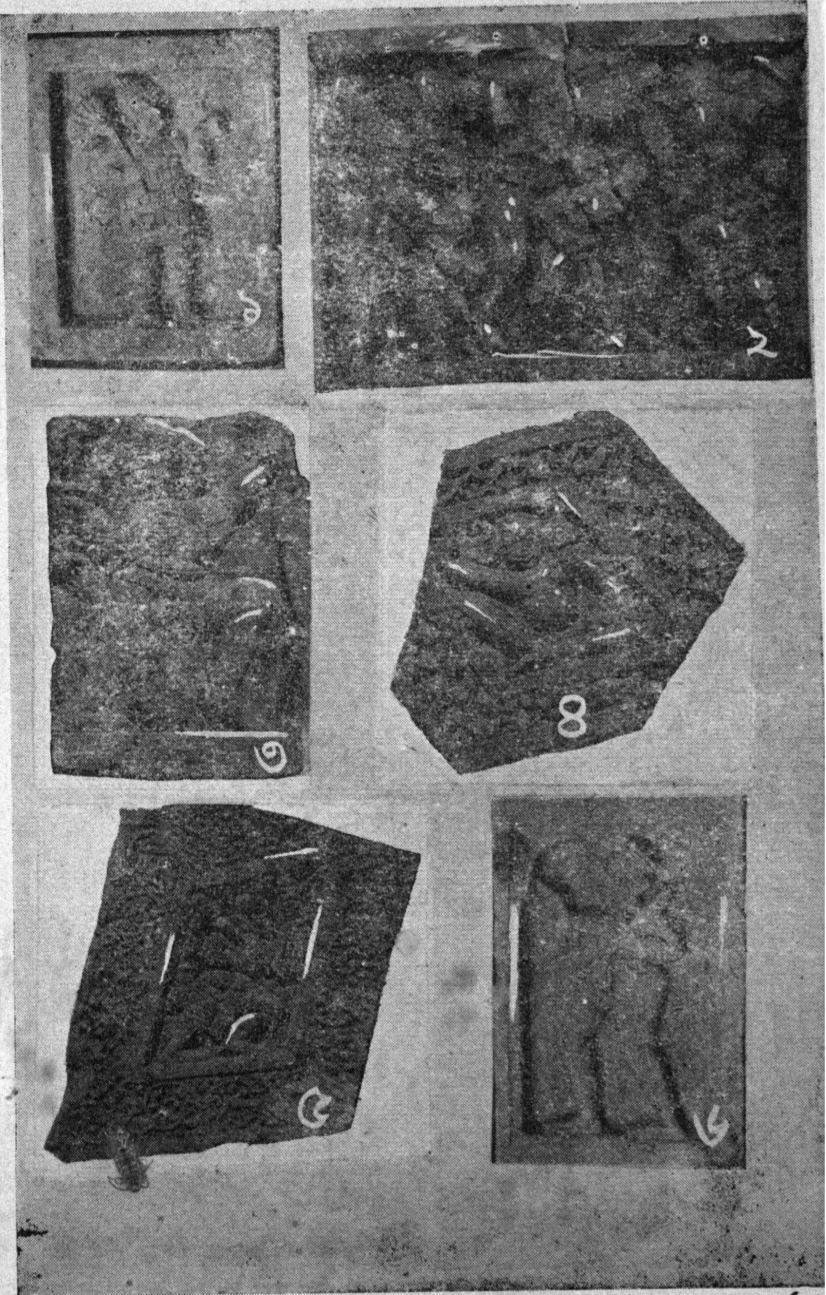
১। মহাবীর—কাঁকড়াকুলি, ২। শোভাযাত্রা—কাঁকড়াকুলি, ৩। মহাবীর—সিঙ্গুর

[১] নৃত্যরত ভৈরব—মাদড়া (পৃঃ ১১৫২)

[৩] বড়মাকালী—বৈঁচী (পৃঃ ৮৯৬)
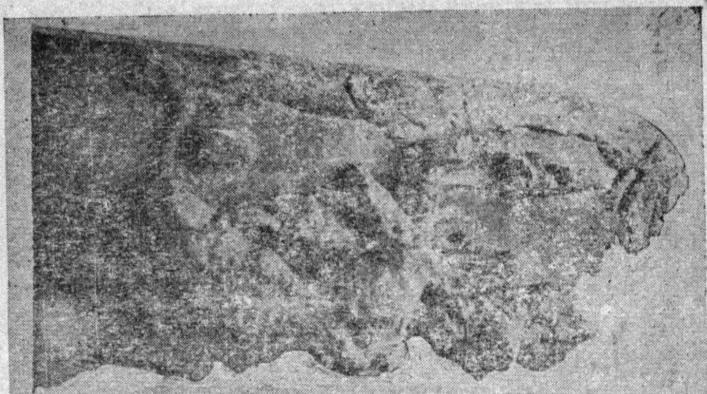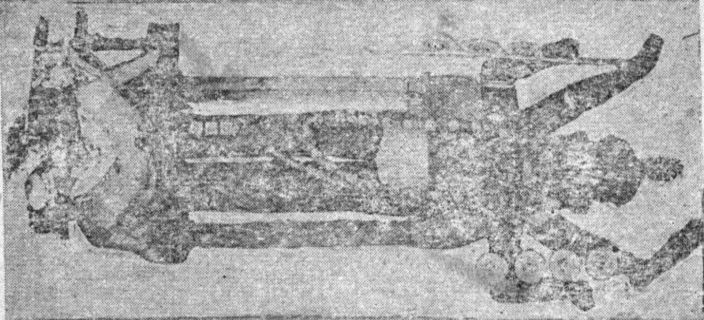
[২] বিষ্ণুমূর্তি—পাণ্ডুয়া (পৃঃ ১১৫২)

[৪] বিষ্ণুমূর্তি—কানপুর (পৃঃ ১১৫২)

১১৭৭ সালে রেজা খাঁ প্রদত্ত রিষড়া সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার সেবায়েত বলরাম পাকড়াশীকে দেয় তায়দাত (পৃঃ ১২১৫)
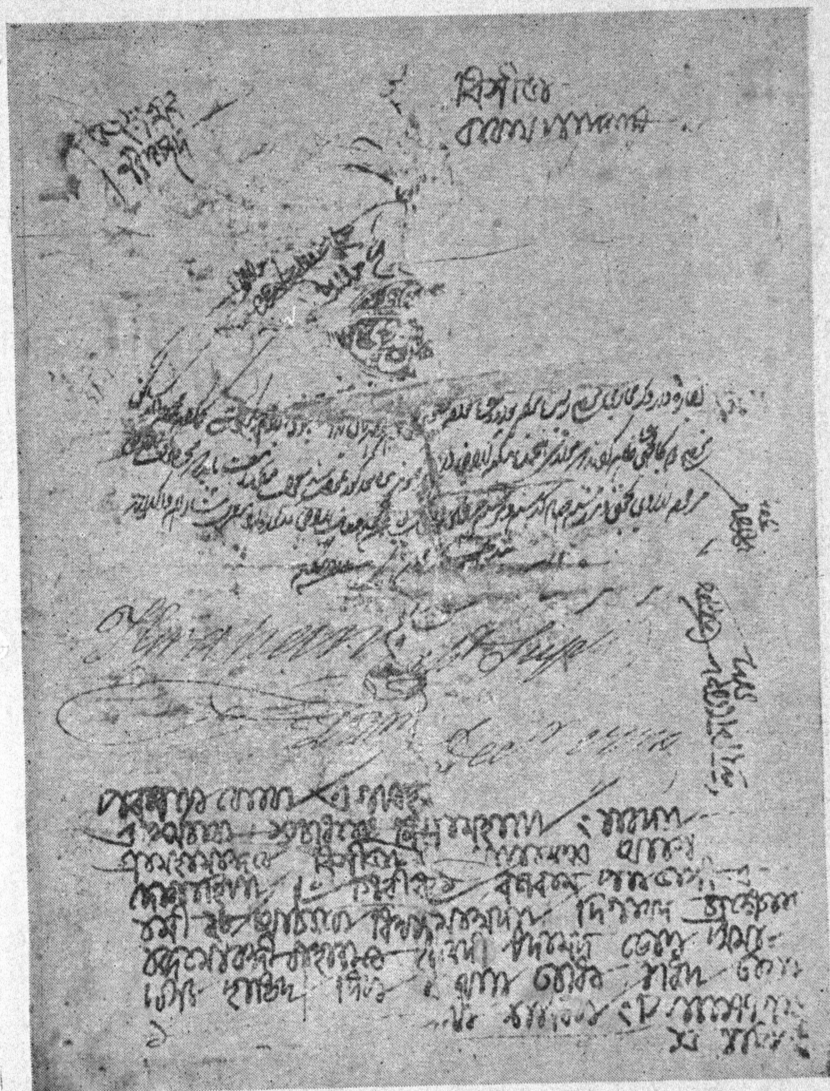
পাঠোদ্ধার: রিসীড়া/বলরাম পাকড়াসী/পরগণা বোরো এগারহ (অস্পষ্ট) সুচরিতেষু প্রিয় মহাশয় (অস্পষ্ট) গ্রামহামজকুরে রিসীড়ায় কার্যঞ্চ আগে দোগাহিয়ায় ৺গিরীধর ৺বলরাম পাকড়াসী এ জমী ১৮/০ আঠারো বিঘা সমুদায় দিগাবাদ ব্রহ্মোত্তর জব্দ-জমাবন্দী বাহালমতে (অস্পষ্ট) বদামদ ভোগদখল জন্য ছাড়িয়া দিলাম। অদ্য তারিখ সন ১১৭৭ সাল ১৫ কার্তিক। ঈশাদি শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা। শ্রীমনোহর রায়।

বিশালাক্ষী মাতা আনুড় (পৃঃ ১৩৬৬)